শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

ষষ্ঠ সম্ভার

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রকাশক : সুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

ষষ্ঠ মুদ্রণ

মুদ্রক :
শ্রীলক্ষ্মী প্রিণ্টিং এণ্টারপ্রাইজার্স
২১বি, রাধানাথ লেন, কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৬ষ্ঠ
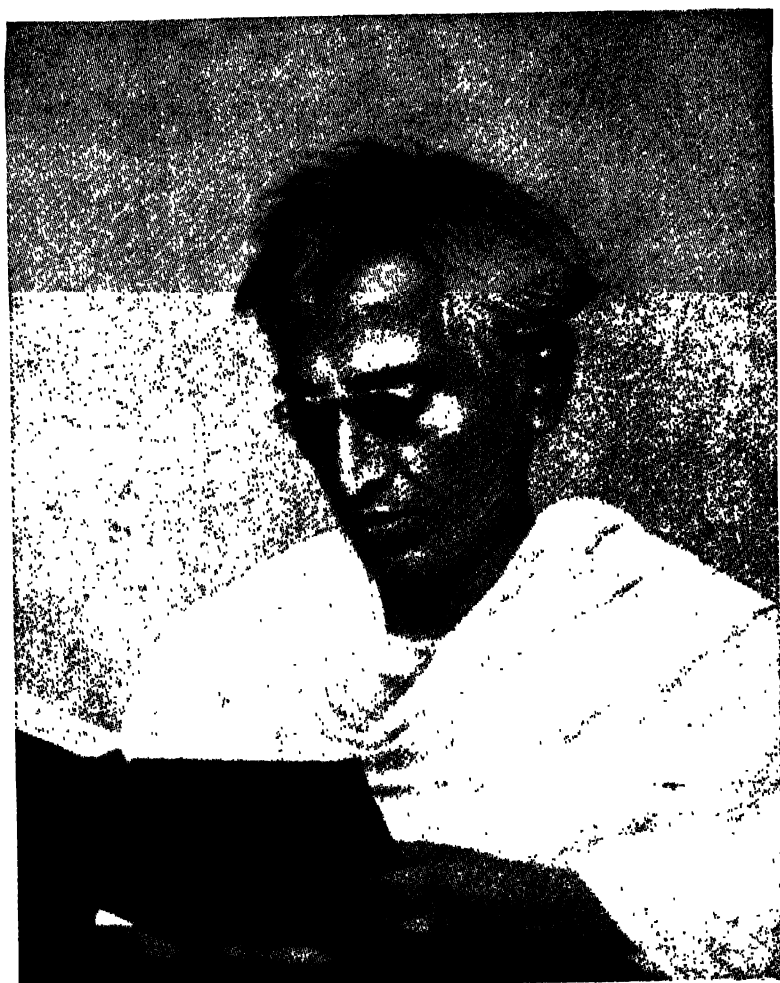
বিপ্রদাস

বিপ্রদাস

১

বলরামপুর গ্রামের রথতলায় চাষা-ভূষাদের একটা বৈঠক হইয়া গেল। নিকটবর্ত্তী রেলওয়ে লাইনের কুলি গ্যাং রবিবারের ছুটির ফাঁকে যোগদান করিয়া সভার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিল এবং কলিকাতা হইতে জন-কয়েক নাম-করা বক্তা আসিয়া আধুনিক কালের অসাম্য ও অমৈত্রীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া জ্বালাময়ী বক্তৃতা দান করিলেন। অসংখ্য প্রস্তাব গৃহীত হইল ও পরে শোভাযাত্রায় বন্দেমাতরম্ ধ্বনি-সহযোগে গ্রাম পরিক্রমণপূর্ব্বক সেদিনের মত সম্মিলনীর কার্য্য সমাধা হইল।

বলরামপুর সমৃদ্ধ গ্রাম। ছোট-বড় অনেকগুলি তালুকদার ও সম্পন্ন গৃহস্থের বাস। একপ্রান্তে মুসলমান কৃষকপল্লী ও তাহারই অদূরে ঘরকয়েক বাগ্দী ও দুলেদের বসতি। ভাগীরথীর একটি শাখা বহুকাল পূর্ব্বে মজিয়া অর্দ্ধবৃত্তাকারে ক্রোশেক বিস্তৃত বিলের সৃষ্টি করিয়াছে; ইহারই তীরে তাহাদের কুটির। এই গ্রামের সর্ব্বাপেক্ষা বিত্তশালী ব্যক্তি যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায়। জমি-জমা তালুক-তেজারতি প্রভৃতিতে তাঁহার সম্পত্তি-সম্পদ প্রচুর বলিলে অতিশয়োক্তি হয় না। তাঁহার সুবৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখের পথে এই শোভাযাত্রা যখন রক্তপতাকায় লিখিত নানাবিধ 'বাণী' ও বিপুল চীৎকারে কৃষক-মজুরের জয়-জয়কার হাঁকিয়া অতিক্রম করিতেছিল, তখন দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া এক দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ-গঠন যুবক নীচের সমস্ত দৃশ্য নিঃশব্দে নিরীক্ষণ করিতেছিল। অকস্মাৎ তাঁহার প্রতি দৃষ্টি পড়ায় বিক্ষুব্ধ জনতার উদ্বেলিত কোলাহল যেন এক মুহূর্ত্তে নিবিয়া গেল। পুরোবর্ত্তী নেতৃস্থানীয় জন দুই-তিন ব্যক্তি চমকিয়া ইতস্ততঃ চাহিয়া বহু লোকের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া উপরের দিকে মুখ তুলিতেই তিনি থামের আড়ালে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, কে?

অনেকেই চাপা মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিল, বিপ্রদাসবাবু!

কে বিপ্রদাস? গাঁয়ের জমিদার বুঝি?

কে একজন কহিল, হাঁ।

নেতারা সহরের লোক, কাহাকেও বড় একটা গ্রাহ্য করেন না; উপেক্ষাভরে কহিলেন, ওঃ—এই! এবং পরক্ষণেই উচ্চ চীৎকারে মাথার উপরে হাত ঘুরাইয়া

সমস্বরে হাঁকিলেন, 'বল ভারত মাতার জয়!' 'বল কৃষাণ মজুরের জয়!' 'বল বন্দেমাতরম্!'

বিশেষ ফল হইল না। অনেকেই চুপ করিয়া রহিল, অথবা মনে মনে বলিল, এবং যে দুই-চারিজন সাড়া দিল তাহাদেরও ক্ষীণ-কণ্ঠ বেশি উর্ধ্বে উঠিল না—বিপ্রদাসের বারান্দা ডিঙাইয়া তাঁহার কানে পৌঁছিল কি না বুঝা গেল না। নেতারা নিজেদের অপমানিত জ্ঞান করিলেন, বিরক্ত হইয়া কহিলেন, এই একটা সামান্য গ্রাম্য জমিদার তাকেই এত ভয়! ওরাই ত আমাদের পরম শত্রু—আমাদের গায়ের রক্ত অহরহ শুষে খাচ্চে। আমাদের আসল অভিযান ত ওদেরই বিরুদ্ধে! ওরা যে—

প্রদীপ্ত বাগ্মিতায় সহসা বাধা পড়িল। বহু শাণিত শর তখনও তাঁহাদের তূণে সঞ্চিত ছিল, কিন্তু প্রয়োগ করায় বিঘ্ন ঘটিল। কে একজন ভিড়ের মধ্য হইতে আস্তে বলিল, ওঁর দাদা!

কার?

একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের যুবক নিশান লইয়া সকলের অগ্রে চলিয়াছিল, সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, উনি আমারই বড়ভাই।

অথচ এই ছেলেটির আগ্রহ, উদ্যম ও অর্থব্যয়ে আজিকার অনুষ্ঠান সফল হইতে পারিয়াছিল।

ওঃ—আপনার! আপনিও বুঝি এখানকার জমিদার?

ছেলেটি সলজ্জ নতমুখে চুপ করিয়া রহিল।

২

বিপ্রদাস নিজের বসিবার ঘরে ছোটভাইকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিল, কালকের আয়োজনটা মন্দ হয়নি। অনেকটা চমক লাগাবার মত। War cry গুলোও বেশ বাছা বাছা, ঝাঁজ আছে তা মানতেই হবে।

দ্বিজদাস চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বিপ্রদাস প্রশ্ন করিল, শোভাযাত্রাটি কি বিশেষ করে আমারই উদ্দেশে আমার নাকের ডগা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ল? ভয় পাব বলে?

দ্বিজদাস শান্তভাবে জবাব দিল, শুধু আপনার জন্যেই নয়। শোভাযাত্রা যে পথ দিয়েই নিয়ে যাওয়া হোক, ভয় যাদের পাবার তারা ত পাবেই দাদা!

বিপ্রদাস মুচকিয়া হাসিল। সে একেবারে অবজ্ঞা-ভরা। বলিল, তোমার দাদা ঠিক সে জাতের মানুষ নয়, এ খবর তোমার শোভাযাত্রীরা অনেকেই জানত। নইলে তাদের জয়ধ্বনি শোনবার জন্য আমাকে বারান্দায় উঠে গিয়ে কান পেতে দাঁড়াতে হ'ত না। ঘরে বসে শোনা যেত। তোমাদের রকমারি নিশান আর বড় বড় বক্তৃতাকে ভয় আমি করিনে। বেশ বুঝি ঝকঝকে বাঁধান দাঁত নিয়ে মানুষকে শুধু খিঁচোনোই যায়, তাতে কামড়ানোর কাজ চলে না।

যে কারণে কাল বহু লোকেরই কণ্ঠরোধ হইয়াছিল তাহা গোপন ছিল না। এবং ইহারই ইঙ্গিতে দ্বিজদাস মনে মনে গভীর লজ্জা বোধ করিল। সে স্বভাবতঃ শান্ত-প্রকৃতির মানুষ, এবং দাদাকে অত্যন্ত মান্য করিত বলিয়া হয়ত আর কোন প্রসঙ্গে চুপ করিয়াই থাকিত, কিন্তু যা লইয়া তিনি খোঁচা দিলেন সে সহা কঠিন। তথাপি মৃদু-কণ্ঠেই বলিল, দাদা, বাঁধানো দাঁত দিয়ে যেটুকু হয় তার বেশি যে হয় না এ আমরা জানি, শুধু আপনারাই জানেন না যে সংসারে সত্যিকার দাঁতওয়ালা লোকও আছে, কামড়াবার দিন এলে তাদের অভাব হয় না।

জবাবটা অপ্রত্যাশিত। বিপ্রদাস আশ্চর্য্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, বটে!

দ্বিজদাস প্রত্যুত্তরে কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সভয়ে থামিয়া গেল। ভয় বিপ্রদাসকে নহে, অকস্মাৎ দ্বারের বাহিরে মায়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—তোরা দরজায় পর্দ্দা টাঙিয়ে রাখিস্ কেন বল্ ত? ছোঁয়া-ছুঁয়ি না করে যে ঘরে ঢুকবো তার জো নেই! ঘর-সংসার বিলিতি ফ্যাশানে ভরে গেল।

দ্বিজদাস ব্যস্ত হইয়া পর্দ্দাটা টানিয়া দিল, এবং বিপ্রদাস চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। একজন প্রৌঢ়া বিধবা মহিলা ভিতরে প্রবেশ করিলেন। বয়স চল্লিশ উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু রূপের অবধি নাই। একটু কৃশ, মুখের পরে বৈধব্যের কঠোরতার ছাপ পড়িয়াছে তাহা লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়। ছোটছেলের দিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরিয়া বড়ছেলেকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, হাঁ রে বিপিন, শুনচি নাকি একাদশী নিয়ে এ মাসে পাঁজিতে গোল বেঁধেচে? এমন ত কখনও হয় না।

বিপ্রদাস কহিল, হওয়া ত উচিত নয় মা!

তুই স্মৃতিরত্নমশাইকে একবার ডেকে পাঠা। তাঁর মতটা কি শুনি।

বিপ্রদাস ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তা পাঠাচ্চি। কিন্তু তাঁর মতামতে কি হবে মা, তোমার কানে একবার যখন খবর পৌঁছেচে, তখন ও-দুটো দিনের একটা দিনও তুমি জল-স্পর্শ করবে না তা জানি।

মা হাসিলেন, বলিলেন, মিথ্যে উপোস করে মরা কি কারও সখ রে? কিন্তু উপায় কি? এ করলে পুণ্যি নেই, না করলে অনন্ত নরক। হাঁ রে, বৌমা বলছিলেন, খবরের কাগজে লিখেচে কে একজন মস্ত পণ্ডিত কলকাতায় নাকি চমৎকার ভাগবত ব্যাখ্যা করচেন। একবার খোঁজ নে দিকি, কি হলে এ-বাড়িতে তিনি পায়ের ধূলো দিতে পারেন?

তোমার হুকুম হলেই নিতে পারি মা।

কেন, আমার হুকুমেরই বা দরকার কি! তোদের শুনতে কি ইচ্ছে যায় না? সেই যে কবে কথকতা হয়ে গেল—

বিপ্রদাস সহাস্যে বাধা দিয়া কহিল, সে ত এখনো তিন মাসও হয়নি মা!

মা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, মোটে তিন মাস? কিন্তু তিন মাস কি কম সময়? তা সে যাই হোক বাবা, এবার কিন্তু না বললে চলবে না। আমার দুই মামীই চিঠি লিখেচেন। কৈলাসনাথ, মানস সরোবর দর্শনে এবার আমি যাবই যাব।

বিপ্রদাস হাতজোড় করিয়া কহিল, দোহাই মা, ও আদেশটি তুমি ক'রো না। তোমার দুই ছেলের একজন সঙ্গে না গেলে মামীদের জিম্মায় তোমাকে তিব্বতে পাঠাতে পারব না। আর সব ক্ষতিই সইবে, কিন্তু মাকে হারান আমার সইবে না।

মায়ের দুই চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল, বলিলেন, ভয় নেই রে, কৈলাসের পথে মরণ হবে তেমন পুণ্যি তোর মায়ের নেই। আমি আবার ফিরে আসব। কিন্তু ছেলের মধ্যে তুই ত আমার সঙ্গে যেতে পারবি নে বিপিন, তোর 'পরেই এত বড় সংসারের সব ভার, আর পিছনে যে ছেলে দাঁড়িয়ে আছে তাকে নিয়ে আমি বৈকুণ্ঠে যেতেও রাজি নই। বামুনের ছেলে হয়ে সন্ধ্যে-আহ্নিক ত অনেকদিনই ছেড়েছে, শুনতে পাই কলকাতায় খাদ্যাখাদ্যের নাকি বিচার করে না। এর ওপর কাল কি করেছে শুনেছিস্?

বিপ্রদাস ভালমানুষের মত করিয়া কহিল, আবার কি করলে? কই শুনিনি কিছু।

মা বলিলেন, নিশ্চয় শুনেছিস। তোর চোখকে ফাঁকি দেবে এত বুদ্ধি ও ছোঁড়ার ঘটে নেই। কিন্তু এর একটা প্রতিকার কর্। ও আমারই খাবে পরবে, আর আমারই টাকায় কলকাতা থেকে লোক এনে আমার প্রজা বিগড়োবার ফন্দি আঁটবে! ওর কলকাতার খরচ তুই বন্ধ কর।

বিপ্রদাস আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, সে কি কথা মা, পড়ার খরচা বন্ধ করে দেব? ও পড়বে না?

মা বলিলেন, দরকার কি? আমার শ্বশুরের ইস্কুলের ছাত্ররা যখন দল বেঁধে এসে বললে, বিদেশী লেখাপড়ায় দেশের সর্ব্বনাশ হ'ল তখন তাদের তুই তেড়ে

মারতে গেলি! আর তোর নিজের ছোটভাই যখন ঠিক ঐ কথাই বলে বেড়ায় তার কি কোন প্রতিবিধান করবিনি? এ তোর কেমন বিবেচনা?

বিপ্রদাস হাসি-মুখে কহিল, তার কারণ আছে মা। ইস্কুলের ক্লাসে প্রমোশন না পেয়ে ও নালিশ করলে আমার সয় না, কিন্তু দ্বিজুর মত এম. এ. পাশ করে বিলিতি শিক্ষাকে যত খুশি গাল দিয়ে বেড়াক আমার গায়ে লাগে না।

মা বলিলেন, কিন্তু এটা? আমার টাকায় আমার প্রজা ক্ষ্যাপানো?

দ্বিজদাস এতক্ষণ নিঃশব্দে ছিল, একটা কথারও জবাব দেয় নাই। এবার উত্তর দিল, কহিল, কালকের সভা-সমিতির জন্যে তোমাদের এস্টেটের একটা পয়সাও আমি অপব্যয় করিনি।

মা ঘরে ঢুকিয়া পর্য্যন্ত একবারও পিছনে তাকান নাই, এখনও চাহিলেন না। বিপ্রদাসকেই প্রশ্ন করিলেন, তা হলে হতভাগাকে জিজ্ঞেস কর্ ত টাকা পেল কোথায়? রোজগার করেচে?

ঠিক এমনি সময়ে পর্দ্দার বাহিরে টুং টাং করিয়া একটুখানি চুড়ির শব্দ হইল। বিপ্রদাস কান পাতিয়া শুনিয়া বলিল, ঐ ত তার জবাব মা! তোমার নিজের ঘরের বৌ যদি টাকা যোগায়, কে আটকাবে বল দিকি?

মায়ের মনে পড়িল। কহিলেন, ও তাই বটে! সতীর কাজ এই! বড়-মানুষের মেয়ে বাপের জমিদারী থেকে বছরে যে ছ-হাজার টাকা পায়, সে আমার খেয়াল ছিল না। তিনিই গুণধর দেওরকে টাকা যোগাচ্চেন। একটুখানি স্থির থাকিয়া কহিলেন, তোর সম্বন্ধ করতে বেয়াইমশাই নিজে যখন এলেন তখনি কর্ত্তাকে আমি বলেছিলুম, রায়বাড়ির মেয়ে ঘরে এনে কাজ নেই। ওদের বংশেরই ত অনাথ রায় বিলেত গিয়ে মেম বিয়ে করেছিল। ওরা পারে না কি? ওদের অসাধ্য সংসারে কি আছে?

বিপ্রদাস তেমনি হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল। সে জানিত সতীর অদৃষ্টে এ খোঁটা আর যাবার নয়। তাহার বাপের বাড়ির সম্পর্কে কে এক অনাথ রায় বাঙালী-মেম বিবাহ করিয়াছিল এ কথা মা আর ভুলিতে পারিলেন না?

সকলেই চুপ করিয়া আছে দেখিয়া তিনি পুনশ্চ বলিলেন, আচ্ছা থাক্। বাবা কৈলাসনাথ এবার টেনেচেন, তাঁকে দর্শন করে ফিরে আসি, তার পরে বিহিত করব। বলিয়া তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

বিপ্রদাস কহিল, কি রে দ্বিজু, মাকে নিয়ে পারবি যেতে? উনি ঝোঁক যখন ধরেচেন তখন থামানো যাবে ভরসা হয় না।

দ্বিজদাস তৎক্ষণাৎ অস্বীকার করিয়া কহিল, আপনি ত জানেন, ঠাকুর-দেবতায়

আমার বিশ্বাস নেই। তা ছাড়া আমার সঙ্গে উনি বৈকুণ্ঠে যেতেও নারাজ, এ ত তাঁর নিজের মুখ থেকেই শুনলেন।

বিপ্রদাস বিরক্ত হইয়া কহিল, হাঁ রে পণ্ডিত, শুনলাম। তুই যেতে পারবি কি না তাই বল্।

আমার এখন মরবার ফুরসৎ নেই। বলিয়া দ্বিজদাস অন্য প্রশ্নের পূর্ব্বেই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

বিপ্রদাস নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তাই বটে। এমনি দেশের কাজ যে মাকেও মানা চলে না।

এইখানে মায়ের একটুখানি পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। বিপ্রদাসের ইনি বিমাতা। তাঁহার জননীর মৃত্যুর বৎসর-কাল পরেই যজ্ঞেশ্বর দয়াময়ীকে বিবাহ করিয়া গৃহে আনিয়াছিলেন এবং সেইদিন হইতে ইহার হাতেই সে মানুষ। ইনি যে জননী নহেন এ সংবাদ বিপ্রদাস যথেষ্ট বয়স না হওয়া পর্য্যন্ত জানিতেও পারে নাই।

৩

এ-বাড়িতে দ্বিজদাস সব চেয়ে বেশি খাতির করিত বৌদিদিকে। তাহার সর্ব্ববিধ বাজে খরচের টাকাও আসিত তাঁহারই বাক্স হইতে। সতী শুধু সম্পর্ক হিসাবে তাহার বড় ছিল না, বয়সের হিসাবেও মাস-কয়েকের বড় ছিল। তাই অধিকাংশ সময়েই তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিত। এই লইয়া ছেলে-বেলায় দ্বিজু মায়ের কাছে কত যে নালিশ জানাইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই।

মাত্র এগারো বছর বয়সে সতী বধূরূপে এই গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া তাহার আদরের সীমা ছিল না। শাশুড়ী হাসিয়া বলিতেন, সত্যি নাকি? কিন্তু এ ত তোমার বড় অন্যায় বৌমা, দেওরের নাম ধরে ডাকা!

সতী বলিত, অন্যায় কেন, আমি যে ওর চেয়ে বয়সে অনেক বড়।

অনেক বড়? কত বড় মা?

আমি জন্মেচি বোশেখ মাসে, ও জন্মেচে ভাদ্র মাসে।

মা সহাস্যে কহিতেন, ভাদ্র মাসেই ত বটে মা, আমারই মনে ছিল না! এর পরেও আর যদি কখনো ও নালিশ করতে আসে ওর কান মলে দেব।

আদালতে হারিয়া দ্বিজু রাগ করিয়া চলিয়া গেলে বধূকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া শাশুড়ী সস্নেহে বলিতেন, ও ছেলেমানুষ কি না তাই বোঝে না। ঠাকুরপো বললে ভারি খুশী হয়! মাঝে মাঝে ডেকো, কেমন মা?

সতী রাজি হইয়া ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিয়াছিল, আচ্ছা মা, মাঝে মাঝে তাই বলে ডাকবো।

সেদিন যে ছিল বালিকা, আজ সে এত বড় বাড়ির গৃহিণী! বিধবা হওয়ার পর হইতে শাশুড়ী ত থাকেন নিজের জপ-তপ এবং ধর্ম্ম-কর্ম্ম লইয়া, তথাপি তাঁহার সেদিনের সেই উপদেশটুকু পরবর্ত্তী কালে সতীর অনেক দিন অনেক কাজে লাগিয়াছে। যেমন আজ।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার প্রায় পোনর-ষোল দিন অতীত হইয়াছে, সকাল-বেলা সতী দেবরের পড়িবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে ডাকিল, ভাই ঠাকুরপো—

দ্বিজদাস হাত তুলিয়া থামাইয়া দিয়া বলিল, থাক্ বৌদি, আর খোসামোদের আবশ্যক নেই, আমি করব।

কি করবে শুনি?

তুমি যা হুকুম করবে তাই। কিন্তু দাদার এ ভারী অন্যায়।

অন্যায়টা কিসে হ'ল বল ত?

দ্বিজদাস তেমনি রাগ করিয়াই কহিল, আমি জানি। এই মাত্র দাদার ঘরের সুমুখ দিয়ে এসেচি। ভেতরে তিনি, মা এবং তোমার ষড়যন্ত্র যা হচ্চিল আমার কানে গেছে। তাঁদের সাহস নেই আমাকে বলেন, তাই তোমাকে ধরেচেন কাজ আদায়ের জন্যে। কত বড় অন্যায় বল ত!

সতী হাসিমুখে কহিল, অন্যায় ত নয় ঠাকুরপো। তাঁরা বেশ জানেন যে তাঁরা বলা মাত্রই জবাব আসবে, আমার মরবার ফুরসুৎ নেই— কিন্তু বৌদিদি হুকুম করলে দ্বিজুর সাধ্য নেই যে না বলে।

দ্বিজদাস ঘাড় নাড়িয়া কহিল, এইখানেই হয়েচে আমার মুস্কিল, আর এইখানেই পেয়েচেন ওঁরা জোর। কিন্তু কি করতে হবে?

সতী বলিল, মা কৈলাস-দর্শনে যাবেনই, আর তোমাকে তাঁর সঙ্গে যেতে হবে।

দ্বিজদাস কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, দু-তিন মাসের কম হবে না। কাজের কত ক্ষতি হবে ভেবে দেখেচো বৌদি?

সতী স্বীকার করিয়া বলিল, ক্ষতি কিছু হবেই। কিন্তু একটা নতুন জায়গাও দেখা হবে। নিজের তরফ থেকে একে নিছক লোকসান বলা চলে না। লক্ষ্মী ভাইটি, পরে যেন আর আপত্তি ক'রো না।

দ্বিজদাস কহিল, তুমি যখন আদেশ করেচ, তখন আপত্তি আর করব না, সঙ্গে যাব। কিন্তু মা অনায়াসে সেদিন দাদাকে বলেছিলেন, আমার কলকাতার পড়ার খরচ বন্ধ করে দিতে।

সতী সহাস্যে বলিল, ওটা রাগের কথা ভাই। কিন্তু হুকুম যিনি দিলেন, তিনি মা ছাড়া আর কেউ নয়। এ কথাটাও তোমার ভুললে চলবে না।

দ্বিজদাস উত্তর দিল, ভুলিনি বৌদি! কিন্তু সেদিন থেকে আমিও কি স্থির করেচি জান? আমি একলা মানুষ, বিয়ে করবার আমার কখনো সময় হবে না, সুযোগও ঘটবে না। সুতরাং খরচ সামান্য। আবশ্যক হলে বরঞ্চ ছেলে পড়িয়ে খাব, কিন্তু এদের এস্টেট থেকে একটা পয়সাও কোনদিন চাইব না।

সতী পুনরায় হাসিয়া কহিল, চাইবার দরকার হবে না ঠাকুরপো, আপনি এসে হাজির হবে। আর তাও যদি না আসে তোমার ছেলে পড়াবার প্রয়োজন হবে না। অন্ততঃ আমি বেঁচে থাকতে নয়। সে ভার আমার রইল।

এ বিশ্বাস দ্বিজুরও মনের মধ্যে স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় ছিল, পলকের জন্য তাহার চোখের পাতা ভারি হইয়া উঠিল, কিন্তু সে ভাবটা তাড়াতাড়ি কাটাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এঁরা কবে যাত্রা কববেন স্থির করচেন? যবেই করুন, শেষকালে আমাকেই সঙ্গে যেতে হল! অথচ মা সেদিন স্পষ্ট করেই বলেছিলেন যে আমার মত ম্লেচ্ছাচারীকে নিয়ে তিনি বৈকুণ্ঠে যেতেও রাজি ন'ন। একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস, না বৌদি?

সতী এ অনুযোগের জবাব দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

দ্বিজু বলিল, সে যাই হোক, তোমার আদেশ অমান্য করব না বৌদি, তাঁদের নিশ্চিন্ত থাকতে ব'লো।

সতী হাসিল, কহিল, আমাকে পাঠিয়ে দিয়ে তাঁরা নিশ্চিন্ত আছেন। ঘর থেকে বার হওয়া মাত্র তোমার দাদার কথা কানে গেল, তিনি জোর গলায় মাকে বলছিলেন, এবার নির্ভয়ে যাত্রার আয়োজন করগে মা, যাকে দৌত্যকর্মে নিযুক্ত করা গেল তাঁর সুমুখে ভায়ার তর্ক চলবে না। ঘাড় হেঁট করে স্বীকার করবে; তুমি দেখে নিয়ো।

শুনিয়া দ্বিজদাস ক্রোধে ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, অস্বীকার করতে পারব না,

জেনেই যদি তাঁরা এ ফন্দি এঁটে থাকেন যে মেয়েদের এই অর্থহীন খেয়াল চরিতার্থ করার বাহন আমাকেই হতে হবে, তা হলে আমার পক্ষ থেকে তুমি দাদাকে এই কথাটা ব'লো বৌদি, যে, তাঁদের লজ্জা হওয়া উচিত।

সতী কহিল, বলে লাভ নেই ঠাকুরপো, জমিদার হয়ে যারা প্রজার রক্ত শুষে খায়, এই তাদের নীতি। নিজের কাজ উদ্ধারের জন্য এদের কোন লজ্জাবোধ নেই। সম্পত্তির অর্দ্ধেক মালিক হয়েও তুমি এদের এস্টেট থেকে টাকা নিতে সঙ্কোচ বোধ কর, তখন একদিকে আমি যেমন দুঃখ পাই, তেমনি আর একদিকে মন খুশীতে ভরে ওঠে। তোমার নাম করে আমি মাকে আশ্বাস দিয়েচি যে, তাঁর যাওয়ার বিঘ্ন হবে না, সঙ্গে তুমি যাবে। তীর্থ থেকে ভালয় ভালয় ফিরে এসো ঠাকুরপো, যত লোকসানই তোমার হোক, আমি সবটুকু তার পূর্ণ করে দেব।

দ্বিজদাস নিঃশব্দে চৌকি হইতে উঠিয়া বৌদির পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া ফিরিয়া গিয়া বসিল।

সতী বলিল, এতক্ষণ পরের উমেদারি করেই ত সময় কাটল, এখন নিজের অনুরোধ একটা আছে।

দ্বিজদাস হাসিয়া কহিল, তোমার নিজের? ঐটি কিন্তু পারব না বৌদি!

সতী নিজেও হাসিল, বলিল, আশ্চর্য্য নয় ঠাকুরপো। ভয় হয় পাছে শুনে না বলে বসো।

বেশ ত, বলেই দেখো না।

সতী কহিল, আমার এক ম্লেচ্ছ খুড়ো আছেন—আপনার নয়, বাবার খুড়তুত ভাই, তিনি বিলাত গিয়েছিলেন। তখন এ খবরটা এঁদের কানে এসে পৌঁছলে এ বাড়িতে আমার ঢোকাই ঘটত না! মার মুখে ও কথা শুনেচ বোধ হয়?

বহু বার। এমন কি গড়পড়তা দিনে একবার করে হিসাব করে নিলে এই পোনর-ষোল বছরে অন্ততঃ সংখ্যায় হাজার পাঁচ-ছয় হবে।

সতী হাসিয়া কহিল, আমারও আন্দাজ তাই। কাকা থাকেন বোম্বায়ে। তাঁর একটি মেয়ে ঐখানেই লেখাপড়া করে। আসচে বছরে সে বিলাত যাবে পড়া শেষ করতে। তোমাকে গিয়ে তাকে আনতে হবে!

কোথায়? বোম্বাই থেকে?

হাঁ। সে লিখেচে, সে একলাই আসতে পারে, কিন্তু এতটা দূর একাকী আসতে বলতে আমার সাহস হয় না।

তাঁকে পৌঁছে দেবার কেউ নেই?

না, কাকা ছুটি পাবেন না।

দ্বিজদাস হঠাৎ রাজি হইতে পারিল না, ভাবিতে লাগিল। সতী বলিতে লাগিল,

আমার বিয়ে যখন হয় তখন সে সে সাত-আট বছরের বালিকা। তার পরে একটিবার মাত্র দেখা হয় কলকাতায়, তখন সে সবে ম্যাট্রিক পাশ করে আই. এ. পড়তে শুরু করেচে—সে ত কত বছর হয়ে গেল। তাকে আমি ভারি ভালবাসি ঠাকুরপো, যদি কষ্ট করে গিয়ে একবার এনে দাও। আনবার জন্যে সে আমাকে প্রায় চিঠি লেখে, কিন্তু সুযোগ আর হয় না।

দ্বিজদাস জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু এখনই বা সুযোগ হ'ল কিসে? মা কি রাজি হয়েচেন?

সতী এ প্রশ্নের সহসা উত্তর দিতে পারিল না। এবং পারিল না বলিয়াই একটি সত্যকার ব্যাকুলতা তাহার মুখে প্রকাশ পাইল। একটুখানি থামিয়া কহিল, মাকে বলেচি। এখনো ঠিক মত দেননি বটে, কিন্তু নিজের তীর্থ-যাত্রা নিয়ে এমনি মেতে আছেন যে, আশা হয় আপত্তি করবেন না। তা ছাড়া নিজে যখন থাকবেন না তখন এই দু-তিন মাস সে অনায়াসে আমার কাছে থাকতে পারবে।

দ্বিজদাস মনে মনে বুঝিল, শাশুড়ীর হুকুম না পাইলেও এই সুযোগে সে প্রবাসী বোনটিকে একবার কাছে আনাইতে চায়। প্রশ্ন করিল, তোমার কাকারা কি ব্রাহ্ম-সমাজের?

সতী বলিল, না। কিন্তু হিন্দু-সমাজও তাদের আপন বলে নেয় না। ওরা ঠিক যে কোথায় আছে নিজেরাও বোধ করি জানে না? এমনিভাবেই দিন কেটে যাচ্চে।

এ অবস্থা অনেকেরই। দ্বিজু মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, যেতে আমার আপত্তি নেই বৌদি, কিন্তু আমি বলি, মা থাকতে তাকে তুমি এখানে এনো না। মাকে ত জানই, হয়ত খাওয়া-ছোঁয়া নিয়ে এমন কাণ্ড করবেন যে, বোনকে নিয়ে তোমার লজ্জার সীমা থাকবে না। তার চেয়ে বরঞ্চ আমরা চলে গেলে তাকে আনার ব্যবস্থা ক'রো—সব দিকেই ভাল হবে।

ইহা যে সুপরামর্শ তাহা সতী নিজেও জানিত, কিন্তু সে যখন নিজে চিঠি লিখিয়া আসিবার প্রার্থনা জানাইয়াছে, তখন কি করিয়া যে একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় নিষেধ করিয়া চিঠির উত্তর দিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না। ইহার সঙ্কোচ এবং দুঃখই কি কম? কহিল, নিজের বোন বলে বলচিনে ঠাকুরপো, কিন্তু সেবার মাস-খানেক তাকে কলকাতায় অত্যন্ত নিকটে পেয়ে নিশ্চয় বুঝেছি যে, রূপে-গুণে তেমন মেয়ে সংসারে দুর্লভ। বাইরে থেকে তাদের আচার-ব্যবহার যেমনই দেখাক, মা তাকে যদি দুটো দিনও কাছে কাছে দেখতে পান ত ম্লেচ্ছ মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা বদলে যাবে। কখনো তাকে অশ্রদ্ধা করতে পারবেন না।

দ্বিজদাস বলিল, কিন্তু এই দুটো দিনই যে মাকে দেখানো শক্ত বৌদি। তিনি দেখতেই চাইবেন না। ইহাও সত্য।

সতী কহিল, কিন্তু তার রূপটাও ত চোখে পড়বে? চোখ বুজে ত মা এটা অস্বীকার করতে পারবেন না! সেও ত একটা পরিচয়।

দ্বিজদাস চুপ করিয়া রহিল। সতী কহিল, আমার নিশ্চয় বিশ্বাস বন্দনাকে পৃথিবীতে কেউ অবহেলা করতে পারে না। যাও না।

দ্বিজদাস বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, বন্দনা! নামটা শুনেচি মনে হয় বৌদি। কোথায় যেন দেখেচি, আচ্ছা দাঁড়াও, খবরের কাগজে কি—একটা ছবিও যেন—

কথাটা শেষ হইল না, ঝি সশব্দে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, বৌমা, তুমি এখানে? তোমার কে-এক কাকা তাঁর মেয়ে নিয়ে বোম্বাই থেকে এসে উপস্থিত হয়েছেন। বাইরে কেউ নেই, বড়বাবুও না। সরকারমশাই তাদের নীচের ঘরে বসিয়েছেন।

ঘটনাটা অভাবনীয়। অ্যাঁ—বলিস্ কি রে? বলিতে বলিতে সতী ঝড়ের বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। পিছনে গেল দ্বিজদাস।

৪

নিখুঁত সাহেবী-পরিচ্ছদে ভূষিত একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক চেয়ারে বসিয়াছিলেন, এবং একটি কুড়ি-একুশ বছরের মেয়ে তাঁহারই পাশে দাঁড়াইয়া দেয়ালে টাঙানো মস্ত একখানি জগদ্ধাত্রী দেবীর ছবি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিতেছিল। তাহারও পরণে যাহা ছিল তাহা নিছক মেম সাহেবের মত না হোক, বাঙলার মেয়ে বলিয়াও হঠাৎ মনে হয় না। বিশেষতঃ গায়ের রঙটা যেন সাদার ধার ঘেঁষিয়া আছে—এমনি ফর্সা। দেহের গঠন ও মুখের শ্রী অনিন্দ্যসুন্দর। দেবরের কাছে সতী এইমাত্র যে গর্ব্ব করিয়া বলিতেছিল তার রূপটা ত শাশুড়ীর চোখে পড়িবে—বস্তুতঃ এ কথা সত্য। ভগিনীর হইয়া এ রূপ লইয়া অহঙ্কার করা চলে।

ঘরে ঢুকিয়া সতী গড় হইয়া প্রণাম করিল, বলিল, সেজকাকা, মেয়ের বাড়িতে এতকাল পরে পায়ের ধূলো পড়ল।

ভদ্রলোক উঠিয়া দাঁড়াইয়া সতীর মাথায় হাত দিলেন, সহাস্যে কহিলেন, হ্যাঁ রে বুড়ী, পড়ল! কবে, কোন কালে কাকাকে নেমন্তন্ন করে খবর পাঠিয়েছিলি যে অস্বীকার করেছিলাম? কখনো বলেচিস্ আসতে? নিজে যখন যেচে এলাম তখন মস্ত ভণিতা করে বলা হচ্ছে, পায়ের ধূলো পড়ল? দ্বিজদাসের প্রতি চোখ পড়িতে জিজ্ঞাসা করিলেন, এটি কে?

সতী পিছনে চাহিয়া দেখিয়া কহিল, ওটি আমার দেওর—দ্বিজু।

দ্বিজদাস দূর হইতে নমস্কার করিল। বন্দনা দিদিকে প্রণাম করিয়া হাসিয়া বলিল, ওঃ—ইনিই সেই? যাঁর জ্বালায় জমিদারী বুঝি যায়। আমাকে চিঠিতে লিখেছিলে? বংশ-ছাড়া, গোত্র-ছাড়া, ভয়ঙ্কর স্বদেশী?

অমন কথা তোকে আবার কবে লিখলুম?

এই ত সেদিন। এরই মধ্যে ভুলে গেলে?

সতী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, ওসব লিখিনি, তোর মনে নেই।

দ্বিজদাস এতক্ষণ পর্য্যন্ত কি এক প্রকার সঙ্কোচের বশে যেন আড়ষ্ট হইয়াছিল। অনাত্মীয়, অপরিচিত যুবতী স্ত্রীলোকের সম্মুখে কি করা উচিত, কি বলিলে ভাল দেখায়, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিল না। ইতিপূর্বে কখনো সুযোগও ঘটে নাই, প্রয়োজনও হয় নাই, কিন্তু এই নবাগত তরুণীর আশ্চর্য্য স্বচ্ছন্দতায় সে যেন একটা নূতন শিক্ষা লাভ করিল। তাহার অহেতুক ও অশোভন জড়তা এক মুহূর্ত্তে কাটিয়া গিয়া সে এক অনাবিল আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করিল। মেয়েদেরও যে শিক্ষা ও স্বাধীনতার প্রয়োজন এ কথা সে বুদ্ধি দিয়া চিরদিনই স্বীকার করিত এবং মা ও দাদার সহিত তর্ক বাধিলে সে এই যুক্তিই দিত যে, স্ত্রীলোক হইলেও তাহারা মানুষ, সুতরাং শিক্ষা ও স্বাধীনতায় তাহাদের দাবী আছে। মূর্খ করিয়া তাহাদের ঘরে বন্ধ করিয়া রাখা অন্যায়। কিন্তু আজ এই অতিথি মেয়েটির আকস্মিক পরিচয়ে সে চক্ষের পলকে প্রথম উপলব্ধি করিল যে, ঐ-সব মামুলী দাবী-দাওয়ার যুক্তির চেয়েও ঢের বড় কথা এই যে, পুরুষের চরম ও পরম প্রয়োজনেই রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতার প্রয়োজন। তাহাকে বঞ্চিত করিয়া পুরুষ কতখানি যে নিজেকে বঞ্চিত করিতেছে এ সত্য এত বড় স্পষ্ট করিয়া ইতিপূর্বে সে কখনো দেখে নাই। মেয়েটিকে উদ্দেশ করিয়া হাসিমুখে কহিল, আপনার কথাই ঠিক, বৌদি ভুলে গেছেন। কিন্তু এ নিয়ে বাদানুবাদ করে লাভ নেই। এই বলিয়া সে ছদ্মগাম্ভীর্য্যে মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, বৌদি, তোমার জোরেই আমার সমস্ত জোর, আর তোমারই চিঠিতেই এই কথা? বেশ, আমাকে তোমরা ত্যাগ কর, আর আমিও আমার সমস্ত অধিকার পরিত্যাগ

করচি। তোমাদের জমিদারী অক্ষয় হয়ে থাক্‌, তুমি একটিবার মুখ ফুটে আদেশ কর, আজই উকিল ডেকে সমস্ত লেখাপড়া করে দিচ্ছি। ইনিই সাক্ষী থাকুন, দেখ আমি পারি কি না?

সাহেব মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিলেন, তোর দেওর ভয়ঙ্কর স্বদেশী নাকি সতী?

সতী বলিল, হাঁ, ভয়ঙ্কর।

তুই বললেই লেখাপড়া করে জমিদারীর অংশ ছেড়ে দিতে চায়?

সতী ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, ও স্বচ্ছন্দে পারে। ওর অসাধ্য কাজ নেই।

বন্দনা কৌতূহল দমন করিতে পারিল না, জিজ্ঞাসা করিল, সত্যি বলচেন? চিরকালের জন্য বাস্তবিক সমস্ত ত্যাগ কবতে পারেন?

দ্বিজদাস তাহার মুখেব প্রতি ক্ষণকাল দৃষ্টিপাত কবিয়া কহিল, সত্যি পারি। ওতে আমার এক তিল লোভ নেই। দেশের পনেব আনা লোক একবেলা পেট ভরে খেতে পায় না—উদয়াস্ত পরিশ্রম করে—আর বিনা পরিশ্রমে আমার বরাদ্দ পোলাও-কালিয়া—ও পাপের অন্ন আমার মুখে রোচে না, গলায় আটকাতে চায়। ও বিষয় আমার গেলেই ভাল। তখন দেশের পাঁচজনের মত খেটে খেয়ে বাঁচি। জোটে মঙ্গল, না জোটে তাদের সঙ্গে উপোস করে মরতে পারলে বরঞ্চ একদিন স্বর্গে যেতেও পারব, কিন্তু এ-পথে কোন কালে সে আশা নেই।

বন্দনা নিষ্পলক-চক্ষে চাহিয়া শুনিতেছিল, কথা শেষ হইতে আর কথা কহিল না, শুধু মুখ দিয়া তাহার একটি নিশ্বাস পড়িল।

সতীর হঠাৎ যেন চমক ভাঙ্গিল। ঠাকুরপোর এ-ছাড়া যেন আর কথা নেই। বলে বলে এমনি মুখস্থ হযে গেছে। কহিল, পুরান বক্তৃতা পরে দিও ঠাকুরপো, ঢের সময় পাবে। সেজকাকাবাবুর হয়ত এখনও হাত-মুখ ধোয়াও সারা হয়নি। বন্দনা, চল্‌ ভাই, ওপরে গিয়ে কাপড়-চোপড় ছাডবি।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, জামাই বাবাজীকে দেখচিনে ত?

সতী কহিল, তিনি সকালেই কি একটা জরুরি কাজে বেরিয়েচেন, ফিরতে বোধ করি দেরি হবে।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, মেজদি, তোমার শাশুড়ীকে ত দেখতে পেলুম না? বাড়িতেই আছেন?

সতী কহিল, এখনো আছেন, কিন্তু শীঘ্রই কৈলাস মানস-সরোবরে তীর্থ-যাত্রা করবেন। সমস্ত সকালটা পূজা-আহ্নিক নিয়েই থাকেন, আর একটু বেলা হলেই তাঁকে দেখতে পাবে।

বন্দনা প্রশ্ন করিল, তিনি খুব বেশি ধর্ম্ম-কর্ম্ম নিয়েই থাকেন, না?

সতী বলিল, হাঁ।

বিধবা হবার পর শুনেচি ঘর-সংসার কিছুই দেখেন না, সত্যি?

সত্যি বই কি। সব আমাকেই দেখতে শুনতে হয়।

বন্দনা উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, উনি তোমার সৎশাশুড়ী না মেজদি?

সতী হাসিয়া কহিল, চোখে ত দেখিনি বোন, লোকে হয়ত মিথ্যে কথা বলে।

দ্বিজদাস উত্তর দিয়া বলিল, মিথ্যেই বলে। কারণ সৎশাশুড়ী মানে দাদার সৎমা ত? মিছে কথা। সৎমা বটে, দাদার নয়, আমার। সে যাক, স্নানাদি সেরে নিয়ে সে আলোচনা পরে হবে, এখন ওপরে চলুন। আচ্ছা, আমি দেখি গে—বৌদি, আর দেরি ক'রো না, এঁদের নিয়ে এস। বলিয়া সে আয়োজনের তত্ত্বাবধান করিতে চলিয়া যাইতেছিল, এমনি সময় মাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

খুব সম্ভব দয়াময়ী খবর পাইয়া আহ্নিকের মাঝখানেই পূজার ঘর ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন। বয়স বেশি নয় বলিয়া তিনি বৈধব্যের পরেও সচরাচর অনাত্মীয় পুরুষদের সম্মুখে বাহির হইতেন না, অন্তরালে থাকিয়া কথা কহিতেন, কিন্তু আজ একেবারে ঘরের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মাথার কাপড় কপালের উপর পর্য্যন্ত টানিয়া দেওয়া, কিন্তু মুখের সবখানিই দেখা যাইতেছে।

আমার সেজকাকাবাবু মা। আর এইটি আমার বোন বন্দনা। বলিয়া সতী কাছে আসিয়া হঠাৎ শাশুড়ীকে প্রণাম করিল। এমন অকারণে প্রণাম করা প্রথাও নয়, কেহ করেও না। দয়াময়ী মনে মনে হয়তো একটু আশ্চর্য্য হইলেন, কিন্তু সে উঠিয়া দাঁড়াইতে সস্নেহে সযত্নে তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া অঙ্গুলির প্রান্তভাগ চুম্বন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, কিন্তু বন্দনার প্রতি চোখ পড়িতেই তাঁহার চোখের দৃষ্টি রুক্ষ হইয়া উঠিল। দিদির দেখাদেখি সেও কাছে আসিয়া প্রণাম করিল, কিন্তু তিনি স্পর্শ করিলেন না, বরঞ্চ বোধ হয় স্পর্শ বাঁচাইতে এক পা পিছাইয়া গিয়া শুধু অস্ফুটে বলিলেন, বেঁচে থাক।

কহিলেন, বেইমশাই, নমস্কার। ছেলে-মেয়ের ভাগ্য যে হঠাৎ আপনার পায়ের ধুলো পড়ল।

ভদ্রলোক প্রতি-নমস্কার করিয়া কহিলেন, নানা কারণে সময় পাইনে বেনঠাকরুণ, কিন্তু না বলে-কয়ে এমন হঠাৎ এসে পড়ার দোষ মার্জ্জনা করবেন। এবারে যখন আসব যথাসময়ে একটা খবর দিয়েই আসব।

দয়াময়ী এ-সব কথার উত্তর দিলেন না, শুধু বলিলেন, পূজা-আহ্নিক এখনো সারা হয়নি বেইমশাই, আবার দেখা হবে। বৌমা, এঁদের ওপরে নিয়ে যাও, খাওয়া-

দাওয়ার যেন কষ্ট না হয়। বিপিন এলে আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দিয়ো। বলিয়া তিনি আর কোন দিকে না চাহিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। বাহ্যতঃ প্রচলিত সৌজন্যের বিশেষ কিছু যে ত্রুটি হইল তাহা নয়, ভিতরের দিক দিয়াই সকলেরই মনে হইল জ্যোৎস্নার মাঝামাঝি একখণ্ড কালো মেঘ নির্ম্মল আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভাসিয়া গেল।

৫

বন্দনা স্নানাদি সারিয়া বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল পিতা ইতিপূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়া লইয়াছেন। একখানা জমকালো গোছের আরাম-কেদারায় বসিয়া চোখে চশমা দিয়া সংবাদ-পত্রে মনোনিবেশ করিয়াছেন। পাশের ছোট্ট টেবিলের উপর একরাশ খবরের কাগজ এবং কাছে দাঁড়াইয়া দ্বিজদাস সেইগুলির তারিখ মিলাইয়া গুছাইয়া দিতেছে। ট্রেনের মধ্যে ও কাজের ভিড়ে কয়েকদিনের কাগজ দেখিবার তাহার সুযোগ হয় নাই। কন্যাকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া চোখ তুলিয়া কহিলেন, মা, আমরা দুটোর গাড়িতেই কলকাতা যাব স্থির করলাম। দিদির বাড়িতে দিন কতক যদি তোমার থাকবার ইচ্ছে হয় ত ফেরার পথে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আমি সোজা বোম্বাই চলে যাব। কি বল?

কলকাতায় তোমার ক'দিন দেরি হবে বাবা?

পাঁচ-সাত দিন—দিন আষ্টেক—তার বেশি নয়।

কিন্তু তার পরে আমাকে বোম্বায়ে নিয়ে যাবে কে?

সে ব্যবস্থা একটা অনায়াসে হতে পারবে। এই বলিয়া তিনি একটু ভাবিয়া কহিলেন, তা বেশ, ইচ্ছে হয় এই ক'টা দিন তুমি সতীর কাছ থাক, ফেরবার পথে আমিই সঙ্গে করে নিয়ে যাব, কেমন?

বন্দনা ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আচ্ছা মেজদিকে জিজ্ঞাসা করে দেখি।

দ্বিজদাস কহিল, বৌদি রান্নাঘরে ঢুকেছেন, হয়ত দেরি হবে। হাতের বাণ্ডিলটা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনাকে কি দেব?

খবরের কাগজ? ও আমি পড়িনে।

কাগজ পড়েন না?

না। ও আমার ধৈর্য্য থাকে না। সন্ধ্যা-বেলা বাবার মুখে গল্প শুনি, তাতেই আমার ক্ষিধে মিটে।

আশ্চর্য্য! আমি ভেবেছিলাম আপনি নিশ্চয়ই খুব বেশি পড়েন।

বন্দনা বলিল, আমার সম্বন্ধে কিছুই না জেনে অমন ভাবেন কেন? ভারি অন্যায়।

দ্বিজু অপ্রতিভ হইয়া উঠিতেছিল, বন্দনা হাসিয়া কহিল, আপনারা কে কতটা দেশোদ্ধার করলেন, এবং ইংরেজ তাতে রেগে গিয়ে কতখানি চোখ রাঙালে তার কিছুতেই আমার কৌতূহল নেই। আছে বাবার। ঐ দেখুন না, একেবারে খবরের তলায় তলিয়ে গেছেন—বাহ্যজ্ঞান নেই।

সাহেবের কানে বোধ করি শুধু মেয়ের 'বাবা' কথাটাই প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু চোখ তুলিবার সময় পাইলেন না, বলিলেন, একটু সবুর কর—বলচি—ঠিক এই জবাবটাই আমি খুঁজছিলাম।

মেয়ে মুচকিয়া হাসিয়া ঘাড় নাড়িল, কহিল, তুমি খুঁজে খুঁজে সারা দিন পড় বাবা, আমার একটুও তাড়াতাড়ি নেই। দ্বিজদাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, মেজদির মুখে শুনেচি, আপনার মস্ত লাইব্রেরি আছে, বরঞ্চ সেইখানে চলুন, দেখিগে আপনার কত বই জমেচে।

চলুন।

লাইব্রেরি ঘরটা তেতলায়। মস্ত চওড়া সিঁড়ি, উঠিতে উঠিতে দ্বিজদাস কহিল, লাইব্রেরি বেশ বড়ই বটে, কিন্তু আমার নয়, দাদার। আমি শুধু কোথায় কি বই বেরুলো সন্ধান নিই এবং হুকুম-মত কিনে এনে দিই।

কিন্তু পড়েন ত আপনি?

সে কিছুই নয়। পড়েন যাঁর লাইব্রেরি তিনি স্বয়ং। আশ্চর্য্য শক্তি এবং তেমনি অদ্ভুত মেধা তাঁর।

কে? দাদা!

হ্যাঁ। ইউনিভারসিটির ছাপ-ছোপ বিশেষ কিছু তাঁর গায়ে লাগেনি সত্যি, কিন্তু মনে হয় এত বড় বিরাট পাণ্ডিত্য এদেশে কম লোকেরই আছে। হয়ত নেই। আপনার ভগিনীপতি তিনি, কখন দেখেননি তাঁকে?

না। কি রকম দেখতে?

ঠিক আমার উল্টো। যেমন দিন আর রাত। আমি কালো, তাঁর বর্ণ সোনার মত। গায়ের জোর তাঁর এ অঞ্চলে বিখ্যাত—লাঠি, তলোয়ার, বন্দুকে এদিকে তাঁর জোড়া নেই। একা মা ছাড়া তাঁর মুখের পানে চেয়ে কথা কইতেও কেউ সাহস করে না।

বন্দনা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার মেজদিও না?

দ্বিজদাস বলিল, না, আপনার মেজদিও না।

ভয়ানক বদ্‌রাগী বুঝি?

না, তাও না। ইংরেজীতে যে অ্যারিস্টোক্র্যাট্ বলে একটা কথা আছে, আমার দাদা বোধ করি কোন জন্মে তাদেরই রাজা ছিলেন। অন্ততঃ আমার ধারণা তাই। বদ্‌রাগী কি না জিজ্ঞাসা করছিলেন? কোনরকম রাগারাগি করবার তাঁর অবকাশ হয় না

বন্দনা কহিল, দাদার ওপর আপনার ভয়ানক ভক্তি? না?

দ্বিজদাস চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে বলিল, এ কথার জবাব যদি কখনো সম্ভব হয় আপনাকে আর একদিন দেব।

বন্দনা সবিস্ময়ে কহিল, তার মানে?

দ্বিজদাস ঈষৎ হাসিয়া বলিল, মানে যদি এখনই বলি আর একদিন জবাব দেবার প্রয়োজন হবে না। আজ থাক্।

মস্ত লাইব্রেরী। যেমন মূল্যবান আলমারি টেবিল চেয়ার প্রভৃতি আসবাব, তেমনি সুশৃঙ্খলায় পরিপাটি করিয়া সাজান। পল্লীগ্রামে এত বড় একটা বিরাট কাণ্ড দেখিয়া বন্দনা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। বোম্বাই শহরে এ বস্তুর অভাব নাই, সে তুলনায় এ হয়ত তেমন কিছু নয়, কিন্তু পল্লীগ্রামে বাস করিয়া কোন একজনের নিছক নিজের জন্যে এত অধিক সঞ্চয় সত্যই বিস্ময়ের ব্যাপার। জিজ্ঞাসা করিল, বাস্তবিক এত বই দাদা পড়েন না কি?

দ্বিজদাস বলিল, পড়েন এবং পড়চেন। আলমারি বন্ধ নয়, কোন একটা বই খুলে দেখুন না, তাঁর পড়ার চিহ্ন হয়ত চোখে পড়বে।

এত সময় পান কখন? দিন রাত শুধু এই-ই করেন না কি?

দ্বিজু ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না। অন্ততঃ আমি ত জানিনে। তা ছাড়া আমাদের বিষয়-সম্পত্তি ভীষণ কিছু একটা না হলেও নিতান্ত কমও নয়। তার কোথায় কি আছে এবং হচ্চে দাদার চোখের ওপর। কেবল আজ বলে নয়, বাবা বেঁচে থাকতেও এই ব্যবস্থাই বরাবর আছে। সময় পাবার রহস্য আমিও ঠিক খুঁজে পাইনে, আপনার মত আমার বিস্ময়ও কম নয়, তবে শুধু এই ভাবি যে জগতে মাঝে মাঝে দু-একজন জন্মায় তারা সাধারণ মানুষের হিসেবের বাইরে। দাদা সেই জাতীয় জীব। আমাদের মত হয়ত এঁদের কষ্ট করে পড়তেও হয় না, ছাপার অক্ষর চোখের মধ্যে দিয়ে আপনিই গিয়ে মগজে ছাপ মেরে দেয়। কিন্তু দাদার কথা

এখন থাক্। আপনি তাঁকে এখনো চোখে দেখেননি, আমার মুখে এক-তরফা আলোচনা অতিশয়োক্তি মনে হতে পারে।

কিন্তু আমার শুনতে খুব ভালই লাগচে।

কিন্তু কেবল ভাল লাগাটাই ত সব নয়। পৃথিবীতে আমরাও অত্যন্ত সাধারণ আরও দশজন ত আছি। একটি মাত্র অসাধারণ ব্যক্তিই যদি সমস্ত জায়গা জুড়ে বসে, আমরা যাই কোথা? ভগবান মুখটা ত কেবল পরের স্তব গাইতেই দেননি?

বন্দনা সহাস্যে কহিল, অর্থাৎ দাদাকে ছেড়ে এখন ছোটভাইয়ের একটু স্তব গাইতে চান—এই ত?

দ্বিজুও হাসিল, কহিল, চাই ত বটে, কিন্তু সুযোগ পাই কোথায়? যারা পরিচিত তারা কান দেবে না, অচেনার কাছেই একটু গুন্ গুন্ করা চলে। কিন্তু সাহস পাইনে, ভয় হয় অভ্যাসের অভাবে নিজের স্তব নিজের মুখে হয়ত বেধে যাবে।

বন্দনা বলিল, না যেতেও পারে, চেষ্টা করে দেখুন। আমার বিশ্বাস পুরুষেরা এ বিদ্যেয় আজন্মসিদ্ধ। আর দেরি করবেন না, আরম্ভ করুন।

দ্বিজু মাথা নাড়িয়া কহিল, না, পেরে উঠব না। তার চেয়ে বরঞ্চ নিরিবিলি বসে দু-চারখানা বই দেখুন, আমি বৌদিকে পাঠিয়ে দিচ্চি। এই বলিয়া সে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই বন্দনা জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, বেশ ত আপনি! না, একলা ফেলে আমাকে যাবেন না। বই আমি অনেক পড়েচি, তার দরকার নেই। আপনি গল্প করুন আমি শুনি।

কিসের গল্প?

আপনার নিজের।

তা হলে একটু সবুর করুন, আমি এক্ষুনি নীচে গিয়ে ঢের ভাল বক্তা পাঠিয়ে দিচ্চি।

বন্দনা বলিল, পাঠাবেন মেজদিদিকে ত? তার দরকার নেই। তাঁর বলবার যা কিছু ছিল চিঠিতেই শেষ হয়ে গেছে। সেগুলো সত্যি কি না এখন তাই শুনতে চাই।

দ্বিজদাস বলিল, না, সত্যি নয়। অন্ততঃ বারো আনা মিথ্যে। আচ্ছা, আপনি নাকি শীঘ্রই বিলেত যাচ্চেন?

বন্দনা বুঝিল, এই লোকটি নিজের প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে চায় না এবং জিদ করবার মত ঘনিষ্ঠতা অশোভন হইবে। কহিল, বাবার ইচ্ছে তাই। ইস্কুলের বিদ্যেটা তিনি সেখানে গিয়েই শেষ করতে বলেন। আপনিও কেন চলুন না?

দ্বিজদাস বলিল, আমার নিজের আপত্তি নেই, কিন্তু টাকা পাব কোথায় ? সেখানে ছেলে পড়িয়েও চলবে না, এবং এত ভার বৌদির ওপরেও চাপাতে পারব না। এ আশা বৃথা।

শুনিয়া বন্দনা হাসিল। কহিল, দ্বিজুবাবু, এ আপনার রাগের কথা। নইলে যে অর্থ আপনাদের আছে তাতে শুধু নিজে নয়, ইচ্ছে করলে এ গ্রামের অর্ধেক লোককে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন। বেশ, সে ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি, আপনি যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'ন।

দ্বিজু কহিল, সে ব্যবস্থা হবার নয়। টাকা প্রচুর আছে সত্যি, কিন্তু সে-সব দাদার, আমার নয়। আমি দয়ার ওপর আছি বললেও অত্যুক্তি হয় না।

বন্দনা পুনরায় হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, অত্যুক্তি যে কি এবং কোনটা, সে আমিও বুঝি। কিন্তু এও রাগের কথা। মেজদিদির চিঠিতে একবার শুনেছিলাম যে, যে-সম্পত্তি আপনি নিজে অর্জ্জন করেননি সে নিতে আপনি অনিচ্ছুক। এ কথা ঠিক নয় ?

দ্বিজদাস বলিল, যদি ঠিকও হয়, সে মানুষের ধর্ম্ম-বুদ্ধির কথা, রাগের নয়। কিন্তু এ-ই সমস্ত কারণ নয়।

সমস্ত কারণটা কি শুনতে পাইনে ?

দ্বিজদাস চুপ করিয়া রহিল। বন্দনা ক্ষণকাল তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমি স্বভাবতঃ এত কৌতূহলী নই এবং আমার এই আগ্রহ যে সৃষ্টিছাড়া আতিশয্য সে বোধ আমারও আছে, কিন্তু বোধ থাকলেই সংসারের সব প্রয়োজন মেটে না—অভাব হাঁ করে চেয়ে থাকে ! আপনার কথা আমি এত বেশি শুনেচি যে, আপনি প্রথম যখন ঘরে ঢুকলেন অপরিচিত বলে আপনাকে মনেই হ'ল না, যেন কতবার দেখেচি এমনি সহজে চিনতে পারলুম। মেজদিদিকে এত কথা বলতে পেরেচেন, আর আমাকে পারেন না ? আর কিছু না হোক, তাঁর মত আমিও ত একজন আত্মীয়।

কথা শুনিয়া দ্বিজু অবাক্ হইয়া গেল। এবং অকস্মাৎ সমস্ত ব্যাপারটা মনে পড়িয়া তাহার সঙ্কোচ ও বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সম্পূর্ণ অচেনা বয়স্থা কন্যার সহিত নির্জ্জনে এইভাবে আলাপ করার ইতিহাস এই প্রথম, দেয়ালে ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, এক ঘণ্টারও উপর কাটিয়া গিয়াছে, ইতিমধ্যে নীচে কেহ যদি তাহাদের খুঁজিয়া থাকে এ-বাটীতে তাহার জবাব যে কি সে ভাবিয়া পাইল না। হয়ত দাদা বাড়ি ফিরিয়াছেন, হয়ত মায়ের আহ্নিক সারা হইয়াছে, হঠাৎ সমস্ত দেহ-মন তাহার ব্যাকুল হইয়া যেন এক মুহূর্ত্তে সিঁড়ির দিকে ছুটিয়া গেল, কিন্তু কিছুই করিতে না পারিয়া তেমনি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

কই, বললেন না? বলুন?

দ্বিজুর চমক ভাঙিল। কহিল, যদি বলি, আপনাকেই প্রথম বলব। বৌদিদিকেও আজও বলিনি।

সে বোঝাপড়া তিনি করবেন। আমি কিন্তু না শুনে—

বলা যে উচিত নয় এ-সম্বন্ধে দ্বিজুর সংশয় ছিল না, কিন্তু অনুরোধ উপেক্ষা করারও তাহার শক্তি রহিল না।

হতবুদ্ধির মত মিনিট-খানেক চাহিয়া থাকিয়া কহিল, বাবা আমাকে বস্তুতঃ কিছুই দিয়ে যাননি।

বন্দনা চমকিয়া উঠিল—ইস্! মিছে কথা। এ হতেই পারে না।

প্রত্যুত্তরে দ্বিজু মাথা নাড়িয়া শুধু জানাইল—পারে।

কিন্তু তার কারণ?

বাবার বোধ হয় ধারণা জন্মেছিল, আমাকে দিলে সম্পত্তি তাঁর নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

এ ধারণার কোন সত্যিকার হেতু ছিল?

ছিল। আমাকে বাঁচাবার জন্য একবার বহু টাকা নষ্ট হয়ে গেছে।

বন্দনার মনে পড়িল এই ধরনের একটা ইঙ্গিত একবার সতীর চিঠির মধ্যে ছিল। জিজ্ঞাসা করিল, বাবা উইল করে গেছেন?

দ্বিজদাস কহিল, এ শুধু দাদাই জানেন। তিনি বলেন, না।

বন্দনা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, তবে রক্ষে। আমি ভাবচি বুঝি তিনি সত্যই উইল করে আপনাকে বঞ্চিত করে গেছেন।

দ্বিজদাস কহিল, তাঁর নিজের ইচ্ছের অভাব ছিল না, কিন্তু মনে হয় দাদা করতে দেননি।

দাদা করতে দেননি? আশ্চর্য্য!

দ্বিজু হাসিয়া বলিল, দাদাকে জানলে আর আশ্চর্য্য মনে হবে না। সন্ধ্যে হয়ে গেছে, ঘরে তখনো চাকর আলো দিয়ে যায়নি, আমি পাশের ঘরে একটা বই খুঁজছিলাম, হঠাৎ বাবার কথা কানে গেল! দাদা বললেন, না। বাবা জিদ করতে লাগলেন, না কেন বিপ্রদাস? আমার পিতা-পিতামহকালের সম্পত্তি আমি নষ্ট হতে দিতে পারব না। পরলোকে থেকেও আমি শান্তি পাব না। তবুও দাদা জবাব দিলেন, না, সে কোনমতেই হতে পারে না। বাবা বললেন, তবুও তোমারি হাতে আমি সমস্ত রেখে গেলাম। যদি ভাল মনে কর দিয়ো, যদি তা না মনে করতে পার, তাকে দিয়ো না। এর পরেও বাবা দু-তিন বছর ছিলেন, কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেননি।

বন্দনা মৃদু-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, এ কথা আর কেউ জানে ?

কেউ না। শুধু আমি জানি লুকিয়ে শুনেছিলাম বলে।

বন্দনা বহুক্ষণ নীরবে থাকিয়া অস্ফুটে কহিল, সত্যাই আপনার দাদা অসাধারণ মানুষ।

দ্বিজদাস শান্তভাবে শুধু বলিল, হাঁ। কিন্তু এখন আমি নীচে যাই, আমার অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। আপনি বসে বসে বই পড়ুন যতক্ষণ না ডাক পড়ে।

বন্দনা হাসিয়া কহিল, এখন বই পড়বার রুচি নেই, চলুন আমিও যাই। অন্ততঃ আট-দশদিন ত এখানে আছি, বই পড়বার অনেক সময় পাব।

দ্বিজদাস চলিতে উদ্যত হইয়াছিল, থমকিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার বাবার সঙ্গে আজ কলকাতা যাবেন না ?

না। তাঁর ফেরবার পথে বোম্বায়ে চলে যাব।

দ্বিজদাস কহিল, বরঞ্চ আমি বলি তাঁর ফেরবার পথেই আপনি কিছুদিন এখানে থেকে যাবেন।

বন্দনা কহিল, প্রথমে সেই ইচ্ছেই ছিল, কিন্তু এখন দেখচি তাতে ঢের অসুবিধে। আমাকে পৌঁছে দেবার কেউ নেই। কিন্তু আপনি যদি রাজি হন, আপনার পরামর্শই শুনি।

কিন্তু আমি ত তখন থাকব না। এই সোমবার মাকে নিয়ে কৈলাস তীর্থে যাত্রা করব।

বন্দনার দুই চক্ষু আনন্দে ও উৎসাহে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—কৈলাস ? কৈলাসে যাবেন ? শুনেচি সে নাকি এক পরমাশ্চর্য্য বস্তু। সঙ্গে আপনাদের আর কে কে যাবেন ?

ঠিক জানিনে, বোধ হয় আরও কেউ কেউ যাবেন।

আমাকে সঙ্গে নেবেন ?

দ্বিজদাস চুপ করিয়া রহিল। বন্দনা ক্ষুণ্ণ অভিমানের কণ্ঠে জোর করিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, আর এই জন্যেই বুঝি ঠিক সেই সময়ে আমাকে এখানে এসে থাকবার সুপরামর্শ দিচ্ছেন ?

দ্বিজদাস তাহার মুখের পানে চোখ তুলিয়া শান্তভাবে কহিল, সত্যিই এই জন্যে পরামর্শ দিয়েচি। বৌদি এত কথা লিখেচেন, কেবল এই খবরটি দেননি যে আমাদের এটা কত বড় গোঁড়া হিন্দুর বাড়ি ? এর আচার-বিচারের কঠোরতার কোন আভাস চিঠিতে পাননি ?

বন্দনা মাথা নাড়িয়া কহিল, না।

না? আশ্চর্য্য! একটুখানি থামিয়া দ্বিজদাস বলিল, একা আমি ছাড়া আপনার ছোঁয়া জল পর্য্যন্ত খাবার লোক এ-বাড়িতে কেউ নেই।

কিন্তু দাদা?

না।

মেজদি?

না, তিনিও না। আমরা চলে গেলে তবুও হয়ত দুদিন এখানে থাকতে পারেন, কিন্তু মা থাকতে একটা দিনও আপনার এ-বাড়িতে থাকা চলে না।

বন্দনার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল—সত্যি বলচেন?

সত্যিই বলচি।

ঠিক এমনি সময়ে নীচের সিঁড়ি হইতে সতীর ডাক শোনা গেল, ঠাকুরপো! বন্দনা! তোমরা দুটিতে করচ কি?

যাচ্চি বৌদি, সাড়া দিয়া দ্বিজদাস দ্রুতপদে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল, বন্দনা পাংশু-মুখে চাপা-কণ্ঠে শুধু কহিল, এত কথা আমি কিছুই জানতুম না। ধন্যবাদ।

৬

বন্দনা নীচে আসিয়া দেখিল পিতা হৃষ্টচিত্তে আহারে বসিয়াছেন। সেই বসিবার ঘরের মধ্যেই একখানি ছোট টেবিলের উপর রূপার থালায় করিয়া খাবার দেওয়া হইয়াছে। একজন দীর্ঘাকৃতি অতিশয় সুশ্রী ব্যক্তি অদূরে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার দেহের শক্তিমান গঠন ও অত্যন্ত ফর্সা রং দেখিয়াই বন্দনা চিনিল যে ইনিই বিপ্রদাস। সতী সঙ্গেই আসিতেছিল, কিন্তু সে প্রবেশ করিল না, দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া প্রণাম করিতে ইঙ্গিত করিয়া জানাইল যে, হাঁ ইনিই।

বাঙালীর মেয়েকে ইহা শিখাইবার কথা নহে এবং ইতিপূর্ব্বে মাকে যেমন সে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়াছিল বড় ভগিনীপতিকে তাহাই করিত কিন্তু হঠাৎ কেমন যেন তাহার সমস্ত মন বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। ইহার অনন্যসাধারণ বিদ্যা ও বুদ্ধির বিবরণ দ্বিজদাসের মুখে না শুনিলে হয়ত এই প্রচলিত শিষ্টাচার লঙ্ঘন করিবার কথা তাহার মনেও উঠিত না, কিন্তু এই পরিচয়ই তাহাকে কঠিন করিয়া তুলিল। দিদির

মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সে হাত তুলিয়া একটা নমস্কার করিল বটে, কিন্তু তাহার উপেক্ষাটাই তাহাতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিল, কথা কহিল সে পিতার সঙ্গেই, বলিল, তুমি একলা খেতে বসেচ, আমাকে ডেকে পাঠাওনি কেন?

সাহেব মুখ তুলিয়া চাহিলেন, বলিলেন, আমার যে গাড়ির সময় হ'লো মা, কিন্তু তোমার ত তাড়াতাড়ি নেই। আমি চলে গেলে তোমরা ধীরে-সুস্থে খাওয়া-দাওয়া করতে পারবে।

সতী আড়াল হইতে ঘাড় নাড়িয়া ইহার অনুমোদন করিল। বন্দনা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, মেজদি, অতগুলি দামী রূপোর বাসন নষ্ট করলে কেন, বাবাকে এনামেল কিংবা চিনেমাটির বাসনে খেতে দিলেই ত হত?

সাহেবের চিবান বন্ধ হইল। অত্যন্ত সরল-প্রকৃতির মানুষ তিনি, কন্যার কথার তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিলেন না, ব্যস্ত এবং লজ্জিত হইয়া উঠিলেন—যেন দোষটা তাঁহার নিজেরই—তাই ত, তাই ত—এ আমি লক্ষ্য করিনি—সতী কোথা গেল—আমাকে ডিসে খেতে দিলেই হত—এঃ—

বিপ্রদাসের মুখ ক্রোধে কঠোর ও গম্ভীর হইয়া উঠিল। এতাবৎ এত বড় অপমান করিতে তাহাকে কেহ সাহস করে নাই, এই নবাগত কুটুম্ব মেয়েটি তাহাকে যেমন করিল। বাসন নষ্ট হইবার দুশ্চিন্তা একটা ছলনা মাত্র। আসলে ইহা তাহাদের আচারনিষ্ঠ পরিবারের প্রতি নির্লজ্জ ব্যঙ্গ, এবং খুব সম্ভব তাহাকেই উদ্দেশ করিয়া। এ দুরভিসন্ধি কে তাহার মাথায় আনিয়া দিল বিপ্রদাস ভাবিয়া পাইল না, কিন্তু যেই দিক, ভাল মানুষ ব্যক্তিটিকে উপলক্ষ্য সৃষ্টি করার কদর্য্যতায় তাহার বিরক্তির অবধি রহিল না। কিন্তু সে ভাব দমন করিয়া একটুখানি হাসিয়া কহিল, তোমার দিদির কাছে শোনোনি যে, এ গোঁড়া হিন্দুর বাড়ি? এখানে এনামেল বল, চিনে-মাটিই বল কিছুই ঢোকবার জো নেই—শোনোনি?

বন্দনা কহিল, কিন্তু দামী পাত্রগুলো ত নষ্ট হয়ে গেল?

সাহেব ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু শুনেছি ঘি মাখিয়ে একটুখানি পুড়িয়ে নিলেই—

বিপ্রদাস এ কথায় কান দিল না, যেমন বলিতেছিল তেমনি বন্দনাকেই লক্ষ্য করিয়া কহিল, এ-বাড়িতে রূপোর বাসনের অভাব নেই, কিন্তু কোন কাজে লাগে না। তোমার বাবা সম্বন্ধে আমার গুরুজন, এ-বাড়িতে অত্যন্ত সম্মানিত অতিথি, রূপোর বাসনের যতই দাম হোক, তাঁর মর্য্যাদার কাছে একেবারেই তুচ্ছ; তোমাদের আসার উপলক্ষ্যে কতকগুলো যদি নষ্ট হয়েই যায়—যাক না। এই বলিয়া একটু মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, তোমার দিদির মত তোমারও যদি কোন গোঁড়াদের বাড়িতে

বিয়ে হয়, তোমার বাবা এলে তাঁকে মাটির সরাতে খেতে দিয়ো, ফেলা গেলে কারও গায়ে লাগবে না! কি বল বন্দনা?

ইস্, তাই বই কি! বাবার জন্যে আমি সোনার পাত্র গড়িয়ে দেব।

বিপ্রদাস হাসিমুখে উত্তর দিল, সে তুমি পারবে না। যে পারে সে বাপের সম্বন্ধে অমন কথা মুখে আনতেও পারে না। এমন কি অপরকে অপমান করার জন্যেও না। তোমার বাবাকে তুমি যত ভালবাস আর একজন তার কাকাকে বোধ করি তার চেয়ে বেশি ভালবাসে।

শুনিয়া সাহেবের মনের উপর হইতে যে একটা ভার নামিয়া গেল তাই নয়, সমস্ত অন্তর খুশীতে ভরিয়া গেল। বলিলেন, তোমার এই কথাটা বাবা ভারি সত্যি। দাদা যখন হঠাৎ মারা গেলেন তখন সতী খুবই ছোট, বিদেশে চাকুরি নিয়ে থাকি, সর্ব্বদা বাড়ি আসা ঘটে না, আর এলেও সমাজের শাসনে একলাটি থাকতে হয়, কিন্ত সতী ফাঁক পেলেই আমার কাছে ছুটে আসত—

বন্দনা তাড়াতাড়ি বাধা দিল, ওসব থাক্ না বাবা।

না, না, আমার যে সমস্তই মনে আছে, মিথ্যে ত নয়। একদিন আমার সঙ্গে একপাতে খেতেই বসে গেল—তার মা ত এই দেখে—

আঃ বাবা, তুমি যে কি বল তার ঠিকানা নেই। কবে আবার মেজদি তোমার সঙ্গে—তোমার কিচ্ছু মনে নেই।

সাহেব মুখ তুলিয়া প্রতিবাদ করিলেন—বাঃ মনে আছে বই কি। আর পাছে এই নিয়ে একটা গোলমাল হয়, তাই তোমার মা সেদিন কি রকম ভয়ে ভয়ে—

বন্দনা বলিল, বাবা, আজ তুমি নিশ্চয় গাড়ি ফেল করলে। ক'টা বেজেচে জান?

সাহেব ব্যস্ত হইয়া পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিলেন, সময় দেখিয়া নিরুদ্বেগের নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তুই এমন ভয় লাগিয়ে দিস্ যে চমকে উঠতে হয়। এখনো ঢের দেরি—অনায়াসে গাড়ি ধরা যাবে।

বিপ্রদাস সহাস্যে সায় দিয়া বলিল, হাঁ গাড়ির এখনো ঢের দেরি। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে আহার করুন, আমি নিজে স্টেশনে গিয়ে আপনাকে তুলে দিয়ে আসব। এই বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দ্বারের আড়াল হইতে সতী নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতে বন্দনা অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, মেজদি, বাবা কি কাণ্ড করলেন শুনেচ?

সতী মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

বন্দনা বলিল, তোমার শাশুড়ীর কানে গেলে হয়ত তোমাকে দুঃখ পেতে হবে। না মেজদি?

সতী কহিল, হয় হবে। এখন থাক্, কাকা শুনতে পাবেন।

কিন্তু তোমার স্বামী—তিনিও যে নিজের কানেই সমস্ত শুনে গেলেন, এ অপরাধের মার্জ্জনা বোধ করি তাঁর কাছেও নেই?

সতী হাসিল, কহিল, অপরাধ যদি সত্যিই হয়ে থাকে আমিই বা মার্জ্জনা চাইব কেন? সে বিচার আমি তাঁর 'পরেই ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছি। যদি থাক, নিজের চোখেই দেখতে পাবে। কাকা, তোমাকে আর কি এনে দেব বল?

সাহেব মুখ তুলিয়া কহিলেন, যথেষ্ট যথেষ্ট—আমার খাওয়া হয়ে গেছে মা, আর কিছুই চাইনে। এই বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ক্রমশঃ স্টেশনে যাত্রা করিবার সময় হইয়া আসিল; নীচে গাড়ি-বারান্দায় মোটর অপেক্ষা করিতেছে, বিছানা ব্যাগ প্রভৃতি আর একখানা গাড়িতে চালান হইয়াছে, সাহেব নিকটে দাঁড়াইয়া বিপ্রদাসের সহিত কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে বন্দনা কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, বাবা, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

পিতা বিস্মিত হইলেন—এই রোদে স্টেশনে গিয়ে লাভ কি মা?

বন্দনা বলিল, শুধু স্টেশনে নয়, কলকাতায় যাব। যখন বোম্বায়ে যাবে, আমি তোমার সঙ্গে চলে যাব।

বিপ্রদাস অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, সে কি কথা! তুমি দিনকয়েক থাকবে বলেই ত জানি।

বন্দনা উত্তরে শুধু কহিল, না।

কিন্তু তোমার ত এখনো খাওয়া হয়নি?

না, দরকার নেই। কলকাতায় পৌঁছে খাব।

তুমি চলে যাচ্ছ তোমার মেজদি শুনেচেন?

বন্দনা কহিল, ঠিক জানিনে, আমি চলে গেলেই শুনতে পাবেন।

বিপ্রদাস বলিলেন, তুমি না খেয়ে অমন করে চলে গেলে সে ভারি কষ্ট পাবে।

বন্দনা মুখ তুলিয়া বলিল, কষ্ট কিসের? আমাকে ত তিনি নেমন্তন্ন করে আনেননি যে না খেয়ে চলে গেলে তাঁর আয়োজন নষ্ট হবে। তিনি নির্ব্বোধ নয়, বুঝবেন। এই বলিয়া সে আর কথা না বাড়াইয়া দ্রুতপদে গাড়িতে গিয়া বসিল।

সাহেব মনে মনে বুঝিলেন কি একটা হইয়াছে। না হইলে হঠাৎ অকারণে কোন-কিছু করিয়া ফেলিবার মেয়ে সে নয়। শুধু বলিলেন, আমিও জানতাম ও দিন-কয়েক সতীর কাছেই থাকবে। কিন্তু একবার যখন গাড়িতে গিয়ে উঠেচে তখন আর নামবে না।

বিপ্রদাস জবাব দিলেন না, নিঃশব্দে তাঁহার পিছনে পিছনে গিয়া মোটরে উঠিলেন।

গাড়ি ছাড়িয়া দিল। অকস্মাৎ উপরের দিকে চাহিতেই বন্দনা দেখিতে পাইল তেতলার লাইব্রেরী-ঘরের জানালার গরাদ ধরিয়া দ্বিজদাস চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। চোখা-চোখি হইতেই সে হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।

৭

স্টেশনে পৌঁছিয়া খবর পাওয়া গেল, কোথায় কি একটা আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য ট্রেনের আজ বহু বিলম্ব; বোধ করি বা এক ঘণ্টারও বেশি লেট হইবে। পরিচিত স্টেশনমাস্টারটিও হঠাৎ পীড়িত হওয়ায় একজন মাদ্রাজী রিলিভিং হ্যাণ্ড কাল হইতে কাজ করিতেছিল, সে সঠিক সংবাদ কিছু দিতে পারিল না, শুধু অনুমান করিল যে, দেরি এক ঘণ্টাও হইতে পারে, দুঘণ্টাও হইতে পারে। বিপ্রদাস সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, কলকাতায় পৌঁছতে রাত্রি হয়ে যাবে, আজ কি না গেলেই চলে না?

কেন চলবে না? আমার ত—

বন্দনা বাধা দিয়া উঠিল, না বাবা, সে হয় না; একবার বেরিয়ে এসে আর ফিরে যাওয়া চলে না।

বিপ্রদাস অনুনয়ের সুরে কহিল, কেন চলবে না বন্দনা? বিশেষতঃ তুমি না খেয়ে এসেচ, সারাদিন কি উপোস করেই কাটাবে?

বন্দনা মাথা নাড়িয়া বলিল, আমার খিদে নেই। ফিরে গেলেও আমি খেতে পারব না।

সাহেব মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইলেন, কহিলেন, এদের শিক্ষা-দীক্ষাই আলাদা। একবার জিদ ধরলে আর টলান যায় না।

বিপ্রদাস চুপ করিয়া রহিল, আর অনুরোধ করিল না।

স্টেশনটি বড় না হইলেও একটি ছোট গোছের ওয়েটিং্ রুম ছিল; সেখানে গিয়া দেখা গেল, একজন ছোকরা বয়সের বাঙালী-সাহেব ও তাঁহার স্ত্রী ঘরখানি পূর্ব্বাহ্নেই দখলে আনিয়াছেন। সাহেব সম্ভবতঃ ব্যারিস্টার কিংবা ডাক্তার কিংবা বিলাতী পাশ-করা প্রফেসারও হইতে পারেন। এ অঞ্চলে কোথায় আসিয়াছিলেন, সে একটা রহস্য। আরাম-কেদারায় দুই হাতলে পদদ্বয় দীর্ঘপ্রসারিত করিয়া অর্দ্ধ-সুপ্ত। আকস্মিক জনসমাগমে মাত্র চক্ষুরুন্মীলন করিলেন—ভদ্রতা-প্রকাশের উদ্যম ইহার অধিক অগ্রসর হইল না। কিন্তু মহিলাটি চেয়ার ছাড়িয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হয়ত মেমসাহেব হইয়া উঠিতে তখনও পারেন নাই, কিন্তু উঁচু গোড়ালির জুতা ও পোষাক-পরিচ্ছদের ঘটা দেখিয়া মনে হয়, এ-বিষয়ে চেষ্টার ত্রুটি হইতেছে না।

ঘরের মধ্যে আর একখানা আরাম-চৌকি ছিল, বন্দনা পিতাকে তাহাতে বসাইয়া দিয়া নিজে একখানি বেঞ্চি অধিকার করিয়া বসিল এবং অত্যন্ত সমাদরে বিপ্রদাসকে আহ্বান করিয়া বলিল; জামাইবাবু, মিথ্যে দাড়িয়ে থাকবেন কেন, আমার কাছে এসে বসুন! বৃহৎ কাষ্ঠে দোষ নেই, আপনার জাত যাবে না।

শুনিয়া বন্দনার পিতা অল্প একটুখানি হাসিলেন, কহিলেন, বিপ্রদাসের ছোঁয়া-ছুঁয়ির বাচ-বিচার কি খুব বেশি না কি।

বিপ্রদাস নিজেও হাসিল, বলিল, বাচ-বিচার আছে, কিন্তু কি হলে খুব বেশি হয়, না জানলে এ-প্রশ্নের জবাব দিই কি করে?

বৃদ্ধ কহিলেন, এই ধর বন্দনা যা বললে?

বিপ্রদাস কহিল, উনি না খেয়ে ভয়ানক রেগে আছেন। মেয়েরা রাগের মাথায় যা বলে তা নিয়ে আলোচনা হয় না।

বন্দনা বলিল, আমি রেগে নেই—একটুও রেগে নেই।

বিপ্রদাস কহিল, আছ, এবং খুব বেশি রকমই রেগে আছ, নইলে আজ তুমি কলকাতায় না গিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে। তা ছাড়া তোমার আপনিই মনে পড়ত যে, এইমাত্র আমরা এক গাড়িতেই এলাম, জাত গিয়ে থাকলে আগেই গেছে, বেঞ্চিতে বসার কথাটা শুধু তোমার ছল মাত্র।

বন্দনা বলিল, হোক ছল, কিন্তু সত্য কথা বলুন ত মুখুয্যেমশাই, আমাদের ছোঁয়াছুয়ি করার জন্যে ফিরে গিয়ে আপনাকে আবার স্নান করতে হবে কি না?

চল না, বাড়ি গিয়ে নিজের চোখে দেখবে?

না। জানেন আপনি, মাকে প্রণাম করতে গেলে তিনি ছোঁবার ভয়ে দূরে সরে গিয়েছিলেন? বলিতে বলিতে তাহার মুখ ক্রোধে ও লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল।

বিপ্রদাস ইহা লক্ষ্য করিল। উত্তরে শুধু শান্তভাবে বলিল, কথাটা মিথ্যে না, অথচ সত্যিও নয়। এর আসল কারণ তাঁর কাছে না থাকলে তুমি বুঝতে পারবে না। কিন্তু সে সম্ভাবনা ত নেই।

না, নেই।

এই তীব্র অস্বীকারের হেতু এতক্ষণে বিপ্রদাসের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। মনে মনে তাহার ক্ষোভের অবধি রহিল না। ক্ষোভ নানা কারণে। বিমাতার সম্বন্ধে কথাটা আংশিক সত্য মাত্র এবং সে নিজেও যেন ইহাতে কতকটা জড়াইয়া গিয়াছে। অথচ বুঝাইয়া বলিবার সুযোগও নাই, সময়ও নাই। অন্যপক্ষে ধীর-চিত্তে বুঝিবার মত মনোবৃত্তির একান্ত অভাব। সুতরাং চুপ করিয়া থাকা ভিন্ন আর উপায় ছিল না—বিপ্রদাস একেবারেই নীরব হইয়া রহিল।

ছোকরা সাহেব পা নীচে নামাইয়া হাই তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি জমিদার বিপ্রদাসবাবু, না?

হাঁ।

আপনার নাম শুনেচি। পাশের গাঁয়ে আমার স্ত্রীর মামার বাড়ি, বেঙ্গলে যখন আসা-ই হল তখন ওর ইচ্ছে একবার দেখা করে যান! তাই আসা। আমি পাঞ্জাবে প্র্যাকটিস করি।

বিপ্রদাস চাহিয়া দেখিল লোকটি তাহারই সমবয়সী—এক-আধ বছরের এদিক-ওদিক হইতে পারে, তার বেশি নয়।

সাহেব কহিতে লাগিলেন, কালই আপনার কথা হচ্ছিল। লোকে বলে আপনি ভয়ানক, অর্থাৎ কিনা খুব কড়া জমিদার। অবশ্য দু-চারজন বামুন-পণ্ডিত গোঁড়া হিন্দু বলে বেশ তারিফও করলে। এখন দেখচি কথাটা মিথ্যে নয়।

অপরিচিতের এই অযাচিত আলোচনায় বন্দনা ও তাঁহার পিতা উভয়েই আশ্চর্য্য হইলেন, কিন্তু বিপ্রদাস কোন উত্তর দিল না। বোধ হয় সে এমনি অন্যমনস্ক ছিল যে সকল কথা তাহার কানে যায় নাই।

তিনি পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন, আমার লেক্‌চারে আমি প্রায়ই বলে থাকি যে, চাই রিয়েল সলিড্ শিক্ষা—ফাঁকিবাজি, ধাপ্পাবাজি নয়। আপনার উচিত একবার ইয়োরোপ ঘুরে আসা। সেখানকার আবহাওয়া, সেখানকার ফ্রি এয়ার ব্রিদ ক'রে না এলে মনের মধ্যে freedom আসে না—কুসংস্কার মন থেকে মুক্ত হতে চায় না। আমি একাধিক্রমে পাঁচ বৎসর সে-দেশে ছিলাম।

বন্দনার পিতা শেষ কথাটায় খুশী হইয়া কহিলেন, একথা সত্যি।

উৎসাহ পাইয়া তিনি গরম হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, এই ডিমোক্র্যাসির যুগে সবাই সমান, কেউ কারো ছোট নয়, এবং চাই প্রত্যেকেরই নিজের অধিকার জোর

করে assert করা—consequence তার যা-ই কেন না হোক। আমার টাকা থাকলে আপনার জমিদারীর প্রত্যেক প্রজাকে আমি নিজের খরচে ইয়োরোপ ঘুরিয়ে আনতাম। নিজের right কাকে বলে এ-কথা তারা তখন নিজেরাই বুঝত।

বন্দনার বোধ করি ভারি খারাপ লাগিল, সে আস্তে আস্তে কহিল, জামাইবাবু তাঁর প্রজাদের উপর অত্যাচার করেন এ-খবর আপনাকে কে দিল? আশা করি আপনার মামাশ্বশুরের ওপর কোন জুলুম হয়নি?

ও—উনি আপনার ভগিনীপতি? Thanks—না, তিনি কোন অভিযোগ করেননি। নিজের স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করিয়া সহাস্যে কহিলেন, তোমার বোনেরা যদি এই রকম হত!—আপনি বোধ করি বিলেত ঘুরে এসেচেন? যাননি? যান, যান। Freedom, সাহস, শক্তি কাকে বলে, সে-দেশের মেয়েরা সত্যি কি একবার স্বচক্ষে দেখে আসুন। আমি next time যাবার সময় ওঁকে সঙ্গে নিয়ে যাব স্থির করেচি।

কেহ কোন কথা কহিবার পূর্ব্বেই স্টেশনের সেই রিলিভং হ্যাণ্ডটি মুখ বাড়াইয়া জানাইল যে ট্রেন distance signal পার হইয়াছে, আসিয়া পড়িল বলিয়া।

সকলে ব্যস্ত হইয়া প্লাটফর্ম্মে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

গাড়ি দাঁড়াইলে দেখা গেল ছুটির বাজারে যাত্রী-সংখ্যার সীমা নাই। তিল-ধারণের জায়গা পাওয়া কঠিন। মাত্র একখানি ফার্ষ্ট ক্লাস আর একখানি সেকেণ্ড ক্লাস। সেকেণ্ড ক্লাস ভর্ত্তি করিয়া এক দল ফিরিঙ্গী রেলওয়ে-সারভ্যাণ্ট কলিকাতায় কি একটা খেলার উপলক্ষ্যে চলিয়াছে, এবং বোধ হয় তাহাদেরই কয়েকজন স্থানা-ভাবে ফার্স্ট ক্লাসে চড়িয়া বসিয়াছে। অপর্য্যাপ্ত মদ ও বিয়ার খাইয়া লোকগুলার চেহারাও যেমন ভয়ঙ্কর, ব্যবহারও তেমনি বে-পরোয়া। গাড়ির দরজা আটকাইয়া সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—go—যাও—যাও!

স্টেশন মাস্টার আসিল, গার্ডসাহেব আসিল, তাহারা গ্রাহ্যই করিল না।

ছোকরা সাহেব কহিল, উপায়?

বন্দনা ভয়ে ভয়ে কহিল, চলুন আজ বাড়ি ফিরে যাই।

বিপ্রদাস বলিল, না।

না ত কি? না হয় রাত্রির ট্রেনে—

ছোকরা সাহেব বলিলেন, সে ছাড়া আর উপায় কি? কষ্ট হবে, তা হোক?

বিপ্রদাস ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না। গাড়িতে চার-পাঁচজন আছে, আর চার-পাঁচজনের জায়গা হওয়া চাই।

বন্দনার পিতা ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, চাই ত জানি, কিন্তু ওরা সব মাতাল যে!

বিপ্রদাসের সমস্ত দেহ যেন কঠিন লোহার মত ঋজু হইয়া উঠিল, কহিল, সে ওদের সখ—আমাদের নয়। উঠুন, আমি সঙ্গে যাব। এবং পরক্ষণেই গাড়ির হাতল ধরিয়া সজোরে ধাক্কা দিয়া দরজা খুলিয়া ফেলিল। বন্দনার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া কহিল, এসো। ছোকরা সাহেবকে ডাকিয়া কহিল, right assert করবেন ত স্ত্রী নিয়ে উঠে পড়ুন। অত্যাচারী জমিদার সঙ্গে থাকতে ভয় নেই।

মাতাল সাহেবগুলো এই লোকটির মুখের পানে এক মুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া নিঃশব্দে গিয়া ও-দিকের বেঞ্চে বসিয়া পড়িল।

৮

গণ্ডগোল শুনিয়া পাশের কামরার সহযাত্রী সাহেবরা প্ল্যাটফর্মে নামিয়া দাঁড়াইল, এবং রুক্ষ-কণ্ঠে সমস্বরে প্রশ্ন করিল, what's up? ভাবটা এই যে সঙ্গীদের হইয়া তাহারা বিক্রম দেখাইতে প্রস্তুত।

বিপ্রদাস অদূরবর্ত্তী গার্ডকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকিয়া কহিল, এই লোকগুলা খুব সম্ভব ফার্ষ্ট ক্লাসের প্যাসেঞ্জার নয়, তোমার ডিউটি এদের সরিয়ে দেওয়া।

সে বেচারাও সাহেব, কিন্তু অত্যন্ত কাল-সাহেব। সুতরাং ডিউটি যাই হোক ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। অনেকেই তামাসা দেখিতেছিল, সেই মাদ্রাজী রিলিভিং হ্যাণ্ডটিও দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে হাত নাড়িয়া নিকটে ডাকিয়া বিপ্রদাস পাঁচ টাকার একটা নোট দিয়া কহিল, আমার নাম আমার চাকরদের কাছে পাবে। তোমার কর্ত্তাদের কাছে একটা তার করে দাও যে এই মাতাল ফিরিঙ্গীর দল জোর করে ফার্স্ট ক্লাসে উঠেচে, নামতে চায় না। আর এ খবরটাও তাদের জানিয়ো যে গাড়ির গার্ড দাঁড়িয়ে মজা দেখলে, কিন্তু কোন সাহায্য করলে না।

গার্ড নিজের বিপদ বুঝিল। সাহসে ভর করিয়া সরিয়া আসিয়া বলিল, Don't you see they are big people? তোমরা রেলওয়ে সারভ্যাণ্ট, রেলের পাশে যাচ্ছ—be careful!

কথাটা মাতালের পক্ষেও উপেক্ষণীয় নয়। অতএব তাহারা নামিয়া পাশের কামরায় গেল, কিন্তু ঠিক অহিংস মেজাজে গেল না? চাপা গলায় যাহা বলিয়া গেল

তাহাতে মন বেশ নিশ্চিন্ত হয় না। সে যা হোক, পাঞ্জাবের ব্যারিস্টারসাহেব গার্ডকে ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন, আপনি না থাকলে আজ হয়ত আমাদের যাওয়াই ঘটত না।

ও—নো। এ আমার ডিউটি।

গাড়ি ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল। বিপ্রদাস নামিবার উপক্রম করিয়া কহিল, আর বোধ হয় আমার সঙ্গে যাবার প্রয়োজন নেই। ওরা আর কিছু করবে না।

ব্যারিস্টার বলিলেন, সাহস করবে না। চাকরির ভয় আছে ত?

বন্দনা দরজা আগলাইয়া কহিল, না, সে হবে না। চাকরির ভয়টাই চরম gurantee নয়—সঙ্গে আপনাকে যেতেই হবে।

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, পুরুষ হলে বুঝতে এর চেয়ে বড় gurantee সংসারে নেই। কিন্তু আমি যে কিছুই খেয়ে আসিনি।

খেয়ে আমিও ত আসিনি।

সে তোমার সখ! কিন্তু একটু পরেই আসবে হোটেল-ওয়ালা বড় স্টেশন, সেখানে ইচ্ছে হলেই খেতে পারবে।

বন্দনা কহিল, কিন্তু সে ইচ্ছে হবে না। উপোস করতে আমিও পারি।

বিপ্রদাস বলিল, পেরে কোন পক্ষেরই লাভ নেই—আমি নেবে যাই। ব্যারিস্টারসাহেবকে কহিল, আপনি সঙ্গে রইলেন একটু দেখবেন। যদি আবশ্যক হয় ত—

বন্দনা কহিল, চেন টেনে গাড়ি থামাবেন? সে আমিও পারব। এই বলিয়া সে জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া বাড়ির চাকরদের বলিয়া দিল, তোমরা মাকে গিয়ে ব'লো যে, উনি সঙ্গে গেলেন। কাল কিংবা পরশু ফিরবেন।

ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

বন্দনা কাছে আসিয়া বসিল, কহিল, আচ্ছা মুখুয্যেমশাই আপনি ত একগুঁয়ে কম নন।

কেন?

আপনি যে জোর করে আমাদের গাড়িতে তুললেন, কিন্তু ওরা-ত ছিল মাতাল, যদি নেমে গিয়ে একটা মারামারি বাধিয়ে দিত?

বিপ্রদাস কহিল, তা হলে চাকরি যেত।

বন্দনা বলিল, কিন্তু আমাদের কি যেত? দেহের অস্থি-পঞ্জর। সেটা চাকরির চেয়ে তুচ্ছ বস্তু নয়।

বিপ্রদাস ও বন্দনা উভয়েই হাসিতে লাগিল, অন্য মহিলাটিও হঠাৎ একটুখানি হাসিয়া ঘাড় ফিরাইল, শুধু তাঁহার স্বামী পাঞ্জাবের নবীন ব্যারিস্টার মুখ গম্ভীর করিয়া রহিলেন।

বন্দনার পিতা এতক্ষণ বিশেষ মনোযোগ করেন নাই, আলোচনার শেষের দিকটা কানে যাইতেই, সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, না না, তামাসার কথা নয়,—এ ব্যাপার ট্রেনে প্রায়ই ঘটে খবরের কাগজে দেখতে পাওয়া যায়। তাই ত জোর-জবরদস্তির আমার ইচ্ছেই ছিল না, রাত্রের ট্রেনে গেলেই সব দিকে স্থবিধে হ'ত।

বন্দনা কহিল, রাত্রের ট্রেনেও যদি মাতাল-সাহেব থাকত বাবা?

পিতা কহিলেন, তা কি আর সত্যিই হয় রে? তা হলে ত ভদ্রলোকের যাতায়াতই বন্ধ করতে হয়। এই বলিয়া তিনি একটা মোটা চুরুট ধরাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বন্দনা আস্তে আস্তে বলিল, মুখুয্যেমশাই, ভদ্রলোকের সংজ্ঞা নিয়ে যেন বাবাকে জেরা করবেন না।

বিপ্রদাস হাসিমুখে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না। সে আমি বুঝেচি।

আচ্ছা মুখুয্যেমশাই, ছেলে-বেলা গড়ের-মাঠে সাহেবদের সঙ্গে কখনো মারামারি করেচেন? সত্যি বলবেন।

না, সে সৌভাগ্য কখনো ঘটেনি।

বন্দনা কহিল, লোকে বলে, দেশের লোকের কাছে আপনি একটা terror। শুনি, বাড়ির সবাই আপনাকে বাঘের মত ভয় করে। সত্যি?

কিন্তু শুনলে কার কাছে?

বন্দনা গলা খাট করিয়া বলিল, মেজদির কাছে।

কি বলেন তিনি?

বলেন, ভয়ে গায়ের রক্ত জল হয়ে যায়।

কি রকম জল! মাতাল-সাহেব দেখলে আমাদের যেমন হয়, তেমনি?

বন্দনা সহাস্যে মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ, অনেকটা ঐ রকম।

বিপ্রদাস কহিল, ওটা দরকার। নইলে মেয়েদের শাসনে রাখা যায় না। তোমার বিয়ে হলে বিদ্যেটা ভায়াকে শিখিয়ে দিয়ে আসব।

বন্দনা কহিল, দেবেন। কিন্তু সব বিদ্যে সকলের বেলায় খাটে না এও জানবেন। মেজদি বরাবরই ভালমানুষ, কিন্তু আমি হলে আমাকেই সকলের ভয় করে চলতে হ'ত।

বিপ্রদাস বলিল, অর্থাৎ ভয়ে বাড়ি-সুদ্ধ লোকের গায়ের রক্ত জল হয়ে যেত। খুব আশ্চর্য্য নয়। কারণ একটা বেলার মধ্যেই নমুনা যা দেখিয়ে এসেচ তাতে বিশ্বাস করতেই প্রবৃত্তি হয়। অন্ততঃ মা সহজে ভুলতে পারবেন না।

বন্দনা মনে মনে একটুখানি উত্তেজিত হইয়া উঠিল, কহিল, আপনার মা কি করেচেন জানেন? আমি প্রণাম করতে গেলুম, তিনি পিছিয়ে সরে গেলেন।

বিপ্রদাস কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিল না, কহিল, আমার মায়ের ঐটুকুমাত্রই দেখে এলে, আর কিছু দেখবার সুযোগ পেলে না। পেলে বুঝতে এই নিয়ে রাগ করে না-খেয়ে আসার মত ভুল কিছু নেই।

বন্দনা বলিল, মানুষের আত্ম-সম্ভ্রম বলে ত একটা জিনিষ আছে।

বিপ্রদাস একটু হাসিয়া কহিল, আত্ম-সম্ভ্রমের ধারণা পেলে কোথা থেকে? ইস্কুল-কলেজের মোটা মোটা বই পড়ে ত? কিন্তু মা ত ইংরিজি জানেন না, বইও পড়েননি। তাঁর জানার সঙ্গে তোমার ধারণা মিলবে কি করে?

বন্দনা বলিল, কিন্তু আমি শুধু নিজের ধারণা নিয়েই চলতে পারি।

বিপ্রদাস কহিল, পারলে অনেক ক্ষেত্রে ভুল হয়, যেমন আজ তোমার হয়েচে। বিদেশের বই থেকে যা শিখেচ তাকেই একান্ত বলে মেনে নিয়েচ বলেই এমনি করে চলে আসতে পারলে। নইলে পারতে না। গুরুজনকে অকারণে অসম্মান করতে বাধত। আত্ম-মর্য্যাদা আর আত্ম-অভিমানের তফাৎ বুঝতে।

বন্দনা তফাৎ না বুঝুক, এটা সে বুঝিল যে তাহার আজিকার আচরণটা বিপ্রদাসের অন্তরে লাগিয়াছে। তাহার জন্য নয়, মায়ের অসম্মানের জন্য।

মিনিট দুই-তিন চুপ করিয়া থাকিয়া বন্দনা হঠাৎ প্রশ্ন করিল, মায়ের মত আপনি নিজেও খুব গোঁড়া হিন্দু, না?

বিপ্রদাস কহিল, হাঁ।

তেমনি ছোঁয়া-ছুঁয়ির বাচ-বিচার করে চলেন?

চলি।

প্রণাম করতে গেলে তাঁর মতই দূরে সরে যান?

যাই। সময়-অসময়ের হিসেব আমাদের মেনে চলতে হয়।

আমার মেজদিদিকেও বোধ করি এমনি অন্ধ বানিয়ে তুলেচেন?

সে তোমার দিদিকেই জিজ্ঞাসা ক'রো। তবে পারিবারিক নিয়ম তাঁকেও মেনে চলতে হয়।

বন্দনা হাসিয়া বলিল, অর্থাৎ বাঘের ভয় না করে কারও চলবার জো নেই।

বিপ্রদাসও হাসিয়া বলিল, না, জো নেই। যেমন দিনের গাড়িতে বাঘের ভয় থাকলে মানুষকে রাত্রের গাড়িতে যেতে হয়—ওটা প্রাণ-ধর্ম্মের স্বাভাবিক নিয়ম।

বন্দনা বলিল, দিদি মেয়েমানুষ, সহজেই দুর্ব্বল, তাঁর ওপর সব নিয়মই খাটান যায়, কিন্তু দ্বিজুবাবুও ত শুনি পরিবারিক নিয়ম মেনে চলেন না, সে সম্বন্ধে বাঘ-মশায়ের অভিমতটা কি?

প্রশ্নটা খোঁচা দিবার জন্যই বন্দনা করিয়াছিল এবং বিদ্ধ করিবে বলিয়াই সে

আশা করিয়াছিল কিন্তু বিপ্রদাসের মুখের 'পরে কোন চিহ্নই প্রকাশ পাইল না, তেমনই হাসিয়া বলিল, এ সকল গূঢ় তথ্য অধিকারী ব্যতিরেকে প্রকাশ করা নিষেধ।

দ্বিজুবাবু নিজে জানতে পাবেন ত?

বিপ্রদাস ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সময় হলেই পাবে। সে জানে রক্তমাংসে বাঘের পক্ষপাতিত্ব নেই।

মুহূর্ত্তকালের জন্য বন্দনার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। ইহার পরে সে যে কি প্রশ্ন করিবে ভাবিয়া পাইল না।

এই পরিবর্ত্তন বিপ্রদাসের তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিকে এড়াইল না।

পিতা ডাকিলেন, বুড়ী, আমাকে একটু জল দাও ত মা।

বন্দনা উঠিয়া গিয়া পিতাকে কুঁজা হইতে জল দিয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিল। পুনশ্চ দ্বিজদাসের কথা পাড়িতে তাহার ভয় করিল। অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া কহিল, মেজদির শাশুড়ীর জন্যে নয়, কিন্তু আমার না-খেয়ে আসায় মেজদি যদি দুঃখ পেয়ে থাকেন ত আমিও দুঃখ পাব। আমি সেই কথাই এখন ভাবচি।

বিপ্রদাস কহিল, মেজদি কষ্ট পাবেন সেইটে হ'লো বড়, আর আমার মা যে লজ্জা পাবেন, বেদনা বোধ করবেন সেটা হ'লো তুচ্ছ! তার মানে, মানুষ আসল জিনিসটি না জানলে কত উল্টো চিন্তাই না করে!

বন্দনা কহিল, একে উল্টো চিন্তা বলচেন কেন? বরঞ্চ এই ত স্বাভাবিক।

বিপ্রদাস চুপ করিয়া রহিল। তাহার ক্ষুণ্ণ মুখের চেহারা বন্দনার চোখে পড়িল।

বাহিরে অন্ধকার করিয়া আসিতেছিল, কিছুই দেখা যায় না, তথাপি জানালার বাহিরে চাহিয়া বন্দনা বহুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। অন্যদিন এই সময়ে ট্রেন হাওড়ায় পৌঁছায়, কিন্তু আজ এখনো দু-তিন ঘণ্টা দেরি। সে মুখ ফিরাইয়া দেখিল বিপ্রদাস পকেট হইতে একটা ছোট খাতা বাহির করিয়া কি সব লিখিয়া যাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, মুখুয্যেমশাই, একটা কথার জবাব দেবেন?

কি কথা?

আপনি বলছিলেন আমাদের আত্ম-সম্ভ্রমবোধ শুধু ইস্কুল-কলেজের বইপড়া ধারণা। কিন্তু আপনার মা ত ইস্কুল-কলেজে পড়েননি, তাঁর ধারণা কোথাকার শিক্ষা?

বিপ্রদাস বিস্মিত হইল, কিন্তু কিছু বলিল না।

বন্দনা কহিল, তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহল আমি মন থেকে সরাতে পারচিনে।

তিনি গুরুজন, আমি অস্বীকার করিনে, কিন্তু সংসারে সেই কথাটাই কি সকল কথার বড় ?

বিপ্রদাস পূর্ব্ববৎ স্থির হইয়া রহিল।

বন্দনা বলিতে লাগিল, আজ আমরা ছিলুম তাঁর বাড়িতে অনাহূত অতিথি। এ ত আমার বই-পড়া বিদেশের শিক্ষা নয় ? তবু ত এসব কিছুই নয়—শুধু বয়সে ছোট বলেই কি আমারই অপমানটা আপনারা অগ্রাহ্য করবেন ?

এখনও বিপ্রদাস কিছুই বলিল না, তেমনি নীরবে রহিল।

বন্দনা কহিল, তবুও তাঁর কাছে আমি ক্ষমা চাইচি। আমার আচরণের জন্যে দিদি যেন না দুঃখ পান। একটু থামিয়া বলিল, আমার বাপ-মা বিলেত গিয়েছেন বলে মেমসাহেব ছাড়া তাঁকে আজও কিছু তিনি ভাবতেই পারেন না। শুনেচি, এই জন্যেই নাকি আজও মেজদির গঞ্জনার পরিসমাপ্তি ঘটেনি। তাঁর ধারণার সঙ্গে আমার ধারণা মিলবে না, তবু তাঁকে বলবেন, আমি যাই হই, অপমানটা অপমান ছাড়া আর কিছু নয়। দিদির শাশুড়ী করলেও না। বলিতে বলিতে তাহার চোখের কোলে জল আসিয়া পড়িল।

বিপ্রদাস ধীরে ধীরে বলিল, কিন্তু তিনি ত তোমাকে অপমান করেন নি।

বন্দনা জোর দিয়া বলিল, নিশ্চয় করেচেন।

বিপ্রদাস তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল না, কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া কহিল, না, অপমান তোমাকে মা করেননি। কিন্তু তিনি নিজে ছাড়া এ কথা তোমাকে কেউ বোঝাতে পারবেন না। তর্ক করে নয়, তাঁর কাছে থেকে এ কথা বুঝতে হবে।

বন্দনা জানালার বাহিরে চাহিয়া রহিল।

বিপ্রদাস বলিতে লাগিল, একদিন বাবার সঙ্গে মার ঝগড়া হয়। কারণটা তুচ্ছ, কিন্তু হয়ে দাঁড়াল মস্ত বড়। তোমাকে সকল কথা বলা চলে না, কিন্তু সেই দিন বুঝেছিলাম আমার এই লেখাপড়া-না-জানা মায়ের আত্ম-মর্য্যাদাবোধ কত গভীর।

বন্দনা সহসা ফিরিয়া দেখিল অপরিসীম মাতৃ-গর্ব্বে বিপ্রদাসের সমস্ত মুখ যেন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে কিছুই না বলিয়া আবার জানালার বাহিরেই চাহিয়া রহিল।

বিপ্রদাস বলিতে লাগিল, অনেকদিন পরে কি-একটা কথার সূত্রে একদিন এই কথাই মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—মা, এত বড় আত্মমর্য্যাদাবোধ তুমি পেয়েছিলে কোথায় ?

বন্দনা মুখ না ফিরাইয়াই কহিল, কি বললেন তিনি ?

বিপ্রদাস কহিল, জান বোধ হয় মায়ের আমি আপন ছেলে নই। তাঁর নিজের দুটি ছেলে-মেয়ে আছে—দ্বিজু আর কল্যাণী। মা বললেন, তোদের তিনটিকে এক-

সঙ্গে এক বিছানায় যিনি মানুষ করে তোলবার ভার দিয়েছিলেন, তিনিই এ-বিত্তে আমাকে দান করেছিলেন বাবা, অন্য কেউ নয়। সেই দিন থেকেই জানি মায়ের এই গভীর আত্ম-সম্মানবোধই কাউকে একটা দিনের জন্যে জানতে দেয়নি, তিনি আমার জননী ন'ন, বিমাতা। বুঝতে পার এর অর্থ?

ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া পুনরায় সে বলিতে লাগিল, অভিবাদনের উত্তরে কে কতটুকু হাত তুললে, কতটুকু সরে দাঁড়াল, নমস্কারের প্রতি-নমস্কারে কে কতখানি মাথা নোয়ালে, এই নিয়ে মর্য্যাদার লড়াই সকল দেশেই আছে, অহঙ্কারের নেশার খোরাক তোমাদের পাঠ্য-পুস্তকের পাতায় পাতায় পাবে, কিন্তু মা না হয়েও পরের ছেলের মা হয়ে যেদিন মা আমাদের বৃহৎ পরিবারে প্রবেশ করলেন, সেদিন আশ্রিত আত্মীয়-পরিজনদের গলায় বিষের থলি যেন উপচে উঠল। কিন্তু যে বস্তু দিয়ে তিনি সমস্ত বিষ অমৃত করে তুললেন, সে গৃহকর্ত্রীর অভিমান নয়, সে গৃহিণীপনার জবরদস্তি নয়, সে মায়ের স্বকীয় মর্য্যাদা। সে এত উঁচু যে তাকে কেউ লঙ্ঘন করতে পারলে না। কিন্তু এ তত্ত্ব আছে শুধু আমাদের দেশে। বিদেশীরা এ খবর ত জানে না, তারা খবরের কাগজের খবর দেখে বলে এদের দাসী, বলে অন্তঃপুরে শেকল-পরা বাঁদী। বাইরে থেকে হয়ত তাই দেখায়—দোষ তাদের দিইনে, কিন্তু বাড়ির দাস-দাসীরও সেবার নীচে অন্নপূর্ণার রাজ্যেশ্বরী মূর্ত্তি তাদের যদিও বা না চোখে পড়ে, তোমাদেরও কি পড়বে না?

বন্দনা অভিভূত-চক্ষে বিপ্রদাসের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

ব্যারিস্টার সাহেব অকস্মাৎ জোর গলায় বলিয়া উঠিলেন, ট্রেন এতক্ষণে হাওড়া প্লাটফর্ম্মে ইন্ করলে।

বন্দনার পিতার বোধ করি তন্দ্রা আসিয়াছিল, চমকিয়া চাহিয়া কহিলেন, বাঁচা গেল।

বন্দনা মৃদুকণ্ঠে চুপি চুপি বলিল, আমার কলকাতায় নামতে আর যেন ভাল লাগচে না মুখুয্যেমশাই। ইচ্ছে হচ্ছে আপনার মার কাছে ফিরে যাই। গিয়ে বলি, মা, আমি ভাল করিনি, আমাকে মার্জ্জনা করুন।

বিপ্রদাস শুধু হাসিল, কিছু বলিল না।

স্টেশনে নামিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কোথায় যাবেন?

রায়সাহেব বলিলেন, গ্র্যাণ্ড হোটেলেই ত বরাবর উঠি, তাদের তার করেও দিয়েচি—ঐখানেই উঠব।

এই লোকটির সুমুখে গ্র্যাণ্ড হোটেলের কথায় বন্দনার কেমন যেন আজ লজ্জা করিতে লাগিল।

পাঞ্জাবের ব্যারিস্টার সাহেব গাড়ির অত্যন্ত লেট হওয়ার প্রতি নিরতিশয় ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বার বার জানাইতে লাগিলেন তাঁহাকে বি. এন. লাইনে যাইতে হইবে, অতএব ওয়েটিং রুম ব্যতীত আজ আর গত্যন্তর নাই।

বিপ্রদাস নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে, রায়সাহেব নিজেও একটুখানি যেন লজ্জিত হইয়াই কহিলেন, কিন্তু বিপ্রদাস, তুমিও—তুমি বোধ হয় আমাদের সঙ্গে—

গ্র্যাণ্ড হোটেলে? বলিয়াই বিপ্রদাস হাসিয়া ফেলিল, কহিল, আমার জন্যে চিন্তা নেই। বৌবাজারে দ্বিজুর একটা বাড়ি আছে, প্রায়ই আসতে হয়, লোকজন সবই আছে—আচ্ছা, আজ সেইখানেই চলুন না?

বন্দনা পুলকিত হইয়া উঠিল—চলুন, সবাই সেইখানেই যাব। তাহার মাথার উপর হইতে যেন একটা বোঝা নামিয়া গেল। আনন্দের প্রাবল্যে অপর দুই সহযাত্রীকে সে-ই সাদরে আহ্বান করিয়া সবাই মিলিয়া মোটরে গিয়া উঠিল।

৯

বন্দনা সকালে উঠিয়া দেখিল এই বাড়িটার সম্বন্ধে সে যাহা ভাবিয়াছিল তাহা নয়। মনে করিয়াছিল পুরুষমানুষের বাসাবাড়ি, হয়ত ঘরের কোণে কোণে জঞ্জাল, সিঁড়ির গায়ে থুথু, পানের পিচের দাগ, ভাঙা-চোরা আসবাব-পত্র, ময়লা বিছানা-কড়ি-বরগায় ঝুল, মাকড়সার জাল—এমনি সব আগোছাল বিশৃঙ্খল ব্যাপার। কাল রাত্রে সামান্য আলোকে স্বল্পকালের মধ্যে দেখাও কিছু হয় নাই, কিন্তু আজ তাহার সুশৃঙ্খল পরিচ্ছন্নতায় সত্যই আশ্চর্য্য হইল। মস্ত বাড়ি, অনেক ঘর, অনেক বারান্দা, সমস্ত পরিষ্কার ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। দ্বারের বাহিরে একজন মধ্যবয়সী বিধবা স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়াছিল, দেখিতে ভদ্রঘরের মেয়ের মত, সে গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিতেই বন্দনা সসঙ্কোচে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

সে বলিল, দিদি, আপনার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি, চলুন, স্নানের ঘরটা দেখিয়ে দিই। আমি এ বাড়ির দাসী।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, বাবা উঠেচেন?

না, কাল শুতে দেরি হয়েচে, হয়ত উঠতেও দেরি হবে।

আমাদের সঙ্গে দুজন যাঁরা এসেচেন তাঁরা?

না, তাঁরাও ওঠেননি।

তোমাদের বড়বাবু? তিনিও ঘুমুচ্চেন?

দাসী হাসিয়া বলিল, না, তিনি গঙ্গাস্নান, পুজো-আহ্নিক সেরে কাছারি-ঘরে গেছেন। খবর পাঠাব কি ?

বন্দনা বলিল, না, তার দরকার নেই।

স্নানের ঘরটা একটু দূরে, ছোট একটা বারান্দা পার হইয়া যাইতে হয়। বন্দনা যাইতে যাইতে কহিল, তোমাদের এখানে বাথরুম শোবার ঘরের কাছে থাকবার জো নেই, না ?

দাসী কহিল, না। মা মাঝে মাঝে কালী-দর্শনের জন্যে কলকাতায় এলে এ-বাড়িতেই থাকেন কি না, তাই ও-সব হবার জো নেই।

বন্দনা মনে মনে বলিল, এখানেও সেই প্রবল-প্রতাপ মা। আচার-অনাচারের কঠিন শাসন। সে ফিরিয়া গিয়া কাপড় জামা গামছা প্রভৃতি লইয়া আসিল, কহিল, এখানে দু-চারদিন যদি থাকতে হয়, তোমাকে কি বলে ডাকব ? এখানে তুমি ছাড়া আর বোধ হয় কোন দাসী নেই ?

সে বলিল, আছে, কিন্তু তার অনেক কাজ। ওপরে আসবার সময় পায় না। যা দরকার হয় আমাকেই আদেশ করবেন দিদি, আমার নাম অন্নদা। কিন্তু পাড়াগাঁয়ের লোক, হয়ত অনেক দোষ-ত্রুটি হবে।

তাহার বিনয়বাক্যে বন্দনা মনে মনে খুশী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় তোমার বাড়ি অন্নদা ? তোমার কে কে আছে ?

অন্নদা বলিল, বাড়ি আমাদের এঁদের গ্রামেই—বলরামপুরে। একটি ছেলে, তাকে এঁরাই লেখা-পড়া শিখিয়ে কাজ দিয়েছেন, বৌ নিয়ে সে দেশেই থাকে। ভালই আছে দিদি।

বন্দনা কৌতুহলী হইয়া প্রশ্ন করিল, তবে নিজে তুমি এখনো চাকুরি ক'র কেন, বৌ-ব্যাটা নিয়ে বাড়িতে থাকলেই ত পার ?

অন্নদা কহিল, ইচ্ছে ত হয় দিদি, কিন্তু পেরে উঠিনে। দুঃখের দিনে বাবুদের কথা দিয়েছিলুম নিজের ছেলে যদি মানুষ হয়, পরের ছেলেদের মানুষ করার ভার নেব। সেই ভারটা ঘাড় থেকে নামাতে পারিনি। দেশের অনেকগুলি ছেলে এই বিদেশে লেখা-পড়া করে। আমি না দেখলে তাদের দেখবার কেউ নেই।

তারা বুঝি এই বাড়িতে থাকে ?

হাঁ, এই বাড়িতে থেকেই কলেজে পড়ে। কিন্তু আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমি বাইরেই আছি, ডাকলেই সাড়া পাবেন।

বন্দনা বাথরুমে ঢুকিয়া দেখিল ভিতরে নানাবিধ ব্যবস্থা! পাশাপাশি গোটা-তিনেক ঘর, স্পর্শ-দোষ বাঁচানোর যত প্রকার ফন্দি-ফিকির বুদ্ধিতে আসিতে পারে তাহার কোন ত্রুটি ঘটে নাই। বুঝিল এসব মায়ের ব্যবহারের জন্য। পাথরের মেঝে,

পাথরের জলচৌকি, একদিকে গোটা-তিনেক প্রকাণ্ড তাঁবার হাঁড়া, বোধ হয় গঙ্গা-জল রাখার জন্য—নিত্য মাজা-ঘষায় ঝক্ ঝক্ করিতেছে—তিনি কবে আসিয়াছিলেন এবং আবার কবে আসিবেন নিশ্চিত কেহ জানে না, তথাপি অবহেলার চিহ্নমাত্র কোথাও চোখে পড়িবার জো নাই। যেন এইখানেই বাস করিয়া আছেন এমনি সযত্ন-সতর্ক ব্যবস্থা। এ যে কেবল হুকুম করিয়া, শাসন চালাইয়াই হয় না, তাহার চেয়েও বড় কিছু একটা সমস্ত নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, এ কথা বন্দনা চাহিবামাত্রই অনুভব করিল। এবং এই মা, স্ত্রীলোকটি যে এ-সংসারে সর্ব্বসাধারণের কতখানি উর্দ্ধে অবস্থিত এই কথাটা সে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নিজের মনে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। গল্পে, প্রবন্ধে, পুস্তকে ভারতীয় নারীজাতির বহু দুঃখের কাহিনী সে পড়িয়াছে, তাহাদের হীনতার লজ্জায় নিজে নারী হইয়া সে মর্ম্মে মরিয়া গিয়াছে—ইহা মিথ্যাও নয়, কিন্তু এই ঘরের মধ্যে আজ একাকী দাঁড়াইয়া সে সকল সত্য বলিয়া মানিয়া লইতেও তাহার বাধিল।

বাহিরে আসিতে অন্নদা হাসিমুখে কহিল, বড্ড দেরি হয়ে গেল দিদি, প্রায় ঘণ্টা-দুয়েক, ওঁরা সব নীচে খাবার-ঘরে অপেক্ষা করে আছেন। চলুন।

তোমাদের বড়বাবু কাছারি-ঘর থেকে বেরিয়েচেন?

হাঁ, তিনিও নীচে আছেন।

আমাদের সঙ্গে বোধকরি খাবেন না?

অন্নদা সহাস্যে কহিল, খেলেও ত সেই দুপুরের পরে দিদি। আজ আবার তাও নেই। একাদশী, সন্ধ্যের পর বোধ হয় কিছু ফল-মূল খাবেন।

বন্দনা কি করিয়া যেন বুঝিয়াছিল এ-গৃহে এ স্ত্রীলোকটি ঠিক দাসী জাতীয় নয়। কহিল, তিনি ত আর বামুনের ঘরের বিধবা ন'ন, একাদশীর উপোস করবেন কোন্ দুঃখে? কাল গাড়িতে একাদশী না হোক দশমীর উপবাস ত ওঁর এমনি হয়ে গেছে।

অন্নদা বলিল, তা হোক, উপোস ওঁর গায়ে লাগে না। মা বলেন, আর জন্মে তপস্যা করে বিপিন এ জন্মে উপোস-সিদ্ধির বর পেয়েচে। ওঁর খাওয়া দেখলে অবাক হতে হয়।

বন্দনা নীচে আসিয়া দেখিল, তাহাদের অভ্যস্ত চা রুটি ডিম প্রভৃতি টেবিলে সুসজ্জিত, এবং পিতা ও সস্ত্রীক পাঞ্জাবের ব্যারিস্টার ক্ষুধায় চঞ্চল। ধৈর্য্য তাহাদের প্রায় শেষ সীমায় উপনীত, মুহূর্ত্তে খবরের কাগজ ফেলিয়া দিয়া সাহেব অনুযোগের কণ্ঠে কহিলেন, ইঃ—এত দেরি মা, সকাল বেলাটায় আর ত কোন কাজ হবে না দেখচি।

বিপ্রদাস অদূরে বসিয়াছিল; বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, মুখুয্যেমশাই, আপনি খাবেন না?

বিপ্রদাস কথাটা বুঝিল, হাসিয়া কহিল, চা আমি খাইনে, খাই শুধু ডাল-ভাত। তার সময় এ নয়—আমার জন্য চিন্তা নেই, তুমি বসে যাও।

বন্দনা ইহার উত্তর দিল না, পিতা এবং অতিথি দুজনকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, আমার অপরাধ হয়ে গেছে। বলে পাঠান উচিত ছিল, কিন্তু হয়নি। খাবার ইচ্ছে আমার নেই, কিন্তু আপনারা আর অপেক্ষা করবেন না—আরম্ভ করে দিন। আমি বরঞ্চ আপনাদের চা তৈরি করে দিই। বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ কাজে লাগিয়া গেল।

সকলেই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। চাকরটা একধারে দাঁড়াইয়াছিল, সে কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল। পিতা উদ্বেগের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, অসুখ করেনি ত মা? সস্ত্রীক ব্যারিস্টারসাহেব কি যে বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না।

বন্দনা চা তৈরি করিতে করিতে কহিল, না বাবা, অসুখ করেনি, শুধু খেতে ইচ্ছে করচে না।

তা হলে কাজ নেই। কাল বেশি রাত্রের খাওয়াটা বোধ করি তেমন হজম হয়নি। তা ছাড়া দিনের বেলা পিত্তি পড়ে গেল কি না।

তাই বোধ হয় হবে। বেলা হলে মুখুয্যেমশায়ের সঙ্গে বসে ডাল-ভাত খাব, এ-বাড়িতে সে হয়ত হজম করতে পারব।

কথাটায় আর কেহ তেমন খেয়াল করিল না, কিন্তু বিপ্রদাসের মুখের উপর দিয়া যেন একটা কাল ছায়া মুহূর্তের জন্য ভাসিয়া গেল।

চাকরটা কি ভাবিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, আজ একাদশী; ও-বেলায় দুটো ফল-মূল ছাড়া আর ত কিছু খান না।

বন্দনা এইমাত্র এ-কথা শুনিয়া আসিয়াছিল, তথাপি বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিল, শুধু ফল-মূল? বেশ হাল্কা খাওয়া। সে-ই বোধ হয় খুব ভাল হবে। না, মুখুয্যেমশাই?

বিপ্রদাস হাসিয়া ঘাড় নাড়িল বটে, কিন্তু কেহ যে তাহাকে স্বচ্ছন্দে উপহাস করিতে পারে আজ এই প্রথম জানিয়া মনে মনে সে যেন স্তব্ধ হইয়া রহিল। এবং তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া বন্দনাও বোধ করি ইহা অনুভব করিল।

কাজ-কর্ম্ম সারিয়া বন্দনা পিতার সহিত যখন বাসায় ফিরিয়া আসিল তখন অপরাহ্ণ বেলা। সস্ত্রীক ব্যারিস্টারসাহেব যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, গড়ের মাঠের ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-সৌধ প্রভৃতি কলিকাতার প্রধান দ্রষ্টব্য বস্তুসকল পরিদর্শন করিয়া তখনও ফিরে নাই। রাত্রের গাড়িতে তাঁহাদের যাইবার কথা, কিন্তু প্রোগ্রাম বদল করিয়া যাত্রাটা আপাততঃ তাঁহারা বাতিল করিয়াছেন।

রায়সাহেব কাপড় ছাড়িতে তাঁহার ঘরে চলিয়া গেলেন, বন্দনার নিজের ঘরের সম্মুখে দেখা হইল অন্নদার সঙ্গে। সে হাসিমুখে অনুযোগের সুরে বলিল, দিদি,

সারাদিন না খেয়ে কাটল আপনার। ফল-মূল সমস্ত আনিয়ে রেখেছি, একটু শীগ্‌গির করে মুখ-হাত ধুয়ে নিন, আমি ততক্ষণ সব তৈরি করে ফেলি। কি বলেন?

কিন্তু বড়বাবু—মুখুয্যেমশাই? তিনি কই?

অন্নদা কহিল, তার জন্য ব্যস্ত হবার দরকার নেই দিদি; এ-সব তাঁর রোজকার ব্যাপার। খাওয়ার চেয়ে না-খাওয়াটাই তাঁর নিয়ম।

কিন্তু কই তিনি?

তিনি গেছেন দক্ষিণেশ্বরে কালীদর্শন করতে। এখুনি আসবেন।

বন্দনা কহিল, সেই ভাল, তিনি এলেই হবে। কিন্তু বাকী সকলে? তাঁদের কি ব্যবস্থা হ'লো? চল ত অন্নদা, তোমাদের রান্নাঘরটা দেখে আসি।

অন্নদা কহিল, চলুন, কিন্তু এ-বেলায় তাঁদের ব্যবস্থা ত রান্নাঘরে হয়নি দিদি, ব্যবস্থা হয়েচে হোটেলে—খাবার সেখান থেকেই আসবে।

বন্দনা আশ্চর্য্য হইয়া গেল—সে কি কথা? এ পরামর্শ তোমাদের দিলে কে?

বড়বাবু নিজেই হুকুম দিয়ে গেছেন।

কিন্তু সে-সব অখাদ্য-কুখাদ্য তাঁরা খাবেন কোথায়? এই বাড়িতে? তোমাদের মা শুনলে বলবেন কি?

অন্নদা অপ্রতিভ হইয়া উঠিল, কহিল, না, তিনি শুনতে পাবেন না। নীচের একটা ঘরে সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। বাসন-পত্র হোটেলওয়ালারাই নিয়ে আসবে, কোন অসুবিধে হবে না।

বন্দনা বলিল, হুকুম ত দিয়ে গেলেন, কিন্তু তামিল করলে কে? তাঁর কাছে আমাকে একবার নিয়ে যেত পার?

সে আর বেশি কথা কি দিদি, চলুন নিয়ে যাচ্চি।

চল।

মুখুয্যেদের একটা বড় রকমের তেজারতি কারবার কলকাতায় চলে। নীচের তলায় গোটা-চারেক ঘর লইয়া আফিস; কেরানী, গোমস্তা, সরকার, পেয়াদা, ম্যানেজার প্রভৃতি ব্যবসায়ের যাবতীয় লোকজন কাজ করে, বন্দনা প্রবেশ করিতেই সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। বয়স ও পদমর্য্যাদার লক্ষণে ম্যানেজার ব্যক্তিটিকেই সহজে চিনিতে পারিয়া সে ইঙ্গিতে তাঁহাকে বাহিরে ডাকিয়া আনিয়া কহিল, হোটেলে হুকুম দিয়ে এসেছিলেন কি আপনি নিজে?

ম্যানেজার ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিলে কহিল, আর একবার যান তাদের বারণ করে দিয়ে আসুন।

ম্যানেজার বিস্মিত হইল, ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, বড়বাবু ফিরে না আসা পর্য্যন্ত—

বন্দনা কহিল, তখন হয়ত আর বারণ করবার সময় থাকবে না। মুখুয্যেমশাই রাগ করলে আমার ওপর করবেন। আপনার ভয় নেই। যান দেরি করবেন না। এই বলিয়াই সে ফিরিতে উদ্যত হইল, উত্তরের অপেক্ষাও করিল না।

হতবুদ্ধি ম্যানেজার ভাবিল, মন্দ নয়। বিপ্রদাসের হুকুম অমান্য করা কঠিন, এমন কি অসম্ভব বলাও চলে, কিন্তু এই অপরিচিত মেয়েটির সুনিশ্চিত নিঃসংশয় শাসন অবহেলা করাও কম কঠিন নয়। প্রায় তেমনি অসম্ভব। ক্ষণকাল বিমূঢ়ের ন্যায় স্তব্ধ থাকিয়া দ্বিধা-স্বরে কহিল, আজ্ঞে, যাই তা হলে—নিষেধ করে আসি? কিছু আগাম দেওয়া হয়ে গেছে—

তা হোক, আপনি দেরি করবেন না। বলিয়া সে ফিরিয়া আসিল।

সন্ধ্যার পরে ফিরিয়া আসিয়া বিপ্রদাস খবর শুনিল। খুশী হইবে কি রাগ করিবে হঠাৎ ভাবিয়া পাইল না। রান্নাঘরে আসিয়া দেখিল, আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ, বন্দনা ছোট একটা টুল পাতিয়া পাচক ব্রাহ্মণকে লইয়া ব্যস্ত, উঠিয়া দাঁড়াইয়া কৃত্রিম বিনয়ের কণ্ঠে কহিল, রাগের মাথায় ম্যানেজার বাবুকে বরখাস্ত করে আসেননি ত মুখুয্যেমশাই।

বিপ্রদাস কহিল, মুখুয্যেমশাই যে বদ্‌রাগী এ খবর তোমায় দিলে কে?

বন্দনা বলিল, লোকে বলে বাঘের গন্ধ এক যোজন দূর থেকে পাওয়া যায়।

বিপ্রদাস হাসিয়া ফেলিল—কিন্তু অতিথিদের উপায় কি হবে? এদের সকলের যে রাত্রে ডিনার করা অভ্যেস—তার কি বল ত?

বন্দনা কহিল, যাঁর যা না হলে নয় তাঁকে লোক দিয়ে হোটেলে পাঠিয়ে দিন। বিলের টাকা আমি দেব।

তামাসা নয় বন্দনা, এ হয়ত ঠিক ভাল হ'ল না।

ভাল হ'তো বুঝি ঐ সব জিনিস এ-বাড়িতে বয়ে আনলে? মা শুনলে কি বলতেন বলুন ত?

বিপ্রদাস একথা যে ভাবে নাই তাহা নহে, কিন্তু স্থির করিয়া উঠিতে পারে নাই, কহিল, তিনি জানতে পারতেন না।

বন্দনা মাথা নাড়িয়া বলিল, পারতেন। আমি চিঠি লিখে দিতুম।

কেন?

কেন? কখনো যা করেননি, দুদিনের এই কটা বাইরের লোকের জন্যে কিসের জন্যে তা করতে যাবেন? কখ্‌খন না।

শুনিয়া বিপ্রদাস শুধু যে খুশী হইল তাই নয়, বিস্ময়াপন্ন হইল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কিন্তু তুমি যে কাল থেকে কিছুই খাওনি বন্দনা? রাগ কি পড়বে না? তাহার কণ্ঠস্বরে এবার একটু স্নেহের সুর লাগিল।

বন্দনা মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, রাগিয়ে দিয়েছিলেন কেন? কিন্তু শুনুন, আপনার

খাবার ফল-মূল সব আনান আছে, ততক্ষণ সন্ধ্যো-আহ্নিক আপনি সেরে নিন, আমি গিয়ে তৈরি করে দেব। কিন্তু আর কেউ যদি দেয়, আমি আজও খাব না বলে দিচ্চি।

আচ্ছা, এস, বলিয়া বিপ্রদাস উপরে চলিয়া গেল।

প্রায় ঘণ্টা-খানেক পরে বন্দনা ফল-মূল মিষ্টান্নের শাদা পাথরের থালা হাতে লইয়া বিপ্রদাসের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। অন্নদার হাতে আসন ও জলের গ্লাস। জল-হাতে সমস্তটা সে সযত্নে মুছিয়া ঠাঁই করিয়া দিল।

বিপ্রদাস বন্দনার পানে চাহিয়া সবিস্ময়ে কহিল, তুমি কি আবার এখন স্নান করলে না কি?

আপনি খেতে বসুন, বলিয়া সে পাত্রটা নামাইয়া রাখিল।

১০

বিপ্রদাস আসনে বসিয়া পুনরায় সেই প্রশ্নই করিল, সত্যিই আবার এখন স্নান করে এলে না কি? অসুখ করবে যে?

তা করুক। কিন্তু হাতে না-খাবার ছল-ছুতা আবিষ্কার করতে আপনাকে দেব না এই আমার পণ। স্পষ্ট করে বলতে হবে, তোমার ছোঁয়া খাব না, তুমি ম্লেচ্ছ-ঘরের মেয়ে।

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, বইয়ে পড়নি যে দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না?

বন্দনা বলিল, পড়েচি, কিন্তু আপনি দুরাত্মাও ন'ন, ভয়ানকও ন'ন—আমাদেরই মত দোষে-গুণে জড়ান মানুষ! তা না হলে সত্যই আজ ও-বেচারাদের ডিনার বন্ধ করতে যেতুম না।

কিন্তু সত্যি কারণটা কি?

সত্যি কারণটাই আপনাকে বলচি। আপনাদের পরিবারে ওটা চলে না। না দেশের বাড়িতে, না এখানে। কিসের তরে ওকাজ করতে যাবেন?

কিন্তু জান ত, সবাই ওঁরা বিলেত-ফেরত—এমনি খাওয়াতেই ওরা অভ্যস্ত।

বন্দনা কহিল, অভ্যাস যাই হোক, তবুও বাঙালী। বাঙালী অতিথি ডিনার খেতে না পেয়ে মারা গেছে কোথাও এমন নজির নেই। সুতরাং এ অজুহাত অগ্রাহ্য। আপনার বাজে কথা।

বিপ্রদাস কহিল, তবে কাজের কথাটা কি শুনি?

বন্দনা বলিল, সে আমি ঠিক জানিনে। কিন্তু বোধ হয় যা আপনি মুখে বলেন তার সবটুকু ভেতরে মানেন না। নইলে মাকে লুকিয়ে এ ব্যবস্থা করতে কিছুতেই রাজি হতেন না। লোকে আপনাকে মিথ্যে অত ভয় করে। যাঁকে করা দরকার সে আপনি ন'ন, আপনার মা।

শুনিয়া বিপ্রদাস কিছুমাত্র রাগ করিল না, বরঞ্চ হাসিয়া বলিল, তুমি দুজনকেই চিনেচ। কিন্তু ব্যাপারটা যে মাকে লুকিয়ে হচ্ছিল এ খবর তুমি শুনলে কার কাছে?

বন্দনা নাম করিল না, শুধু কহিল, আমি জিজ্ঞেসা করে জেনে নিয়েছি। সে এত বড় দুর্ঘটনা যে, মেজদি আমাকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারবেন না, চিরদিন অভিসম্পাত করে বলবেন, বন্দনার জন্যেই এমন হ'ল। তাই কিছুতেই একাজ করতে আপনাকে আমি দিতে পারিনে।

বিপ্রদাস কহিল, তুমি পরম আত্মীয়-কুটুম্বের মধ্যে সকলের বড়। এ তোমার যোগ্য কথা। কিন্তু লুকোচুরি না করে তোমার হাতে আমার খাওয়া চলে না এ-কথা সে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করেছিলে? বরঞ্চ জেনে এস গিয়ে, ততক্ষণ আমি অপেক্ষা করে রইলুম, বলিয়া সে হাসিয়া খাবারের থালাটা একটুখানি ঠেলিয়া দিল।

বন্দনার মুখ প্রথমে লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল, পরে সামলাইয়া লইয়া কহিল, না, একথা তাকে জিজ্ঞাসা করতে আমি যেতে পারব না, আপনার খেয়ে কাজ নেই।

বিপ্রদাস বলিল, কিন্তু মুস্কিল এই যে, নিজের বাড়িতে তোমাকে উপবাসী রাখতে ত পারিনে, বলিয়া সে আহারে প্রবৃত্ত হইল।

বন্দনা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু এর পরে কি করবেন?

বাড়ি ফিরে গিয়ে গোবর খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করব, বলিয়া হাসিল। কিন্তু তাহার হাসি সত্ত্বেও ইহা সত্য না পরিহাস, বন্দনা নিশ্চিত বুঝিতে না পারিয়া পুনরায় স্তব্ধ হইয়া রহিল।

বিপ্রদাস কহিল, মায়ের সঙ্গে বোঝাপড়া একটা হবেই, কিন্তু তোমার বোনের শাস্তি থেকে যে পরিত্রাণ পাব এটা তার চেয়েও বড়। বলিয়া পুনশ্চ সহাস্যে কহিল, বিশ্বাস হ'ল না? আচ্ছা আগে বিয়ে হোক, তখন মুখুয্যেমশায়ের কথাটা বুঝবে, বলিয়া সে খাবারের পাত্রটা নিঃশেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

এদিকে ডিনার বাতিল হইল বটে, কিন্তু অন্যান্য রুচিকর আহার্য্যের আয়োজনে অবহেলা ছিল না। সুতরাং পরিতৃপ্তির দিক দিয়া কোথাও ত্রুটি ঘটিল না। কিন্তু সর্ব্বকার্য্য সমাধা করার পরে বিছানায় শুইয়া বন্দনা ভাবিতেছিল, তাহার সম্বন্ধে বিপ্রদাসের আচরণ প্রত্যাশিতও নয়, হয়ত অন্যায়ও নয়, এবং আপনার জন হইয়াও যেজন্য এতকাল ঘনিষ্ঠতা ও পরিচয় ছিল না তাহাও এতদিনের প্রাচীন কাহিনী যে নূতন করিয়া আঘাত বোধ করা শুধু বাহুল্য নয়, বিড়ম্বনা। প্রণাম করিতে গেলে

বিপ্রদাসের মা স্পর্শদোষ বাঁচাইয়া সরিয়া গিয়াছিলেন, তাহার প্রতিবাদে বন্দনা না খাইয়া রাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। শিক্ষাবিহীন নারীর উদ্ধত ধর্মবোধ তাহাকে আঘাত করে নাই তাহা নয়, তথাপি এই মূঢ়তাকেও একদিন বিস্মৃত হওয়া সহজ, কিন্তু বিপ্রদাস যাহা করিল তাহার প্রতিবাদে কি করা যে উচিত বন্দনা খুঁজিয়া পাইল না। তাঁহার হাতের ছোঁয়া ফল-মূল-মিষ্টান্ন সে খাইয়াছে সত্য, কিন্তু স্বেচ্ছায় নয়, দায়ে পড়িয়া। পাছে বলরামপুরের কদর্য্য কাণ্ড এখানেও ঘটে এই ভয়ে। এ যেন পাগলের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে। কিন্তু এই অনাচার বিপ্রদাসের লাগিয়াছে, বাড়ি ফিরিয়া সে প্রায়শ্চিত্ত করিবে এই কথাটা কেমন করিয়া যেন নিশ্চয় অনুমান করিয়া বন্দনার চোখে ঘুম রহিল না। অথচ একথাও বহুবার ভাবিল ব্যাপারটা এত গুরুতর কিসে? তাহাদের চলার পথ ত এক নয়—সংসারে উভয়ের জন্যই প্রশস্ত স্থান যথেষ্ট রহিয়াছে। দৈবাৎ সংঘর্ষ যদি একদিন বাধিয়াই থাকে বাধিলই বা। এ প্রশ্নের মুখোমুখী হইবার ডাক এ-জীবনে তাহাকে কে দিতেছে? এমন করিয়া সে আপনাকে আপনি শান্ত করিবার অনেক চেষ্টাই করিল, কিন্তু তথাপি এই মানুষটির নিঃশব্দ অবজ্ঞা কোনমতে মন হইতে দূর করিতে পারিল না।

ভাবিতে ভাবিতে কখন এক সময়ে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু অসুস্থ বাধাগ্রস্ত নিদ্রা অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া গেল। তখনও ভোর হয় নাই, অসমাপ্ত নিদ্রার অবসন্ন জড়িমা দুই চোখ আচ্ছন্ন করিয়া আছে, কিন্তু বিছানাতেও থাকিতে পারিল না, বাহিরে আসিয়া বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া চাহিয়া দেখিল আলো-আকাশ নিশান্তের অন্ধকারে গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছে। দূরে বড় রাস্তায় ক্বচিৎ-কদাচিৎ গাড়ীর শব্দ অস্ফুটে শোনা যায়, লোক চলাচলের তখনও অনেক বিলম্ব, সমস্ত বাড়িটাই একান্ত নীরব, সহসা চোখে পড়িল দ্বিতলে মায়ের পূজার ঘরে আলো জ্বলিতেছে, এবং তাহারই একটা সূক্ষ্ম রেখা রুদ্ধ জানালার ফাঁক দিয়া সম্মুখের থামে আসিয়া পড়িয়াছে। একবার মনে করিল চাকরেরা হয়ত আলোটা নিবাইতে ভুলিয়াছে, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল হয়ত এ বিপ্রদাস—পূজায় বসিয়াছে।

কৌতূহল অদম্য হইয়া উঠিল। বুঝিল, হঠাৎ দেখা হইয়া গেলে লজ্জা রাখিবার ঠাঁই রহিবে না, এই রাত্রে ঘর ছাড়িয়া নীচে আসার কোন কারণই দেওয়া যাইবে না, কিন্তু আগ্রহ সংবরণ করিতে পারিল না।

ধ্যানের কথা বন্দনা পুস্তকে পড়িয়াছে, ছবিতে দেখিয়াছে, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে কখনো চোখে দেখে নাই। নিঃশব্দে রাত্রির নিঃসঙ্গ অন্ধকারে সেই দৃশ্যই আজ তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। বিপ্রদাসের দুই চোখ মুদ্রিত, তাহার বলিষ্ঠ দীর্ঘ দেহ আসনের পরে স্তব্ধ হইয়া আছে, উপরের বাতির আলোটা তাহার মুখে, কপালে প্রতিফলিত হইয়া পড়িয়াছে—বিশেষ কিছুই নয়, হয়ত আর কোন সময়ে দেখিলে

বন্দনার হাসিই পাইত, কিন্তু তন্দ্রা-জড়িত চক্ষে এ-মূর্ত্তি আজ তাহাকে মুগ্ধ করিয়া দিল। এইভাবে কতক্ষণ সে যে দাঁড়াইয়াছিল তাহার হুঁস নাই, কিন্তু হঠাৎ যখন চৈতন্য হইল তখন পূবের আকাশ ফর্সা হইয়া গিয়াছে, এবং ভৃত্যের দল ঘুম ভাঙিয়া উঠিল বলিয়া। ভাগ্য ভাল যে, ইতিমধ্যে জাগিয়া উঠিয়া কেহ তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়ে নাই। আর সে অপেক্ষা করিল না, ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িতেই গভীর নিদ্রামগ্ন হইতে তাহার মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইল না।

দ্বারে করাঘাত করিয়া অন্নদা ডাকিল, দিদি, বড্ড বেলা হয়ে গেল যে, উঠবেন না?

বন্দনা ব্যস্ত হইয়া দ্বার খুলিয়া বাইরে আসিয়া দাঁড়াইল, বাস্তবিকই বেলা হইয়াছে, লজ্জিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এঁরা বোধ হয় আজও অপেক্ষা করে আছেন? একটু সকালে আমাকে তুলে দিলে না কেন? স্নান করে তৈরি হয়ে নিতে ত একঘণ্টার আগে পেরে উঠব না অন্নদা।

তাহার বিপন্ন মুখের পানে চাহিয়া অন্নদা হাসিয়া বলিল, ভয় নেই দিদি, আজ আর ওঁরা সবুর করতে পারেন নি—শেষ করে নিয়েছেন—এখন যতক্ষণ খুশি স্নান করুন গে, কেউ পেছু ডাকবে না।

শুনিয়া বন্দনা যেন বাঁচিয়া গেল। সেও হাসিমুখে কহিল, তোমাদের অনেক জিনিসই পছন্দ করিনে সত্যি, কিন্তু এটা করি। সকলের দল বেঁধে ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে যে গেলবার পালা নেই এ মস্ত স্বস্তি।

অন্নদা বলিল, কিন্তু সকালে কি আপনার ক্ষিদে পায় না দিদি?

বন্দনা কহিল, একদিনও না। অথচ ছেলেবেলা থেকে নিত্যই খেয়ে আসচি। আচ্ছা যাই, আর দেরি করব না, বলিয়া সে চলিয়া গেল।

ঘণ্টা-দুই পরে নীচে বিপ্রদাসের সহিত তাহার দেখা হইল। সে কাছারি-ঘর হইতে কাজ সারিয়া বাহির হইতেছিল। বন্দনা নমস্কার করিল।

চা খাওয়া হ'লো?

হাঁ।

ওঁরা অপেক্ষা করতে পারলেন না, কিন্তু তোমারই—

বন্দনা থামাইয়া দিয়া কহিল, সেজন্যে ত অনুযোগ করিনি মুখুয্যেমশাই।

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, মেজাজের বাহাদুরী আছে তা অস্বীকার করব না, কিন্তু দুবোনের মধ্যে প্রভেদটি যেন চন্দ্র-সূর্য্যের মত। শুনলাম নাকি শীঘ্রই যাচ্ছ বিলেতে শিক্ষাটা পাকা করে নিতে। যাও, ফিরে এসে একটা খবর দিয়ো, গিয়ে একবার মূর্ত্তিটা দেখে আসব।

শুনিয়া বন্দনা হাসিয়া ফেলিল, কিন্তু জবাব দিল না।

বিপ্রদাস কহিল, সেদেশে শুনেচি বেলা বারোটা পর্য্যন্ত লোককে ঘুমুতে হয়। কঠিন সাধনা। তোমাকে কিন্তু কষ্ট করে সাধতে হবে না, এদেশ থেকেই আয়ত্ত হয়ে রইল।

বন্দনা এবারও হাসিল, কিন্তু তেমনই চুপ করিয়া বিপ্রদাসের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। নিতান্তই সাধাসিধে সাধারণ ভদ্র চেহারা। হাস্যপরিহাসে স্নেহশীল, তাহাদের একজন। অথচ কাল রাত্রির নীরবতায়, নির্জ্জন গৃহের মধ্যে স্তব্ধ মৌন এই মূর্ত্তিটিকে কি যে রহস্যাবৃত মনে হইয়াছিল এই দিবালোকে সেই কথা স্মরণ করিয়া তাহার কৌতুহলের সীমা রহিল না।

মুখুয্যেমশাই, এরা কোথায়? কাউকে ত দেখচিনে?

বিপ্রদাস কহিল, তার মানে তাঁরা নেই। অর্থাৎ শ্বশুরমশাই এবং সস্ত্রীক ব্যারিস্টার-মশাই—তিনজনেই গেছেন হাওড়ায় রেলওয়ে স্টেশনে—গাড়ি রিজার্ভ করতে।

বন্দনা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, সস্ত্রীক ব্যারিস্টারমশাই করতে পারেন, কিন্তু বাবা করতে যাবেন কেন? তাঁর ছুটি শেষ হতে এখনও আট-দশ দিন বাকী আছে। তা ছাড়া আমাকে না বলে?

বিপ্রদাস কহিল, বলবার সময় পাননি, বোধ করি ফিরে এসেই বলবেন। সকালে বোম্বাইয়ের অফিস থেকে জরুরি তার এসেচে—মুখের ভাব দেখে সন্দেহ রইল না যে না-গেলেই নয়।

কিন্তু আমি? এত শীগ্‌গির যেতে যাব কেন?

বিপ্রদাসও সেই স্বরে স্বর মিলাইয়া কহিল, নিশ্চয়ই, যেতে যাবে কেন? আমিও ত ঠিক তাই বলি।

বন্দনা বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসু-মুখে চাহিয়া রহিল।

বিপ্রদাস কহিল, বোনটিকে একটা তার করে দাও না—দেওরটিকে সঙ্গে করে এসে পড়ুন। তোমাদের মিলবে ভাল, অতিথি-সৎকারের দায় থেকে আমিও অব্যাহতি পেয়ে বাঁচব।

বন্দনা সভয়ে ব্যগ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, সে কি সম্ভব হতে পারে মুখুয্যেমশাই? মা কি কখনো এ প্রস্তাবে রাজি হবেন? আমাকে তিনি ত দেখতে পারেন না।

বিপ্রদাস কহিল, একবার চেষ্টা করেই দেখো না। বল ত তার করার একটা ফরম পাঠিয়ে দিই—কি বল?

বন্দনা উৎসুক চক্ষে ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া শেষে কি ভাবিয়া বলিল, থাক্ মুখুয্যেমশাই, এ আমি পারব না।

তবে থাক্।

আমি বরঞ্চ বাবার সঙ্গে না হয় চলেই যাই।

সেই ভাল, বলিয়া বিপ্রদাস চলিয়া গেল।

খাবার টেবিলের ওপর পিতার টেলিগ্রামখানা পড়িয়াছিল, বন্দনা খুলিয়া দেখিল সত্যই বোম্বাই অফিসের তার। অত্যন্ত জরুরি—বিলম্ব করিবার জো নাই।

বন্দনা ঘরে গিয়া আরেকবার তোরঙ্গ গুছাইতে প্রবৃত্ত হইল।

বাবা তখনও ফিরেন নাই, ঘণ্টা-কয়েক পরে অন্নদা ঘরে ঢুকিয়া কহিল, আপনার নামে একটা টেলিগ্রাম এসেচে দিদি, এই নিন।

আমার টেলিগ্রাম? সবিস্ময়ে হাতে লইয়া বন্দনা খুলিয়া দেখিল বলরামপুর হইতে মা তাকেই তার করিয়াছেন। সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছেন পিতার সহিত সে যেন কোনমতে ফিরিয়া না যায়। বৌমা দ্বিজুকে লইয়া রাত্রের গাড়িতে যাত্রা করিতেছে।

১১

রাত্রের গাড়িতে আসিতেছে মেজদি এবং সঙ্গে আসিতেছে দ্বিজদাস। বন্দনার আনন্দ আর ধরে না। সেদিন দিদির শ্বশুরবাড়িতে নিজের আচরণের জন্য সে মনে মনে বড় লজ্জিত ছিল, অথচ প্রতিকারের উপায় পাইতেছিল না। আজ অত্যন্ত অনিচ্ছাতেও তাহাকে পিতার সঙ্গে বোম্বায়ে ফিরিয়া যাইতে হইত, অকস্মাৎ অভাবিত পথে এ সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল। টেলিগ্রামের কাগজখানা বন্দনা অনেকবার নাড়াচাড়া করিল, অন্নদাকে পড়িয়া শুনাইল এবং উৎসুকভাবে অপেক্ষা করিয়া রহিল পিতার জন্যে—এই ছোট্ট কাগজখানি তাহার হাতে তুলিয়া দিতে। বিপ্রদাস বাড়িতে নাই, খোঁজ লইয়া জানিল কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তিনি বাহিরে গিয়াছেন। এ ব্যবস্থা তিনিই করিয়াছেন সুতরাং তাহাকে জানাইবার কিছুই নাই, তবু একবার বলিতেই হইবে। অথচ এই বলার ভাষাটা সে মনে মনে আলোচনা করিতে গিয়া দেখিল কোন কথাই তাহার মনঃপূত হয় না। আনন্দ-প্রকাশের সহজ রাস্তাটা যেন কখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বহুনিন্দিত জমিদার জাতীয় এই কড়া ও গোঁড়া লোকটিকে তাহার শুরু হইতেই খারাপ লাগিয়াছিল, এখন তিনি যথেষ্টই দুর্ব্বোধ্য, তথাপি ধীরে ধীরে তাহার মনের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল। সে দেখিতেছিল এই মানুষটির আচরণ পরিমিত, কথা স্বল্প, ব্যবহার

ভদ্র ও মিষ্ট, তবু কেমন একটা ব্যবধান তাঁহার প্রত্যেকটি পদক্ষেপে প্রতি মুহূর্ত্তেই অনুভব করা যায়। সকলের মাঝখানে থাকিয়াও সে সকলের হইতে দূরে বাস করে। আশ্রিত পরিজন, দাসী-চাকর, কর্ম্মচারিবর্গ সকলে ইহাকে শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বেশী করে ভয়। তাহাদের ভাবটা যেন এইরূপ—বড়বাবু অন্নদাতা, বড়বাবু রক্ষাকর্ত্তা, বড়বাবু দুর্দ্দিনের অবলম্বন, কিন্তু বড়বাবু কাহারও আত্মীয় ন'ন। পিতৃবিয়োগে তাঁহাকে দায় জানান যায়, কিন্তু পুত্রের বিবাহ-উৎসবে আহারের নিমন্ত্রণ করা চলে না। এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধটুকু তাহারা ভাবিতে পারে না।

কাল বন্দনা রান্নাঘরের দাসীটিকে সরল ও কিঞ্চিৎ নির্ব্বোধ পাইয়া কথায় কথায় ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতেছিল, কিন্তু অনেক জেরা করিয়াও কেবল এইটুকু বাহির করিতে পারিল যে, সে ইহার হেতু জানে না, শুধু সকলেই ভয় করে বলিয়া সে-ও করে এবং অপরকে প্রশ্ন করিলেও বোধ করি এই উত্তরই মিলিত। মুখুয্যে পরিবারে এ যেন এক সংক্রামক ব্যাধি। সেদিন ট্রেনের মধ্যে দৈবাৎ সেই ক্ষুদ্র ঘটনাটুকু অবলম্বন করিয়া বিপ্রদাসের বলিষ্ঠ প্রকৃতি বন্দনার কাছে ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়া আবার সম্পূর্ণ আত্মগোপন করিয়াছে। গাড়ির মধ্যে সেদিন কাছে বসিয়া হাস্যপরিহাসের কত কথাই হইয়া গেল, কিন্তু আজ মনে হয় না সেই মানুষটি এ-বাড়ির বড়বাবু।

হঠাৎ নীচে হইতে একটা গোলমাল উঠিল, কে একজন ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল তাহার পিতা রায়সাহেব স্টেশন হইতে ফিরিয়াছেন খোঁড়া হইয়া। বন্দনা জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল পাঞ্জাবের ব্যারিস্টার ও তদীয় পত্নী দুইজন দুই বগল ধরিয়া সাহেবকে গাড়ি হইতে নামাইতেছেন। তাঁহার এক পায়ে জুতা-মোজা খোলা ও তাহাতে খান দুই-তিন ভিজা রুমাল জড়ানো। প্ল্যাটফর্ম্মে ভিড়ের হুড়ামুড়িতে কে নাকি তাঁহার পায়ের উপর ভারী কাঠের বাক্স ফেলিয়া দিয়াছে। লোকজনে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে উপরে তুলিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল—দরওয়ান ছুটিল ডাক্তার ডাকিতে—ডাক্তার আসিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া ঔষধ দিল—বিশেষ কিছু নয়, কিন্তু কিছু-দিনের জন্য তাঁহার চলা-হাঁটা বন্ধ হইল।

পরদিন বিকালে সতী আসিয়া পৌছিল, বন্দনা কলরবে অভ্যর্থনা করিতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল মোটর হইতে অবতরণ করিতেছে শুধু মেজদি নয়, সঙ্গে আছেন শাশুড়ী—দয়াময়ী। উচ্ছ্বসিত আনন্দকলরোল নিবিয়া গেল, বন্দনা আড়ষ্টভাবে কোনমতে একটা প্রণাম সারিয়া লইয়া একেবারে সরিয়া দাঁড়াইতেছিল; কিন্তু দয়াময়ী কাছে আসিয়া আজ তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন, হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাল আছ ত মা?

বন্দনা মাথা নাড়িয়া সায় দিল, ভাল আছি। মা, হঠাৎ আপনি এসে পড়লেন যে?

দয়াময়ী বলিলেন, না এসে কি করি বল ত? আমার একটি পাগলী মেয়ে রাগ করে না খেয়ে চলে এসেচে, তাকে শান্ত করে বাড়ি ফিরিয়ে না নিয়ে গেলে নিজে শান্তি পাই কই মা?

বন্দনা কুণ্ঠিত-হাস্যে কহিল, কি করে জানলেন আমি রাগ করে এসেচি?

দয়াময়ী বলিলেন, আগে ছেলে-মেয়ে হোক, আমার মত তাদের মানুষ করে বড় করে তোল, তখন আপনি বুঝবে মেয়ে রাগ করলে কি করে মায়ে জানতে পারে।

কথাগুলি তিনি এমন মিষ্ট করিয়া বলিলেন যে বন্দনা আর কোন জবাব না দিয়া হেঁট হইয়া এবার তার পা ছুঁইয়া প্রণাম করিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, বাবা বড় অসুস্থ মা।

অসুস্থ? কি হয়েচে তাঁর?

পায়ে আঘাত লেগে কাল থেকে শয্যাগত, উঠতে পারেন না। বলিয়া সে দুর্ঘটনার হেতু বিবৃত করিল।

দয়াময়ী ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন—চিকিৎসার ত্রুটি হয়নি ত? চল ত কোন্ ঘরে তোমার বাবা আছেন আমাকে নিয়ে যাবে। আগে তাঁকে দেখে আসি গে, তারপর অন্য কাজ। এই বলিয়া তিনি সতীকে সঙ্গে করিয়া বন্দনার পিছনে পিছনে উপরে উঠিয়া রায়সাহেবের ঘরে প্রবেশ করিলেন। আজ তাঁহার পায়ের বেদনা বিশেষ ছিল না, ইঁহাদের দেখিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়া নমস্কার করিলেন। দয়াময়ী হাত তুলিয়া প্রতিনমস্কার করিয়া সহাস্যে কহিলেন, বেইমশাই, পা ভাঙলো কি করে, কোথায় ঢুকেছিলেন?

সতী ও বন্দনা উভয়েই অন্যদিকে মুখ ফিরাইল, রায়সাহেব নিরীহ মানুষ, প্রতিবাদের স্বরে বুঝাইতে লাগিলেন যে, কোথাও ঢুকিবার জন্য নয়, স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে বিনাদোষে এই দুর্গতি ঘটিয়াছে।

দয়াময়ী হাসিয়া বলিলেন, যা হবার হয়েচে, এখন থাকুন দিন-কতক মেয়েদের জিম্মায় ঘরে বন্ধ। পাছে একটা মেয়েতে শাসন করে না উঠতে পারে তাই আর একটিকে টেনে আনলুম বেয়াই। দুজনে পালা করে দিন কতক সেবা করুক।

রায়সাহেব তাহাই বিশ্বাস করিলেন এবং এই অনুগ্রহ ও সহানুভূতির জন্য বহু ধন্যবাদ দিলেন।

আবার দেখা হবে—যাই এখন হাত-পা ধুই গে, বলিয়া বিদায় লইয়া দয়াময়ী নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় মোটরে আসিয়া পৌঁছিল দ্বিজদাস ও তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র—বাসুদেব। মেজদির ছেলেকে বন্দনা সেদিন দেখিতে পায় নাই। সে ছিল পাঠশালায়ও এবং তাহার ছুটির পূর্ব্বেই বন্দনা বাড়ি হইতে চলিয়া আসিয়াছিল। পিতামহীকে ছাড়িয়া বাসু থাকে না, তাই সঙ্গে আসিয়াছে এবং তাঁহারি সঙ্গে বাড়ি ফিরিয়া যাইবে।

কাকা পরিচয় করাইয়া দিলে বাসুদেব প্রণাম করিল। বন্দনার পায়ে জুতা দেখিয়া সে মনে মনে বিস্মিত হইল, কিন্তু কিছু বলিল না। আট-নয় বছরের ছেলে, কিন্তু জানে সব।

বন্দনা সস্নেহে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে চিনতে পারলে না বাসু?

পেরেচি মাসিমা।

কিন্তু তুমি ত ছিলে তখন পাঁচ-ছ বছরের ছেলে—মনে থাকবার ত কথা নয় বাবা?

তবু মনে আছে মাসিমা, তোমাকে দেখেই চিনতে পেরেছিলুম। আমাদের বাড়ি থেকে তুমি রাগ করে চলে গেলে, আমি ফিরে গিয়ে তোমাকে দেখতে পেলুম না।

রাগ করে চলে যাবার কথা তুমি কার কাছে শুনলে?

কাকাবাবু বলছিলেন ঠাকুরমাকে।

বন্দনা দ্বিজদাসের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, রাগ করার কথা আপনিই বা জানলেন কি করে?

দ্বিজদাস কহিল, শুধু আমিই নয়, বাড়ির সবাই জানে। তা ছাড়া আপনি লুকোবার ত বিশেষ চেষ্টা করেননি।

বন্দনা বলিল, সবাই আমার রাগ করাটাই জানে, তার কারণটা কি জানে?

দ্বিজদাস বলিল, সবাই না জানুক আমি জানি। রায়সাহেবকে একলা টেবিলে খেতে দেওয়া হয়েছিল বলে।

বন্দনা বলিল, কারণটা যদি তাই-ই হয়, আমার রাগ করাটা আপনি উচিত বিবেচনা করেন?

দ্বিজদাস কহিল, করি। যদিও তাঁদেরও আর কোন উপায় ছিল না।

আপনি আমার বাবার সঙ্গে বসে খেতে পারেন?

পারি। কিন্তু, দাদা বারণ করলে পারিনে।

পারেন না! কিন্তু আপনাকে বারণ করার অধিকার দাদার আছে মনে করেন?

দ্বিজদাস বলিল, সে তাঁর ব্যাপার আমার নয়। আমার পক্ষে দাদার অবাধ্য হওয়া অনুচিত মনে করি।

বন্দনা কহিল, যা কর্ত্তব্য বলে বোঝেন তা করায় কি আপনার সাহস নেই?

দ্বিজদাস ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, দেখুন এ ঠিক সাহস অ-সাহসের বিষয় নয়। স্বভাবতঃ আমি ভীতু লোক নই, কিন্তু দাদার প্রকাশ্য নিষেধ অবজ্ঞা করার কথা আমি ভাবতে পারিনে। ছেলে-বেলায় বাবার অনেক কথা আমি শুনিনি, দণ্ডও পাইনি তা নয়, কিন্তু আমার দাদা অন্য প্রকৃতির মানুষ। তাঁকে কেউ কখন উপেক্ষা করে না।

উপেক্ষা করলে কি হয়?

কি হয় আমি জানিনে, কিন্তু আমাদের পরিবারে এ প্রশ্ন আজও ওঠেনি।

বন্দনা কহিল, মেজদির চিঠিতে জানি দেশের জন্যে আপনি অনেক কিছু করেন যা দাদার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। সে-সব করেন কি করে?

দ্বিজদাস কহিল, তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে হলেও তাঁর নিষেধের বিরুদ্ধে নয়। তা হলে পারতুম না।

বন্দনা মিনিট দুই-তিন নীরবে থাকিয়া কহিল, দিদির চিঠি থেকে আপনাকে যা ভেবেছিলুম তা আপনি ন'ন। এখন তাঁকে ভরসা দিতে পারব, তাঁদের ভয় নেই। আপনার স্বদেশ-সেবার অভিনয়ে মুখুয্যে বংশের বিপুল সম্পদের এক কণাও কোন দিন লোকসান হবে না। দিদি নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

দ্বিজদাস হাসিয়া বলিল, দিদির লোকসান হয় এই কি আপনি চান?

বন্দনা বিব্রত হইয়া কহিল, বাঃ—তা কেন চাইব। আমি চাই তাঁদের ভয় ঘুচুক, তাঁরা নির্ভয় হোন।

দ্বিজদাস কহিল, আপনার চিন্তা নেই, তাঁরা নির্ভয়েই আছেন। অন্ততঃ দাদার সম্বন্ধে একথা নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি, ভয় বলে কোন বস্তু তিনি আজও জানেন না। ও তাঁর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ।

বন্দনা হাসিয়া বলিল, তার মানে ভয় জিনিসটা সবটুকু বাড়ির সকলে মিলে আপনারাই ভাগ করে নিয়েচেন, তাঁর ভাগে আর কিছুই পড়েনি—এই ত?

শুনিয়া দ্বিজদাসও হাসিল, অনেকটা তাই বটে। তবে আপনাকেও বঞ্চিত করা হবে না, সামান্য যা অবশিষ্ট আছে সেটুকু আপনিও পাবেন। তিন-চারদিন একসঙ্গে আছেন এখনও তাঁকে চিনতে পারেননি?

বন্দনা কহিল, না। আপনার কাছ থেকে তাঁকে চিনতে শিখব আশা করে আছি।

দ্বিজদাস কহিল, তা হলে প্রথম পাঠ নিন। ঐ জুতো জোড়াটি খুলে ফেলুন।

চাকর আসিয়া বলিল, মা আপনাদের ওপরে ডাকচেন।

চলিতে চলিতে বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, হঠাৎ মা এসেচেন কেন?

দ্বিজদাস বলিল, প্রথম, কৈলাস-যাত্রা সম্বন্ধে মামীদের সঙ্গে পরামর্শ করা, দ্বিতীয়,—আপনাকে বলরামপুরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। দেখবেন যেন না বলে বসবেন না।

বন্দনা বলিল, আচ্ছা তাই হবে।

দ্বিজদাস কহিল, মার সামনে আপনাকে মিস্ রায় বলা চলবে না। আপনি আমার বয়সে ছোট—বৌদিদির ছোট বোন—অতএব নাম ধরেই ডাকব। যেন রাগ করে আবার একটা কাণ্ড বাঁধাবেন না।

বন্দনা হাসিয়া বলিল, না, রাগ করব কেন? আপনি আমার নাম ধরেই ডাকবেন। কিন্তু আপনাকে ডাকবো কি বলে?

দ্বিজদাস বলিল, আমাকে দ্বিজুবাবু বলেই ডাকবেন। কিন্তু দাদাকে মুখুয্যেমশাই বলা মানাবে না। তাঁকে সবাই বলে বড়দাদাবাবু—আপনাকে ডাকতে হবে বড়দাদা বলে। এই হ'ল আপনার দ্বিতীয় পাঠ।

কেন?

দ্বিজদাস বলিল, তর্ক করলে শেখা যায় না, মেনে নিতে হয়। পাঠ মুখস্থ হলে এর কারণ প্রকাশ করব, কিন্তু এখন নয়।

বন্দনা কহিল, মুখুয্যেমশাই কিন্তু নিজে আশ্চর্য্য হবেন।

দ্বিজদাস বলিল, হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু মা, বৌদিদি এঁরা বড় খুশী হবেন। এটা সত্যিই দরকার।

আচ্ছা, তাই হবে।

সিঁড়ির একধারে জুতা খুলিয়া রাখিয়া বন্দনা দয়াময়ীর ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। পিছনে গেল দ্বিজদাস ও বাসুদেব। তিনি তোরঙ্গ খুলিয়া কি একটা করিতেছিলেন এবং কাছে দাঁড়াইয়া অন্নদা বোধ করি গৃহস্থালীর বিবরণ দিতেছিল। দয়াময়ী মুখ তুলিয়া চাহিলেন, কিছুমাত্র ভুমিকা না করিয়া সহজ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার গা ধোয়া, কাপড় ছাড়া হয়েছে মা?

হাঁ মা, হয়েচে।

তা হলে একবার রান্নাঘরে যাও মা! এতগুলি লোকের কি ব্যবস্থা বামুনঠাকুর করচে জানিনে—আমিও আহ্নিকটা সেরে যাচ্ছি।

বন্দনা নীরবে চাহিয়া রহিল, তিনি সেদিকে দৃষ্টিপাতও করিলেন না, বলিলেন, দ্বিজুর শরীরটা ভালো নেই, সকালে ও কিছু খেয়ে আসেনি। ওর খাবারটা যেন একটু শীগ্-গির হয় মা। এই বলিয়া তিনি অন্নদাকে সঙ্গে করিয়া পূজার ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন, বন্দনার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিলেন না।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, কি অসুখ করল?

দ্বিজদাস কহিল, সামান্য একটু জ্বরের মত।

কি খাবেন এ-বেলা?

দ্বিজদাস কহিল, সাগু বার্লি ছাড়া যা দেবেন তাই।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, রান্নাঘরে যাব, শেষকালে কোন গোলযোগ ঘটবে না ত?

দ্বিজদাস বলিল, না। অন্নদাদিদি সেই পরিচয়ই বোধ হয় আপনার দিয়েচেন। ওঁর কথা মা কখন ঠেলতে পারেন না—ভারি ভালবাসেন। ম্লেচ্ছ অপবাদটা বোধ করি আপনার কাটল।

বন্দনা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, খুব আশ্চর্য্যের কথা।

দ্বিজদাস স্বীকার করিয়া বলিল, হাঁ। ইতিমধ্যে আপনি কি করেচেন, অন্নদা-দিদি কি কথা মাকে বলেচেন জানিনে কিন্তু আশ্চর্য্য হয়েচি আপনার চেয়েও ঢের বেশি আমি নিজে। কিন্তু আর দেরি করবেন না, যান, খাবার ব্যবস্থা করুন গে। আবার দেখা হবে। বলিয়া দুইজনে মায়ের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

১২

কৈলাস তীর্থ-যাত্রায় পথের দুর্গমতার বিবরণ শুনিয়া মামীরা পিছাইয়াছেন, দয়াময়ীর নিজেরও বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় না, তথাপি তাঁহার কলিকাতায় কাটিল পাঁচ-ছয়দিন দক্ষিণেশ্বর, কালীঘাট ও গঙ্গাস্নান করিয়া। কাজের লোকের হাতেই কাজের ভার পড়ে, এ-বাটীর প্রায় সমস্ত দায়িত্বই আসিয়া ঠেকিয়াছে বন্দনার কাছে। সতী কিছুই করে না, সকল ব্যাপারে বোনকে দেয় আগাইয়া, নিজে বেড়ায় শাশুড়ীর সঙ্গে ঘুরিয়া। তবুও কোথাও বাহির হইতে হইলে তাহাকে ডাক দিয়া বলে, বন্দনা, আয় না ভাই আমাদের সঙ্গে। তুই সঙ্গে থাকলে কাউকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে হয় না।

বিপ্রদাসেরও আজ-কাল করিয়া বাড়ি যাওয়া ঘটে নাই, মা কেবলি বাধা দিয়া বলেন, বিপিন চলিয়া গেলে তাঁহাকে বাড়ি লইয়া যাইবে কে? সেদিন সন্ধ্যায় তিনি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখিয়া ফিরিয়া আসিলেন, বিপ্রদাসকে ডাকাইয়া আনাইয়া উত্তেজনার সহিত বলিতে লাগিলেন, বিপিন, তুই যা বলিস্ বাবা, লেখা-পড়া জানা মেয়েদের ধরণই আলাদা।

বিপ্রদাস বুঝিল, এ বন্দনার কথা। জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েচে মা?

দয়াময়ী বলিলেন, কি হয়েচে? আজ মস্ত একটা লালমুখো এসে আমাদের গাড়ি আটকালে। ভাগ্যে মেয়েটা সঙ্গে ছিল, ইংরিজিতে কি দুকথা বুঝিয়ে বললে, সাহেব তক্ষনি গাড়ি ছেড়ে দিলে। নইলে কি হ'ত বল ত? হয়ত সহজে ছাড়ত না, নয়ত থানায় পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে যেত—কি বিভ্রাটই ঘটত! তোর নতুন পাঞ্জাবী ড্রাইভারটা যেন জন্তু।

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, কি করেছিলে তোমরা—ধাক্কা লাগিয়েছিলে?

বন্দনা আসিয়া দাঁড়াইল। দয়াময়ী ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিলেন, তোমার কথা বিপিনকে তাই বলছিলুম মা, লেখা-পড়া-জানা মেয়েদের ধরণই আলাদা! তুমি সঙ্গে না থাকলে সবাই আজ কি বিপদেই পড়তুম। কিন্তু সমস্ত দোষ সেই মেম বেটির। চালাতে জানে না তবু চালাবে। জানে না—তবু বাহাদুরি করবে।

বিপ্রদাস সহাস্যে কহিল, লেখা-পড়া-জানা মেয়েদের ধরনই ঐ রকম মা। মেম-সাহেব নিশ্চয়ই লেখা-পড়া জানে।

মা ও বন্দনা দুজনেই হাসিলেন। বন্দনা কহিল, মুখুয্যেমশাই, সেটা মেমসাহেবের দোষ, লেখা-পড়ার নয়। মা, আমি রান্নাঘরটা একবার ঘুরে আসি গে। কাল দ্বিজুবাবুর আবার রুটি ঠাকুর শক্ত করে ফেলেছিল, তাঁর খাবার সুবিধে হয়নি! বলিয়া সে চলিয়া গেল।

দয়াময়ী স্নেহের চক্ষে সেই দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, সকল দিক দৃষ্টি আছে। কেবল লেখা-পড়াই নয় বিপিন, মেয়েটা জানে না এমন কাজ নেই। আর তেমনি মিষ্টি কথা। ভার দিয়ে নিশ্চিন্তি—সংসারের কিচ্ছুটি চেয়ে দেখতে হয় না।

বিপ্রদাস কহিল, ম্লেচ্ছ বলে ঘেন্না কর না ত মা?

দয়াময়ী বলিলেন, তোর এক কথা! ম্লেচ্ছ হতে যাবে কিসের জন্যে—ওর মা একবার বিলেত গিয়েছিল বলেই লোকে মেমসাহেব বলে দুর্ণাম রটালে। নইলে আমার মতই বাঙালী ঘরের মেয়ে। বন্দনা জুতো পরে—তা পরলেই বা। বিদেশে অমন সবাই পরে। লোকজনের সামনে বার হয়—তাতেই বা দোষ কি। বোম্বায়ে ত আর ঘোমটা দেওয়া নেই—ছেলে-বেলা থেকে যা শিখচে তাই করে। আমার যেমন বৌমা তেমনি ও! বাপের সঙ্গে চলে যাবে বলচে—শুনলে মন কেমন করে বাবা।

বিপ্রদাস কহিল, মন কেমন করলে চলবে কেন মা? বন্দনা থাকতে আসেনি—দুদিন পরে ওকে যেতে ত হবেই।

দয়াময়ী কহিলেন, যাবে সত্যি, কিন্তু ছেড়ে দিতে মন চায় না—ইচ্ছে করে চিরকাল ধরে রেখে দিই।

বিপ্রদাস ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, সে তো আর সত্যিই হবার জো নেই মা—পরের মেয়েকে অত জড়িও না। দুদিনের জন্যে এসেচে সেই ভালো। বলিয়া সে কিছু অন্যমনস্কের মত বাহিরে চলিয়া গেল।

কথাটা দয়াময়ীর বেশ মনঃপুত হইল না। কিন্তু সে ক্ষণকালের ব্যাপার মাত্র। বলরামপুরে ফিরিবার কেহ নাম করেন না, তাঁহাদের দিনগুলো কাটিতে লাগিল যেন উৎসবের মত—হাসিয়া গল্প করিয়া এবং চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া। সকলের সঙ্গেই হাস্য-পরিহাসে এতটা হাল্কা হইতে দয়াময়ীকে ইতিপূর্বে কেহ কখনও দেখে নাই—তাঁহার অন্তরে কোথায় যেন একটা আনন্দের উৎস নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছিল, তাঁহার বয়স ও প্রকৃতি-সিদ্ধ গাম্ভীর্য্যকে সেই স্রোতে মাঝে মাঝে যেন ভাসাইয়া দিতে চায়। সতীর সঙ্গে আভাস-ইঙ্গিতে প্রায়ই কি কথা হয়, তাহার অর্থ শুধু শাশুড়ী-বধূই বুঝে, আরও একজন হয়ত কিছু-একটা অনুমান করে সে অন্নদা। সস্ত্রীক পাঞ্জাবের ব্যারিস্টার সাহেব এতদিন থাকিয়া কাল বাড়ি গিয়াছেন, তাঁহাদের উভয়ের নামই বসন্ত, এই লইয়া দয়াময়ী যাইবার সময়ে কৌতুক করিয়াছিলেন এবং প্রতিশ্রুতি করাইয়া লইয়াছেন যে, কর্ম্মস্থলে ফিরিবার পূর্ব্বে আবার দেখা দিয়া যাইতে হইবে। হয় কলিকাতায়, নয় বলরামপুরে। রায়সাহেবের পা ভাল হইয়াছে, আগামী সপ্তাহে তিনি বোম্বাই যাত্রা করিবেন, দয়াময়ী নিজে দরবার করিয়া বন্দনার কিছুদিনের ছুটি মঞ্জুর করাইয়া লইয়াছেন, সে যে বোম্বাইয়ের পরিবর্ত্তে বলরামপুরে গিয়া অন্ততঃ আরও একটা মাস দিদির কাছে অবস্থান করিবে এ ব্যবস্থা পাকা হইয়াছে।

মুখুয্যেদের মামলা-মকদ্দমা হাইকোর্টে লাগিয়াই থাকে, একটা বড়রকম মামলার তারিখ নিকটবর্ত্তী হইতেছিল, তাই বিপ্রদাস স্থির করিল আর বাড়ি না গিয়া এই দিনটা পার করিয়া দিয়া সকলকে লইয়া দেশে ফিরিবে। নানা কাজে তাহাকে সর্ব্বদাই বাহিরে থাকিতে হয়, আজ ছিল রবিবার, দয়াময়ী আসিয়া হাসিমুখে বলিলেন, একটা মজার কথা শুনেচিস্ বিপিন?

বিপ্রদাস আদালতের কাগজ দেখিতেছিল, চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, কি কথা মা?

দয়াময়ী বলিলেন, দ্বিজুদের কি একটা হাঙ্গামার মিটিং ছিল আজ, পুলিশে হতে দেবে না, আর ওরা করবেই। লাঠা-লাঠি মাথা ফাটা-ফাটি হ'তই, শুনে ভয়ে মরি—

সে গেছে নাকি?

না। সেই কথাই ত তোকে বলতে এলুম। কারও মানা শুনবে না, এমন কি ওর বৌদিদির কথা পর্য্যন্ত না, শেষে শুনতে হ'ল বন্দনার কথা।

খবরটা যত মজারই হোক মায়ের সুপরিচিত মর্য্যাদার কোথায় যেন একটু ঘা দিল। বিপ্রদাস মনে মনে বিস্মিত হইয়াও মুখে শুধু বলিল, সত্যি নাকি?

দয়াময়ী হাসিয়া জবাব দিলেন, তাই ত হ'ল দেখলুম। কবে নাকি ওদের সর্ত্ত হয়েছিল এখানে একজন জুতো পরবে না, চাল-চলনে এ বাড়ির নিয়ম লঙ্ঘন করবে না, আর তার বদলে অন্যজনকে তার অনুরোধ মেনে চলতে হবে। বন্দনা ওর ঘরে ঢুকে শুধু বললে, দ্বিজুবাবু, সর্ত্ত মনে আছে ত? আপনি কিছুতে আজ যেতে পারবেন না। দ্বিজু স্বীকার করে বললে, বেশ তাই হবে, যাব না। শুনে আমার ভাবনা ঘুচল বিপিন। কি করে আসবে, কি ফ্যাসাদ বাধবে—কর্ত্তা বেঁচে নেই, কি ভয়ে ভয়েই যে ওকে নিয়ে থাকি তা বলতে পারিনে।

বিপ্রদাস চুপ করিয়া রহিল। মা বলিতে লাগিলেন, আগে তবু ওর ইস্কুল-কলেজ, পড়া-শুনা, একজামিন-পাশ করা ছিল, এখন সে বালাই ঘুচেচে, হাতে কাজ না থাকলে বাইরের কোন্ ঝঞ্ঝাট যে কখন ঘরে টেনে আনবে তা কেউ বলতে পারে না। ভাবি শেষ পর্য্যন্ত এত বড় বংশের একটা কলঙ্ক হয়ে না দাঁড়ায়।

বিপ্রদাস হাসিয়া ঘাড় নাড়িল, কহিল, না, না, সে ভয় ক'র না, দ্বিজু কলঙ্কের কাজ কখন করবে না।

মা বলিলেন, ধর্ যদি হঠাৎ একটা জেল হয়েই যায়? সে আশঙ্কা কি নেই?

বিপ্রদাস কহিল, আশঙ্কা আছে জানি, কিন্তু জেলের মধ্যে ত কলঙ্ক নেই মা, কলঙ্ক আছে কাজের মধ্যে। তেমন কাজ কোনদিন করবে না। ধর যদি আমারি কখন জেল হয় হতেও ত পারে, তখন কি আমার জন্যে তুমি লজ্জা পাবে মা? বলবে কি বিপিন আমার বংশের কলঙ্ক?

কথাটি দয়াময়ীকে শূল বিদ্ধ করিল। কি জানি কোন নিহিত ইঙ্গিত নাই ত? এই ছেলেটিকে বুকে করিয়া এতবড় করিয়াছেন, বেশ জানিতেন, সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য বিপ্রদাস পারে না এমন কাজ নাই। কোন বিপদ, কোন ফলাফলই সে গ্রাহ্য করে না অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে। যখন তাহার মাত্র আঠারো বৎসর বয়স তখন একটি মুসলমান-পরিবারের পক্ষ লইয়া সে একাকী এমন কাণ্ড করিয়াছিল যে কি করিয়া প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারিল তাহা আজও দয়াময়ীর সমস্যার ব্যাপার। বন্দনার মুখে সেদিনকার ট্রেনের ঘটনা শুনিয়া তিনি শঙ্কায় একেবারে নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছিলেন। দ্বিজুর জন্য তাঁহার উদ্বেগ আছে সত্য, কিন্তু অন্তরের ঢের বেশি ভয় আছে তাঁহার এই বড় ছেলেটির জন্য। মনে মনে ঠিক এই কথাই ভাবিতেছিলেন। বিপ্রদাস কহিল, কেমন মা, কলঙ্কের দুর্ভাবনা গেল ত? জেল হঠাৎ একদিন আমারও হয়ে যেতে পারে যে?

দয়াময়ী অকস্মাৎ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, বালাই ষাট! ও সব অলক্ষুণে কথা তুই বলিসনে বাবা। তার পরেই কহিলেন, জেল হবে তোর আমি বেঁচে থাকতে? এতদিন ঠাকুর-দেবতাকে ডেকেচি তবে কেন? এত সম্পত্তি

রয়েচে কিসের জন্যে? তার আগে সর্ব্বস্ব বেচে ফেলব, তবু এ ঘটতে দেব না বিপিন।

বিপ্রদাস হেঁট হইয়া তাঁহার পদধূলি লইল, দয়াময়ী সহসা তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া কহিলেন, দ্বিজুর যা হয় তা হকগে, কিন্তু তুই আমার চোখের আড়াল হলে আমি গঙ্গায় ডুবে মরব বিপিন! এ সইতে আমি পারব না, তা জেনে রাখিস্। বলিতে বলিতে কয়েক ফোঁটা জল তাহার চোখ দিয়া গড়াইয়া পড়িল।

মা এ-বেলা কি—, বলিতে বলিতে বন্দনা ঘরে ঢুকিল। দয়াময়ী তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিলেন, বন্দনার বিস্মিত মুখের দিকে চাহিয়া সহাস্যে কহিলেন, ছেলেটাকে অনেকদিন বুকে করিনি তাই একটু সাধ হ'ল নিতে।

বন্দনা কহিল, বুড়ো ছেলে—আমি কিন্তু সকলকে বলে দেব।

দয়াময়ী প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, তা দিও, কিন্তু বুড়ো কথাটি মুখে এনো না, মা। এই ত সেদিনের কথা, বিয়ের কনে উঠানে এসে দাঁড়িয়েচি, আমার পিসশাশুড়ী তখনও বেঁচে, বিপিনকে আমার কোলে ফেলে দিয়ে বললেন, এই নাও তোমার বড়ছেলে বৌমা। কাজ-কর্ম্মের ভিড়ে অনেকক্ষণ কিছু খেতে পায়নি—আগে খাইয়ে ওকে ঘুম পাড়াও গে, তার পরে হবে অন্য কাজ। তিনি বোধ হয় দেখতে চাইলেন আমি পারি কি না—কি জানি পেরেচি কিনা। বলিয়া তিনি আবার হাসিলেন।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি তখন কি করলেন মা?

দয়াময়ী বলিলেন, ঘোমটার ভিতর থেকে চেয়ে দেখি একতাল সোনা দিয়ে গড়া জ্যান্ত পুতুল, বড় বড় চোখ মেলে আশ্চর্য্য হয়ে আমার পানে তাকিয়ে আছে। বুকে করে নিয়ে দিলুম ছুট। আচার-অনুষ্ঠান তখন অনেক বাকী, সবাই হৈ চৈ করে উঠলো, কিন্তু আমি কান দিলুম না। কোথায় ঘর, কোথায় দোর চিনিনে যে দাসীটি সঙ্গে দৌড়ে এসেছিল সে ঘর দেখিয়ে দিলে, তাকেই বললুম, আন ত ঝি আমার খোকার দুধের বাটি, ওকে না খাইয়ে আমি একপা নড়ব না। সেদিন পাড়া-প্রতিবেশী মেয়েরা কেউ বেহায়া, কেউ বললে আর কত-কি, আমি কিন্তু গ্রাহ্যই করলুম না। মনে মনে বললুম, বলুক গে ওরা। যে রত্ন কোলে পেলুম তাকে ত আর কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। আমার সেই ছেলেকে তুমি বল কিনা বুড়ো!

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা স্মরণ করিতে অশ্রুজল ও হাসিতে মিশিয়া মুখখানি তাঁহার বন্দনার চোখে অপূর্ব্ব হইয়া দেখা দিল, অকৃত্রিম স্নেহের সুগভীর তাৎপর্য্য এমন করিয়া উপলব্ধি করার সৌভাগ্য তাহার আর কখন ঘটে নাই। অভিভূত চক্ষে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া সে আপনাকে সামলাইয়া লইল, হাসিয়া বলিল, মা, আপনার দুটি ছেলের মধ্যে কোন্‌টিকে বেশি ভালবাসেন সত্যি করে বলুন ত?

শুনিয়া দয়াময়ীও হাসিলেন, বলিলেন, অসম্ভব সত্যি হলেও বলতে নেই মা, শাস্ত্রে নিষেধ আছে।

বন্দনা বাইরের লোক, সবে মাত্র পরিচয় হইয়াছে, ইহার সুমুখে এই সকল পূর্ব্ব কথার আলোচনায় বিপ্রদাস অস্বস্তি বোধ করিতেছিল, কহিল, বললেও তুমি বুঝবে না বন্দনা, তোমার কলেজের ইংরিজি পুঁথির মধ্যে এ-সব তত্ত্ব নেই; তার সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই করতে গিয়ে মায়ের কথা তোমার ভারি অদ্ভুত ঠেকবে। এ আলোচনা থাক।

শুনিয়া বন্দনা খুশী হইল না, কহিল, ইংরিজি পুঁথি আপনিও ত কম পড়েননি মুখুয্যেমশাই, আপনিই বা তবে বোঝেন কি করে।

বিপ্রদাস বলিল, কে বললে মাকে আমরা বুঝি বন্দনা—বুঝিনে। এ-সব তত্ত্ব শুধু আমার এই মায়ের পুঁথিতেই লেখা আছে—তার ভাষা আলাদা, অক্ষর আলাদা, ব্যাকরণ আলাদা। সে কেবল উনি নিজেই বোঝেন—আর কেউ না। হাঁ মা, যা বলতে এসেছিলে সে ত এখন বললে না?

বন্দনা বুঝিল এ ইঙ্গিত তাহাকে। কহিল, মা, এ-বেলায় রান্নার কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছিলুম—আমি যাই, কিন্তু আপনিও একটু শীঘ্র করে আসুন। সব ভুলে গিয়ে আবার যেন ছেলে কোলে করে বসে থাকবেন না। বলিয়া বিপ্রদাসকে সে একটু কটাক্ষ করিয়া চলিয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে দয়াময়ীর মুখের 'পরে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়িল, ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া দ্বিধার কণ্ঠে কহিলেন, বিপিন তুই ত খুব ধার্ম্মিক, জানিস্ ত বাবা, মাকে কখনও ঠকাতে নেই।

বিপ্রদাস বলিল, দোহাই মা, অমন করে তুমি ভূমিকা ক'র না। কি জিজ্ঞাসা করবে কর।

দয়াময়ী কহিলেন, তুই হঠাৎ আজ ও কথা বললি কেন যে তোরও জেল হতে পারে? কৈলাস যাবার সঙ্কল্প এখনও ত্যাগ করিনি বটে, কিন্তু আর ত আমি এক পাও নড়তে পারব না বিপিন!

বিপ্রদাস হাসিয়া ফেলিল, কহিল, কৈলাসে পাঠাতে আমিও ব্যস্ত নই মা, কিন্তু সে দোষ আমার ঘাড়ে শেষকালে যেন চাপিও না। ওটা শুধু একটা দৃষ্টান্ত—দ্বিজুর কথায় তোমাকে বোঝাতে চেয়েছিলুম যে কেবল জেলে যাবার জন্যই কারও বংশে কলঙ্ক পড়ে না।

দয়াময়ী মাথা নাড়িলেন—ওতে আমি ভুলব না বিপিন। এলোমেলো কথা বলার লোক তুই নয়—হয় কি করেচিস্, নয় কি-একটা করার মতলবে আছিস্, আমাকে সত্যি করে বল্।

বিপ্রদাস কহিল, তোমাকে সত্যি করে বলচি আমি কিছুই করিনি। কিন্তু মানুষের মধ্যে কত রকমের মতলব আনাগোনা করে তার কি কোন সঠিক নির্দ্দেশ দেওয়া চলে মা?

দয়াময়ী পূর্ব্বের মত মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না, তাও না। নইলে তোকে দেখলেই কেন আজকাল আমার এমন মন-কেমন করে? তোকে মানুষ করেচি, আমি বেঁচে থাকতেই শেষকালে এতবড় নেমকহারামি করবি বাবা? বলিতে বলিতে তাঁহার দুই চোখ জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

বিপ্রদাস বিপন্ন হইয়া বলিল, অমঙ্গল কল্পনা করে যদি তুমি মিথ্যে ভয় পাও মা, আমি তার কি প্রতিকার করতে পারি বল? তুমি ত জান তোমার অমতে কখন একটা কাজও আমি করিনে।

দয়াময়ী বলিলেন, কর না সত্যি, কিন্তু কাল দ্বিজুকে ডেকে পাঠিয়ে কেন বলেচ কাজ-কর্ম্ম সমস্ত বুঝে নিতে?

বড় হল, আমাকে সাহায্য করবে না?

দয়াময়ী রাগ করিয়া বলিলেন, ওর কতটুকু শক্তি? আমাকে ভোলাস্‌নে বিপিন, তুই আজ এত ক্লান্ত যে তোর প্রয়োজন হল ওর সাহায্য নেবার? কি তোর মনে আছে আমাকে খুলে বল্‌?

বিপ্রদাস চুপ করিয়া রহিল, একথা বলিল না যে, তিনি নিজেই এইমাত্র দ্বিজদাসের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে তাহাকে বলিতেছেন। কিন্তু ইহারই আভাস পাওয়া গেল দয়াময়ীর পরবর্ত্তী কথায়। বলিতে লাগিলেন, আমাদের এ পুণ্যের সংসার, ধর্ম্মের পরিবার, এখানে অনাচার সয় না। আমাদের বাড়ি নিয়মের কড়াকড়িতে বাঁধা। তোর বিয়ে দিয়েছিলুম আমি সতেরো বছর বয়সে—সে তোর মত নিয়ে নয়—আমাদের সাধ হয়েছিল বলে, কিন্তু দ্বিজু বলে সে বিয়ে করবে না। ও এম. এ, পাশ করেচে, ওর ভাল-মন্দ বোঝবার শক্তি হয়েচে, ওর ওপর কারও জোর খাটবে না। সে যদি সংসারী না হয় তাকে আমার বিশ্বাস নেই, আমার শ্বশুরের বিষয়-সম্পত্তিতে সে যেন হাত দিতে না আসে।

বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করিল, দ্বিজু কবে বললে সে বিয়ে করবে না?

প্রায়ই ত বলে, বিয়ে করবার লোক অনেক আছে তারা করুক। ও করবে শুধু দেশের কাজ। তোরা ভাবিস্ এখানে এসে পর্য্যন্ত আমি দিনরাত ঘুরে বেড়াই—খুব মনের সুখে আছি। কিন্তু সুখে নেই! এর ওপর তুই দিলি আজ জেলের দৃষ্টান্ত—যেন আমাকে বোঝাবার আর কোন দৃষ্টান্তই তোর হাতে ছিল না। একদিন কিন্তু টের পাবি বিপিন।

বিপ্রদাস কহিল, ওর বৌদিদিকে হুকুম করতে বল না মা?

তার কথাও সে শুনবে না।

শুনবে মা, শুনবে। সময় হলেই শুনবে। একটু হাসিয়া কহিল, আর যদি আমাকে আদেশ কর ত তার পাত্রীর সন্ধান করতে পারি।

বন্দনা আসিয়া ঘরে ঢুকিল, অনুযোগের সুরে কহিল, কৈ এলেন না ত? আমি কতক্ষণ-ধরে বসে আছি মা!

চল মা, যাচ্ছি।

বিপ্রদাস কহিল, আমাদের অক্ষয়বাবুর সেই মেয়েটিকে তোমার মনে আছে মা? এখন সে বড় হয়েচে। মেয়েটি যেমন রূপে তেমনি গুণে। আমাদের স্ব-ঘর, বল ত গিয়ে দেখে আসি, কথাবার্ত্তা বলি। আমার বিশ্বাস দ্বিজুর অপছন্দ হবে না।

না না, সে এখন থাক্, বলিয়া দয়াময়ী পলকের জন্য একবার বন্দনার মুখের পানে চাহিয়া দেখিলেন, বলিলেন, সতীর ইচ্ছে—না—না বিপিন, বৌমাকে জিজ্ঞেসা না করে সেসব কিছু করে কাজ নেই।

বন্দনা কথা কহিল। সুন্দর শান্ত চোখে উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, তাতে দোষ কি মা? এই ত কলকাতায়, চলুন না, দিদিকে নিয়ে আমরা গিয়ে দেখে আসি গে।

শুনিয়া দয়াময়ী বিব্রত হইয়া পড়িলেন, কি যে জবাব দিবেন ভাবিয়া পাইলেন না।

বিপ্রদাস কহিল, এ উত্তম প্রস্তাব মা। অক্ষয়বাবু স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ, সংস্কৃতের অধ্যাপক। মেয়েকে ইস্কুল-কলেজ থেকে পাশ করাননি বটে, কিন্তু যত্ন করে শিখিয়েচেন অনেক। একদিন তাঁদের ওখানে আমার নিমন্ত্রণ ছিল, সেদিন মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করেছিলুম আমি অনেক কথা। মনে হয়েছিল, বাপ সাধ করে মেয়ের নামটি যে রেখেছিলেন মৈত্রেয়ী তা অসার্থক হয়নি। যাও না মা, গিয়ে একবার তাকে দেখে আসবে—তোমার বড়বৌ অন্ততঃ মনে মনে স্বীকার করবেন তিনি ছাড়াও সংসারে রূপসী মেয়ে আছে।

মা হাসিতে চাহিলেন, কিন্তু হাসি আসিল না, মুখে কথাও যোগাইল না—বন্দনা পুনশ্চ অনুরোধ করিল, চলুন না মা, আমরা গিয়ে একবার মৈত্রেয়ীকে দেখে আসি গে? বেশি দূর ত নয়।

দয়াময়ী চাহিয়া দেখিলেন বন্দনার মুখের 'পরে এখন সে লাবণ্য আর নাই, যেন ছায়ায় ঢাকা দিয়াছে। এইবার এতক্ষণে তিনি জবাব খুঁজিয়া পাইলেন, কহিলেন, না মা, দূর বেশি নয় জানি, কিন্তু সে সময় আমার নেই। চল আমরা যাই,—এ বেলায় কি রান্না হবে দেখি গে। বলিয়া তিনি তাহার হাত ধরিয়া ঘর হইতে বাহিরে গেলেন।

১৩

সন্ধ্যা-বন্দনা সারিয়া বিপ্রদাস এইমাত্র নিজের লাইব্রেরী-ঘরে আসিয়া বসিয়াছে। সকালের ডাকে যে-সকল দলিলপত্র বাড়ি হইতে আসিয়াছে সেগুলা দেখা প্রয়োজন, এমনি সময়ে মা আসিয়া প্রবেশ করিলেন—হাঁ রে বিপিন, তুই কি বাড়িয়েই বলতে পারিস!

বিপ্রদাস চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—কিসের মা?

অক্ষয়বাবুর মেয়ে মৈত্রেয়ীকে আমরা যে দেখে এলুম।

মেয়েটি কি মন্দ?

দয়াময়ী একটু ইতস্তত: করিয়া কহিলেন, না মন্দ, বলিনে—সচরাচর এমন মেয়ে চোখে পড়ে না সে সত্যি, কিন্তু তাই বলে আমার বৌমার সঙ্গে তার তুলনা করলি? বৌমার কথা থাক্, কিন্তু রূপে বন্দনার কাছেই কি দাঁড়াতে পারে?

বিপ্রদাস বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, তবে বুঝি তোমরা আর কাউকে দেখে এসেচ। সে মৈত্রেয়ী নয়।

দয়াময়ী হাসিয়া বলিলেন, তাই বটে! আমাদের সঙ্গে তার কত কথা হ'লো, কি যত্ন করেই না সে বৌমাদের খাওয়ালে—তার পরে কত বই, কত লেখা-পড়ার কথা-বার্ত্তা বন্দনার সঙ্গে তার হ'লো, আর তুই বলিস আমরা আর কাকে দেখে এসেছি!

বিপ্রদাস বলিল, বন্দনার সব প্রশ্নের সে হয়ত জবাব দিতে পারেনি, কিন্তু মা লেখা-পড়ায় বন্দনা ইস্কুল-কলেজে কত বই পড়ে কতগুলো পরীক্ষা পাশ করেচে, আর তার শুধু বাপের কাছে ঘরে বসে শেখা। এই যেমন আমার সঙ্গে তোমার ছোটছেলের তফাৎ!

শুনিয়া দয়াময়ীর দুই চোখ কৌতুকে নাচিয়া উঠিল—চুপ কর্ বিপিন, চুপ কর্। দ্বিজু ও-ঘরে আছে, শুনতে পেলে লজ্জায় বাড়ি ছেড়ে পালাবে। একটু থামিয়া বলিলেন, তোর মা মুখ্যু বলে কি এতই মুখ্যু যে কলেজের পাশ করাকেই চতুর্ব্বর্গ ভাববে? তা নয় রে, বরঞ্চ ছোট ছোট কথায় মিষ্টি করে সে বন্দনার সকল কথারই জবাব দিয়েচে। গাড়িতে আসতে আসতে মেয়েটির কত প্রশংসাই বন্দনা করলে। কিন্তু আমি বলি আমাদের গেরস্ত-ঘরে দরকার কি বাপু অত লেখা-পড়ায়? আমার একটা বৌ যেমন হয়েচে আর একটি তেমনি হলেই আমার চলে যাবে। নইলে বিদ্যের গুমোরে সে যে মনে মনে গুরুজনদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে সে হবে না।

বিপ্রদাস বুঝিল জেরার জবাবটা মায়ের এলো-মেলো হইয়া যাইতেছে, হাসিয়া কহিল, সে ভয় ক'রো না মা। বিদ্যা যাদের কম, গুমোর হয় তাদেরই বেশি, ও

বাপের কাছে সত্যি সত্যিই যদি কিছু শিখে থাকে আচার-আচরণে সকলের নিচু হয়েই থাকবে তুমি দেখ।

যুক্তিটা মা অস্বীকার করিতে পারিলেন না, বলিলেন, একথা তোর সত্যি, কিন্তু আগে থেকে জানব কি করে বল? তা ছাড়া, আমাদের পাড়াগাঁয়ে বিত্তের কমবেশী কেউ যাচাই করতে আসে না, কিন্তু বৌ দেখতে এসে সকলে যে নাক তুলে বলবে বুড়ো-মাগীর কি চোখ ছিল না যে অমন বৌয়ের পাশে এই বৌ এনে দাঁড় করালে। এ আমার সইবে না বাবা।

বিপ্রদাস ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, কিন্তু অক্ষয়বাবুকে ত একটা জবাব দিতে হবে মা। সেদিন তাঁকে ভরসা দিয়েছিলুম, আমার মায়ের বোধ হয় অমত হবে না।

শুনিয়া দয়াময়ী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, ও কথা না বললেই ভাল হ'ত বিপিন। তা সে যাই হোক, বৌমার মত কি হচ্ছে আগে শুনি, তার পরে তাঁকে বললেই হবে।

বিপ্রদাস কহিল, অক্ষয়বাবু আমাদের নিতান্ত পর নয়। এতদিন পরিচয় ছিল না বলেই তা প্রকাশ পায়নি। কিন্তু আত্মীয়তার জন্যেও বলিনে, কিন্তু তোমার আর এক ছেলের যখন বিয়ে দিয়েছিলে, নিজের ইচ্ছেতেই দিয়েছিলে, অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করতে যাওনি। আর এর বেলাতেই কি যত মত-জানাজানির দরকার হ'ল মা?

তর্কে হারিয়া দয়াময়ী হাসিমুখে বলিলেন, কিন্তু এখন যে বুড়ো হয়েচি বাবা, আর কতকাল বাঁচব বল ত? কিন্তু চিরকাল যাকে নিয়ে ঘর করতে হবে তার মত না নিয়ে বিয়ে দিতে পারি? না না, দুদিন আমাদের তুই ভাবতে সময় দে। বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন। বাহিরে আসিয়া দয়াময়ী নিজের ঘরের দিকে না গিয়া বেহাইয়ের ঘরের উদ্দেশে চলিলেন। এই কয়েক দিনের ঘনিষ্ঠতায় বন্দনার পিতার কাছে তাঁহার অনেকটা সঙ্কোচ কাটিয়া গিয়াছিল, প্রায়ই নিজে আসিয়া তাঁহার তত্ত্ব লইয়া যাইতেন—এদিকে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, আহ্নিকে বসিলে শীঘ্র উঠিতে পারিবেন না ভাবিয়া তাঁহার ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন—কেমন আছেন—

কথাটা সম্পূর্ণ হইতে পারিল না। ঘরের অপর প্রান্তে বসিয়া একটি সুদর্শন যুবক বন্দনার সহিত মৃদুকণ্ঠে গল্প করিতেছিল, নিখুঁত সাহেবি পোষাকের এই অপরিচিত লোকটির সম্মুখে হঠাৎ আসিয়া পড়ায় দয়াময়ী সলজ্জে পিছাইয়া যাইবার উপক্রমেই রায়সাহেব বলিয়া উঠিলেন, কোথায় পালাচ্চেন বেয়ান, ও যে আমাদের সুধীর। ওকে লজ্জা কিসের? ও ত বিপ্রদাস দ্বিজদাসের মতই আপনার ছেলে। আমার অসুখের খবর পেয়ে মাদ্রাজ থেকে দেখতে এসেচে। সুধীর, ইনি বন্দনার দিদির শাশুড়ী—বিপ্রদাসের মা, এঁকে প্রণাম কর।

সুধীরের প্রণাম করার অভ্যাস নাই, ও পোষাকে করাও কঠিন, সে কাছে আসিয়া মাথা নোয়াইয়া কোনমতে আদেশ পালন করিল।

এই ছেলেটির সহিত দয়াময়ীর সন্তান-সম্বন্ধ যে কি সূত্রে হইল তাহা বুঝাইবার জন্য রায়সাহেব বলিতে লাগিলেন, ওর বাপ আর আমি একসঙ্গে বিলাতে পড়েছিলুম বেয়ান, তখন থেকেই আমরা পরম বন্ধু। সুধীর নিজেও বিলাতে অনেকগুলো পাশ করে মাদ্রাজের শিক্ষাবিভাগের ভাল চাকরি পেয়েচে। কথা আছে ওদের বিয়ের পরে কিছুদিনের ছুটি নিয়ে ও বন্দনাকে সঙ্গে নিয়ে আবার বিলেতে বেড়াতে যাবে, সেখানে ইচ্ছে হয় বন্দনা কলেজে ভর্ত্তি হবে, না হয় দেশ দেখেই দুজনে ফিরে আসবে। ত্যাখো সুধীর, তোমরা যদি এই আগস্ট সেপ্টেম্বরেই যাওয়া স্থির করতে পার আমিও না হয় মাস-তিনেকের ছুটি নিয়ে একবার ঘুরে আসি। কি বলিসরে বুড়ি, ভাল হয় না?

বন্দনা সেখান হইতেই আস্তে আস্তে বলিল, কেন হবে না বাবা, তুমি সঙ্গে থাকলে ত ভালই হয়।

রায়সাহেব উৎসাহ-ভরে কহিলেন, তাতে আরও একটা সুবিধে এই হবে যে, তোদের বিয়ের পরেও মাস-খানেক সময় পাওয়া যাবে, কোনরকম তাড়া-হুড়ো করতে হবে না। বুঝলে না সুধীর সুবিধেটা?

ইহাতে সুধীর ও বন্দনা উভয়েই মাথা নাড়িয়া সায় দিল। দয়াময়ী এতক্ষণে বুঝিলেন এই ছেলেটি রায়সাহেবের ভাবী জামাতা। অতএব তাঁহারও পুত্র-স্থানীয়। বুকের ভিতরটায় হঠাৎ একবার তোলপাড় করিয়া উঠিল, কিন্তু তিনি বিপ্রদাসের মা, বলরামপুরের বহুখ্যাত মুখুয্যে পরিবারের কর্ত্রী, মুহূর্ত্তে নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সুধীর, তোমাদের বাড়ি কোথায় বাবা?

সুধীর কহিল, এখন বোম্বায়ে। কিন্তু বাবার মুখে শুনেচি আগে ছিল দুর্গাপুরে, কিন্তু বর্ত্তমানে সেখানে বোধ করি আমাদের আর কিছু নেই।

কোন দুর্গাপুর সুধীর? বর্দ্ধমান জেলার?

সুধীর বলিল, হাঁ, বাবার মুখে তাই শুনেচি। কালনার কাছে কোন্ একটি ছোট্ট গ্রাম, এখন নাকি সে দেশ ম্যালেরিয়ায় ধ্বংস হয়ে গেছে।

দয়াময়ী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, তোমার বাবার নামটি কি?

সুধীর বলিল, আমার বাবার নাম শ্রীরামচন্দ্র বসু।

দয়াময়ী চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার পিতামহর নাম কি ছিল হরিহর বসু?

প্রশ্ন শুনিয়া রায়সাহেব পর্য্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন, বলিলেন, আপনি কি ওদের জানেন নাকি?

হাঁ, জানি। দুর্গাপুরে আমার মামার বাড়ি। ছেলে-বেলায় দিদিমার কাছে

মানুষ হয়েচি বলে ও-গ্রামের প্রায় সকলকেই চিনি। ওঁদের বাড়ি ছিল আমাদের পাড়ায়। কিন্তু এখন আর কথা কইবার সময় নেই সুধীর, আমার আহ্নিকের দেরি হয়ে যাচ্ছে! কিন্তু কিছু না খেয়েই যেন তুমি চলে যেও না—আমি এখনি সমস্ত ঠিক করে দিতে বলচি।

সুধীর সহাস্যে কহিল, তার আর বাকী নেই, বিপ্রদাসবাবু আগেই সে কাজ সমাধা করে দিয়েছেন।

দিয়েচে? আচ্ছা তা হলে এখন আমি আসি, বলিয়া দয়াময়ী বাহির হইয়া গেলেন। বন্দনার প্রতি একবার চাহিলেন না, একটা কথাও বলিলেন না।

পরদিন সকালে স্নান-আহ্নিক সারিয়া বিপ্রদাস প্রতিদিনের অভ্যাসমত মায়ের পদধূলির জন্য আজও তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়া ভয়ানক আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল তাঁহার জিনিস-পত্র বাঁধা-ছাঁদা হইতেছে।

এ কি মা, কোথাও যাবে নাকি?

দয়াময়ী বলিলেন, তোকে খুঁজে পেলুম না, তাই দত্তমশাইকে জিজ্ঞেসা করে জানলুম সাড়ে নটার গাড়িতে বার হতে পারলে সন্ধ্যার আগেই বাড়ি পৌছতে পারব। কিন্তু পরশু তোর মকদ্দমার দিন, তুই ত সঙ্গে যেতে পারবিনে, দ্বিজুকে বলে দে, ও আমাদেব পৌছে দিয়ে আসুক।

বিপ্রদাস চাহিয়া দেখিল মায়ের দুই চোখ রাঙা, মুখ শুষ্ক, দেখিলে মনে হয় সারারাত্রি তাঁহার উপর দিয়া একটা ঝড় বহিয়া গিয়াছে।

বিপ্রদাস সভয়ে প্রশ্ন করিল, হঠাৎ কি কোন দরকার পড়েছে মা?

মা বলিলেন, দুদিনের জন্যে এসে আট-দশদিন কেটে গেল, ওদিকে ঠাকুর-সেবার কি হচ্চে জানিনে, পাঁচ-ছয়টি গরুর প্রসব হবার সময় হয়েচে দেখে এসেচি, তাদের কি হল খবর পাইনি, বাসুর পাঠশালা কামাই হচ্ছে—আর ত দেরি করা চলে না বিপিন।

এ সকল ব্যাপার দয়াময়ীর কাছে তুচ্ছ নয় সত্য, কিন্তু আসল কারণটা তিনি প্রকাশ করিলেন না, বিপ্রদাস তাহা বুঝিয়াই বলিল, তবু কি আজ না গেলে নয় মা?

না বাবা, তুই আমাকে বাধা দিসনে। দ্বিজুকে সঙ্গে যেতে বলে দে, না হয় আর কেউ আমাদের পৌছে দিয়ে আসুক।

তাই হবে মা, বলিয়া বিপ্রদাস পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া বাহির হইয়া গেল। নিজের শোবার ঘরে আসিয়া দেখিল সতী অত্যন্ত ব্যস্ত এবং কাছে বসিয়া অন্নদা সন্দেশের হাঁড়ি, ফল-মূল ও ছেলের দুধের ঘটি গুছাইয়া ঝুড়িতে তুলিতেছে।

সতী মাথায় আঁচল টানিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বিপ্রদাস বলিল, অন্নদাদিদি, ব্যাপার কি জান?

না দাদা, কিছুই জানিনে। সকালে মা আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বলে দিলেন ছেলে-বৌয়ের গাড়িতে খাবার কষ্ট না হয়, তিনি নটার ট্রেনে বাড়ি যাবেন।

বিপ্রদাস সতীকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় সেও মাথা নাড়িয়া জানাইল, সে কিছুই জানে না।

শুনিয়া বিপ্রদাস স্তব্ধ হইয়া রহিল। অন্নদা না জানিতেও পারে, কিন্তু বৌ জানে না শাশুড়ীর কথা এমন বিষয় কি আছে? কয়েক মুহূর্ত নীরবে দাঁড়াইয়া সে নীচে চলিয়া গেল, উদ্বেগের সহিত ইহাই ভাবিতে ভাবিতে গেল, এ-সকল মায়ের একান্ত স্বভাব-বিরুদ্ধ। কি জানি কোন্ গভীর দুঃখ তাঁহার এই বিপর্যস্ত আচরণের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রহিল যাহা কাহারও কাছে তিনি প্রকাশ করিলেন না।

দয়াময়ী যাত্রা করিয়া যখন নীচে নামিলেন, তখন ট্রেনের অনেক সময় বাকী, কিন্তু কিছুতেই আজ তাঁহার বিলম্ব সহে না, কোনমতে বাহির হইতে পারিলেই বাঁচেন। সম্মুখে মোটর প্রস্তুত, আর একটায় জিনিস-পত্র চাপাইয়া চাকরেরা উঠিয়া বসিয়াছে, ব্যাগ-হাতে বিপ্রদাসকে আসিতে দেখিয়া তিনি বিস্ময়কর কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, দ্বিজু কই?

বিপ্রদাস কহিল, সে যাবে না মা, আমিই তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসব।

কেন, যেতে রাজি হ'ল না বুঝি?

বিপ্রদাস সবিনয়ে কহিল, তাকে এমন কথা তোমার বলা উচিত নয় মা। তুমি হুকুম করলে সে সত্যিই কবে অবাধ্য হয়েছে বল ত?

তবে হ'ল কি? গেল না কেন?

আমিই যেতে বলিনি মা, বলিয়া বিপ্রদাস একটু হাসিয়া কহিল, যে জন্যে তুমি এত ব্যস্ত হয়ে পড়েচ তোমার সেই ঠাকুর, তোমার গরুর পাল, তাদের সত্যিই কি অবস্থা ঘটল নিজের চোখে দেখব বলেই সঙ্গে যাচ্ছি। অন্য কিছুই নয় মা।

আর কোন সময়ে দয়াময়ী নিজেও হাসিয়া হয়ত কত কথাই ছেলেকে বলিতেন, কিন্তু এখন চুপ করিয়া রহিলেন।

অন্নদা বন্দনাকে ডাকিতে গিয়াছিল, সে এইমাত্র স্নান করিয়া পিতার ঘরে যাইতেছিল, অন্নদার আহ্বানে দ্রুতপদে নীচে আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। দয়াময়ী কহিলেন, আজ আমরা বাড়ি যাচ্ছি বন্দনা!

বাড়ি? সেখানে কি হয়েচে মা?

না, হয়নি কিছু। কিন্তু দুদিনের জন্যে এসে দশ-বারো দিন দেরি হয়ে গেল, আর বাড়ি ছেড়ে থাকা চলে না। তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হ'লো না—এখনো ওঠেননি—আমার ত্রুটি যেন বেহাই মার্জ্জনা করেন। দ্বিজু রইল, অন্নদা রইল, তুমি দেখো তাঁর যেন অযত্ন না হয়। এসো বৌমা, আর দেরি ক'রো না, এই বলিয়া তিনি গাড়িতে গিয়া উঠিলেন।

সতী পিছনে ছিল, সে কাছে আসিয়া বোনের হাত ধরিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল—আমরা চললুম ভাই—আর কিছু তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না, চোখ মুছিতে মুছিতে গাড়িতে তাহার শাশুড়ীর পাশে গিয়া বসিল।

বন্দনা স্তব্ধ-বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ দাঁড়াইয়া—যেন পাথরের মূর্ত্তি, অকস্মাৎ একি হইল!

বাসু আসিয়া যখন তাহার পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া বলিল, আমি যাচ্ছি মাসীমা, তখনই তাহার চৈতন্য হইল, তাহারও এখনো কাহাকেও প্রণাম করা হয় নাই। তাড়াতাড়ি বাসুর কপালে একটা চুমা দিয়া সে গাড়ির দরজার কাছে আসিয়া হাত বাড়াইয়া দয়াময়ী ও মেজদির পায়ের ধূলা লইল। সতী নীরবে তাহার চিবুক স্পর্শ করিল, মা অস্ফুটে আশীর্ব্বাদ করিলেন, কিন্তু কি বলিলেন, বুঝা গেল না। মোটর ছাড়িয়া দিল।

অন্নদা কহিল, চল দিদি, আমরা ওপরে যাই।

তাহার স্নেহের কণ্ঠস্বরে বন্দনা লজ্জা পাইল, ক্ষণকালের বিহ্বলতা সজোরে ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিল, তুমি যাও অন্নদা, আমি রান্নাঘরের কাজগুলো সেরে নিয়ে যাচ্ছি। এই বলিয়া সেই দিকে চলিয়া গেল।

কাল বিকালেও কথা হইয়াছিল রায়সাহেব বোম্বাই রওনা হইলে সকলে একত্রে বলরামপুর যাত্রা করিবেন। কিন্তু তাহার উল্লেখ পর্য্যন্ত নয়, সুদূর ভবিষ্যতে কোন একদিনের মৌখিক আহ্বান পর্য্যন্ত নয়।

ঘণ্টা-খানেক পরে নিজের হাতে চায়ের সরঞ্জাম লইয়া বন্দনা পিতার ঘরে গেলে তিনি অত্যন্ত আক্ষেপ-সহকারে বলিয়া উঠিলেন, বেহানরা চলে গেলেন, সকালে উঠতে পারিনি মা, ছি ছি, কি না-জানি আমাকে তাঁরা মনে করে গেলেন।

বন্দনা বলিল, বাবা, আমরা কবে বোম্বায়ে যাব?

বাবা বলিলেন, তোমার যে বলরামপুরে যাবার কথা ছিল মা, গেলে না কেন?

মেয়ে বলিল, তোমাকে একলা ফেলে রেখে কি করে যাব বাবা, তুমি যে আজও ভাল হতে পারনি।

ভাল ত হয়েচি মা। বেহানকে কথা দেওয়া হয়েচে তুমি যাবে, না হয় যাবার পথে আমি তোমাকে বলরামপুরে নামিয়ে দিয়ে যাব। কি বল মা?

না বাবা, সে হবে না। তোমাকে এতটা পথ একলা যেতে আমি দিতে পারব না।

কন্যার কথা শুনিয়া পিতা পুলকিত-চিত্তে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, দূর বুড়ী! দেখা হলে বেয়ান তোকে ঠাট্টা করে বলবে, বুড়ো বাপটাকে মেয়েটা চোখের আড়াল করতে পারে না। ছি ছি—

তুমি খাও বাবা, আমি আসচি, বলিয়া বন্দনা বাহির হইয়া গেল।

১৪

সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়, বন্দনা আসিয়া দ্বিজদাসের ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিল, একবার আসতে পারি দ্বিজুবাবু? ভিতর হইতে সাড়া আসিল, পার। একবার নয়, শত সহস্র অসংখ্যবার পার।

বন্দনা দরজার পাল্লা দুটা শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত ঠেলিয়া দিয়া প্রবেশ করিল এবং ঘরের সব কয়টা আলো জ্বালিয়া দিয়া খোলা দরজার সম্মুখে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল।

দ্বিজদাস হাতের বইটা একপাশে উপুড় করিয়া রাখিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়া বলিল, কি হুকুম?

কি পড়ছিলেন?

ভূতের গল্প।

অতিথি বড় না ভূতের গল্প বড়?

ভূতের গল্প বড়।

বন্দনা বিরক্ত হইয়া বলিল, সকল সময়েই তামাসা ভাল নয়। আমরা যে আপনার বাড়িতে অতিথি এ জ্ঞান আপনার আছে?

দ্বিজদাস কহিল, তোমরা যে দাদার বাড়িতে অতিথি এ জ্ঞান আমার পূর্ণ মাত্রায় আছে। এবং বাড়ি-আলা আদেশ দিয়ে গেছেন তোমাদের যত্নের যেন না ত্রুটি হয়। নিশ্চয় হ'ত না, কিন্তু এই ভূতের গল্পটায় আত্ম-বিস্মৃত হয়ে কর্ত্তব্যে কিঞ্চিৎ শৈথিল্য ঘটেচে। অতএব অতিথির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

সমস্ত দিনটা আমার কত কষ্টে কেটেচে জানেন?

নিশ্চয় জানি।

নিশ্চয় জানেন? অথচ প্রতিকারের কি কোন উপায় করেচেন?

দ্বিজদাস কহিল, না করার প্রথম কারণ পূর্ব্বেই নিবেদন করেচি। দ্বিতীয় কারণ, এ প্রতিকার আমার সাধ্যাতীত।

কেন?

সে আমার বলা উচিত নয়।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, মা এবং মেজদি এমন হঠাৎ বাড়ি চলে গেলেন কেন?

মেজদি গেলেন প্রবলপরাক্রান্ত শাশুড়ীর হুকুম বলে। নইলে তিনি নির্দ্দোষ।

কিন্তু মা গেলেন কেন?

মা-ই জানেন।

আপনি জানেন না?

দ্বিজদাস কহিল, একেবারেই জানিনে বললে মিথ্যা বলা হবে। কারণ বৌদি কিঞ্চিৎ অনুমান করেচেন এবং আমি তার যৎসামান্য একটু অংশ লাভ করেচি।

বন্দনা বলিল, সেই যৎসামান্য অংশটুকুই আমাকে আপনার বলতে হবে।

দ্বিজদাস এক মুহূর্ত মৌন থাকিয়া কহিল, তবেই বিপদে ফেললে বন্দনা। একথা কি তোমার না শুনলেই চলে না?

না, সে হবে না, আপনাকে বলতেই হবে।

না-ই বা শুনলে!

বন্দনা বলিল, দেখুন দ্বিজবাবু, আমাদের সর্ত্ত হয়েছিল, এ-বাড়িতে আপনার সমস্ত কথা আমি শুনব এবং আপনিও আমার সমস্ত কথা শুনবেন। আপনি জানেন আপনার একটি আদেশও আমিও লঙ্ঘন করিনি। বলিতে গিয়া তাহার চোখে জল আসিতেছিল আর একদিকে চাহিয়া তাহা কোনমতে সামলাইয়া লইল।

দ্বিজদাস ব্যথিত হইয়া বলিল, নিতান্ত অর্থহীন ব্যাপার তাই বলার আমার ইচ্ছে ছিল না। মা তোমার 'পরেই রাগ করে চলে গেছেন বটে, কিন্তু তোমার কিছুমাত্র অপরাধ নেই। সমস্ত দোষ মার নিজের। বৌদিদিরও কিঞ্চিৎ আছে, কারণ প্রত্যক্ষে না হলেও পরোক্ষে চক্রান্তে যোগ দিয়েছিলেন বলেই আমার সন্দেহ। কিন্তু সবচেয়ে নিরপরাধ বেচারা দ্বিজদাস নিজে।

বন্দনা অধীর হইয়া উঠিল—বলুন না শীগ্‌গির চক্রান্তটা কিসের?

দ্বিজদাস বলিল, চক্রান্ত শব্দটা বোধ হয় সঙ্গত নয়! কিন্তু মা করেছিলেন মনে মনে স্বর্ণলঙ্কা-ভাগ। কিন্তু হিসেবের ভুলে ভাগ্যে পড়ল যখন শূন্য তখন সমস্ত সংসারের উপর গেলেন চটে। চটাও ঠিক নয়, অনেকটা আশাভঙ্গের ক্ষুব্ধ অভিমান।

বন্দনা নীরবে চাহিয়া রহিল, দ্বিজদাস বলিতে লাগিল, জানো নিশ্চয়ই যে একদিন তোমার প্রতি ছিল তাঁর যত বড় বিতৃষ্ণা আর একদিন জন্মালো তাঁর তেমনি গভীর স্নেহ। রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, কাজে-কর্ম্মে, দয়া-মায়ায় একা বৌদি ছাড়া মার কাছে কেউ তোমার আর জোড়া রইলো না। তোমাকে ম্লেচ্ছ বলে সাধ্য কার? তখনি মা কোমর বেঁধে প্রমাণ করতে বসতেন এতবড় নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণ-তনয়া সমস্ত ভারতবর্ষ হাতড়ালে খুঁজে মিলবে না। এই বলিয়া দ্বিজদাস নিজের রসিকতার আনন্দে অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

এ হাসি বন্দনার অত্যন্ত খারাপ লাগিলেও সে নিজেও হাসিয়া ফেলিল।

দ্বিজদাস বলিল, হাসচ কি বন্দনা, আসলে সেই ত হয়েচে সকলের বিপদ।

বন্দনা কহিল, এতে বিপদ কিসের জন্যে?

দ্বিজদাস বলিল, তবে অবধানপূর্ব্বক শ্রবণ কর। দয়াময়ীর দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ। জ্যেষ্ঠের প্রতি যেমন অগাধ আশা ও ভরসা, কনিষ্ঠের প্রতি তেমনি অপরিসীম সন্দেহ ও ভয়। তাঁহার ধারণা অপদার্থতায় পৃথিবীতে কনিষ্ঠের সমকক্ষ কেউ নেই। কিন্তু মা ত! গর্ভে ধারণ করে সন্তানকে সহজে জলাঞ্জলি দিতে পারেন না, অতএব মনে মনে সদ্গতির উপায় নির্দ্ধারণ করলেন—তোমার স্কন্ধে, তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে সংসার-মরুভূমি নির্ভয়ে উত্তীর্ণ করে দেবেন। কিন্তু বিধাতা বিরূপ, অকস্মাৎ কাল সন্ধ্যায় আবিষ্কৃত হল বন্দনার স্কন্ধদেশে স্থান নাই, ছোট সে তরী—অর্থাৎ কি-না দয়াময়ীর সকল সঙ্কল্প, সকল স্বপ্নজাল ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত করে কে এক সুধীরচন্দ্র তথায় পূর্ব্বাহ্নেই সমারূঢ়, তাঁকে নাড়ায় সাধ্য কার! এই বলিয়া সে আর এক দফা উচ্চহাস্যে ঘর ভরিয়া দিল।

বন্দনা কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল, এ-রকম বিকট হাসির কারণটা আপনার কি? মা অপদস্থ হয়েচেন তাই, না আপনি নিজে অব্যাহতি পেলেন তারই আনন্দোচ্ছ্বাস? কোনটা?

দ্বিজদাস স্মিতমুখে বলিল, যদিচ এর কোনটাই নয়, তথাপি কবুল করতে বাধা নেই যে অকস্মাৎ পদস্খলনে মা-জননীর এই ধরাশায়িনী মূর্ত্তিতে দর্শক হিসাবে আমি কিঞ্চিৎ অনাবিল আনন্দ-রস উপভোগ করেচি। তবে, ক্ষতি তাঁর বিশেষ হবে না যদি এর থেকে তিনি অন্ততঃ এটুকু শিক্ষা লাভ করে থাকেন যে, সংসারে বুদ্ধি পদার্থটা তাঁরই নিজস্ব নয়, ওতে অপরেরও দাবী থাকতে পারে। কারণ, আমাকে না হোক দাদাকেও মা যদি তাঁর ষড়যন্ত্রের আভাস দিতেন, আর কিছু না ঘটুক, এ কর্ম্মভোগ থেকে তাঁকে নিষ্কৃতি দিতে পারা যেত। দাদা এবং আমি উভয়েই জানতুম তুমি অন্যের বাক্‌দত্তা বধূ, পরস্পর প্রণয়-শৃঙ্খলে আবদ্ধ, অতএব এ অবস্থার অন্যথা ঘটা সম্ভবপরও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা কার কাছে কবে শুনলেন?

দ্বিজদাস বলিল, তোমার বাবার কাছে। এখানে আমাদের আসার দিনই রায়-সাহেব তোমাদের ভালবাসা বাক্‌দান ও আশু বিবাহের মনোজ্ঞ আলোচনায় আমাদের দুভায়ের দুজোড়া কানেই সুধাবর্ষণ করেছিলেন। না, না, রাগ করো না বন্দনা, সাধা-সিধে নিরীহ মানুষ, চিত্তের প্রফুল্লতায় সুসংবাদ আত্মীয়-স্বজনের কাছে চেপে রাখবার প্রয়োজনই মনে করেননি।

বন্দনা কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, এই জন্যেই কি মুখুয্যেমশাই মৈত্রেয়ীকে দেখতে আমাদের পাঠিয়েছিলেন?

দ্বিজদাস বলিল, সে ঠিক জানিনে। কারণ, দাদার সমস্ত মনের কথা দেবতারও

অজ্ঞাত। শুধু এটুকু জানি তাঁর মনে মৈত্রেয়ী দেবী সর্ব্বগুণান্বিতা কন্যা। বলরামপুরের ধনী ও মহামাননীয় মুখুয্যে-পরিবারের অযোগ্যা নয়।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, মৈত্রেয়ী দেবী সম্বন্ধে আপনার অভিমতটা কি?

দ্বিজদাস বলিল, এ-বাড়িতে ও-প্রশ্ন অবৈধ। আমি তৃতীয় পক্ষ। প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষ, অর্থাৎ মা ও দাদা যে কোন নারীর গলদেশে আমাকে বন্ধন করে দেবেন তাঁরই কণ্ঠলগ্ন হয়ে আমি পরমানন্দে ঝুলতে থাকব। এই এ-গৃহের সনাতন রীতি, এর পরিবর্ত্তন নেই।

তাহার বলবার ভঙ্গীতে বন্দনা হাসিয়া ফেলিল, বলিল, আর ধরুন, মৈত্রেয়ীর পরিবর্ত্তে বন্দনার গলদেশেই যদি তাঁরা আপনাকে বেঁধে দেন?

দ্বিজদাস ললাটে করাঘাত করিয়া বলিল, হায় বন্দনা, সে আশা বৃথা! দুষ্ট রাহু পূর্ণচন্দ্র ভক্ষণ করেচে, কোথাকার সুধীরচন্দ্র লাফ মেরে এসে প্রসাদে আগুন ধরিয়ে দিলে, দ্বিজদাসের স্বর্ণলঙ্কা চোখের সম্মুখে ভস্মীভূত হয়ে গেল। এ প্রসঙ্গ বন্ধ করো কল্যাণি, অভগার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

তাহার নাটকীয় উক্তিতে বন্দনা আর একবার হাসিয়া বলিল, সোনার লঙ্কার সবটা ত পোড়েনি দ্বিজুবাবু, অশোক-কাননটা রক্ষে পেয়েছিল। হৃদয় বিদীর্ণ না হতেও পারে।

দ্বিজদাস মাথা নাড়িয়া বলিল, সে আশ্বাস বৃথা, শ্রীরামচন্দ্রের বরাতের জোর ছিল, কিন্তু আমি সর্ব্ববাদিসম্মত হতভাগ্য দ্বিজদাস। আমার দগ্ধ অদৃষ্টে সমস্ত আশাই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে—কিছুই অবশিষ্ট নেই।

না যায়নি।

কি যায়নি?

বন্দনা জোর দিয়া বলিল, কিছুই যায়নি। দ্বিজদাস হতভাগ্য বলে বন্দনা হতভাগিনী নয়। আমার অদৃষ্টকে পুড়িয়ে ছাই করে এ সাধ্য সুধীরের নেই। সংসারে কারও নেই, মায়েরও না আপনার দাদারও না।

তাহার শান্ত দৃঢ় কণ্ঠস্বরে দ্বিজদাস অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

চুপ করে রইলেন যে? আমার মনের কথা আপনি টের পাননি? আজ কি এই ছলনা করতে চান?

না, ছলনা করতে চাইনে বন্দনা, অনুমান করেছিলুম তা মানি। কিন্তু সন্দেহও ছিল প্রচুর।

বন্দনা কহিল, সে সন্দেহ যেন আজ থেকে যায়। ক্ষণকাল তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বলিল, কিন্তু সন্দেহ আমার ত ছিল না। সেই প্রথম দিন থেকেই না। বাড়ি থেকে রাগ করে চলে এলুম, একলা উপরের ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে

হাত তুলে ইঙ্গিতে আমাকে বিদায় দিলেন, মাত্র একটি বেলার পরিচয়, তবু কি অর্থ তার আমার কাছে এতটুকু অস্পষ্ট ছিল ভাবেন?

দ্বিজদাস চুপ করিয়া চাহিয়া আছে দেখিয়া বন্দনা বলিল, গেল সন্দেহ?

দ্বিজদাস বলিল, বোধ হয় আর একটু তাড়া দিলেই যাবে। কিন্তু ভাবছি, আমার সংশয়-নিরসনের এই পদ্ধতিই কি চিরকাল চালাবে?

বন্দনা বলিল, চিরকালের ব্যবস্থা আগে ত আসুক। কিন্তু সমস্ত জেনেও যে তাচ্ছিল্যের অভিনয় করে তাকে বোঝাবার আর কোন পথ নেই।

কিন্তু সে আমি নয়, মা। বোঝাবে কি করে?

বন্দনা বলিল, মা আপনি বুঝবেন। আমাকে তিনি মেয়ের মতো ভালবাসেন। আজ হঠাৎ যত চঞ্চল হয়েই যান, যা জেনে গেচেন সে যে সত্যি নয় এ-কথা মাকেই যদি না বোঝাতে পারি আমি কিসের আশা করি বলুন ত! আমার কোন ভাবনা নেই দ্বিজুবাবু, একদিন-না-একদিন সমস্ত কথা তাঁকে আমি বোঝাবই বোঝাব। বলিতে গিয়া শেষের দিকে হঠাৎ তাহার গলা ভাঙ্গিয়া দুই চোখ জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

সত্য ও মিথ্যার দ্বিধা দ্বিজদাসের ঘুচিয়াও ঘুচিতেছিল না, কিন্তু এই চোখের জল ও কণ্ঠস্বরের নিগূঢ় পরিবর্ত্তনে তাহার সকল সংশয় ঘুচিল—এ ত শুধু পরিহাস নয়। বিস্ময় ও ব্যথায় আলোড়িত হইয়া সে বলিয়া উঠিল, এ কি বন্দনা, তুমি কাঁদচ যে?

প্রত্যুত্তরে বন্দনা কথা কহিল না, কেবল অশ্রু মুছিয়া আর একদিকে চাহিয়া রহিল।

দ্বিজদাস নিজেও বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, সুধীর ত তোমার কাছে কোন দোষ করেনি, বন্দনা।

বন্দনা মুখ ফিরিয়া চাহিল না, শুধু বলিল, দোষের বিচার কিসের জন্যে বলুন ত? আমি কি তাঁর অপরাধের প্রতিশোধ নিতে বসেচি?

দ্বিজদাস একথার জবাব খুঁজিয়া পাইল না, বুঝিল প্রশ্নটা একেবারে নিরর্থক হইয়াছে। আবার কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া বলিল, কিন্তু সুধীর তোমাদের আপন সমাজের—অথচ শিক্ষায়, সংস্কারে, অভ্যাসে, আচরণে মুখুয্যেদের সঙ্গে তোমার কোথাও মিল হবে না। তবে কিসের জন্য এদের কারাগারে এসে চিরকালের জন্য তুমি ঢুকতে যাবে বন্দনা? আমার জন্যে? আজ হয়ত তুমি বুঝবে না, কিন্তু একদিন যদি এ ভুল ধরা পড়ে তখন পরিতাপের অবধি থাকবে না। আমাকে তুমি কিভাবে বুঝেচ জানিনে, কিন্তু বৌদি, মা, দাদা, আমাদের ঠাকুর, আমাদের অতিথিশালা, আমাদের আত্মীয়-স্বজন, আমি এঁদেরই একজন। আমাকে আলাদা করে ত তুমি কোনদিনই পাবে না। দীর্ঘকাল এ কি তোমার সইবে?

বন্দনা বলিল, না সইলে মানুষের মরার পথ ত চিরকাল খোলা থাকে দ্বিজুবাবু, কোন কয়েদখানাই ত বন্ধ করতে পারে না। কিন্তু আমাকেও আপনি কি বুঝেচেন জানিনে, কিন্তু আমার শাশুড়ী, আমার জা, আমার ভাশুর, আমাদের ঠাকুর, অতিথি-শালা, আমাদের আত্মীয়-স্বজন-সমাজ, এর থেকে আলাদা করে আমার স্বামীকে আমি একদিনও পেতে চাইনে। তিনি সকলের সঙ্গে এক হয়েই যেন আমার থাকেন।

দ্বিজদাস বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, এ-সব ধারণা ত তোমাদের নয়, এ তুমি কার কাছে শিখলে বন্দনা?

বন্দনা কহিল, কেউ আমাকে শেখায়নি দ্বিজুবাবু, কিন্তু মার কাছে থেকে, মুখুয্যে-মশাইকে দেখে এ-সব আমার আপনিই মনে হয়েচে। এ-বাড়িতে সকল ব্যাপারে সকলের বড় মা, তার পরে মুখুয্যেমশাই, তার পরে দিদি, তারপরে আপনি, এখানে অন্নদারও একটা বিশেষ স্থান আছে। এ-বাড়িতে জায়গা যদি কখনো পাই এঁদের ছোট হয়েই পাবো, কিন্তু সে আমার একটুও অসঙ্গত মনে হবে না।

শুনিয়া দ্বিজদাসের যেমন ভাল লাগিল তেমনি মন ব্যথায় ভরিয়া গেল। কিন্তু বন্দনার মনের কথা এমনি করিয়া জানিয়া লওয়া অন্যায়,—এ আলোচনা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। জোর করিয়া নিজেকে সে কঠিন করিয়া বলিল, কিন্তু মাকে আমাদের এই সব কথা জানিয়ে কোন লাভ নেই। তিনি তোমাকে মেয়ের মত ভালবাসেন এ আমি জানি, তাই তাঁর মনের একান্ত আশা ছিল তুমি হবে এ-বাড়ির ছোট বৌ, তোমাদের দুই বোনের হাতে তাঁর দুই ছেলেকে সঁপে দিয়ে যাবেন তিনি কৈলাসে, ফিরতে যদি আর না পারেন, সেই দুর্গম পথেই যদি আসে পরকালের ডাক, এই কথাটা মনে নিয়ে তখন নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে যাত্রা করতে পারবেন। তাঁর বৃহৎ সংসারের দায়িত্ব হস্তান্তরে আর কোন দিকে ফাঁক নেই। কিন্তু সে হবার আর জো নেই, তাঁর মতে বাক্‌দান মানেই সম্প্রদান। ভালোবেসে যাকে সম্মতি দিয়েচো সে-ই তোমার স্বামী। বিয়ের মন্ত্র পড়া হয়নি বলে তাঁকে ত্যাগ করতেও তুমি পার, কিন্তু সেই শূন্য আসন জুড়ে দয়াময়ীর ছেলে গিয়ে বসতে পারবে না।

শুনিয়া বেদনায় বন্দনার মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেল, জিজ্ঞাসা করিল, মা কি এইসব বলে গেছেন দ্বিজুবাবু?

দ্বিজদাস কহিল অন্ততঃ বলা অসম্ভব মনে করিনে বন্দনা। বৌদি বলছিলেন, মায়ের সবচেয়ে বেজেচে এই ব্যথাটা যে সুধীর আমাদের জাত নয়,—আসলে তোমরা জাত মানো না। এ এত বড় বিভেদ যে, কিছু দিয়েই এ ফাঁক ভরানো যাবে না।

আপনিও কি এই কথাই বলেন?

আমি ত তৃতীয় পক্ষ বন্দনা, আমার বলায় কি আসে যায়।

রায়সাহেবের আহারের সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছিল, বন্দনা উঠিয়া

দাঁড়াইল। বাহির হইবার পূর্ব্বে কহিল, বাবার ছুটি শেষ হয়েচে, কাল তিনি চলে যাবেন। আমিও তার সঙ্গে চলে যাবো দ্বিজুবাবু?

দ্বিজদাস কহিল, এ-ও কি আমার বলবার বন্দনা? যদি যাও আমাকে তুমি ভুল বুঝে যেও না। তুমি যাবার পরে তোমার হয়ে মাকে তোমার সমস্ত কথা জানাবো, লজ্জা করবো না। তারপরে রইল আজকের আমাদের সন্ধ্যাবেলাকার স্মৃতি, আর রইল আমাদের বন্দে মাতরমের মন্ত্র।

বন্দনা ইহার কোন উত্তর দিল না, নীরবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

১৫

নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া বন্দনার অত্যন্ত গ্লানি বোধ হইতে লাগিল। সে কি নেশা করিয়াছে যে, নির্লজ্জ উপযাচিকার ন্যায় আপন হৃদয় উদ্ঘাটিত করিয়া সমস্ত আত্ম-মর্য্যাদায় জলাঞ্জলি দিয়া আসিল? অথচ দ্বিজদাস পুরুষ হইয়াও যেমন রহস্যাবৃত ছিল তেমনি রহিল। তাহার মুখের ভাবে না ছিল অগ্রাহ্য, না ছিল উল্লাস, সে না দিল আশা, না দিল সান্ত্বনা। বরঞ্চ পরিহাসচ্ছলে এই কথাটাই বার বার করিয়া জানাইল যে সে তৃতীয় পক্ষ; তাহার ইচ্ছা-অনিচ্ছা এ-বাড়িতে অবান্তর বিষয়। শুধু কি এই? মার নাম করিয়া বলিল, বাক্‌দান মানেই সম্প্রদান, বলিল, নিরপরাধ সুধীরের শূন্য আসনে গিয়া দয়াময়ীর ছেলে বসিবে না। কিন্তু অপমানের পাত্র ইহাতেও পূর্ণ হইল না, তাহার চোখে জল দেখিয়া সে অবশেষে দয়ার্দ্র-চিত্তে মাত্র এইটুকু কথা দিয়াছে যে বন্দনার এই বেহায়া-পনার কাহিনী মায়ের কাছে সে উল্লেখ করিবে।

আবার এইখানেই কি শেষ? দ্বিজদাসের কথার উত্তরে সে যাচিয়া বলিয়াছিল, এই পরিবারে যেখানে যে-কেহ আছে, সকলের ছোট হইয়াই সে আসিতে চায়। আর সে ভাবিতে পারিল না, সেইখানে স্তব্ধভাবে বসিয়া তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, প্রকৃত সে অত্যন্ত ছোট হইয়া গেছে—এত ছোট যে আত্মঘাতী হইলেও এ হীনতার প্রায়শ্চিত্ত হয় না।

বাহির হইতে কে আসিয়া জানাইল রায়সাহেব তাহাকে ডাকিতেছেন। উঠিয়া সে পিতার ঘরে গেল, সেখানে তাহাকে বারংবার জিদ করিয়া সম্মত করাইল, কালই,—তাঁহাদের বোম্বায়ে রওনা হইতে হইবে। অথচ, কথা ছিল বিপ্রদাস ফিরিয়া আসিলে রাত্রের ট্রেনে তাঁহারা যাত্রা করিবেন। হঠাৎ এইভাবে চলিয়া যাওয়াটা যে ভালো

হইবে না ইহাতে সাহেবের সন্দেহ ছিল না—ছুটিও ছিল, স্বচ্ছন্দে থাকাও চলিত, তথাপি কন্যার প্রস্তাবে তাহাকে রাজী হইতে হইল।

বিছানায় শুইয়া বন্দনার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, তার পরে এক সময়ে সে ঘুমাইয়া পড়িল। সকালে উঠিয়া সে নিজের এবং বাপের জিনিস-পত্র সমস্ত গুছাইয়া ফেলিল, ফোন করিয়া গাড়ি রিজার্ভ করিল এবং বোম্বায়ে তার করিয়া দিল। সন্ধ্যায় ট্রেন, কিন্তু কিছুতেই যেন আর বিলম্ব সহে না।

বেলা তখন নটা বাজিয়াছে, অন্নদা ঘরে ঢুকিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল,—এ কি কাণ্ড?

বন্দনা ময়লা কাপড়গুলো ভাঁজ করিয়া একটা তোরঙ্গে তুলিতেছিল, কহিল, আজ, আমরা যাবো।

সে তো আজ নয় দিদিমণি। যাবার কথা যে কাল।

না, আজই যাওয়া হবে। এই কথা বলিয়া সে কাজ করিতে লাগিল, মুখ তুলিল না!

অন্নদা এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া বলিল, আপনি উঠুন আমি গুছিয়ে দিচ্ছি। আপনার কষ্ট হচ্ছে।

কষ্ট দেখবার দরকার নেই, নিজের কাজে যাও তুমি। এ-বাড়ির সমস্ত লোকের প্রতি যেন তাহার ঘৃণা ধরিয়া গেছে।

হেতু না জানিলেও একটা যে রাগারাগির পালা চলিতেছে অন্নদা সেটা জানিত। হঠাৎ মা কাল বাড়ি চলিয়া গেলেন, আজ বন্দনাও তেমনি হঠাৎ চলিয়া যাইতে উদ্যত। কিন্তু রাগের বদলে রাগ করা অন্নদার প্রকৃতি নয়, সে যেমন সহিষ্ণু তেমনি ভদ্র, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কুণ্ঠিতস্বরে কহিল, আমার দোষ হয়ে গেছে দিদিমণি, আজ সময়ে আমি উঠতে পারিনি।

বন্দনা মুখ তুলিয়া চাহিল, বলিল, আমি ত তার কৈফিয়ৎ চাইনি অন্নদা, দরকার হয় তোমার মনিবকে দিও। দ্বিজুবাবু তাঁর ঘরেই আছেন, তাঁকে বলোগে। এই বলিয়া সে পুনরায় কাজে মন দিল।

বন্দনাও পিতার একমাত্র সন্তান বলিয়া একটুখানি বেশী আদরেই প্রতিপালিত। সহ্য করার শক্তিটা তাহার কম। কিন্তু তাই বলিয়া কটু কথা বলার কুশিক্ষাও তাহার হয় নাই এবং হয়ত এত বড় কঠোর বাক্যও সে জীবনে কাহাকেও বলে নাই। তাই বলিয়া ফেলিয়াই সে মনে মনে লজ্জা বোধ করিতেছিল, এমনি সময়ে অন্নদাই সলজ্জ মৃদুকণ্ঠে কহিতে লাগিল, ডাক্তাররা চলে গেলেন, ফর্সা হয়েচে দেখে ভাবলুম আর শোবো না, শুইনিও, কিন্তু দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে বসতে কি করে চোখ জড়িয়ে এলো, কোথা, দিয়ে বেলা হয়ে গেল টের পেলুম না। মনিবের কথা বলচেন

দিদিমণি, কিন্তু আপনিও কি আমার মনিব ন'ন? বলুন ত, এ অপরাধ আর কখনও কি আমার হয়েছে? উঠুন আমি গুছিয়ে দিই।

শেষের দিকে কথাগুলো বোধ হয় বন্দনার কানে যায় নাই, অন্নদার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, ডাক্তার চলে গেলেন মানে?

অন্নদা কহিল, কাল রাত্তিরে দ্বিজুর ভারি অসুখ গেছে। এখানে এসে পর্য্যন্ত ওর শরীর খারাপ, কিন্তু গ্রাহ্য করে না। কাল মা'দের নিয়ে বাড়ি যাবার কথায় আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললে, মা যেন না জানতে পারেন, কিন্তু দাদাকে বলে আমার যাওয়াটি মাপ করে দাও অনুদিদি, আজ যেন আমি উঠতে পারচিনে এমনি দুর্ব্বল।

ওকে মানুষ করেছি, ওর সব কথা আমার সঙ্গে! ভয় পেয়ে বললুম, সেকি কথা! শরীর খারাপ ত লুকোচ্চো কেন? ওর স্বভাবই হ'লো হেসে উড়িয়ে দেওয়া, তা সে যত গুরুতরই হোক। তেমনি একটুখানি হেসে বললে, তুমি ওদের বিদেয় করো না দিদি, তার পরে আপনি চাঙ্গা হয়ে উঠবো। ভাবলুম, মার সঙ্গে ওর বনে না, কোথাও সঙ্গে যেতে চায় না, এ বুঝি তারই একটা ফন্দি। তাই কিছু আর বললুম না। বড়দাদাবাবু ওঁদের নিয়ে চলে গেলেন। তার পরে সমস্ত দিনটা ও শুয়ে কাটালে, কিছু খেলে না; দুপুরবেলা গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, দ্বিজু, কেমন আছ? বললে, ভাল আছি! কিন্তু ওর চেহারা দেখে তা মনে হলো না! ডাক্তার আনতে চাইলুম, দ্বিজু কিছুতে দিলে না, বললে, কেন মিছে দাদার অর্থদণ্ড করাবে দিদি, তোমার অপব্যয়ের কথা শুনলে গিন্নী রাগ করবেন। মায়ের উপর এ অভিমান ওর আর গেল না। সমস্ত দিন খেলে না, বিছানায় শুয়ে কাটালে, বিকেলে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, দ্বিজু, শরীর যদি সত্যই খারাপ নেই তবে সমস্ত দিন শুয়ে কাটাচ্ছোই বা কেন? ও তেমনি হেসে বললে, অনুদিদি, শাস্ত্রে লেখা আছে শুয়ে থাকার মত পুণ্য কাজ জগতে নেই, এতে কৈবল্য মেলে। একটু পারত্রিক মঙ্গলের চেষ্টায় আছি। তোমার ভয় নেই। সব তাতেই ওর তামাসা, কথায় পারবার জো নেই, রাগ করে চলে এলুম, কিন্তু ভয় ঘুচলো না। ও একখানা বই টেনে পড়তে শুরু কর দিলে!

অন্নদা একটু থামিয়া বলিতে লাগিল, রাত্রি বোধ করি তখন বারোটা, আমার দোরে ঘা পড়ল। কে রে? বাইরে থেকে জবাব এলো, অনুদিদি আমি। দোর খোলো। এত রাত্রে দ্বিজু ডাকে কেন, ব্যস্ত হয়ে দোর খুলে বেরিয়ে এলুম,—দ্বিজুর, এ কি মূর্ত্তি! চোখ কোটরে ঢুকেচে, গলা ভাঙা, শরীর কাঁপচে; কিন্তু তবু হাসি। বললে, দিদি, মানুষ করেছিলে তাই তোমার ঘুম ভাঙালুম। যদি চোখ বুজতেই হয় তোমার কোলেই মাথা রেখে বুজবো। এই বলিয়া অন্নদা ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার কান্না যেন থামিতে চাহে না এমনি ভিতরের অদম্য আবেশ। আপনাকে সামলাইতে তাহার অনেকক্ষন লাগিল, তারপরে কহিল, বুকে করে তাকে ঘরে

নিয়ে গেলুম, কিন্তু যেমন কাঠ বমি তেমনি পেটের যন্ত্রণা—মনে হ'লো রাত বুঝি আর পোহাবে না, কখন নিশ্বাসটুকু বা বন্ধ হয়ে যায়। ডাক্তারদের খবর দেওয়া হ'লো, তাঁরা সব এসে পড়লেন, ফুঁড়ে ওষুধ দিলেন, গরম জলের তাপ সেক চলতে লাগলো—চাকররা সব জেগে বসে—ভোরবেলায় দ্বিজু ঘুমিয়ে পড়লে। ডাক্তাররা বললে আর ভয় নেই'। কিন্তু কিভাবে যে রাতটা কেটেচে দিদিমণি, ভাবলে মনে হয় বুঝি দুঃস্বপ্ন দেখেচি—ওসব কিছুই হয়নি! এই বলিয়া অন্নদা আবার আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিল।

বন্দনা আস্তে আস্তে বলিল, আমি কিছুই জানতে পারিনি, আমাকে তুললে না কেন অন্নদা?

অন্নদা কহিল, সকালে ঐ একটা অশান্তি গেলো, আর তোমাকে ব্যস্ত করলুম না দিদিমণি। নইলে দ্বিজু বলেছিল।

বন্দনা এ প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দিল, কহিল, দ্বিজুবাবু এখন কেমন আছেন?

অন্নদা কহিল, ভালো আছে, ঘুমুচ্চে। ডাক্তাররা বলে গেছেন হয়ত সন্ধ্যার আগে আর ঘুম ভাঙবে না। বড়বাবু এসে পড়লে বাঁচি দিদি।

তাঁকে কি খবর দেওয়া হয়েচে?

না। দত্তমশাই বললেন তার আবশ্যক নেই, তিনি আপনিই আসবেন।

ও ঘরে লোক আছে ত?

হাঁ দিদিমণি, দু'জন বসে আছে।

ডাক্তার আবার কখন আসবেন।

সন্ধ্যার আগেই আসবেন। বলে গেছেন আর ভয় নেই।

চিকিৎসকেরা অভয় দিয়ে গেছেন বন্দনার এইটুকু সান্ত্বনা। এছাড়া তাহার কি-ই বা করিবার আছে।

বন্দনা গিয়া পিতাকে দ্বিজদাসের পীড়ার সংবাদ দিল, কিন্তু বেশি বলিল না!

তিনি সেইটুকু শুনিয়াই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন—কৈ আমি ত কিছুই জানতে পারিনি!

না, আমাদের ঘুম ভাঙানো কেউ উচিত মনে করেনি।

কিন্তু সেটা ত ভালো হয়নি!

বন্দনা চুপ করিয়া রহিল, তিনি ক্ষণেক পরে বলিলেন, টিকিট কিনতে পাঠান হয়েচে, গাড়ি রিজার্ভ হয়ে গেছে, আমাদের যাওয়ায় ত দেখচি একটু বিঘ্ন ঘটল।

বন্দনা বলিল, কেন বিঘ্ন হবে বাবা, আমরা থেকেই বা তাঁদের কি উপকার করবো.?

না, উপকার নয়, কিন্তু তবু—

না বাবা, এমনি করে কেবলই দেরি হয়ে যাচ্চে, তুমি মত বদলো না। এই বলিয়া বন্দনা বাহির হইয়া আসিল।

বেলা পড়িয়া আসিতেছে, বন্দনার ঘরে ঢুকিয়া অন্নদা মেঝের উপর বসিল। তাঁহাদের যাত্রা করিতে তখনও ঘণ্টা-দুয়েক দেরি। বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, দ্বিজুবাবু ভাল আছে?

হাঁ দিদি, ভাল আছে, ঘুমুচ্চে।

বন্দনা কহিল, আমাদের যাবার সময়ে কারও সঙ্গে দেখা হলো না। একজনের তখনো হয়ত ঘুম ভাঙবে না, আর একজন যখন বাড়ি এসে পৌছাবেন তখন আমরা অনেক দূরে চলে গেছি!

অন্নদা সায় দিয়া বলিল, হাঁ, বড়দাদাবাবু আসবেন প্রায় ন'টা রাত্তিরে। একটু পরে কহিল, তিনি এসে পড়লে সবাই বাঁচি। সকলের ভয় ঘোচে।

কিন্তু ভয় ত কিছু নেই অন্নদা!

অন্নদা বলিল, নেই সত্যি, কিন্তু বড়দাদাবাবুর বাড়িতে থাকাই আলাদা জিনিস দিদি। তখন কারও আর কোন দায়িত্ব নেই, সব তাঁর। যেমন বুদ্ধি, তেমনি বিবেচনা, তেমনি সাহস, আর তেমনি গাম্ভীর্য্য। সকলের মনে হয় যেন বটগাছের ছায়ায় বসে আছি।

সেই পুরাতন কথা, সেই বিশেষণের ঘটা! মনিবের সম্বন্ধে এ যেন ইহাদের মজ্জাগত হইয়াছে। অন্য সময় হইলে বন্দনা খোঁটা দিতে ছাড়িত না, কিন্তু এখন চুপ করিয়া রহিল।

অন্নদা বলিতে লাগিল, আর এই দ্বিজু! দুই ভায়ে যেন পৃথিবীর এ-পিঠ ও-পিঠ!

বন্দনা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, কেন?

অন্নদা বলিল, তা বইকি দিদি। না আছে দায়িত্ব-বোধ, না আছে ঝঞ্ঝাট, না আছে গাম্ভীর্য্য। বৌদি বলেন, ও হচ্চে শরতের মেঘ, না আছে বিদ্যুত, না আছে জল। উড়ে উড়ে বেড়ায়, ব্যাপার যত গুরুতর হোক হেসে-খেলে ও কাটাবেই কাটাবে। না গৃহী না বৈরাগী, কত খাতক যে ওর কাছে 'বুঝিয়া পাইলাম' লিখিয়ে নিয়ে পরিত্রাণ পেয়েচে তার হিসেব নেই।

বন্দনা কহিল, মুখুয্যেমশাই রাগ করেন না?

করেন না! খুব করেন। বিশেষ মা। কিন্তু ওকে পাওয়া যাবে কোথায়? কিছুদিনের মতো এমন নিরুদ্দেশ হয় যে বৌদি কান্নাকাটি শুরু করে দেন, তখন সবাই

মিলে খুঁজে ধরে আনে। কিন্তু এমন করেও ত চিরদিন কাটতে পারে না দিদি, ওরও বিয়ে দিতে হবে, ছেলে-পুলে হবে, তখন যে এ অবস্থায় দেউলে হতে হবে!

বন্দনা কহিল, একথা তোমরা ওকে বলো না কেন?

অন্নদা কহিল, ঢের বলা হয়েচে, কিন্তু ও কান দেয় না। বলে, তোমাদের ভাবনা কেন? দেউলেই যদি হই বৌদিদি ত আর দেউলে হবে না, তখন সকলে মিলে ওঁর ঘাড়ে গিয়ে চাপবো।

বন্দনা হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল, মেজদি কি বলেন?

অন্নদা কহিল, দেওরের উপর তাঁর আদরের শেষ নেই। বলেন, আমরা খাবো আর দ্বিজু উপোস করবে নাকি? আমার পাঁচশো টাকা তো আর কেউ ঘুচোতে পারবে না, আমাদের গরিবী-চালে তাতেই চলে যাবে। বড়বাবু তাঁর লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে সুখে থাকুন আমরা চাইতে যাবো না।

শুনিয়া বন্দনার কি যে ভালো লাগিল তাহার সীমা নাই। যে বলিয়াছে সে তাহারই বোন! অথচ যে সমাজে যে আবহাওয়ার মধ্যে সে নিজে মানুষ সেখানে এ কথা কেহ বলে না, হয়ত ভাবিতেও পারে না। বলার কখনো প্রয়োজন হয় কি না তাই বা কে জানে।

কিন্তু অন্নদা যাহা বলিতেছিল সে যেন পুরাকালের একটা গল্প। ইহারা একান্নবর্ত্তী পরিবার কেবল বাহিরের আকৃতিতে নয়, ভিতরের প্রকৃতিতে। অন্নদা এখানে শুধু দাসী নয়, দ্বিজদাসের সে দিদি। কেবল মৌখিক নয়, আজও সকল কথা তাহার ইহারই কাছে। এই অন্নদার বাবা এই পরিবারের কর্ম্মে গত হইয়াছে, তাহার ছেলে এখানে মানুষ হইয়া এখানেই কাজ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে। অন্নদার অভাব নাই, তবু মায়া কাটাইয়া তাহার যাইবার জো নাই। এই সমৃদ্ধ বৃহৎ পরিবারে অনুবিদ্ধ এমন কতজনের পুরুষানুক্রমের ইতিহাস মিলে। দয়াময়ীর অবাধ্য সন্তান দ্বিজদাসও কাল বলিয়াছিল, তাহার মা, দাদা, বৌদি, তাহাদের গৃহদেবতা, অতিথিশালা সমস্ত লইয়াই সে,—তাহাদের হইতে পৃথক করিয়া বন্দনার কোনদিন তাহাকে পাইবার সম্ভাবনা নাই। তখন বন্দনা অস্বীকার করে নাই বটে, তবু আজই এ কথার যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিল।

কথা শেষ হয় নাই, অনেক কিছু জানিবার আগ্রহ তাহার প্রবল হইয়া উঠিল, কিন্তু বাধা পড়িল। চাকর আসিয়া জানাইল রায়সাহেব ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, ছ'টা বাজিয়াছে। যাত্রা করিবার সময় একঘণ্টার বেশি নাই। প্রস্তুত হইবার জন্য বন্দনাকে উঠিতে হইল।

যথাসময়ে রায়সাহেব নীচে নামিলেন, নামিতে নামিতে মেয়ের নাম ধরিয়া একটা হাঁক দিলেন, বন্দনার কানে আসিয়া তাহা পৌঁছিল। অন্যায় যত বড় হোক, অনিচ্ছা

যত কঠিন হোক যাইতেই হইবে। বারংবার জিদ করিয়া যে ব্যবস্থা নিজে ঘটাইয়াছে তাহার পরিবর্ত্তন চলিবে না। ঘর হইতে যখন বাহির হইল এই কথাই সর্ব্বাগ্রে মনে হইল, ভবিষ্যতে যতদূর দৃষ্টি যায় কোনদিন কোন ছলেই এখানে ফিরিয়া আসার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু তাহার অনেক সুখের স্বপ্ন দিয়া এই ঘরখানি যে পূর্ণ হইয়া রহিল তাহা কোনকালে ভুলিতে পারিবে না। সোজা পথ ছাড়িয়া দ্বিজদাসের পাশের বারান্দা ঘুরিয়া নামিবার সময়ে সে ঘরের মধ্যে একবার চোখ ফিরাইল। কিন্তু যে জানালাটা খোলা ছিল তাহা দিয়া দ্বিজদাসকে দেখা গেল না।

মোটরের কাছে দাঁড়াইয়া দত্তমশাই, রায়সাহেব তাঁহাকে ডাকিয়া ভৃত্যদের দিবার জন্য অনেকগুলো টাকা হাতে দিলেন এবং হঠাৎ যাবার জন্য অনেক দুঃখ প্রকাশ করিয়া দ্বিজদাসের খবরটা তাঁহাকে অতি শীঘ্র জানাইবার অনুরোধ করিলেন।

গাড়িতে উঠিবার পূর্ব্বে বন্দনা অন্নদাকে একপাশে ডাকিয়া লইয়া বলিল, দ্বিজুবাবুর তুমি দিদি,—তাঁকে মানুষ করেচ—এই আংটিটি তোমার বৌমাকে দিও অনুদিদি সে যেন পরে, এই বলিয়া হাতের আংটি খুলিয়া তাহার হাতে দিয়াই বাবার পাশে গিয়া বসিল।

মোটর ছাড়িয়া দিল। এখানে-ওখানে দাঁড়াইয়া কয়েকজন ভৃত্য ও দত্তমশাই নমস্কার করিল।

বন্দনা নিজের অজ্ঞাতসারেই উপরে চোখ তুলিল, কিন্তু আজ সেখানে আর এক-দিনের মত সকলের অগোচরে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে সংকেত বিদায় দিতে দ্বিজদাস দাঁড়াইয়া নাই। আজ সে পীড়িত,—আজ সে নিদ্রায় অচেতন।

১৬

দয়াময়ীর আচরণে বন্দনার প্রতি যে প্রচ্ছন্ন লাঞ্ছনা ও অব্যক্ত গঞ্জনা ছিল সতীকে তাহা গভীরভাবে বিঁধিয়াছিল। কিন্তু শাশুড়ীকে কিছু বলা সহজ নয়, তাই সে একখানি চিঠি লিখিয়া বোনের হাতে দিবার জন্য স্বামীকে ঘরে ডাকিয়া পাঠাইল। দুপুরের ট্রেনে বিপ্রদাস কলকাতায় ফিরিবে। এমন সময় দয়াময়ী আসিয়া প্রবেশ করিলেন। এরূপ তিনি কখনো করেন না—ছেলে এবং বৌ উভয়েই বিস্মিত হইল—সতী মাথায় আঁচল টানিয়া দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, শাশুড়ী নিষেধ করিলেন, না বৌমা, যেও না। তোমার অসাক্ষাতে তোমার বোনের নিন্দে করবো না, একটু দাঁড়াও। বিপিন, জানিস্ তুই, কেন এত ব্যস্ত হয়ে আমি বাড়ি চলে এলুম ?

বিপ্রদাস বলিল, ঠিক জানিনে মা, কিন্তু কোথায় কি-একটা গোলযোগ ঘটেচে এইটুকুই আন্দাজ করেচি।

মা কহিলেন, গোলযোগ ঘটেনি কিন্তু ঘটতে পারত। এর থেকে মা দুর্গা আমাকে রক্ষে করেচেন। কাল বেহাই-মশাই বোম্বাই চলে যাবেন, কথা ছিল তার পরে বন্দনা এসে কিছুদিন থাকবে মেজদিদির কাছে। কিন্তু মেয়েটার মাথায় যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে ত এখানে সে আর আসতে চাইবে না, বাপের সঙ্গে সোজা বোম্বায়ে চলে যাবে। যদি না যায় যেতে বলে দিস্। বৌমা, মনে কিছু দুঃখ ক'রো না মা, অমন বোনকে বনবাসে দেওয়া চলে, কিন্তু ঘরে এনে তোলা চলে না।

বিপ্রদাস নিরুত্তরে চাহিয়া রহিল, তাহার বিস্ময়ের অবধি নাই। দয়াময়ী বলিতে লাগিলেন, আমার পোড়াকপাল যে ওকে ভালবাসতে গিয়েছিলুম, মনে করেছিলুম ও আমাদেরই একজন। ওর চাল-চলনে গলদ আছে,—ভেবেছিলুম, সে-সব ইস্কুলে-কলেজে পড়ার ফল,—চাঁদের গায়ে উড়ো মেঘের মত, বাতাস লাগলে উড়ে যাবে—থাকবে না। হাজার হোক সতীর বোন তো বটে? কিন্তু ও বর বেছে নিলে কায়েতের ঘর থেকে, কে জানত বিপিন, বামুনের বংশে জন্মে ওরা এত অধঃপাতে গেছে।

বিপ্রদাস কহিল,—ও এই কথা। কিন্তু ওরা যে জাত মানে না এ খবর তুমি ত শুনেছিলে মা?

দয়াময়ী বলিলেন, শুনেছিলুম, কিন্তু চোখে দেখিনি, বোধ হয় মনে বুঝতেও পারিনি। রূপকথার গল্পের মতো। কিন্তু চোখে দেখলে যে কারো 'পরে কারো এত বেতেষ্টা জন্মায় তা সত্যিই জানতুম না বাবা। বলিতে বলিতে ঘৃণায় যেন তিনি শিহরিয়া উঠিলেন, কহিলেন, মরুকগে। যা ইচ্ছে হয় করুক, কে আর আমার ও—কিন্তু আমার বাড়িতে আর না।

বিপ্রদাস চুপ করিয়া আছে দেখিয়া বলিলেন, কই জবাব দিলিনে যে বিপিন?

জবাব ত তুমি চাওনি মা! হুকুম দিলে বন্দনা যেন না আসে,—তাই হবে।

তাহার কথা শুনিয়া দয়াময়ী দ্বিধায় পড়িলেন, হুকুমটা কি অন্যায় দিচ্ছি তোর মনে হয়?

হয় বই কি মা। বন্দনা অন্যায় কিছু করেনি, সামাজিক আচার-ব্যবহারে আমাদের সঙ্গে তাদের মেলে না, তারা জাত মানে না, একথা জেনেই তাকে তুমি আসার আহ্বান করেছিলে, ভালোও বেসেছিলে। তোমার মনে হয়ত আশা ছিল তারা মুখেই বলে কাজে করে না,—এইখানেই তোমার হয়েচে ভুল, আঘাতও পেয়েচো এই জন্যে।

দয়াময়ী বলিলেন, সে হয়ত সত্যি, কিন্তু ওর বিয়ের ব্যাপারটা শুনলে তোরই কি ঘেন্না হয় না বিপিন? তুই বলিস্ কি বল্ তো!

বিপ্রদাস স্মিতমুখে কহিল, তার বিয়ে এখনো হয়নি, কিন্তু হলেও আমার রাগ করা উচিত নয় মা। বরঞ্চ এই ভেবে শ্রদ্ধাই করবো যে ওদের বিশ্বাস সত্য কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেলে, ওরা ঠকালে না কাউকে। কিন্তু কলকাতায় অনেককে দেখেচি যারা বাক্যের আড়ম্বরে মানে না কিছুই, জাতি-ভেদ বিশ্বাসও করে না, গালও দেয় প্রচুর, কিন্তু কাজের বেলাতেই গা-ঢাকা দেয়,—আর তাদের খুঁজে মেলে না। তাদেরই অশ্রদ্ধা করি আমি সবচেয়ে বেশি। রাগ ক'রো না মা, তোমার দ্বিজুটি হ'লো এই জাতের।

শুনিয়া দয়াময়ী মনে মনে যে অখুশী হইলেন তা নয়। দ্বিজুর সম্বন্ধে বলিলেন, ওটা ঐ রকম ফাঁকিবাজ। কিন্তু, আচ্ছা বিপিন, বন্দনাকে যদি তুই ঘৃণাই করিসনে তবে তার ছোঁয়া কিছু খাস্‌নে কেন? ওকে রান্নাঘরে পাঠাতুম বলে তুই সে-ঘরে খাওয়াই ছেড়ে দিলি, খেতে লাগলি আমার ঘরে। আর কেউ না বুঝুক, আমিও বুঝতে পারিনি ভাবিস?

বিপ্রদাস বলিল, তুমি বুঝবে না ত মা হয়েছিলে কেন। কিন্তু আমি যে সত্যি জাত মানি মা, আমি ত তার ছোঁয়া খেতে পারিনে। যেদিন মানবো না সেদিন প্রকাশ্যেই তার হাতে খাবো, একটুও লুকোচুরি করবো না।

দয়াময়ী বলিলেন, তুই জানিস্‌নে বিপিন, কি করে আমি তার কাছ থেকে এইটি ঢেকে বেড়াতুম। মেয়েটা এখানে আসুক না আসুক, দেখিস্ যেন একথা কখনো সে টের না পায়। তার ভারি লাগবে। তোকে সে বড় ভক্তি করে। তাঁহার শেষের কথাগুলি যেন সহসা স্নেহরসে আর্দ্র হইয়া উঠিল।

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, আমাকে সে ভক্তি করে কি না জানিনে মা, কিন্তু তার ছোঁয়া যে খাইনে এ সে জানে।

অমন অভিমানী মেয়ে এ জেনেও তোকে অত ভক্তি করতো? তার মানে?

ভক্তি করার কথা তোমরাই জানো মা, কিন্তু আমি জানি সে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী —তোমাদের সমস্ত ঢাকা-ঢাকিই সেখানে নিষ্ফল হয়েচে।

দয়াময়ী ক্ষণকাল নীরবে কি ভাবিলেন, তার পরে বলিলেন, তাই বুঝি সে অতো করে পীড়াপীড়ি করতো?

কিসের পীড়াপীড়ি মা?

দয়াময়ী বলিতে লাগিলেন, আমি বিধবা মানুষ, আমার ভাতে-ভাত হলেই চলে, কিন্তু সে তা কিছুতেই দেবে না। মার্কেট থেকে নানা নতুন তরকারী আনবে, নিজে কুটে-বেছে দেবে, বামুনপিসিকে দিয়ে দশখানা তরকারী জোর করে রাঁধিয়ে

নিয়ে তবে ছাড়বে। ও জানতো সামনে এসে যার দেওয়া চলে না তাকে পরের হাত দিয়ে ঘুষ পাঠাতে হয়। কেন, খেয়েও কি বুঝতে পারিসনি বিপিন, অমন রান্না পিসি তার বাপের জন্মেও রাঁধতে জানে না?

বিপ্রদাস সহাস্যে উত্তর দিল, না মা, অত লক্ষ্য করিনি। শুধু মাঝে মাঝে সন্দেহ হ'তো তোমার অতিথিদের সে-রান্নাঘরের বিপুল আয়োজনের টুকরা-টাকরা হয়ত আমাদের এ-রান্নাঘরেও ছিটকে এসে পড়েচে। কিন্তু সে যে দৈবকৃত নয় একজনের ইচ্ছাকৃত এ খবর আনন্দের। কিন্তু তোমার শেষ আদেশ জানিয়ে দাও মা। ট্রেনের সময় হয়ে এলো, আমাকে এখনি ছুটতে হবে,—তার নিমন্ত্রণ তুমি রাখলে না প্রত্যাহার করলে তাই বলো।

দয়াময়ী সতীকে উদ্দেশ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি বলো বৌমা?

ছেলেবেলায় সতী শাশুড়ীর সম্মুখে স্বামীর সহিত কথা কহিত, কিন্তু এখন আর বলে না। প্রায়ই পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায়, নয় নিরুত্তরে থাকে। কিন্তু আজ কথা কহিল, আস্তে আস্তে বলিল, থাকগে মা, এখানে তার আর এসে কাজ নেই।

জবাব শুনিয়া শাশুড়ী খুশী হইতে পারিলেন না। তাঁহার অভিলাষ ছিল অন্য প্রকার, অথচ নিজের মুখে প্রকাশ করাও চলে না। বলিলেন, বড় মানুষের মেয়ের অভিমান হলো বুঝি?

না মা, অভিমান নয়, কিন্তু যা করে আমরা চলে এসেচি তার পরে আর তাকে এখানে ডাকা চলে না।

কেন চলবে না বৌমা, একটা অন্যায় যদি হয়েই থাকে তার কি আর সংশোধন নেই?

নেই বলিনে, কিন্তু দরকার কি। আগেও অনেকবার সে আসতে চেয়েচে, কিন্তু কখনো আমরা রাজি হতে পারিনি, এখনো সমস্ত বাধা তেমনি আছে। সে ঢুকতো বলে উনি রান্নাঘরের সম্পর্ক ছেড়েছিলেন, কাজ কি তাকে এখানে এনে?

বিপ্রদাস কহিল, সে নালিশ তার, তোমার নয়। বলিয়াই হাসিয়া ফেলিল, কহিল, তবু বন্দনা আমাকে প্রচণ্ড ভক্তি করে, স্বয়ং মা তার সাক্ষী।

সতী মুখ তুলিয়া চাহিল, বোধ হয় হঠাৎ ভুলিয়া গেল, শাশুড়ী আছেন, বলিল, শুধু মা কেন আমিও তার সাক্ষী। মেয়েরা ভক্তি যখন করে তখন নালিশ আর করে না। দেব-দেবতাও কম পীড়ন করেন না, তবু পূজো বন্ধ না করে বলে দুঃখ দিয়েচেন তিনি ভালোর জন্যই। শাশুড়ীকে বলিল, তোমাকেও বন্দনা কম ভক্তি করেনি মা, কম ভালোবাসেনি। তোমার ধারণা তোমার ঘরে সে খাবার আয়োজন করে দিত কেবল ওঁর জন্যে? তা নয়, করত সে তোমাদের দু'জনের জন্যেই,—তোমাদের দু'জনকেই ভালোবাসে। তার 'পরে দিয়েছিলে তুমি রান্নাঘরের ভার—সকলকে খেতে দেবার

কাজ, কিন্তু তোমাকে অবহেলা করে সে আর সকলকে পোলাও-কালিয়া খাওয়াতে পারত না মা, ভাতে-ভাত সবাইকে গিলতে হ'তো। কিন্তু আর কেন তাকে টানাটানি করা? আমরা যা চেয়েছিলুম সে আশা ঘুচেচে—আর সে ফিরবে না মা। এই বলিয়া সতী দ্রুত প্রস্থান করিল।

দারুণ বিস্ময়ে উভয়েই হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। সতীর স্বভাবে এরূপ উক্তি, এরূপ আচরণ এমনি সৃষ্টিছাড়া যে ভাবাই যায় না সে প্রকৃতিস্থ আছে। বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করিল, কি ব্যাপার মা?

দয়াময়ী কহিলেন, জানিনে ত বাবা!

কিসের জন্যে বন্দনাকে তোমরা চেয়েছিলে মা? কিসের আশা ঘুচলো?

দয়াময়ী মনে মনে লজ্জায় মরিয়া গেলেন, কিছুতে মুখে আনিতে পারিলেন না কি তাঁর সঙ্কল্প ছিল। শুধু বলিলেন, সে-সব কথা আর একদিন হবে বিপিন, আজ না!

মা, অক্ষয়বাবুর মেয়ের সম্বন্ধে কি কিছু স্থির করলে? তাঁদের ত একটা জবাব দেওয়া চাই।

আমার আপত্তি নেই বিপিন, তোদের মত হলেই হবে। দ্বিজুকেও জিজ্ঞাসা করিস্ সে কি বলে। এই বলিয়া তিনিও ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। বিপ্রদাস সংশয়ে পড়িল। স্পষ্ট বিশেষ হইল না, কিন্তু স্পষ্ট করিয়া লইবারও সময় আর ছিল না।

বিপ্রদাস কলিকাতায় আসিয়া দেখিল বাড়ি খালি। বন্দনা ও তাহার পিতা ঘণ্টা-কয়েক পূর্ব্বে চলিয়া গেছেন। এ সংশয় যে তাহার একেবারে ছিল না তা নয়, কিন্তু এতটাও আশঙ্কা করে নাই। অন্নদা কারণ জানে না, শুধু এইটুকু জানে যে যাবার ইচ্ছা রায়সাহেবের তেমন ছিল না, কেবল কন্যাই জিদ করিয়া পিতাকে টানিয়া লইয়া গেছে। বন্দনার 'পরে দাবী কিছুই নাই, থাকার দায়িত্বও তাহার নয়, এখানে সে অতিথি মাত্র, তবু সে যে দেখা না করিয়া পীড়িত দ্বিজদাসকে অচেতন ফেলিয়া রাখিয়া অকারণ ব্যস্ততায় চলিয়া গেছে মনে করিতে তাহার ক্লেশ বোধ হইল। অনেকটা রাগের মতো—নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর বলিয়া যেন শাস্তি দিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু প্রকাশ করা তাহার প্রকৃতি নয়, সে-ভাব তাহার মনের মধ্যেই রহিয়া গেল।

দিন-চারেক পরে বিপ্রদাস হাইকোর্ট হইতে ফিরিল প্রবল জ্বর লইয়া। হয়ত ম্যালেরিয়া, হয়ত বা আর কিছু। চোখ রাঙা, মাথার যন্ত্রণা অত্যন্ত বেশি, অন্নদা কাছে আসিলে বলিল, অনুদি, অসুখ ত কখন হয় না, বহুকাল জরাসুর দৈত্যটাকে ফাঁকি দিয়ে এসেচি, এবার বুঝিবা সে সুদে-আসলে উসুল করে। মনে হচ্চে কিছু ভোগাবে, সহজে নিষ্কৃতি দেবে না।

অবস্থা দেখিয়া অন্নদা চিন্তিত হইল, কিন্তু নির্ভয়ের সুরে সাহস দিয়া বলিল, না দাদা, তোমার পুণ্যের দেহ, এতে দৈত্য-দানার বিক্রম চলবে না, তুমি দু'দিনেই ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়ে দিই—আমি তাচ্ছিল্য করতে পারবো না।

তাই দাও দিদি, বলিয়া বিপ্রদাস শয্যা গ্রহণ করিল।

অন্নদা বিপদে পড়িল। ওদিকে হঠাৎ বাসুদেবের অসুখের সংবাদে কাল দ্বিজদাস বাড়ি গেছে, দত্তমশাই সহরে নাই—মনিবের কাজে তিনিও ঢাকায়। একাকী কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়া সকালে আসিয়া বলিল, বিপিন, একটা কথা বলব ভাই রাগ করবে না ত?

তোমার কথায় কখনো রাগ করেচি অনুদি?

অন্নদা পাশে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, প্রাণ দিয়ে রোগের সেবা করতেই পারি, কিন্তু মুখ্যু মেয়েমানুষ জানিনে ত কিছু, বাড়িতেও খবর পাঠাতে পারচিনে, ছেলের অসুখ—ফেলে রেখে বৌ আসবে কি করে—কিন্তু বন্দনাদিদিকে একটা খবর দিলে হয় না?

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, বোম্বাই কি এ-পাড়া ও-পাড়া দিদি, যে, খবর পেয়ে সে দেখতে আসবে। হয়ত তার নুন আনতেই এদিকের পান্তা ফুরিয়ে যাবে। তাতে কাজ নেই।

অন্নদা জিভ কাটিয়া বলিল, বালাই ষাট, এমন কথা মুখে আনতে নেই ভাই। বন্দনাদিদি কলকাতায় আছে, এখনো তার বোম্বায়ে যাওয়া হয়নি।

বন্দনা কলকাতায় আছে?

হাঁ, তার মাসীর বাড়ীতে বালিগঞ্জে। মেসো পাঞ্জাবের বড় ডাক্তার, মেয়ের বিয়ে দিতে দেশে এসেচেন। হঠাৎ হাওড়ার ইষ্টিশানে দেখা, তাঁরাও নাবচেন গাড়ি থেকে, এঁরাও যাচ্চেন বোম্বায়ে। মাসী জোর করে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে এলেন, বললেন, দৈবাৎ যখন পাওয়া গেল তখন মেয়ের বিয়ে না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি কিছুতে ছেড়ে দেবেন না। শুধু একদিন আটকে রেখে ওর বাপকে তারা যেতে দিলে।

বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করিল, মাসীটি কি চেনা?

হ্যাঁ, আপনার বড় মাসী। দূরে-দূরে থাকে। সর্ব্বদা দেখা-শুনা হয় না, সত্যি, কিন্তু আপনার লোক বটে।

তুমি এত কথা জানলে কি করে অনুদি?

কাল এসেছিলেন তাঁরা বেড়াতে, দ্বিজুর খবর নিতে। দুপুরবেলায় ওপরের বারান্দায় বসে নাতির জন্যে কাঁথা সেলাই করচি, দেখি বাইরের উঠানে দু-গাড়ি লোক এসে উপস্থিত। মেয়ে-পুরুষে অনেকগুলি। কে এঁরা? উঁকি মেরে দেখি

আমাদের বন্দনাদিদি। কিন্তু সাজ-সজ্জায় এমনি বদ্‌লেচে যে হঠাৎ চেনা যায় না, যেন সে মেয়ে নয়। কি করি, কোথায় বসাই,—ব্যস্ত হয়ে উঠলুম। খানিকপরে দিদি এলেন ওপরে, সকলের খবর নিলেন, খবর দিলেন—তাঁর নিজের মুখেই শুনতে পেলুম অন্ততঃ মাসখানেক কলকাতায় থাকা হবে। বললেন, বেশ আছি। থিয়েটার, সিনেমা, চড়িভাতী, বাগান-বাড়ি—আমাদের শেষ নেই। নিত্য নতুন ঘটা।

বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করিল, বাসুর অসুখের খবর তাকে দিয়েছিলে?

হ্যাঁ, দিলুম বই কি। শুনে বললেন, ও কিছু না,—সেরে যাবে।

বিপ্রদাস ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিল, তাকে খবর দিয়ে কি হবে অন্নদি, আমিও সেরে যাবো। সে ক'টা দিন তুমি একলা পারবে না আমাকে দেখতে?

অন্নদা জোর করিয়া কহিল, পারবো বই কি ভাই, কিন্তু তবু মনে হয়, একবার জানানো উচিত, নইলে বউ হয়ত দুঃখ করবে। হাজার হোক বোন ত।

ঠিকানা জানো?

আমাদের শোফার জানে। ওদের পৌঁছে দিয়ে এসেছিল।

বিপ্রদাস অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আচ্ছা, দাও একটা খবর। কিন্তু অতো আমোদ-আহ্লাদ ছেড়ে কি সে আসতে পারে? মনে ত হয় না দিদি।

অন্নদা বলিল, মনে আমারও বড়ো হয় না ভাই। তার সাজ-গোজের কথাই কেবল চোখে পড়ে। তবুও একবার বলে পাঠাই।

বিপ্রদাস নিরুৎসুক ক্লান্ত-কণ্ঠে শুধু বলিল, পাঠাও দিদি; তাই যখন তোমার ইচ্ছে।

১৭

হঠাৎ বড় মাসীর সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে বন্দনার যখন দেখা হইয়া গেল তখন বোম্বায় যাওয়া বন্ধ করিয়া তাহাকে বাড়ি ফিরাইয়া আনা মাসীর কষ্টসাধ্য হইল না। তিনি মেয়ের বিবাহ-উপলক্ষে স্বামীর কর্ম্মস্থল উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে দেশে আসিতেছিলেন। মাসীর প্রস্তাবে রাজি হওয়ার আসল কারণটা ছাড়া আরও একটা হেতু ছিল, এখানে তাহা প্রকাশ করা প্রয়োজন। বন্দনার ছেলেবেলা হইতে এতকাল সুদূর প্রবাসেই দিন কাটিয়াছে, তার শিক্ষা-দীক্ষা সমস্তই সে-দিকের, অথচ, যে সমাজের অন্তর্গত সে, তাহার বৃহত্তর অংশটাই আছে কলিকাতায়, ইহার সহিত

আজও তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় নাই। সামান্য পরিচয় যেটুকু সে শুধু খবরের কাগজ, মাসিকপত্র ও সাধারণ সাহিত্যের গল্প-উপন্যাসের সহযোগে। কলিকাতায় সর্ব্বদা আনাগোনা যাহাদের, তাহাদের মুখে মুখে অনেক তথ্য মাঝে মাঝে তাহার কানে আসে—অ্যানিটা চ্যাটার্জি এম. এ. বিনীতা ব্যানার্জি বি. এ. অনসূয়া, চিত্রলেখা, প্রিয়ম্বদা প্রভৃতি বহু জমকালো নাম ও চমকানো কাহিনী—বিংশ শতাব্দের অত্যাধুনিক মনোভাব ও রোমাঞ্চকর জীবন-যাত্রার বিবরণ—কিন্তু ইহার কতটা যে যথার্থ ও কতটা বানানো দূর হইতে নিঃসংশয়ে অনুমান করা ছিল তাহার পক্ষে কঠিন। তাই আপন সমাজের কোন চিত্রটা ছিল তাহার মনের মধ্যে অতিরঞ্জিত ঘোরালো, কোনটা বা ছিল অস্বাভাবিক রকমের ফিকা, এই ছবিগুলিই প্রত্যক্ষ পরিচয়ে স্পষ্ট ও সত্য করিয়া লইবার সুযোগ মাসীমার মেয়ে প্রকৃতির বিবাহ-উপলক্ষে যখন মিলিল তখন বন্দনা উপেক্ষা করিতে পারিল না, সহজেই সম্মত হইয়া তাঁহার বালিগঞ্জের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। আপন দলের বহুজনের সঙ্গে তাঁহাদের জানা-শুনা, বিশেষতঃ প্রকৃতি এখানকার স্কুল-কলেজে পড়িয়াই বি. এ. পাশ করিয়াছে, তাহার নিজের বন্ধু-বান্ধবীর সংখ্যাও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয়। আসিয়া পর্য্যন্ত এই দলের মাঝখানেই বন্দনার এই কয়দিন কাটিল। পিতা অনাথ রায় বোম্বায়ে ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু সুধীর রহিল কলিকাতায়। আসন্ন বিবাহের আনন্দোৎসব নিত্যই চলিয়াছে, সেদিন বেলঘরের একটা বাগানে পিকনিক সারিয়া সদলবলে বাড়ি ফিরবার পথেই সে দ্বিজদাসের সংবাদ লইতে এ-বাড়িতে আসিয়া হাজির হইয়াছিল। এই খবরটাই অন্নদা সেদিন বিপ্রদাসকে দিয়াছিল।

মাসীর বাড়িতে দলের লোকের আসা-যাওয়া, খাওয়া-দাওয়া, সলা-পরামর্শের কামাই নাই, আজও ছিল অনেকের চায়ের নিমন্ত্রণ। অতিথিগণ আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, উপরের ঘরে মহাসমারোহে চলিয়াছে চা-খাওয়া! এমন সময়ে বিপ্রদাসের প্রকাণ্ড মোটর আসিয়া গেটের মধ্যে প্রবেশ করিল। ভৃত্যের দল অবহিত হইয়া উঠিল, কিন্তু শোফার দরজা খুলিয়া দিতে যে প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি অবতরণ করিল তাহার পোষাকের সামান্যতায় ও স্বল্পতায় সকলে বিস্মিত ও বিব্রত হইয়া পড়িল। মোটরের সঙ্গে মানুষের সামঞ্জস্য নাই। অন্নদার পরণে ছিল সাদা থান, তেমনি একটা শাদা মোটা চাদর গায়ে জড়ানো, পা খালি, হাত খালি, মাথায় আঁচলটা কপালের অর্দ্ধেকটা চাপা দিয়াছে—সে নিজেও যেন সলজ্জ সঙ্কোচে কিছু জড়-সড়ো। ভৃত্য-বেহারাদের চাপকান-পাগড়ীর সাজ-সজ্জায় বুঝা কঠিন কে কোন দেশের, তথাপি সম্মুখের লোকটাকে বাঙালী আন্দাজ করিয়া অন্নদা জিজ্ঞাসা করিল, বন্দনা দিদি আছেন?

সে বাঙালীই বটে, কহিল, হাঁ আছেন। তাঁরা উপরে চা খাচ্ছেন, আপনি ভেতরে এসে বসুন।

না, আমি এখানেই দাঁড়িয়ে আছি, তাঁকে একটু খবর দিতে পারবে না?

পারবো। কি বলতে হবে?

বলোগে বিপ্রদাসবাবুর বাড়ি থেকে অন্নদা এসেচে।

বেহারা চলিয়া গেল, অনতিবিলম্বে বন্দনা নীচে আসিয়া অন্নদার হাত ধরিয়া ঘরে আনিয়া বসাইল। এমন সে কখনও করে নাই, ভুলিয়া গেল সামাজিক পর্য্যায়ে এই বিধবা তাহার কাছে অনেক ছোট—ও-বাড়ির দাসী মাত্র—অকারণে তাহার চোখ সজল হইয়া উঠিল, বলিল, অনুদি, তুমি যে আমার খবর নিতে আসবে এ আমি মনে করিনি। ভেবেছিলুম আমাকে তোমরা ভুলে গেছো।

ভুলবো কেন দিদি, ভুলিনি। বড়বাবু আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন বলতে—

না অনুদি, আমাকে আপনি বলে ডাকলে আর আমি জবাব দেবো না।

অন্নদা আপত্তি করিল না, শুধু হাসিয়া বলিল, ওদের মানুষ করেচি বলেই 'তুমি' বলে ডাকি, নইলে ও-বাড়ির আমি দাসী বই ত নয়।

বন্দনা বলিল, তা হোক। কিন্তু মুখুয্যেমশাই ত এসেচেন পাঁচ-ছ দিন হোল কলকাতায়, নিজে বুঝি একবার আসতে পারতেন না? তিনি ত জানেন আমি বোম্বায়ে যাইনি।

হাঁ, আমার মুখে এ খবর তিনি শুনেচেন। কিন্তু জানো ত দিদি তাঁর কত কাজ। এতটুকু সময় ছিল না।

একথা শুনিয়া বন্দনা খুশী হইল না, বলিল, কাজ সকলেরই আছে অনুদি। আমরা গিয়েছিলুম বলেই ভদ্রতারক্ষার ছলনায় তোমাকে তিনি পাঠিয়েছেন, নইলে মনেও করতেন না। তাঁকে বোলো গিয়ে আমার মাসীমার তাঁদের মতো ঐশ্বর্য্য নেই বটে, তবু একবার আমার খোঁজ নিতে এ-বাড়িতে পা দিলে তাঁর জাত যেতো না। মর্য্যাদারও লাঘব হ'তো না।

এ সকল অনুযোগের উত্তর অন্নদার দিবার নয়। সে ও-বাটীতে যাইবার অনুরোধ করিতে গেল, কিন্তু শুনিবার ধৈর্য্য বন্দনার নাই, অন্নদার অসম্পূর্ণ কথার মাঝখানেই বলিয়া উঠিল, না অনুদি, সে হবে না। কোথাও যাবার আমার সময় নেই। কাল বাদে পরশু আমার বোনের বিয়ে।

পরশু?

হাঁ পরশু।

এ সময় অসুখের সংবাদ দেওয়া উচিত কি না অন্নদা ভাবিতেছিল, কিন্তু সে তখনি প্রশ্ন করিয়া উঠিল, আমাকে যাবার হুকুমটা দিলে কে? ছোটবাবু ত নেই জানি, বড়বাবু বোধ করি? কিন্তু তাঁকে বোলো গিয়ে হুকুম চালিয়ে তাঁর অভ্যাস খারাপ

হয়ে গেছে। আমি খাতকও নয়, তাঁর জমিদারীর আমলাও নই। আমাকে অনুরোধ করতে হয় নিজে এসে। মেজদি ভাল আছেন?

হাঁ আছেন।

আর সকলে?

অন্নদা বলিল, খবর এসেচে ছেলের অসুখ।

কার অসুখ—বাসুর? কি হয়েছে তার?

সে আমি ঠিক জানিনে দিদি।

বন্দনা চিন্তিত-মুখে বলিল, ছেলের অসুখ তবু নিজে না গিয়ে মুখুয্যেমশাই এখানে বসে আছেন যে বড়ো? মামলা-মকদ্দমা আর টাকা-কড়ির টানটাই কি হ'লো তাঁর বেশী অনুদি? একটা হিতাহিত বোধ থাকা উচিত।

অন্নদা বলিল, টাকার টান নয় দিদি, আজ দুদিন থেকে তিনি নিজেও শয্যাগত। ছেলের অসুখে সেখানে তারা বিব্রত, খবর দেওয়াও যায় না, অথচ এখানে দত্তমশাই পর্য্যন্ত নেই—তিনি গেছেন ঢাকায়, একা আমি মুখ্যু মেয়েমানুষ কিছুই বুঝিনে, ভয় হয় পাছে শক্ত হয়ে ওঠে। বিপিনের কখনো কিছু হয় না বলেই ভাবনা। বিয়েটা চুকে গেলে একবার পারবে না যেতে দিদি?

শঙ্কায় বন্দনার মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল—ডাক্তার এসেচেন? কি বলেন তিনি?

বললেন, ভয় নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে অন্য ডাক্তার ডাকতেও বলে গেলেন। অন্নদার চোখ জলে ভরিয়া গেল, বন্দনার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, এ দু'টো দিন যেমন করে হোক কাটাবো, কিন্তু বিয়ে চুকে গেলেও যাবে না? আমাদের ওপর রাগ করেই থাকবে? তোমাদের কোথায় কি ঘটেছে আমার জানবার কথা নয়, জানিওনে, কিন্তু এ জানি আর যে-ই দোষ করে থাক্ বিপিন কখনো করেনি। তাকে না জানলে হয়ত ভুল হয়, কিন্তু জানলে এ ভুল হবে না দিদি।

বন্দনা ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, চলো আমি যাচ্ছি।

এখুনি যাবে?

হ্যাঁ, এখুনি বই কি।

বাড়িতে বলে যাবে না? এঁরা ভাববেন যে।

বলতে গেলে দেরি হবে অনুদি, তুমি এসো। এই বলিয়া সে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া মোটরে গিয়া বসিল। বেহারাকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকিয়া বলিয়া দিল, মাসীমাকে জানাইতে সে মেজদির বাড়িতে চলিল, সেখানে বিপ্রদাসবাবুর অসুখ!

বন্দনা আসিয়া যখন বিপ্রদাসের ঘরে প্রবেশ করিল তখন বেলা গেছে, কিন্তু আলো জালার সময় হয় নাই। বিপ্রদাস বালিশগুলা জড়ো করিয়া দেওয়ালে হেলান

দিয়া বিছানায় বসিয়া, মুখ দেখিয়া মনে হয় না যে অসুখ গুরুতর। মনের মধ্যে স্বস্তি বোধ করিয়া বলিল, মুখুয্যেমশাই, নমস্কার করি। মেজদি উপস্থিত থাকলে রাগ করতেন, বলতেন, গুরুজনের পায়ের ধূলো নিয়েই প্রণাম করতে। কিন্তু ছুঁতে ভয় করে পাছে ছোঁয়া যান।

বিপ্রদাস কিছুই না বলিয়া শুধু একটু হাসিল। বন্দনা বলিল, ডেকে পাঠিয়েচেন কেন,—সেবা করতে? অন্নদি বলছিলো, ওষুধ খাওয়াবার সময় হয়েছে। কিন্তু একি ব্যাপার! ডাক্তারী ওষুধের শিশি যে! কবরেজের বড়ি কই? ডাক্তার ডাকার বুদ্ধি দিলে কে আপনাকে?

বিপ্রদাস কহিল, আমাদের চলতি ভাষায় ডেঁপো বলে একটা কথা আছে তার মানে জানো বন্দনা?

বন্দনা বলিল, জানি মশাই জানি। মানুষ হয়ে যারা মানুষকে ঘেন্না করে, ছোঁয় না, তাদের বলে। তাদের চেয়ে ডেঁপো সংসারে আর কেউ আছে না কি?

বিপ্রদাস বলিল, আছে। যাদের সত্যি-মিথ্যে যাচাই করবার ধৈর্য্য নেই, অকারণে নির্দ্দোষীকে ফুটিয়ে যারা বাহাদুরি করে তারা, তাদের দলের মস্ত বড় পাণ্ডা তুমি নিজে।

অকারণে কোন্ নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে হুল ফুটিয়েচি আপনি বলে দিন ত শুনি?

আমাকে বলে দিতে হবে না বন্দনা, সময় এলে নিজেই টের পাবে।

আচ্ছা, সেই দিনের প্রতীক্ষা করে রইলুম, এই বলিয়া বন্দনা খাটের কাছে একটা চৌকি আনিয়া লইয়া বসিল, বলিল, এখন বলুন নিজে কেমন আছেন?

ভালো আছি, কিন্তু জ্বরটা রয়েচে। রাত্রে আর একটু বাড়বে বলে মনে হয়!

কিন্তু আমাকে ডেকে পাঠালেন কেন? আমাকে আপনার কিসের দরকার?

দরকার আমার নয়, অন্নদিদির, সেই বড় ভয় পেয়েচে। তার মুখে শুনলাম পরশু তোমার বোনের বিয়ে, চুকে গেলে একদিন এসো। আমার জবানি তোমার মেজদি কিছু খবর পাঠিয়েছেন সেগুলো তোমায় শোনাবো।

আজ পারেন না?

না, আজ নয়।

বন্দনা মিনিট-দুই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তার পরে কহিল, মুখুয্যেমশাই, অসুখ আপনার বেশি নয়, দু'দিনেই সেরে উঠবেন। আমি জানি আমাকে প্রয়োজন নেই, তবুও আপনার সেবার ভান করেই আমি থাকবো, সেখানে ফিরে যাবো না। আমার তোরঙ্গটা আনতে লোক পাঠিয়ে দিয়েচি, আপনি আপত্তি করতে পারবেন না।

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, কিসের আপত্তি বন্দনা, তোমার থাকায়? কিন্তু বোনের বিয়ে যে।

বিয়ে ত আমার সঙ্গে নয়—আমি না গেলেও বোনের বিয়ে আটকাবে না।

সত্যি থাকবে না বিয়েতে?

না।

কিন্তু এরই জন্যে যে কলকাতায় রয়ে গেলে?

বন্দনা কহিল, যাচ্ছিলুম বোম্বায়ে, স্টেশন থেকে ফিরে এলুম, কিন্তু ঠিক এই জন্যেই নয়। দূরে থাকি, আপন সমাজের প্রায় কাউকে চিনিনে, মুখে মুখে কত কথা শুনি, গল্প-উপন্যাসে কত-কি পড়ি, তাদের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারিনে—মনে হয় বুঝিবা আমরা সমাজ-ছাড়া এক-ঘরে। মাসীমা ডাকলেন, ভাবলুম প্রকৃতির বিয়ের উপলক্ষে দৈবাৎ যে সুযোগে মিললো, এমন আর পাবো না। তাই ফিরে এলুম মুখুয্যেমশাই।

বিপ্রদাস সহাস্যে কহিল, কিন্তু সে বিয়েটাই যে বাকি এখনো। দলের লোকদের চেনবার সুযোগ পেলে কই?

সুযোগ পুরো পাইনি সত্যি, কিন্তু যতটা পেরেচি সে-ই আমার যথেষ্ট।

নিজের সঙ্গে এঁদের কতখানি মিললো? শুনতে পারি কি?

বন্দনা হাসিয়া ফেলিল, বলিল, আপনি সেরে উঠুন তার পরে বিস্তারিত করে শোনাবো।

চাকর আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল। শিয়রের জানালাটা বন্ধ করিয়া বন্দনা ঔষধ খাওয়াইল, কহিল, আর বসে নয়, এবার আপনাকে শুতে হবে। এই বলিয়া এলো-মেলো বিছানাটা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া বালিশগুলো ঠিক করিয়া দিল, বিপ্রদাস শুইয়া পড়িলে পা হইতে বুক পর্য্যন্ত চাদর দিয়া ঢাকিয়া দিয়া বলিল, সেরে উঠে নিজেকে শুদ্ধ শুচি করে তুলতে না জানি কত গোবর-গঙ্গাজলই না আপনার লাগবে!

বিপ্রদাস দুই হাত প্রসারিত করিয়া বলিল, এত। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, সেবাযত্ন করতেও একটু জানো দেখচি।

জানি একটু? না মুখুয্যেমশাই, এ চলবে না। আমাদের সম্বন্ধে আপনাকে আরো একটু খোঁজ-খবর নিতে হবে।

অর্থাৎ—

অর্থাৎ আমাদের নিন্দেই যদি করেন সজ্ঞানে করতে হবে। এমনধারা চোখ বুজে যা-তা বলতে দেবো না। বিপ্রদাসের মুখে পরিহাসের চাপা হাসি, কহিল, এই আমাদেরটা কারা বন্দনা? কাদের সম্বন্ধে আরও একটু খোঁজ-খবর নিতে হবে? যাদের থেকে এইমাত্র পালিয়ে এলে তাদের?

কে বললে আমি পালিয়ে এলুম ?

আমি বলচি।

জানলেন কি করে ?

জানলুম তোমার মুখ দেখে।

বন্দনা ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিল, দ্বিজুবাবু একদিন বলেছিলেন দাদার চোখে কিছুই এড়ায় না। কথাটা যে কতখানি সত্যি আমি বিশ্বাস করিনি। আপনার অসুখ আমি চাইনে, কিন্তু এ আমাকে সত্যিই উদ্ধার করেচে। সত্যিই পালিয়ে এসে আমি বেঁচে গেছি। যে কটা দিন আপনি অসুস্থ আমি আপনার কাছেই থাকবো, তার পরে সোজা বাবার কাছে চলে যাবো—মাসীর বাড়িতে আর ফিরবো না। দূর থেকে যাদের দেখতে চেয়েছিলুম তাদের দেখা পেয়ে গেছি, এমন ইচ্ছে আর নেই যে একটা দিনের জন্যেও ওদের মধ্যে গিয়ে কাটিয়ে আসি।

বিপ্রদাস নীরবে চাহিয়া রহিল। বন্দনা বলিতে লাগিল, ওদের শুধু শাড়ি গাড়ি আর মিথ্যে ভালোবাসার গল্প। কোথায় নৈনি আর কোথায় মুসৌরির হোটেল আমি জানিওনে, কিন্তু ওদের মুখে-মুখে তার কি-যে নোঙরা চাপা ইঙ্গিত,—শুনতে শুনতে ইচ্ছে হ'তো, কোথাও যেন ছুটে পালিয়ে যাই। আজ এই ঘরের মধ্যে বসে মনে হচ্ছে যেন এই ক'টা দিন অবিশ্রাম এলো-মেলো ধূলোবালির ঘূর্ণি-ঝড়ের মধ্যে আমার দিন-রাত কেটেচে। এর ভেতর ওরা বাঁচে কি করে মুখুয্যেমশাই ?

বিপ্রদাস বলিল, সে রহস্য আমার জানার কথা নয়। মরুভূমির মধ্যে কবরগুলো যেমন টিকে থাকে বোধ করি তেমনি করে।

বন্দনা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, দুঃখের জীবন। ওদের না আছে শান্তি, না আছে কোন ধর্ম্মের বালাই। কিছু বিশ্বাস করে না, কেবলি করে তর্ক। একটু থামিয়া বলিল, খবরের কাগজ পড়ে, ওরা জানে অনেক। পৃথিবীর কোথায় কি নিত্য ঘটচে কিছুই ওদের অজানা নয়! কিন্তু আমি ত ও-সব পড়তে পারিনে, তাই অর্দ্ধেক কথা বুঝতেই পারতুম না। শুনতে শুনতে যখন অরুচি ধরে যেতো তখন আর কোথাও সরে গিয়ে নিশ্বেস ফেলে বাঁচতুম। কিন্তু তাদের ত ক্লান্তি নেই, তারা বকতে বকতে সবাই যেন মেতে উঠতো।

কিন্তু তোমার বাবা কাছে থাকলে সুবিধে হত বন্দনা। খবরের কাগজের সব খবর তাঁকে জিজ্ঞেস করলেই টের পেতে—ওদের কাছে ঠকতে হ'তো না।

বন্দনা হাসিমুখে সায় দিয়া বলিল, হাঁ, বাবার সে বাতিক আছে। সমস্ত খবর খুঁটিয়ে না পড়ে তাঁর তৃপ্তি নেই। কিন্তু আমাদের মেয়েদের তাতে দরকার কি বলুন ত? কি হবে জেনে পৃথিবীর কোথায় কি দিন-রাত ঘটচে ?

এ কথা তোমার মেজদির মুখে শোভা পায় বন্দনা, তোমার মুখে নয়। এই বলিয়া বিপ্রদাস হাসিল।

বন্দনা বলিল, তারা কি আমার মেজদির চেয়ে বেশি জানে মনে করেচেন? একটুও না। শূন্য কলসী বলেই মুখ দিয়ে তাদের এত আওয়াজ বার হয়। তাদের আর কিছু না জেনে থাকি এ খবরটা জেনে নিয়েচি মুখুয্যেমশাই।

কিন্তু জ্ঞান ত চাই।

না চাইনে! জ্ঞানের আস্ফালনে মুখের মধু তাদের বিষ হয়ে উঠেচে। জানে তারা আমার মেজদির মতো সবাইকে ভালবাসতে? জানে না। পারে তারা মেজদির মতো ভক্তি করতে? পারে না। ওদের বন্ধুই কি কেউ আছে? মনে হয় কেউ নেই, এমনি পরস্পরের বিদ্বেষ। তাদের অভাবটাই কি কম? বাইরের জাঁক-জমকে বোঝাই যাবে না ভেতরটা ওদের এত ফোঁপরা। কিসের জন্যে ওদের নিয়ে এত মাতামাতি? সমস্ত ভেতরটা যে একেবারে ঘুণে ঝাঁঝরা করে দিয়েচে।

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, হয়েচে কি বন্দনা, এত রাগ কিসের? কেউ টাকা ঠকিয়ে নেয়নি ত?

না, ঠকিয়ে নেয়নি, ধার নিয়েচে।

কত?

বেশি না চার-পাঁচ'শ।

তাদের নাম জানো ত?

জানতুম, কিন্তু ভুলে গেছি। এই বলিয়া বন্দনা হাসিয়া ফেলিল, কহিল, ছি ছি, এত অল্প পরিচয়েও যে কেউ কারও কাছে টাকা চাইতে পারে আমি ভাবতেও পারিনে। বলতে মুখে বাধে না, লজ্জার ছায়া এতটুকু চোখে পড়ে না, এ যেন তাদের প্রতিদিনের ব্যাপার। এ কি করে সম্ভব হয় মুখুয্যেমশাই?

বিপ্রদাসের মুখ গম্ভীর হইল, কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া কহিল, তোমার মনটাকে তারা বড় বিষিয়ে দিয়েচে বন্দনা, কিন্তু সবাই এমনি নয়, ঐ মাসীমার দলটাই তোমাদের সমস্ত দল নয়। যারা বাইরে রয়ে গেল, খুঁজলে হয়ত তাদেরও একদিন দেখা পাবে।

বন্দনা বলিল, পাই ভালোই। তখন ধারণা আমার সংশোধন করবো, কিন্তু যাদের দেখতে পেলুম তারা সবাই শিক্ষিত, সবাই পদস্থ লোকের আত্মীয়। গল্প-উপন্যাসের রঙ করা ভাষায় সজ্জিত হয়ে এরা দূর থেকে আমার চোখে কি আশ্চর্য্য অপরূপ হয়েই না দেখা দিত। মনে গর্ব্বের সীমা ছিল না, ভাবতুম আমাদের

মেয়েদেয় পেয়েচি, পড়ার দুর্নাম এবার ঘুচলো। আমার সেই ভুল এবার ভেঙেচে মুখুয্যেমশাই।

বিপ্রদাস সহাস্যে কহিল, ভুল কিসের? এঁরা যে দ্রুত এগিয়ে চলেছেন এ তো মিথ্যে নয়।

শুনিয়া বন্দনা হাসিল, বলিল, না মিথ্যে হবে কেন, সত্যিই। তবু আমার সান্ত্বনা এই যে সংখ্যায় এঁরা অত্যন্ত স্বল্প,—এঁদেরই গড়ের মাঠের মনুমেণ্টের ডগায় ঠেলে তুলে হট্টগোল বাধানো যেমন নিষ্ফল তেমনি হাস্যকর।

বিপ্রদাস বলিল, এ হচ্চে তোমার আর এক ধরণের গোঁড়ামি। স্বধর্ম্মত্যাগের বিপদ আছে বন্দনা,—সাবধান।

বন্দনা এ-কথায় কান দিল না, বলিতে লাগিল, এই নগণ্য দলের বাইরে রয়েচে বাঙলার প্রকাণ্ড নারী-সমাজ। এদের আমি আজও দেখিনি, বাইরে থেকে বোধ করি দেখাও মেলে না, তবু মনে হয় বাতাসের মতো এরাই আছে বাঙলার নিশ্বাসে মিশে। জানি, এদের মধ্যে আছে ছোট, আছে বড়,—বড়র দৃষ্টান্ত রয়েছে আমার মেজদিতে তাঁর শাশুড়ীতে—এবার কলকাতায় আসা আমার সার্থক হ'লো মুখুয্যে-মশাই। আপনি হাসচেন যে?

ভাবছি, টাকার শোকটা মানুষকে কি রকম বক্তা করে তোলে। এ দোষটা আমারও আছে কিনা।

কোন্ টাকার শোক্,—সেই পাঁচ শ'র?

তাই ত মনে হচ্চে।

বন্দনা হাসিয়া বলিল, টাকার জন্যে আর ভাবনা নেই। আপনাকে সেবা করার মজুরী হিসাবে ডবল আদায় করে ছাড়বো। আপনি না দেন মায়ের কাছে আদায় হবে।

অন্নদা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, আটটা বাজে, বিপিনের খাবার সময় হ'লো।

বন্দনা ব্যস্ত হইয়া বলিল, চলো অনুদি যাচ্চি। কেমন, যাই মুখুয্যেমশাই?

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, যাও। কিন্তু সেবার ত্রুটি হলে মজুরী কাটা যাবে।

ত্রুটি হবে না মশাই, হবে না। বলিয়া সেও হাসি-মুখে বাহির হইয়া গেল।

১৮

বন্দনা বলিল, খাবার হয়ে গেছে নিয়ে আসি?

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, তোমার কেবলি চেষ্টা হচ্চে আমার জাত মারার। কিন্তু সন্ধ্যে-আহ্নিক এখনো করিনি, আগে তার উদ্যোগ করিয়ে দাও।

আমি নিজে করে দেবো মুখুয্যেমশাই?

নইলে কে আর আছে এখানে যে করে দেবে? কিন্তু মার পূজোর ঘরে যেতে পারবো না—গায়ে জোর নেই,—এই ঘরে করে দিতে হবে। আগে দেখবো কেমন আয়োজন করো, খুঁত ধরবার কিছু থাকে কি না, তখন বুঝে দেখবো খাবার তুমি আনবে না আমাদের বামুনঠাকুর আনবে।

শুনিয়া বন্দনা পুলকে ভরিয়া গেল, বলিল; আমি এই সর্ত্তেই রাজি। কিন্তু একজামিনে পাশ যদি হই তখন কিন্তু মিথ্যে ছলনায় ফেল করাতে পারবেন না। কথা দিন।

দিলুম কথা। কিন্তু আমাকে নিজের হাতে খাইয়ে কি তোমার এত লাভ?

তা আমি বলবো না, এই বলিয়া বন্দনা দ্রুত প্রস্থান করিল।

মিনিট-দশেকের মধ্যে সে স্নান করিয়া প্রস্তুত হইয়া একটি জলপূর্ণ ঘটি লইয়া প্রবেশ করিল। ঘরের যে দিকটার খোলা জানালা দিয়া পূবের রোদ আসিয়া পড়িয়াছে সেই স্থানটি জল দিয়া ভাল করিয়া মার্জ্জনা করিয়া নিজের আঁচল দিয়া মুছিয়া লইল, পূজার ঘর হইতে আসন কোশাকুশি প্রভৃতি আনিয়া সাজাইল, ধূপদানি আনিয়া ধূপ জ্বালাইল, তারপরে বিপ্রদাসের ধুতি গামছা এবং হাত-মুখ ধোবার পাত্র আনিয়া কাছে রাখিয়া দিয়া বলিল, আজ সময় নেই ফুল তুলে এনে মালা গেঁথে দেবার, নইলে দিতুম, কাল এ ত্রুটি হবে না। কিন্তু আধ ঘণ্টা সময় দিলুম, এর বেশি নয়। এখন বেজেছে ন'টা—ঠিক সাড়ে ন'টায় আবার আসবো। এর মধ্যে আপনাকে কেউ বিরক্ত করবে না, আমি চললুম। এই বলিয়া সে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

বিপ্রদাস কোন কথা না বলিয়া শুধু চাহিয়া রহিল। আধ ঘণ্টা পরে বন্দনা যখন ফিরিয়া আসিল তখন সন্ধ্যাবন্দনা সমাপ্ত করিয়া বিপ্রদাস একটা আরাম-চৌকিতে হেলান দিয়া বসিয়াছে।

পাশ না ফেল মুখুয্যেমশাই?

পাশ ফার্স্ট ডিভিসনে। আমার মাকেও হার মানিয়েচ। কার সাধ্য বলে তোমাকে ম্লেচ্ছ, ম্লেচ্ছদের ইস্কুল-কলেজে পড়ে বি. এ. পাশ করেচ।

এবার তা হলে খাবার আনি?

আনো। কিন্তু তার আগে এগুলো রেখে এসোগে, বলিয়া বিপ্রদাস কোশাকুশি প্রভৃতি দেখাইয়া দিল।

এ আর আমাকে বলে দিতে হবে না মশাই জানি, বলিয়া পূজার পাত্রগুলি সে হাতে তুলিয়া লইয়াছে এমন সময়ে ঘরের বাহিরে বারান্দায় অনেকগুলি উঁচুগোড়ালি জুতার খুট্‌ খুট্‌ শব্দ একসঙ্গে কানে আসিয়া পৌঁছিল, এবং পরক্ষণে অন্নদা দ্বারের কাছে মুখ বাড়াইয়া বলিল, বন্দনাদিদি, তোমার মাসীমা—

মাসী এবং আরও দুই তিনটি অল্প-বয়সী মেয়ে একেবারে ভিতরে আসিয়া পড়িলেন, বিপ্রদাস দাঁড়াইয়া উঠিয়া অভ্যর্থনা করিল, আসুন।

মাসী বলিলেন, নীচ থেকেই খবর পেলুম বিপ্রদাসবাবু ভালো আছেন—

বিপ্রদাস কহিল, হাঁ, আমি ভাল আছি।

আগন্তুক মেয়েরা বন্দনাকে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইল, পায়ে জুতা নাই, গায়ে জামা নাই, ভিজা চুলে গরদের শাড়ি ভিজিয়াছে। এলো, কালো চুলের রাশি পিঠের 'পরে ছড়ানো, দুই হাতে পূজোর জিনিষ-পত্র, তাহার এ মূর্ত্তি তাহাদের শুধু অদৃষ্টপূর্ব্ব অপরিচিত নয়, অভাবনীয়। বন্দনা বলিল, আপনারা দোর ছেড়ে একটু সরে দাঁড়ান, এগুলি রেখে আসিগে।

একটি মেয়ে বলিল, ছোঁয়া যাবে বুঝি?

হাঁ, বলিয়া বন্দনা চলিয়া গেল।

ক্ষণেক পরে সে সেই বেশেই ফিরিয়া আসিয়া বিপ্রদাসের চেয়ারের ধার ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। মাসী বলিলেন, আমাদের না জানিয়ে তুমি চলে এলে সেজন্যে রাগ করিনে, কিন্তু আজ তোমার বোনের বিয়ে—তোমাকে যেতে হবে।

মেয়ে দু'টি বলিল, আমরা আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে এসেচি।

বন্দনা বলিল, না মাসীমা, আমার যাওয়া হবে না।

সে কি কথা বন্দনা! না গেলে প্রকৃতি কত দুঃখ করবে জানো?

জানি, তবু আমি যেতে পারবো না।

শুনিয়া মাসী বিস্ময় ও ক্ষোভে অধীর হইয়া বলিলেন, কিন্তু এই জন্যেই তোমার বোম্বায়ে যাওয়া হ'ল না—এই জন্যেই তোমার বাবা আমার কাছে তোমাকে রেখে গেলেন। তিনি শুনলে কি বলবেন বলো ত?

সেই মেয়েটি বলিল, তা ছাড়া সুধীরবাবু—মিস্টার ডাটা ভারি রাগ করেচেন। আপনার চলে আসাটা তিনি মোটে পছন্দ করেননি।

বন্দনা তাহার দিকে চাহিল, কিন্তু জবাব দিল মাসীকে, বলিল, আমি না গেলে প্রকৃতির বিয়ে আটকাবে না, কিন্তু গেলে মুখুয্যেমশায়ের সেবার ক্রুটি হবে। ওঁকে দেখবার কেউ নেই।

কিন্তু উনি ত ভাল হয়ে গেছেন। তোমাকে যেতে বলা ওঁর উচিত। এই বলিয়া মাসী বিপ্রদাসের দিকে চাহিলেন।

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, ঠিক কথা। আমার যেতে বলাও উচিত, বন্দনার যাওয়াও উচিত। বরঞ্চ না গেলেই অন্যায় হবে।

বন্দনা মাথা নাড়িয়া কহিল, না—অন্যায় হবে আমি মনে করিনে। বেশ, আপনি বলেচেন যেতে আমি যাবো, কিন্তু রাত্রেই চলে আসবো, সেখানে থাকতে পারবো না। এ অনুমতি মাসীমাকে দিতে হবে।

একটা রাতও থাকতে পারবে না?

না।

আচ্ছা তাই হবে, বলিয়া মাসী মনে মনে রাগ করিয়া দলবল লইয়া প্রস্থান করিলেন।

বিপ্রদাস বলিল, দেখলে তো তোমার মাসীমা রাগ করে চলে গেলেন; কিন্তু হঠাৎ এ খেয়াল হ'লো কেন?

বন্দনা বলিল, রাগ করে গেলেন জানি, কিন্তু শুধু খেয়ালের বশেই যেতে চাইচিনে তা নয়। ওদের যা-কিছু সমস্তর উপরেই আমার বিতৃষ্ণা ধরে গেছে। তাই ওখানে আর যেতে চাইনে মুখুয্যেমশাই।

এটা একটু বাড়াবাড়ি বন্দনা।

সত্যই বাড়াবাড়ি কিনা বলা শক্ত। আমি সর্ব্বদাই নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করি, অথচ বেশ বুঝতে পারি ওদের মধ্যে গিয়ে আমার না থাকে সুখ, না থাকে স্বস্তি। একবার বোম্বায়ে একটা কাপড়ের কলের কারখানা দেখতে গিয়েছিলুম, কেবলি আমার সেই কথা মনে হতে থাকে—তার কত কল কত চাকা আশে পাশে সামনে পিছনে অবিশ্রাম ঘুরচে—একটু অসাবধান হলেই যেন ঘাড়-মুখ গুঁজড়ে তার মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলবে। ওসব দেখতে যে ভাল লাগে তা নয়, তবু মনে হয় বেরুতে পারলে বাঁচি; কিন্তু আর দেরি করবো না, আপনার খাবার আনিগে, বলিয়া বাহির হইতে গিয়াই চোখে পড়িল দ্বারের সম্মুখে পায়ের ধূলা, জুতোর দাগ; থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, খাবার আনা হ'ল না মুখুয্যেমশাই, একটু সবুর করতে হবে। চাকর দিয়ে এগুলো আগে ধুইয়ে ফেলি, এই বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইতেছিল, বিপ্রদাস সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল, এত খুঁটিনাটি তুমি শিখলে কার কাছে বন্দনা?

শুনিয়া বন্দনা নিজেও আশ্চর্য্য হইল, বলিল, কে শেখালে আমার মনে নেই মুখুয্যেমশাই, বলিয়া একটু চুপ করিয়া কহিল, বোধ হয় কেউ শেখায়নি। আমার আপনিই মনে হচ্চে, আপনাকে সেবা করার এসব অপরিহার্য্য অঙ্গ, না করলেই ত্রুটি হবে। বলিয়া সে চলিয়া গেল।

বিকালের দিকে অভ্যস্ত এবং যথোচিত সাজ-সজ্জা করিয়া বন্দনা বিপ্রদাসের ঘরের খোলা দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, মুখুয্যেমশাই, চললুম বোনের বিয়ে দেখতে। মাসী ছাড়লেন না বলেই যেতে হচ্চে।

বিপ্রদাস কহিল, আশীর্ব্বাদ করি তুমিও যেন শীঘ্র এই অত্যাচারের শোধ নিতে পারো। তখন ঐ মাসীকে পাঞ্জাব থেকে হিঁচড়ে বোম্বায়ে টেনে নিয়ে যেও।

মাসীর ওপর রাগ নেই, কিন্তু আপনাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাবো। ভয় নেই, গাড়ি-ভাড়া আমরাই দেবো, আপনার নিজের লাগবে না। এই বলিয়া বন্দনা হাসিয়া কহিল, ফিরতে আমার রাত হবে, কিন্তু সমস্ত ব্যবস্থা করে গেলুম, অন্যথা হলে এসে রাগ করবো।

করবে বই কি! না করলেই সকলে আশ্চর্য্য হবে। ভাববে, শরীর ভালো নেই, বিয়ে-বাড়িতে খেয়ে বোধ হয় অসুখ করেচে।

বন্দনা হাসিমুখে মাথা নাড়িয়া বলিল, হয়েচে আমার গুণ-ব্যাখ্যা করা। কিন্তু সে কথা যাক, আপনি সন্ধ্যে-আহ্নিক করতে নীচে যাবেন না যেন। অনুদি এই ঘরেই সব এনে দেবে। তার আধ ঘণ্টা পরেই ঠাকুর দিয়ে যাবে খাবার, এক ঘণ্টা পরে ঝড়ু ওষুধ দিয়ে আলো নিবিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে চলে যাবে। এই হুকুম সকলকে দিয়ে গেলুম। বুঝলেন?

হাঁ বুঝেছি।

তবে চললুম।

যাও। কিন্তু চমৎকার মানিয়েচে তোমাকে বন্দনা, এ কথা স্বীকার করবোই। কারণ, যে পোষাকটা পরেচো এইটেই হ'লো তোমার স্বাভাবিক, যেটা এখানে পরে থাকো সেটা কৃত্রিম।

সে কি কথা মুখুয্যেমশাই,—ওরা বলে মেয়েদের জুতো পরা আপনি দেখতে পারেন না?

ওরা ভুল বলে, যেমন বলে তোমার হাতে আমি খেতে পারিনে।

বন্দনা বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, ভুল হবে কেন মুখুয্যেমশাই, আমার হাতে খেতে সত্যিই ত আপনার আপত্তি ছিল।

বিপ্রদাস বলিল, আপত্তি ছিল, কিন্তু আপত্তিটা সত্যিকারের হলে সে আজও থাকতো, যেতো না।

কথাটা বন্দনা বুঝিল না, কিন্তু বিপ্রদাসের উক্তি অসত্য বলিয়া মনে করাও কঠিন, বলিল, দ্বিজুবাবু একদিন বলেছিলেন দাদার মনের কথা কেউ জানতে পারে না, যেটা শুধু বাইরের তাই কেবল লোকে টের পায়; কিন্তু যা অন্তরের তা অন্তরেই চাপা থাকে, মুখুয্যেমশাই—এ কি সত্যি?

উত্তরে বিপ্রদাস শুধু একটু হাসিল, তারপরে বলিল, বন্দনা, তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। যদি সত্যিই থাকতে সেখানে ইচ্ছা না হয় থেকো না—চলে এসো।

চলেই আসবো মুখুয্যেমশাই, থাকতে সেখানে পারবো না। এই বলিয়া বন্দনা আর বিলম্ব না করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

পরদিন সকালে দেখা হইলে বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করিল, বোনের বিয়ে নির্বিঘ্নে সমাধা হলো?

হাঁ হ'লো—বিঘ্ন কিছু ঘটেনি।

নিজের জিদই বজায় রইলো, মাসীর অনুরোধ রাখলো না? কত রাতে ফিরলে?

রাত্রি তখন তিনটে। মাসীর কথা রাখা চলল না, রাত্রেই ফিরতে হ'লো। একটুখানি থামিয়া বোধ হয় বন্দনা ভাবিয়া লইল বলা উচিত কি-না, তার পরেই সে বলিতে লাগিল, মাত্র কয়েক ঘণ্টা ছিলুম কিন্তু কাজ করে এসেচি অনেক। এক বছরে যা করতে পারিনি মিনিট পাঁচ-ছয়েই তা হয়ে গেল। সুধীরের সঙ্গে শেষ করে এলুম।

বিপ্রদাস আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, বলো কি!

হ্যাঁ তাই। কিন্তু ওকে অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে আসিনি। আজ সকালে যে মেয়েটিকে দেখেছিলেন তার নাম হেম। হেমনলিনী রায়। ওর জিম্মাতেই সুধীরকে দিয়ে এলুম। আবার আমার সেই বোম্বায়ের কলের কথাই মনে পড়ে, তার মতো ওদের ওখানেও ভালবাসার টানা-পোড়েন দেখতে দেখতে মানুষের ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে। আবার ভাঙেও তেমনি।

বিপ্রদাস তেমনি বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—ব্যাপারটা হ'লো কি? সুধীরের সঙ্গে হঠাৎ শেষ করে আসার মানে?

বন্দনা কহিল, শেষ করার মানে শেষ করা। কিন্তু তাই বলে ওখানে হঠাৎ বলেও কিছু নেই। ওদের তাল অসম্ভব দ্রুত বলেই বাইরে থেকে 'হঠাৎ' বলে ভ্রম হয়, কিন্তু আসলে তা নয়। সুধীর আমাকে ডেকে বললে, আমার অত্যন্ত অন্যায় হয়েচে। বললুম, কি অন্যায় হয়েচে সুধীর? সে বললে, কাউকে না বলে—অর্থাৎ তাকে না জানিয়ে—অকস্মাৎ এ-বাড়িতে চলে আসা আমার খুব গর্হিত কাজ হয়েচে।

বিশেষতঃ সেখানে বিপ্রদাসবাবু ছাড়া আর কেউ নেই যখন। বললুম, সেখানে অন্নদাদিদি আছে। সুধীর বললে, কিন্তু সে দাসী ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি বললুম, ও-বাড়িতে তাঁকে দিদি বলে সবাই ডাকে। শুনে সেই হেম মেয়েটি মুখ টিপে একটু হেসে বললে, পাড়াগাঁয়ে ও-রকম ডাকার রীতি আছে শুনেচি, তাতে দাসী-চাকরদের অহঙ্কার বাড়ে, আর কিছু বাড়ে না। তারা নিজেরাও বড় হয়ে ওঠে না। সুধীর বললে, এঁদের কাছে তুমি বলেচো যে এখানে থাকতে পারবে না, রাত্রেই ফিরে যাবে ; কিন্তু সে-বাড়িতে তোমার একলা থাকাটা আমরা কেউ পছন্দ করিনে। তোমার বাবা শুনলেই বা কি বলবেন ? বললুম, বাবা কি বলবেন সে ভাবনা তোমার নয় আমার। কিন্তু আরও যাঁরা পছন্দ করেন না তাঁদের মধ্যে কি তুমি নিজেও আছ ? হেম বললে, নিশ্চই আছেন। সকলকে ছাড়া ত উনি নন। এই মেয়েটার গায়ে-পড়া মন্তব্যের উত্তর দিতে ইচ্ছে হ'ল না, তাই সুধীরকে বললুম, তোমার এ কথার জবাবে আমিও বলতে পারতুম যে অনর্থক ছুটি নিয়ে তোমার কলকাতায় থাকাটা আমিও পছন্দ করিনে, কিন্তু সে কথা আমি বলব না। তুমি যে নোঙরা ইঙ্গিত করলে তা ইতর সমাজেই চলে, কিন্তু তোমাদের বড়-দলেও যে সে সমান সচল এ আমি জানতুম না, কিন্তু আর আমার সময় নেই, গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েচে, আমি চললুম। সেই মেয়েটা বলে উঠলো, যা অশোভন, যা অনুচিত তার আলোচনা ছোট বড় সকল দলেই চলে জানবেন। বললুম, আপনারা যত খুশি আলোচনা চালান আপত্তি নেই। আমি উঠলুম। সুধীর হঠাৎ কেমনধারা যেন হয়ে গেল,—মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠল,—নিজেকে সামলে বললে, তোমার মাসীমাকেও জানিয়ে যাবে না ? বললুম, তাঁকে জানানোই আছে বিয়ে হয়ে গেলেই আমি চলে যাবো যত রাতই হোক। সুধীর বললে, কাল তোমার সঙ্গে কি একবার দেখা হতে পারবে ? বললুম, না। সে বললে, পরশু ? বললুম, পরশুও না।

তার পরের দিন ?

না তার পরের দিনও নয়।

কবে তোমার সময় হবে ?

সময় আমার হবে না।

কিন্তু আমার যে একটা বিশেষ জরুরি কথা আলোচনা করবার আছে ?

তোমার হয়ত আছে কিন্তু আমার নেই। এই বলে উঠে পড়লুম।

সুধীর আমাকে যে চেনে না, তা নয়, সঙ্গে এগিয়ে আসতে সাহস করলে না, সেইখানেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমি গাড়িতে এসে বসলুম।

বিপ্রদাস ঈষৎ হাসিয়া কহিল, এর মানে কি শেষ করে দেওয়া বন্দনা ? একটু-

খানি কলহ। সন্দেহ যদি থাকে দেখা হলে তোমার মেজদিকে জিজ্ঞেস করে নিও।

বন্দনা হাসিল না, গম্ভীর হইয়া বলিল, কাউকে জিজ্ঞেসা করার প্রয়োজন নেই মুখুয্যেমশাই, আমি জানি আমাদের শেষ হয়ে গেছে, এ আর ফিরবে না।

তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া বিপ্রদাস হতবুদ্ধি হইয়া রহিল,—বলো কি বন্দনা, এত বড় জিনিস কি কখনও এত অল্পেই শেষ হতে পারে? সুধীরের আঘাতটাই একবার ভেবে দেখো দিকি।

বন্দনা বলিল, ভেবে দেখেছি মুখুয্যেমশাই। এ আঘাত সামলাতে সুধীরের বেশী দিন লাগবে না, আমি জানি ঐ হেম মেয়েটিই তাকে পথ দেখিয়ে দেবে; কিন্তু আমি নিজের কথা ভাবছিলুম। শুধু যে গাড়িতে বসেই ভেবেচি তা নয়, কাল বিছানায় শুয়ে সমস্ত রাত আমি ঘুমোতে পারিনি। অস্বস্তি বোধ করেচি সত্যি, কিন্তু কষ্ট আমি পাইনি।

কষ্ট পাবে রাগ পড়ে গেলে। তখন এই সুধীরের জন্যেই আবার পথ চেয়ে থাকবে, বলিয়া বিপ্রদাস হাসিল।

এ হাসিতেও বন্দনা যোগ দিল না, শান্তভাবে বলিল, রাগ আমার নেই। কেবল অনুতাপ হয় যে, চলে আসার সময় যদি কঠিন কথা আমার মুখ দিয়ে বার না হতো। দেখিয়ে এলুম যেন দোষ তাঁর,—জানিয়ে এলুম যেন মর্ম্মাহত হয়ে আমি বিদায় নিলুম। কিন্তু তা তো সত্যি নয়, এই মিথ্যে আচরণের জন্যেই শুধু লজ্জা বোধ করি মুখুয্যেমশাই, আর কিছুর জন্যেই নয়। তাহার কথার শেষের দিকে চোখ যেন সজল হইয়া আসিল।

বিপ্রদাসের মনের বিস্ময় বহুগুণে বাড়িয়া গেল, এ যে ছলনা নয় এতক্ষণে সে বুঝিল। বলিল, সুধীরকে তুমি কি সত্যিই আর ভালবাসো না?

না।

এতদিন ত বাসতে! এত সহজে এ ভালবাসা গেল কি করে?

এত সহজে গেল বলেই এত সহজে এর উত্তর পেলুম। নইলে আপনার কাছে মিথ্যে বলতে হোত। এই বলিয়া সে কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আপনি জানতে চাইলেন কোনদিন সুধীরকে ভালোবেসেছিলুম কি-না! সেদিন ভাবতুম সত্যিই ভালোবাসি; কিন্তু তার পরেই আর একজন পড়লো চোখে—সুধীর গেল মিলিয়ে! এখন দেখি সেও গেছে মিলিয়ে। শুনে হয়ত আপনার ঘৃণা হবে, মনে হবে এমন তরল মন ত দেখিনি। আমি জানি মেয়েদের এ লজ্জার কথা,—কোন মেয়েই এ স্বীকার করতে চায় না—এ যেন তাদের চরিত্রকেই কলুষিত করে দেয়? হয়ত আমিও কারো কাছে মানতে পারতুম না, কিন্তু কেন জানিনে আপনার কাছে কোন কথা বলতেই আমার লজ্জা করে না।

বিপ্রদাস চুপ করিয়া রহিল। বন্দনা বলিতে লাগিল, হয়ত এই আমার স্বভাব, হয়ত এ আমার বয়সের স্বধর্ম্ম, অন্তর শূন্য থাকতে চায় না, হাতড়ে বেড়ায় চারিদিকে। কিংবা এমনই হয়ত সকল মেয়েরই প্রকৃতি, ভালোবাসার পাত্র যে কে সমস্ত জীবনে খুঁজেই পায় না। এই বলিয়া স্থির হইয়া মনে মনে কি যেন ভাবিতে লাগিল, তার পরেই বলিয়া উঠিল, কিংবা হয়ত খুঁজে পাবার জিনিস নয় মুখুয্যেমশাই—ওটা মরীচিকা।

বিপ্রদাস তেমনই মৌন হইয়া রহিল। বন্দনার যেন মনের আগল খুলিয়া গেছে, বলিতে লাগিল, এই সুধীরের সঙ্গেই এক বছর পূর্ব্বে আমার বিবাহ স্থির হয়ে গিয়েছিল, শুধু তার মায়ের অসুখ বলেই হতে পারেনি। কাল ঘরে ফিরে এসে ভাবছিলুম বিয়ে যদি সেদিন হয়ে যেতো, আজ কি মন আমার এমনি করে তাকে ঠেলে ফেলে দিতো? মনকে শাসনে রাখতুম কি দিয়ে? ধর্ম্মবুদ্ধি দিয়ে? সংস্কার দিয়ে? কিন্তু অবাধ্য মন শাসন মানতে যদি না চাইতো কি হতো তখন? যাদের মধ্যে এই কটা দিন কাটিয়ে এলুম ঠিক কি তাদের মতন? এমনি ষড়যন্ত্র আর লুকোচুরিতে মন পরিপূর্ণ করে শুকনো হাসি মুখে টেনে লোক ভুলিয়ে বেড়াতুম? এমনি পরস্পরের নিন্দে করে, হিংসে করে, শত্রুতা করে? কিন্তু আপনি কথা কইচেন না কেন মুখুয্যেমশাই?

বিপ্রদাস বলিল, তোমার মনের মধ্যে যে ঝড় বইচে তার ভয়ানক বেগের সঙ্গে আমি চলতে পারবো কেন বন্দনা, কাজেই চুপ করে আছি।

বন্দনা বলিল, না সে হবে না, এমন করে এড়িয়ে যেতে আপনাকে আমি দেবো না। জবাব দিন!

কিন্তু শান্ত না হলে জবাব দিয়ে লাভ কি? তোমার আজকের অবস্থা যে স্বাভাবিক নয় একথা তুমি বুঝতে পারবে কেন?

কেন পারবো না মুখুয্যেমশাই, বুদ্ধি ত আমার যায়নি।

যায়নি কিন্তু ঘুলিয়ে আছে। এখন থাক্। সন্ধ্যের পর সমস্ত কাজকর্ম্ম সেরে আমার কাছে এসে যখন স্থির হয়ে বসবে তখন বলবো। পারি তখনি এর জবাব দেবো।

তবে সেই ভালো, এখন আমারও যে সময় নেই—এই বলিয়া বন্দনা বাহির হইয়া গেল। বস্তুতঃ তাহার কাজের অবধি নাই। সকালে ছুটি লইয়া অন্নদা কালীঘাটে গেছে, সে কাজগুলোও আজ তাহারই কাঁধে পড়িয়াছে। কত চাকর-বাকর, কত ছেলে এখানে থাকিয়া স্কুল-কলেজে পড়ে,—তাহাদের কত রকমের প্রয়োজন। কাজের ভিড়ে তাহার মনেও পড়িল না সে সারা রাত্রি ঘুমায় নাই, সে আজ ভারি ক্লান্ত।

সন্ধ্যার পর বিপ্রদাসের রাত্রির খাওয়া সাঙ্গ হইল, নীচের সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া বন্দনা তাহার শয্যার কাছে আসিয়া একটা চৌকি টানিয়া বসিল, বলিল, মুখুয্যে-মশাই, একটা কথার সত্যি জবাব দেবেন ?

বিপ্রদাস বলিল, সচরাচর তাই ত দিয়ে থাকি। প্রশ্নটা কি ?

বন্দনা বলিল, মেজদিদিকে আপনি কি সত্যিই ভালবাসেন ? ছেলেবেলায় আপনাদের বিয়ে হয়েচে—সে কতদিনের কথা—কখন কি এর অন্যথা ঘটে নি ?

বিপ্রদাস অবাক হইয়া গেল। এমন কথা যে কাহারও মনে আসিতে পারে সে কল্পনাও করে নাই! কিন্তু আপনাকে সামলাইয়া লইয়া সহাস্যে কহিল, তোমার মেজ-দিদিকেই বরঞ্চ এ প্রশ্ন জিজ্ঞেসা করো।

বন্দনা বলিল, তিনি জানবেন কি করে ? আপনার আসল মনের কথা ত শুনেচি কেউ জানতে পারে না। না বলতে চান বলবেন না, আমি একরকম করে বুঝে নেবো, কিন্তু বললে সত্যি কথাই আপনাকে বলতে হবে।

সত্যি কথাই বলবো, কিন্তু আমাকে কি তোমার সন্দেহ হয় ?

হয়। আপনি অনেক বড় মানুষ, কিন্তু তবুও মানুষ। মনে হয় কোথায় যেন আপনি ভারি একলা, সেখানে আপনার কেউ সঙ্গী নেই। এ কথা সত্যি নয়।

বিপ্রদাস এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিল না, বলিল, স্ত্রীকে ভালবাসা যে আমার ধর্ম্ম বন্দনা।

বন্দনা বলিল, ধর্ম্ম যতদূর প্রসারিত ততদূর আপনি খাঁটি, কিন্তু তার চেয়েও বড় কি সংসারে কিছু নেই ?

দেখতে ত পাইনে বন্দনা।

বন্দনা বলিল, আমি দেখতে পাই মুখুয্যেমশাই। বলবো সে কথা।

বিপ্রদাসের মুখ সহসা যেন পাণ্ডুর হইয়া উঠিল,—বলিষ্ঠ গৌরবর্ণ মুখে যেন রক্তের লেশ নাই, দুই হাত সম্মুখে বাড়াইয়া বলিল, না, একটি কথাও নয় বন্দনা। আজ তোমার ঘরে যাও,—কাল হোক, পরশু হোক,—আবার যখন প্রকৃতিস্থ হয়ে আলোচনার বুদ্ধি ফিরে পাবে তখন এর জবাব দেবো। কিংবা হয়তো আপনিই তখন বুঝবে ঐ যারা তোমার মাসীর বাড়িতে বুদ্ধিকে তোমার আচ্ছন্ন করেচে তারাই সব নয়। ধর্ম্ম যাদের কাছে অত্যাজ্য তারাও আছে, জগতে তারাও বাস করে। না না, আর তর্ক নয়,—তুমি যাও।

বন্দনা বুঝিল এ আদেশ অবহেলার নয়। এই হয়ত সেই বস্তু যাহাকে বাড়িশুদ্ধ সকলে ভয় করে। বন্দনা নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

১৯

পরদিন বিকালের দিকে বন্দনা আসিয়া বলিল, মুখুয্যেমশাই, আবার চললুম মাসীমার বাড়িতে। এবার আর ঘণ্টা কয়েকের জন্য নয়, এবার যতদিন না মাসী আমাকে বোম্বায়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারেন ততদিন।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ আরজেণ্ট টেলিগ্রাম এসেচে বাবার হুকুম। কাল সকালবেলা মাসী গাড়ি পাঠাবেন আমাকে নিতে।

বিপ্রদাস কহিল, অর্থাৎ বোঝা গেল তোমার মাসীর প্রতিশোধ নেবার অধ্যবসায় এবং বুদ্ধি আছে। এ বোধ হয় তাঁরই প্রিপেড টেলিগ্রামের জবাব। কই দেখি কাগজটা?

না, সে আপনাকে দেখাতে পারবো না।

শুনিয়া বিপ্রদাস ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল, তারপর ঈষৎ হাসিয়া বলিল, ভগবান যে কারো দর্প রাখেন না এ তারই নমুনা। এতদিন ধারণা ছিল আমাকে জড়ানো যায় না, কিন্তু দেখচি যায়। অন্ততঃ তেমন লোকও আছে। তোমার মাসীর মাথায় এ ফন্দিও খেলেচে। দাও না পড়ে দেখি অভিযোগটা কতখানি গুরুতর, বলিয়া সে হাত বাড়াইল।

এবার বন্দনা কাগজখানা তাঁহার হাতে দিল। রায়সাহেবের সুদীর্ঘ টেলিগ্রাম সমস্তটা আগাগোড়া পড়িয়া সেটা ফিরাইয়া দিয়া বিপ্রদাস বলিল, মোটের ওপর তোমার বাবা অসঙ্গত কিছুই লেখেননি। নিঃস্বার্থ পরোপকারের বিপদ আছে, অসুস্থ আত্মীয়কে সেবা করতে আসাটাও সংসারে সহজ কাজ নয়।

বন্দনা প্রশ্ন করিল, আমাকে কি আপনি মাসীর বাড়িতেই ফিরে যেতে বলেন?

সেই ত তোমার বাবার আদেশ বন্দনা। এ তো বলরামপুরের মুখুয্যেবাড়ি নয় —হুকুম দেওয়ার কর্ত্তা এ-ক্ষেত্রে তোমার মুখুয্যেমশাই নয়,—মাসী আবার আদেশটা দিয়েচেন বাপের মুখ দিয়ে, অতএব মান্য করতেই হবে।

বন্দনা বলিল, এ হলো আপনার মামুলি বচন। বাবা জানেন না কিছুই, তবু সেই আদেশ, ন্যায়-অন্যায় যাই হোক, শুনতে হবে? মাসীর বাড়িটি যে কি সে তো আপনি জানেন।

বিপ্রদাস কহিল, জানিনে, কিন্তু তোমার মুখে শুনেচি সে ভাল জায়গা নয়। আমি সুস্থ থাকলে নিজে গিয়ে তোমাকে বোম্বায়ে পৌঁছে দিয়ে আসতুম, কিন্তু সে শক্তি নেই।

এই অবস্থায় আপনাকে ফেলে চলে যাবো? যে-মাসীকে চিনিনে তাঁর জিদটাই বড় হবে?

কিন্তু উপায় কি?

উপায় এই যে আমি যাবো না।

তবে থাকো। বাবাকে একটা তার করে দাও। কিন্তু মাসী নিতে এলে কি তাঁকে বলবে?

বন্দনা কহিল, যেতে পারবো না, শুধু এই কথাই বলবো। তার বেশি নয়?

বিপ্রদাস বলিল, তোমার মাসী কিন্তু এতেই নিরস্ত হবেন না। এবার হয়ত বাড়িতে আমার মাকে টেলিগ্রাম করবেন।

এ সম্ভাবনা বন্দনার মনে আসে নাই, শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল, বলিল, আপনি ঠিকই বলেচেন মুখুয্যেমশাই, হয়ত কাজটা শেষ হয়েই গেছে—খবর দিতে মাসীর বাকি নেই, কিন্তু কেন জানেন?

বিপ্রদাস কহিল, জানা ত সম্ভব নয়, তবে এটুকু আন্দাজ করা যেতে পারে যে এতখানি উদ্যম তাঁর নিঃস্বার্থ নয়, তোমার একান্ত কল্যাণের জন্যেও নয়; হয়ত কি একটা তাদের মনের মধ্যে আছে।

বন্দনা বলিল, কি আছে আমি জানি। ভাইপো এসেচেন ব্যারিস্টারী পাশ করে,—মাসী দিয়েচেন আমাদের আলাপ-পরিচয় করিয়ে। দৃঢ় বিশ্বাস সে-ই আমার যোগ্য বর। কারণ বাবার আমি এক মেয়ে, যে সম্পত্তি তিনি রেখে যাবেন তার আয়ে উপার্জ্জন না করলেও ভাইপোর অনায়াসে চলে যাবে।

বিপ্রদাস বলিল, ভাইপোর কল্যাণ চিন্তা করা পিসির পক্ষ থেকে দোষের নয়। ছেলেটি দেখতে কেমন?

ভালো।

আমার মতো হবে?

বন্দনা হাসিয়া বলিল, এটি হলো আপনার অহঙ্কারের কথা। মনে বেশ জানেন এত রূপ সংসারে আর নেই; কিন্তু সে তুলনা করতে গেলে সংসারে সব মেয়েকেই যে আইবুড়ো থাকতে হয় মুখুয্যেমশাই! কেবল আপনার পানে চেয়েই তাদের দিন কাটাতে হয়। তবু বলবো দেখতে অশোককে ভালই, খুঁৎ খুঁৎ করা অন্ততঃ আমার সাজে না!

তা হলে পছন্দ হয়েচে বলো?

যদি হয়েও থাকে, সে পছন্দের কেউ দোষ দেবে না বলতে পারি। এই বলিয়া বন্দনা হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, পাঁচটা বাজলো, আপনার বার্লি খাবার সময় হয়েচে—যাই আনিগে। ইতিমধ্যে অশোকের কথাটা আর একটু ভেবে রাখুন,

বলিয়া সে চলিয়া গেল। মিনিট-পাঁচেক পরে সে যখন ফিরিয়া আসিল তাহার হাতে রূপোর বাটিতে বার্লি—বরফের ভিতর রাখিয়া ঠাণ্ডা করা—নেবুর রস নিঙড়াইয়া দিয়া কহিল, এর সবটুকু খেতে হবে, ফেলে রাখলে চলবে না। সেবার ত্রুটি দেখিয়ে কেউ যে আমার কৈফিয়ৎ চাইবে সে আমি হতে দেবো না।

বিপ্রদাস বলিল, জুলুমের বিদ্যেটি ষোল আনায় শিক্ষা করে নিয়েচ, কারো কাছে ঠকতে হবে না দেখচি।

বন্দনা বলিল, না। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবো, মুখুয্যেমশায়ের ওপর হাত পাকিয়ে পাকা হয়ে গেছি।

খাওয়া শেষ হইলে উচ্ছিষ্ট পাত্রটা হাতে করিয়া বন্দনা চলিয়া যাইতেছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার একটি কথার জবাব দেবেন মুখুয্যেমশাই?

কি কথা বন্দনা?

সংসারে সকলের চেয়ে আপনাকে কে বেশি ভালবাসে বলতে পারেন?

পারি।

বলুন ত কি নাম তার?

তার নাম বন্দনা দেবী।

শুনিয়া বন্দনা চক্ষের পলকে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু মিনিট পনেরো পরেই আবার ফিরিয়া আসিয়া বিছানার কাছে একটা চৌকি টানিয়া বসিল। বিপ্রদাস হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, অমন করে ছুটে পালিয়ে গেলে কেন বলো ত?

বন্দনা প্রথমে জবাব দিতে পারিল না। তারপরে ধীরে ধীরে বলিল, কথাটা হঠাৎ কেমন সইতে পারলুম না মুখুয্যেমশাই। মনে হ'ল যেন আমার কি-একটা বিশ্রী চুরি আপনার কাছে ধরা পড়ে গেছে।

তাই এখনো মুখ তুলে চাইতে পারচো না?

তা কেন পারবে না, বলিয়া জোর করিয়া মুখ তুলিয়া বন্দনা হাসিতে গেল, কিন্তু সলজ্জ সরমে সমস্ত মুখখানি তাহার রাঙা হইয়া উঠিল, পরে আত্মসংবরণ করিতে করিতে বলিল, কি করে আপনি এ কথা জানলেন বলুন ত?

বিপ্রদাস কহিল, এ প্রশ্ন একেবারে বাহুল্য বন্দনা। এতই কি পাষাণ আমি যে এটুকুও বুঝতে পারিনি? তা ছাড়া সন্দেহ যদিও কখনো থাকে, আজ তোমার পানে চেয়ে আর তা আমার নেই।

বন্দনা আবার মুখ নীচু করিল।

বিপ্রদাস বলিল, কিন্তু তাই বলে ও চলবে না বন্দনা, মুখ তুলে তোমাকে চাইতে

হবে। লজ্জা পাবার তুমি কিছুই করোনি, আমার কাছে তোমার কোন লজ্জা নেই! চাও, মুখ তোল, শোন আমার কথা।

এ সেই আদেশ। বন্দনা মুখ তুলিয়া চাহিল, ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, আপনি বোধ হয় আমার উপর খুব রাগ করেছেন, না মুখুয্যেমশাই?

বিপ্রদাস স্মিতমুখে বলিল, কিছুমাত্র না। একি রাগ করার কথা? শুধু আমার মনের আশা এইটুকু যে, এ ভুল তোমার নিজের কাছেই একদিন ধরা পড়বে। কেবল সেইদিনই এর প্রতিকার হবে।

কিন্তু ধরা যদি কোনদিন না পড়ে? এ-কে ভুল বলেই যদি কোনদিন টের না পাই?

পাবেই। এর থেকে যে সংসারে কত অনর্থের সূত্রপাত হয় এ যদি না বুঝতে পারো ত আমিও বুঝবো আমাকে তুমি ভালোবাসোনি। সুধীরকে ভালোবাসার মতো এ-ও তোমার একটা খেয়াল—মনের মধ্যে কাউকে টেনে এনে শুধু আপনাকে ভোলানো। তার বেশি নয়।

বন্দনার মুখ মুহূর্তে ম্লান হইয়া উঠিল, অত্যন্ত ব্যথিত-কণ্ঠে বলিল, সুধীরের সঙ্গে তুলনা করবেন না মুখুয্যেমশাই, এ আমি সইতে পারিনে। কিন্তু এর থেকে সংসারে যে অনর্থের সূত্রপাত হয়, আপনার এ কথা মানবো। মানবো যে, এ অমঙ্গল টেনে আনে, কিন্তু তাই বলে মিথ্যে স্বীকার করবো না। মিথ্যেই যদি হ'তো এতটুকু ভালোবাসাই কি আপনার পেতুম? পাইনি কি আমি?

নিরুদ্ধ নিশ্বাসে বিপ্রদাস কথাগুলি শুনিতেছিল, জিজ্ঞাসা শেষ করিয়া বন্দনা মুখ তুলিতেই সে চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, পেয়েচো বই কি বন্দনা, তুমি অনেকখানিই পেয়েচো। নইলে তোমার হাতে আমি খেতুম কি করে? তোমার রাত্রি-দিনের সেবা নিতে পারতুম আমি কিসের জোরে? কিন্তু তাই বলে কি গ্লানির মধ্যে, অধর্মের মধ্যে নিজে নেমে দাঁড়াবো, তোমাকে টেনে নামাবো? যারা আমার পানে চেয়ে চিরদিন বিশ্বাসে মাথা উঁচু করে আছে সমস্ত ভেঙে-চুরে তাদের হেঁট করে দেবো? এই কি তুমি বলো?

বন্দনা দৃপ্তস্বরে কহিল, তা'হলে আপনিও স্বীকার করুন আজ ছাড়তে যা পারেন না সে শুধু এই দম্ভটাকে। বলুন সত্য করে ওদের কাছে এই বড় হয়ে থাকার মোহকেই আপনি বড় বলে জেনেচেন। নইলে কিসের গ্লানি মুখুয্যেমশাই—কাকে মানতে যাবো আমরা অধর্ম্ম বলে? মানুষের মনগড়া একটা ব্যবস্থা—মানুষেই যাকে বারবার মেনেচে, বার বার ভেঙেচে—তাঁকেই? আপনি পারলেও আমি এ পারবো না?

বিপ্রদাস গম্ভীর হইয়া বলিল, তুমি না পারলেও আমি পারবো, আর তাতেই

আমাদের কাজ চলে যাবে। ইংরাজি বই অনেক পড়েচো বন্দনা, মাসীর বাড়িতে আলোচনাও অনেক শুনেচো, সে সব ভুলতে সময় লাগবে দেখচি।

বন্দনা কহিল, আপনি আমাকে তামাসা করচেন, আমি কিন্তু একটুও তামাসা করিনি মুখুয্যেমশাই, যা বলেচি সমস্তই সত্যি বলেচি।

তা বুঝেচি। কিন্তু এ পাগলামি মাথায় এনে দিল কে?

আপনি।

বলো কি? এ অধর্ম্ম বুদ্ধি দিলুম তোমাকে অবশেষে নিজে আমিই?

হাঁ, আপনি দিয়েচেন। হয়তো না জেনে, কিন্তু আপনি ছাড়া আর কেউ নয়।

এইবার বিপ্রদাস নির্ব্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। বন্দনা বলিতে লাগিল, যাকে অধর্ম্ম বলে নিন্দে করলেন তাকে ত আমি মানিনে,—আমি জানি, ধর্ম্ম বলে স্বীকার করেচেন যা একমনে সে শুধু আপনার সংস্কার। অত্যন্ত দৃঢ় সংস্কার, তবু সে তার বড়ো নয়।

বিপ্রদাস মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিল, বলিল, হয়তো এ কথা তোমার সত্যি বন্দনা, এ আমার সংস্কার,—সুদৃঢ় সংস্কার, কিন্তু মানুষের ধর্ম্ম যখন এই সংস্কারের রূপ ধরে বন্দনা, তখনি সে হয় যথার্থ, তখনি হয় সে সহজ। জীবনের কর্ত্তব্যে আর তখন ঠোকাঠুকি বাধে না, তাকে মানতে গিয়ে নিজের সঙ্গে লড়াই করে মরতে হয় না। তখন বুদ্ধি হয়ে আসে শান্ত, অবাধ জলস্রোতের মতো সে সহজে বয়ে যায়। বুঝি একেই বলেছিলুম সেদিন, এ হলো বিপ্রদাসের অত্যাজ্য ধর্ম্ম—এর আর পরিবর্ত্তন নেই।

কোনদিনই কি এর পরিবর্ত্তন নেই মুখুয্যেমশাই?

তাইতো আজও জানি বন্দনা। আজও ভাবতে পারিনে এ-জীবনে এর পরিবর্ত্তন আছে।

এতক্ষণে বন্দনার দুই চোখ বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল, বিপ্রদাস সযত্নে তাহার হাতখানি টানিয়া লইয়া বলিল, কিন্তু এ পরিবর্ত্তনেরই বা দরকার কিসের? ভালো তোমাকে বেসেচি,—রইলো তোমার সে ভালোবাসা আমার মনের মধ্যে—এখন থেকে সে দেবে তোমাকে সান্ত্বনা, দুর্ব্বলতায় বল, ভার যখন আর একাকী বইতে পারবো না তখন দেবো আমাকে ডাক। সে-ও রইলো আজ থেকে তোমার জন্যে তোলা। আসবে ত তখন?

বন্দনা বাঁ হাত দিয়া চোখ মুছিয়া বলিল, আসবো যদি আসবার শক্তি থাকে,—পথ যদি থাকে তখনও খোলা, নইলে পারবো না ত আসতে মুখুয্যেমশাই!

কথাটা শুনিয়া বিপ্রদাস যেন চমকিয়া গেল, বলিল, বটেই ত! বটেই ত!

আসার পথ যদি থাকে খোলা, চিরদিনের তরে যদি বন্ধ হয়ে সে না যায়। তখন এসো কিন্তু। অভিমানে মুখ ফিরিয়ে থেকো না।

বন্দনা চোখের জল আবার মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, আমার একটি ভিক্ষে রইলো মুখুয্যেমশাই, আমার কথা যেন কাউকে বলবেন না।

না, বলবো না। বলার লোক যে আমার নেই সে তো তুমি নিজেই জানতে পেরেচো।

হাঁ পেরেচি।

দুইজনে কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল।

বিপ্রদাস কহিল, এই বিপুল সংসারে আমি যে এতখানি একা এ কথা তুমি কি করে বুঝেছিলে বন্দনা?

বন্দনা বলিল, কি জানি কি করে বুঝেছিলুম। আপনাদের বাড়ি থেকে রাগ করে চলে এলুম, আপনি এলেন সঙ্গে। গাড়িতে সেই মাতাল সাহেবগুলোর কথা মনে পড়ে? ব্যাপারটা বিশেষ কিছু নয়—তবু মনে হলো যাদের আমরা চারপাশে দেখি তাদের দলের আপনি নয়,—একাকী কোন ভার কাঁধে নিতেই আপনার বাধে না। এই কথাই বলেছিলেন সেদিন দ্বিজুবাবু,—মিলিয়ে দেখলুম কারও কাছে কিছুই আপনি প্রত্যাশা করেন না। রাত্রে বিছানায় শুয়ে কেবলি আপনাকে মনে পড়ে—কিছুতে ঘুমোতে পারলুম না। শেষরাত্রে উঠে দেখি নিচে পূজোর ঘরে আলো জ্বলছে, আপনি বসেচেন ধ্যানে। একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে ভোর হয়ে এলো, পাছে চাকররা কেউ দেখতে পায় ভয়ে ভয়ে পালিয়ে এলুম আমার ঘরে। আপনার সে মূর্ত্তি আর ভুলতে পারলুম না মুখুয্যেমশাই, আমি চোখ বুজলেই দেখতে পাই।

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, দেখেছিলে নাকি আমাকে পূজো করতে?

বন্দনা বলিল, পূজো করতে ত আপনার মাকেও দেখেচি, কিন্তু সে ও নয়। সে আলাদা। আপনি কিসের ধ্যান করেন মুখুয্যেমশাই?

বিপ্রদাস পুনরায় হাসিয়া বলিল, সে জেনে তোমার কি হবে? তুমি ত তা করবে না!

না করবো না। তবু জানতে ইচ্ছে করে।

বিপ্রদাস চুপ করিয়া রহিল। বন্দনা কহিতে লাগিল, আমার সেইদিনই প্রথম মনে হয় সকলের মধ্যে থেকেও আপনি আলাদা, আপনি একা। যেখানে উঠলে আপনার সঙ্গী হওয়া যায় সে উঁচুতে ওরা কেউ উঠতে পারে না। আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো মুখুয্যেমশাই? বলবেন?

কি কথা বন্দনা?

মেয়েদের ভালোবাসায় বোধ হয় আর আপনার প্রয়োজন নেই—না ?

এ প্রশ্নের মানে ?

মানে জানিনে, এমনি জিজ্ঞাসা করচি। এ বোধ হয় আর আপনি কামনা করেন না,—আপনার কাছে একেবারে তুচ্ছ হয়ে গেছে।—সত্যি কি-না বলুন।

বিপ্রদাস উত্তর দিল না, শুধু হাসিমুখে চাহিয়া রহিল।

নীচের প্রাঙ্গণে সহসা গাড়ির শব্দ শোনা গেল, আর পাওয়া গেল দ্বিজদাসের কণ্ঠস্বর। এর পরক্ষণেই দ্বারের কাছে আসিয়া অন্নদা ডাকিয়া বলিল, দ্বিজু এলো বিপিন।

একলা নাকি ? না, আর কেউ সঙ্গে এলো ?

না, একাই ত দেখচি। আর কেউ নেই।

শুনিয়া বন্দনা ব্যস্ত হইয়া উঠিল, বলিল, যাই মুখুয্যেমশাই, দেখিগে তার খাবার যোগাড় ঠিক আছে কি না। বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

সকালে দ্বিজু আসিয়া যখন বিপ্রদাসের পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল তখন ঘরের একধারে বসিয়া বন্দনা পূজার সজ্জা প্রস্তুত করিতেছিল, দ্বিজদাস বলিল, এই পঞ্চমীতে মায়ের পুকুর প্রতিষ্ঠা। বৃহৎ ব্যাপার দাদা ?

মায়ের কাজে ত বৃহৎ ব্যাপারই হয় দ্বিজু, এতে ভাবনার কি আছে ? বলিয়া বিপ্রদাস হাসিল।

দ্বিজদাস কহিল, তা হয়। এবার সঙ্গে মিলেছে বাসুর ভালো হওয়ার মানত-পূজো—সেও একটা অশ্বমেধ-যজ্ঞ। অধ্যাপক বিদায়ের-ফর্দ্দ তৈরী হচ্ছে,—কুটুম্ব-স্বজন অতিথি-অভ্যাগতের যে সংক্ষিপ্ত তালিকা বৌদিদির মুখে মুখে পেলুম তাতে আশঙ্কা হয় এবার আপনার অর্থে ওরা কিঞ্চিৎ গভীর খাবোল মারবে। সময় থাকতে সতর্ক হোন।

বন্দনা মুখ তুলিল না, কিন্তু সামলাইতে না পারিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল। বিপ্রদাস বিষয়ী লোক, বিপ্রদাস কৃপণ, এ দুর্নাম একা মা ছাড়া প্রচার করিবার সুযোগ পাইলে কেহ ছাড়ে না। বিপ্রদাস নিজেও এ-হাসিতে যোগ দিয়া বলিল, এবার কিন্তু তোর পালা। এবার খরচ হবে তোর।

আমার ? কোন আপত্তি নেই যদি থাকে। কিন্তু তাতে ব্যবস্থার কিছু অদল-বদল করতে হবে। বিদায় যারা পাবে তারা টোলের পণ্ডিত-সমাজ নয়, বরঞ্চ টোলের দোর বন্ধ করে যাদের বাইরে ঠেলে রাখা হয়েচে—তারা।

বিপ্রদাস তেমনই হাসিয়া কহিল, টোলের ওপর তোর রাগ কিসের ? লোকের মুখে-মুখে এদের শুধু নিন্দেই শুনলি, নিজে কখনও চোখে দেখলিনে। ওদের দল-ভুক্ত বলে হয়ত আমি পর্য্যন্ত তোর আমলে ভাত পাবো না।

দ্বিজদাস কাছে আসিয়া আর একবার পায়ের ধূলা লইল, কহিল, ঐ কথাটা বলবেন না। আপনি দু-দলেরই বাইরে, অথচ তৃতীয় স্থানটা যে কি তাও আমি জানিনে। শুধু এইটুকু জেনে রেখেচি আমার দাদা আমাদের বিচারের বাইরে।

বিপ্রদাস কথাটাকে চাপা দিল। জিজ্ঞাসা করিল, আমার অসুখের কথা মা শোনেননি ত?

না। সে বরঞ্চ ছিল ভালো, পুকুর-প্রতিষ্ঠার হাঙ্গামা বন্ধ হ'তো।

আত্মীয়দের আনবার ব্যবস্থা হয়েচে?

হচ্চে। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান—সকলকেই। সকন্যা অক্ষয়বাবুর আমন্ত্রণ-লিপি গেছে, মায়ের বিশ্বাস বৃহৎ ব্যাপারে মৈত্রেয়ীর অগ্নিপরীক্ষা হয়ে যাবে। আমার ওপর ভার পড়েচে তাঁদের নিয়ে যাবার।

মা আর কাউকে নিয়ে যাবার কথা বলে দেননি?

হাঁ, অনুদিকেও নিয়ে যেতে হবে। কলেজের ছেলেরা যদি কেউ যেতে চায় তারাও!

তোর বউদিদির কোন ফরমাস নেই?

না।

নীচে আবার মোটরের শব্দ পাওয়া গেল। হর্নের চেনা আওয়াজ কানে আসিতেই বন্দনা জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিল, মাসীমার গাড়ি। আমি দেখি গে মুখুয্যেমশাই। আপনি সন্ধ্যে-আহ্নিক সেরে নিন—দেরি হয়ে যাচ্চে। বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

আমিও যাই মুখ-হাত ধুইগে। ঘণ্টাখানেক পরে আসবো, বলিয়া দ্বিজদাসও চলিয়া গেল। বিপ্রদাসের পূজা-আহ্নিক সমাপ্ত হইল, আজ খাবার ফল-মূল দিয়া গেল অন্নদা। মাসীর বাড়ি হইতে যে মেয়েটি নিতে আসিয়াছে বন্দনা ব্যস্ত আছে তাহাকে লইয়া। এ খবর সে-ই দিল।

দ্বিজদাস যথাসময়ে ফিরিয়া আসিল। হাতে তাহার বিরাট ফর্দ্দ, কলিকাতার অর্দ্ধেক জিনিস কিনিয়া গাড়ি বোঝাই করিয়া চালান দিতে হইবে। দুই ভাইয়ে এই লইয়া যখন ভয়ানক ব্যস্ত তখন দরজার বাহির হইতে প্রার্থনা আসিল, মুখুয্যেমশাই, আসতে পারি কি? পায়ে কিন্তু আমার জুতো রয়েচে।

জুতো! তা হোক, এসো।

বন্দনা ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। যে-বেশে বলরামপুরে তাকে প্রথম দেখা গিয়েছিল এ সেই বেশ। বিপ্রদাস অত্যন্ত বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, কোথাও যাচ্চো নাকি বন্দনা?

হাঁ, মাসীমার বাড়িতে।

কখন ফিরবে ?

ফেরবার কথা ত জানিনে মুখুয্যেমশাই। এই বলিয়া হেঁট হইয়া সে বিপ্রদাসকে প্রণাম করিল, কিন্তু অন্যদিনের মতো পায়ে হাত দিয়া স্পর্শ করিল না। মুখ তুলিল না, শুধু কপালে হাত ঠেকাইয়া দ্বিজদাসকেও নমস্কার করিল, তাহার পরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

২০

দ্বিজদাস জিজ্ঞাসা করিল, বন্দনা হঠাৎ চলে গেল কেন ? আমার এসে পড়াটাই কি কারণ নাকি ?

বিপ্রদাস বলিল, না। ওঁর বাবা টেলিগ্রাম করেচেন মাসীর বাড়িতে গিয়ে থাকতে যতদিন না বোম্বায়ে ফিরে যাওয়া ঘটে।

কিন্তু হঠাৎ মাসী বেরুলো কোথা থেকে ? বন্দনা আমার সঙ্গে ত প্রায় কথাই কইলেন না, সর্ব্বক্ষণ আড়ালে আড়ালে রইলেন, তার পর সকাল না হতে হতেই দেখচি সরে পড়লেন। একটা নমস্কার করে গেলেন সত্যি, কিন্তু সে-ও মুখ ফিরিয়ে। আমার বিরুদ্ধে হ'লো কি তাঁর ?

প্রশ্নের জবাবটা বিপ্রদাস এড়াইয়া গেল এবং মাসীর ব্যাপারটা সংক্ষেপে জানাইয়া কহিল, আমার অসুখে ভয় পেয়ে এই মাসীর বাড়ি থেকেই অনুদি ওকে ডেকে এনেছিলেন আমার শুশ্রূষা করতে। যথেষ্ট করেচে। ওর কাছে তোদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

দ্বিজদাস কহিল, উচিত নয় বলিনে, কিন্তু আপনাকে সেবা করতে যাওয়াটাও ত একটা ভাগ্য! সে মূল্যটা যদি উনিও অনুভব করতে পেরে থাকেন ত কৃতজ্ঞতা ওঁর কাছেও আমাদের পাওনা আছে।

বিপ্রদাস সহাস্যে কহিল, তুই ভারি নরাধম।

দ্বিজদাস বলিল, নরাধম কিন্তু নির্ব্বোধ নই। আমার কথা যাক্। কিন্তু এই সেবা করার কথাটা মায়ের কানে গেলে উনি চিরকাল আমাদের মাকেই কিনে রাখবেন। সেই কি সোজা সম্পদ ?

শুনিয়া বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, মাকে এতকাল পরে তুই চিনতে পেরেছিস্ বল্ ?

দ্বিজদাস বলিল, যদি পেরেও থাকি সে শুধু আপনিই জানুন। আমি মায়ের কুপুত্র, আমি কুলাঙ্গার, তাঁর কাছে এই পরিচয়ই থাক্। একে আর নাড়িয়ে কাজ নেই দাদা।

কিন্তু কেন? মা তোকে বিশ্বাস করতে পারেন, তোকে ভাল ভাবতে পারেন, এ কি তুই সত্যিই চাস্‌নে? এ অভিমানে লাভ কি বল্‌তো?

লাভ কি জানিনে, কিন্তু লোভ বিশেষ নেই। আমি আপনার পেয়েছি স্নেহ, পেয়েছি বউদিদির ভালবাসা, এই আমার সাত রাজার ধন, সাতজন্ম দু'হাতে বিলিয়েও শেষ করতে পারবো না, কিন্তু বলিয়া ফেলিয়াই তাহার চোখ-মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। হৃদয়ের এই সকল আবেগ-উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিতে সে চির'দিন পরাঙ্মুখ,—চিরদিন নিস্পৃহতার আবরণে ঢাকা দিয়া বেড়ানোই তাহার প্রকৃতি,—মুহূর্ত্তে নিজেকে সামলাইয়া ফেলিয়া বলিল, কিন্তু এ-সব আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যেটা প্রয়োজন সে হচ্ছে এই যে, আমার চোখে বন্দনার চলে যাওয়ার ভাবটা দেখালো যেন রাগের মতো। এর মানেটা বলে দিন।

মানেটা বোধ হয় এই যে, তুই যখন এসে পড়েছিস্ তখন ওর আর দরকার নেই। এখন থেকে সেবা-শুশ্রূষার ভার তোর উপর। এই বলিয়া বিপ্রদাস হাসিতে লাগিল।

দ্বিজদাস বলিল, আপনি ঠাট্টা করছেন বটে, কিন্তু আমি বলচি, এইসব ইংরাজি-নবিশ মেয়েগুলো এই দম্ভতেই একদিন মরবে। আপনাকে রোগে সেবা করার দিন যেন-না কখনও আসে, কিন্তু এলে প্রমাণ হতে দেরি হবে না যে দাদার সেবায় দ্বিজুকে হারানো দশটা বন্দনার সাধ্যে কুলোবে না, এ কথা তাকে জানিয়ে দেবেন।

স্নেহ-হাস্যে বিপ্রদাসের মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কহিল, আচ্ছা জানাবো, কিন্তু বিশ্বাস করবে কিনা জানিনে। তবে সে পরীক্ষার প্রয়োজন দাদার কাছে নেই,—আছে শুধু একজনের কাছে, সে মা। বোঝা-পড়া তোদের একটা হওয়া দরকার—বুঝলি রে দ্বিজু?

দ্বিজদাস বলিল, না দাদা বুঝলাম না। কিন্তু মা যখন, তখন বেঁচে থাকলে বোঝা-পড়া একদিন হবেই, কিন্তু এখুনি প্রয়োজনটা কিসের এলো এইটেই ভেবে পাচ্ছিনে। এই বলিয়া ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিল, আমার কপালে সবই উল্টো। বাবা জন্ম দিলেন, কিন্তু দিয়ে গেলেন না কানাকড়ির সম্পত্তি—সে দিলেন আপনি। মা গর্ভে ধারণ করলেন, কিন্তু পালন করলেন অন্নদাদিদি, আর সমস্ত ভার বয়ে মানুষ করে তুললেন বৌদিদি,—দুজনেই পরের ঘর থেকে এসে। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ এবং মাতা স্বর্গাদপি গরীয়সী—এই শ্লোক আউড়ে মনকে আর কত চাঙ্গা রাখবো দাদা, আপনিই বলুন?

বিপ্রদাস কহিল, মায়ের মামলা নিয়ে আর ওকালতি করবো না, সে তুই আপনিই একদিন বুঝবি, কিন্তু বাবার সম্বন্ধে যে ধারণা তোর আছে সে ভুল। অর্দ্ধেক বিষয়ের সত্যিই তুই মালিক।

দ্বিজদাস বলিল, হতে পারে সত্যি, কিন্তু বাবার মৃত্যুর পরে ঘরে দোর দিয়ে তাঁর উইলখানা কি আপনি পুড়িয়ে ফেলেননি?

কে বলল তোকে?

এতকাল যিনি আমাকে সকল দিক দিয়ে রক্ষে করে এসেচেন সে তাঁর মুখেই শোনা।

তা হতে পারে, কিন্তু তোর বৌদিদি ত সে উইল পড়ে দেখেননি। এমন ত হতে পারে বাবা তোকেই সমস্ত দিয়ে গিয়েছিলেন বলে রাগ করে আমি তা পুড়িয়েছি। অসম্ভব ত নয়।

শুনিয়া কৌতুকের হাসিতে দ্বিজদাস প্রথমটা খুব হাসিয়া লইয়া কহিল, দাদা, আপনি যে কখনো মিথ্যে বলেন না! দ্বাপরে যুধিষ্ঠিরের মিথ্যেটা নোট করে গিয়েছিলেন বেদব্যাস, আর কলিতে আপনারটা নোট করে রাখবে দ্বিজদাস। দুই-ই হবে সমান। যা হোক, এটা বোঝা গেল, বিপাকে পড়লে সবই সম্ভব হয়। আর পাপ বাড়াবেন না, এখন থেকে কি আমাকে করতে হবে?

আমাদের কারবার বিষয়-আশয় সমস্ত দেখতে হবে।

কিন্তু কেন? কিসের জন্যে এত ভার আমি বইতে যাবো আমাকে বুঝিয়ে দিন। আপনি একা পারচেন না নাকি? অসম্ভব। আমি নিষ্কর্মা অপদার্থ হয়ে যাচ্ছি? না, যাচ্ছিনে। তবু মা জিজ্ঞেস করলে তাঁকে জানিয়ে দেবেন পদার্থের আসার দরকার নেই, অপদার্থ হয়েই আমি দিন কাটিয়ে দেবো, তাঁকে ভাবতে হবে না। আপনি থাকতে টাকা-কড়ি বিষয়-সম্পত্তির বোঝা আমি বইব না। শেষে কি আপনাদের মতো ঘোরতর বিষয়ী হয়ে উঠব নাকি? লোকে বলবে, ওর শিরের মধ্যে দিয়ে রক্ত বয় না, বয় শুধু টাকার স্রোত। বলিতে বলিতেই লক্ষ্য করিল বিপ্রদাস অন্যমনস্ক হইয়া কি যেন ভাবিতেছে, তাহার কথায় কান নাই। এমন সচরাচর হয় না,—এ স্বভাব বিপ্রদাসের নয়, একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, দাদা, সত্যিই কি চান আমি বিষয়-কর্ম্ম দেখি, যা আমার চিরদিনের স্বপ্ন সেই স্বদেশ-সেবায় জলাঞ্জলি দিই?

বিপ্রদাস তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিল, জলাঞ্জলি দিবি এমন কথা ত তোকে কোনদিনই বলিনে দ্বিজু। যা তোর স্বপ্ন সে তোর থাক্,—চিরদিন থাক—তবু বলি সংসারের ভার তুই নে।

কিন্তু কেন বলুন? কারণ না জানলে আমি কিছুতেই এ-কথা মানবো না।

বিপ্রদাস এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া বলিল, এর কারণ ত খুবই স্পষ্ট দ্বিজু। আজ আমি আছি, কিন্তু এমন ত ঘটতে পারে আর আমি নেই।

দ্বিজদাস জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, না, ঘটতে পারে না। আপনি নেই,—কোথাও নেই এ আমি ভাবতে পারিনে।

তাহার বিশ্বাসের প্রবলতা বিপ্রদাসকে আঘাত করিল, কিন্তু হাসিয়া বলিল, সংসারে সবই ঘটে রে, এমন কি অসম্ভবও। এই কথাটা ভাবতে যারা ভয় পায় তারা নিজেদের ঠকায়! আবার এমনও হতে পারে আমি ক্লান্ত, আমার ছুটির দরকার,—তবু দিবিনে তুই?

না দাদা, পারবো না দিতে। তার চেয়ে সহজ আপনার আদেশ পালন করা। বলুন, কবে থেকে আমাকে কি করতে হবে।

আজ থেকে এ সংসারের সব ভার নিতে হবে।

আজ থেকেই? এতই তাড়াতাড়ি? বেশ তাই হবে। আপনার অবাধ্য হবো না। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল, কিন্তু শুনিতে পাইল দাদার কথা—তোকে বলতে হবে না রে, আমি জানি আমার অবাধ্য তুই নয়।

দ্বিজদাসের কাজ শুরু হইয়া গেল। সে অলস, অকর্ম্মণ্য, উদাসীন এই ছিল সকলের চিরদিনের অভিযোগ। কিন্তু দাদার আদেশে মায়ের ব্রত-প্রতিষ্ঠার সুবৃহৎ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার সর্ব্বপ্রকার দায়িত্ব আসিয়া পড়িল যখন একাকী তাহার পরে তখন এ দুর্নাম অপ্রমাণ করিতে তাহার অধিক সময় লাগিল না। এই অনভ্যস্ত গুরুভার সে যে এত স্বচ্ছন্দে বহন করিবে এতখানি আশা বিপ্রদাস করে নাই, কিন্তু তাহার নিরলস, সুশৃঙ্খল কর্ম্মপটুতায় সে যেন একেবারে বিস্মিত হইয়া গেল। যাহা কিনিয়া পাঠাইবার তাহা গাড়ি বোঝাই করিয়া দ্বিজদাস বাড়ি পাঠাইল, যাহা লইবার তাহা সঙ্গে রাখিল, আত্মীয়-কুটুম্বগণকে একত্র করিয়া যথাযোগ্য সমাদরে রওনা করিয়া দিল, এখানকার সকল কার্য্য সমাধা করিয়া আজ গৃহে ফিরিবার দিন সে দাদার শেষ উপদেশ গ্রহণ করিতে তাঁহার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল সেখানে বসিয়া বন্দনা। সেই যাবার দিন হইতে আর সে আসে নাই, তাহার কথা কাজের ভিড়ে দ্বিজদাস ভুলিয়াছিল—আজ হঠাৎ তাহাকে দেখিতে পাইয়া মনে মনে সে আশ্চর্য্য হইল, কিন্তু সে-ভাব প্রকাশ না করিয়া শুধু একটা মামুলি নমস্কার শিষ্টাচার সারিয়া লইয়া বলিল, দাদা, আজ রাত্রির গাড়িতে আমি বাড়ি যাচ্ছি; সঙ্গে যাচ্চেন অক্ষয়বাবু, তার স্ত্রী ও কন্যা মৈত্রেয়ী। আপনার কলেজের ছাত্ররা বোধ করি কাল-পরশু যাবে,—তাদের ভাড়া দিয়ে গেলুম। অনুদিকে কি সঙ্গে নিয়ে যাবেন? কিন্তু দিন তিন-চারের বেশি বিলম্ব করবেন না যেন।

আমাকে কি যেতেই হবে?

হাঁ। না যান তো একজোড়া খড়ম কিনে দিন, নিয়ে গিয়ে ভরতের ম'তো সিংহাসনে বসাবো।

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, ফাজিলের অগ্রগণ্য হয়েচিস্ তুই। কিন্তু আশ্চর্য্য করলি অক্ষয়বাবুর কথায়। তিনি যাবেন কি করে? তাঁর তো ছুটি নেই—কাজ কামাই হবে যে?

দ্বিজদাস বলিল, তা হবে; কিন্তু লোকসান নেই—ওদিকে তার চেয়েও ঢের বড় কাজ হবে বড়-ঘরে মেয়ে দিতে পারাটা। টাকা-ওয়ালা জামাই ভবিষ্যতের অনেক ভরসা—কলেজের বাঁধা মাইনের অনেক বেশি।

বিপ্রদাস রাগিয়া বলিল, তোর কথাগুলো যেমন রূঢ় তেমনি কর্কশ। মানুষের সম্মান রেখে কথা কইতে জানিসনে?

দ্বিজদাস বলিল, জানি কি-না বৌদিদিকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন। সৌজন্যের বাজে অপব্যয় করিনে শুধু এই আমার দোষ।

শুনিয়া বিপ্রদাস না হাসিয়া পারিল না, বলিল তোর একটি সাক্ষী শুধু বৌদিদি। মাতালের সাক্ষী শুঁড়ী।

দ্বিজদাস কহিল, তা হোক, আপনার কথাটাও ঠিক মধু-মাখা হচ্চে না দাদা। কারণ আমিও মাতাল নই, তিনিও মদের যোগান দেন না। দেন অমৃত, দেন গোপনে বহুলোকের অন্ন যা অনেক বড়লোক পারে না।

বিপ্রদাস কহিল, তাদের পেরেও কাজ নেই। আদর দিয়ে দেওরকে অন্ধ করে তোলা ছাড়া বড়লোকদের অন্য কাজ আছে।

বন্দনা মুখ নীচু করিয়া হাসিতে লাগিল, দ্বিজদাস সেটা লক্ষ্য করিয়া বলিল, এ নিয়ে আর তর্ক করবো না দাদা। বৌদিদি আপনার নেই,—বাঙালীর সংসারে তাঁর স্নেহ যে কি সে আপনি কোনদিন জানেন না। অন্ধকে আলো বোঝানোর চেষ্টায় ফল নেই। একটু হাসিয়া বলিল, বন্দনা আড়ালে হাসচেন, কিন্তু মাসীর বাড়ির বদলে দিনকতক আমাদের বাড়িতে কাটিয়ে এলে হয়ত আমার কথাটা বুঝতেন। কিন্তু থাকগে এ-সব আলোচনা। আপনি কবে বাড়ি যাচ্চেন বলুন?

আমি বড় ক্লান্ত দ্বিজু, মাকে বুঝিয়ে বলতে পারবিনে?

বিপ্রদাসের এমন নির্জ্জীব নিস্পৃহ কণ্ঠস্বর সে কখনো শোনে নাই চমকিয়া চাহিয়া দেখিল ক্ষীণ হাসিটুকু তখনো ওষ্ঠপ্রান্তে লাগিয়া আছে—কিন্তু এ যেন তাহার দাদা নয় আর কেহ—বিস্ময় ও ব্যথায় অভিভূত হইয়া কহিল, অসুখ কি এখনো সারেনি দাদা?

না, সেরে গেছে।

তবু মায়ের কাজে বাড়ি যেতে পারবেন না এ কথা মাকে বোঝাবো কি করে? ভয় পেয়ে তিনি চলে আসবেন, তাঁর সমস্ত আয়োজন লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।

বিপ্রদাস ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, তুই আমাকে কবে যেতে বলিস?

দ্বিজদাস বলিল, আজ, কাল, পরশু—যবে হোক। আমাকে অনুমতি দিন আমি নিজে এসে আপনাকে নিয়ে যাবো।

বিপ্রদাস হাসিমুখে কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া কহিল, বেশ তাই হবে। আমি নিজেই যেতে পারবো, তোকে ফিরে আসতে হবে না।

দ্বিজদাস চলিয়া গেলে বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, এটা কি হলো মুখুয্যেমশাই, বাড়ি যেতে আপত্তি করলেন কিসের জন্যে?

বিপ্রদাস কহিল, কারণটা ত নিজের কানেই শুনলে?

শুনলুম, কিন্তু ও-জবাব পরের জন্যে, আমার জন্যে নয়। বলুন কিসের জন্যে বাড়ি যেতে চান না। আপনাকে বলতেই হবে।

আমি ক্লান্ত।

না।

না কেন? ক্লান্তিতে সকলের দাবী আছে, নেই কি শুধু আমার?

আপনারও আছে, কিন্তু সে দাবী সত্যিকার হলে সকলের আগে বুঝতে পারতুম আমি। আর সকলের চোখকেই ঠকাতে পারবেন, পারবেন না ঠকাতে শুধু আমার চোখকে। যাবার সময় মেজদিকে চিঠি লিখে যাবো, আপনার রাগ ধরবার কখনো দরকার হলে যেন তিনি আমাকে ডেকে পাঠান।

মেজদি নিজে পারবেন না রাগ ধরতে, তুমি দেবে ধরে! এ কথা শুনলে কিন্তু তিনি খুশী হবেন না।

বন্দনা বলিল, খুশী হবেন না সত্যি, কিন্তু কৃতজ্ঞ হবেন। আমার মেজদি হলেন সে-যুগের মানুষ, স্বামী তাঁকে খুঁজে বেছে নিতে হয়নি, ভগবান দিয়েছিলেন আশীর্ব্বাদের মতো অঞ্জলি পূর্ণ করে। তখন থেকে সুস্থ সবল মানুষটিকে নিয়েই তাঁর কারবার। কিন্তু সে মানুষেরও যে হঠাৎ একদিন মন ভাঙতে পারে এ খবর তিনি জানবেন কি করে?

বিপ্রদাস কথা না কহিয়া শুধু একটুখানি হাসিল।

বন্দনা বলিল, আপনি হাসলেন যে বড়ো?

বিপ্রদাস বলিল, হাসি আপনি আসে বন্দনা। স্বামী খুঁজে-বেছে নেবার অভিযানে আজ পর্য্যন্ত যাদের তুমি দেখতে পেয়েচো তাদের বাইরে যে কেউ আছে তা তোমরা ভাবতে পারো না। সংসারে সাধারণ নিয়মটাই শুধু মানো, স্বীকার করতে চাও না তার ব্যতিক্রমটাকে। অথচ এই ব্যতিক্রমটার জোরেই টিকে আছে ধর্ম্ম, টিকে আছে পুণ্য, আছে কাব্য-সাহিত্য, আছে অবিচলিত শ্রদ্ধা বিশ্বাস! এ না থাকলে পৃথিবীটা যেতো একেবারে মরুভূমি হয়ে। এই সত্যটাই আজও জানো না।

বন্দনা বিদ্রূপের সুরে বলিল, এই ব্যতিক্রমটা বুঝি আপনি নিজে মুখুয্যেমশাই? কিন্তু সেদিন যে বললেন আমাকেও আপনি ভালবাসেন?

সে আজও বলি। কিন্তু ভালবাসার একটিমাত্র পথই তোমাদের চোখে পড়ে আর সব থাকে বন্ধ; তাই সেদিনের কথাগুলো আমার তুমি বুঝতে পারনি। একবার দেখে এসো গে দ্বিজু আর তার বৌদিদিকে। দৃষ্টি অন্ধ না হোলে দেখতে পাবে কি করে শ্রদ্ধা গিয়ে মিশেচে ভালবাসার সঙ্গে? রহস্য-কৌতুকে, আদরে-আহ্লাদে, নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় সে শুধু তার বৌদিদি নয়, সে তার বন্ধু, সে তার মা। সেই সম্বন্ধ ত তোমার-আমারও,—ঠিক তেমনি করেই কেন আমাকে তুমি নিতে পারলে না বন্দনা!

তাহার কণ্ঠস্বরের মধ্যে ছিল গভীর স্নেহের সঙ্গে মিশিয়া তিরস্কারের সুর, বন্দনাকে তাহা কঠিন আঘাত করিল। কিছুক্ষণ নীরবে অধোমুখে থাকিয়া সহসা চোখ তুলিয়া বলিল, আপনাকে আমি ভুল বুঝেছিলুম মুখুয্যেমশাই। আমার মেজদিদিকে যদি আপনি সত্যই ভালোবাসতেন, দুঃখ আমার ছিল না; কিন্তু তা আপনি বাসেন না। আপনি পালন করেন শুধু ধর্ম্ম, মেনে চলেন শুধু কর্ত্তব্য। কঠিন আপনার প্রকৃতি,—কাউকে ভালোবাসতে জানেন না। যত ঢেকেই রাখুন এ সত্য একদিন প্রকাশ পাবেই।

ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিয়া উঠিল, আজ আমার ভুলও ভাঙলো। শূন্যের মধ্যে হাত বাড়িয়ে মানুষ খুঁজতে আর না যাই, আজ আমাকে এই আশীর্ব্বাদ আপনি করুন।

বিপ্রদাস সহাস্যে হাত বাড়াইয়া বলিল,—করলুম তোমাকে সেই আশীর্ব্বাদ। আজ থেকে মানুষ খোঁজা যেন তোমার শেষ হয়, যে তোমার চিরদিনের তাকে যেন তিনিই তোমাকে দান করেন।

কথাটাকে অপমানকর পরিহাস মনে করিয়া বন্দনা রাগিয়া বলিল, আপনি ভুল করেচেন মুখুয্যেমশাই, মানুষ খুঁজে বেড়ানোই আমার পেশা নয়। তারা আলাদা। কিন্তু হঠাৎ আজ কেন এসেচি এখনো সেই কথাটা আপনাকে বলা হয়নি। এদিক দিয়ে সত্যিই আমার একটা মস্ত ভুল ভেঙে গেছে। এখানে আপনাদের সংস্রবে এসে ভেবেছিলুম এই সব আচার-বিচার বুঝি সত্যিই ভালো, খাওয়া-ছোঁয়ার নিয়ম মেনে চলা, ফুল তোলা, চন্দন ঘষা, পূজোর সাজ-গোছ করা—আরও কত কি খুঁটিনাটি,—মনে করতুম এ সব বুঝি সত্যিই মানুষকে পবিত্র করে তোলে, কিন্তু এবার মাসীমার বাড়িতে গিয়ে মূঢ়তা ঘুচেছে। দিনকয়েক কি পাগলামিই না করেছিলুম মুখুয্যে-মশাই। যেন সত্যিই এ-সব বিশ্বাস করি, যেন আমাদের শিক্ষায় সংস্কারে সত্যিই কোথাও এর থেকে প্রভেদ নেই। এই বলিয়া সে জোর করিয়া হাসিতে লাগিল।

ভাবিয়াছিল কথাটা হয়ত বিপ্রদাসকে ভারি আঘাত করবে, কিন্তু দেখিতে পাইল একেবারেই না। তাহার ছদ্ম হাসিতে সে প্রসন্ন হাসি যোগ করিয়া বলিল,

আমি জানতুম বন্দনা। তোমার কি মনে নেই আমি সতর্ক করে একদিন তোমাকে বলেছিলুম, এ-সব তোমার জন্যে নয়, এ-সব করতে তুমি যেয়ো না। সেই মূঢ়তা ঘুচেছে জেনে আমি খুশীই হলুম। মনে করেছিলে শুনে বুঝি বড় কষ্ট পাবো, কিন্তু তা নয়। যার যা স্বাভাবিক নয় তা না করলে আমি দুঃখ বোধ করিনে। তোমার ত মনে আছে আমি কিসের ধ্যান করি তুমি জানতে চাইলে আমি চুপ করেছিলুম। বলতে বাধা ছিল বলে নয়, অকারণ বলে। কিন্তু এসব কথাবার্ত্তা এখন থাক্। তোমার বোম্বায়ে ফিরে যাবার কি কোন দিন স্থির হ'লো?

অভিমানে বন্দনার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, বিপ্রদাসের প্রশ্নের উত্তরে শুধু বলিল, না।

সেদিন তোমার মাসীর ভাইপো অশোকের কথা বলেছিলে। বলেছিলে ছেলেটিকে তোমার ভালই লেগেচে। এ কয়দিনে তার সম্বন্ধে আর কিছু কি জানতে পারলে?

না।

তোমাদের বিয়েই যদি হয় আশীর্ব্বাদ করবো, কিন্তু মাসীর তাড়ায় যেন কিছু করে বোসো না। তাঁর তাগাদাকে একটু সামলে চোলো।

বন্দনার চোখে জল আসিয়া পড়িল, কিন্তু মুখ নীচু করিয়া সামলাইয়া বলিল, আচ্ছা।

বিপ্রদাস বলিল, আমি পরশু বাড়ি যাব। দু'তিন দিনের বেশি থাকতে পারবো না। ফিরে আসার পরেও যদি কলকাতায় থাকো একবার এসো।

বন্দনা মুখ নীচু করিয়াই ছিল, মাথা নাড়িয়া কি একটা জবাব দিল তাহার স্পষ্ট অর্থ বুঝা গেল না।

বিপ্রদাস কহিল, শুনলে ত আমার ছুটি মঞ্জুর হ'লো, এখন থেকে সব ভার দ্বিজুর। সংসারের ঘানিতে বাবা আমাকে ছেলেবেলাতেই জুড়ে দিয়েছিলেন, কখনো অবকাশ পাইনি কোথাও যাবার। আজ মনে হচ্ছে যেন নিশ্বাস ফেলে বাঁচবো।

এবার বন্দনা মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সত্যিই কি নিশ্বাস ফেলার এতই দরকার হয়েছে মুখুয্যেমশাই? সত্যিই কি আজ আপনি এত শ্রান্ত?

বিপ্রদাস এ প্রশ্নের উত্তরটা এড়াইয়া গেল, বলিল, ভালো কথা বন্দনা, আমার অসুখে তোমার সেবার উল্লেখ করে দ্বিজুকে বলেছিলুম, তোমার কাছে তাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। এর অর্দ্ধেক তারা কেউ পারতো না। দ্বিজু কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেও তোমাকে বলতে বলেচে, যদি সে সময় কখনো আসে দাদার সেবায় তার সমকক্ষ হওয়া দশটা বন্দনারও সাধ্যে কুলোবে না।

বন্দনা বলিল, তাঁকেও বলবেন সর্ত্ত আমি স্বীকার করে নিলুম। কিন্তু পরীক্ষার দিন যদি কখনো আসে তখন যেন তাঁর দেখা মেলে।

শুনিয়া বিপ্রদাস হাসিমুখে বলিল, দেখা মিলবে বন্দনা; সে পিছোবার লোক নয়। তাকে তুমি জানো না।

জানি মুখুয্যেমশাই। ভালো করেই জানি, আপনার কাজে তাঁর প্রতিযোগিতা করা সত্যিই বন্দনার শক্তিতে কুলোবে না।

ভ্রাতৃগর্ব্বে বিপ্রদাসের মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কহিল, জানো বন্দনা, দ্বিজু আমার সাধু লোক।

আপনার চেয়েও নাকি?

হ্যাঁ, আমার চেয়েও। এই বলিয়া বিপ্রদাস এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, কিন্তু সে বলছিল তুমি নাকি তার উপর রাগ করে আছো। কথা কওনি কেন?

কথা কওয়ার দরকার হয়নি মুখুয্যেমশাই।

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, তবেই ত দেখচি তুমি সত্যাই রাগ করে আছো। কিন্তু একটা কথা আজ তোমাকে বলি বন্দনা, দ্বিজুর ব্যবহারটা রুক্ষ, কথাগুলোও সর্ব্বদা বড় মোলায়েম হয় না, কিন্তু তার কর্কশ কারণটা ঘুচিয়ে যদি কখন তার দেখা পাও, দেখবে এমন মধুর লোক আর নেই। কথাটা আমার বিশ্বাস কোরো, এমন নির্ভর করবার মানুষও তুমি সহজে খুঁজে পাবে না।

বন্দনা আর একদিকে চাহিয়া রহিল, উত্তর দিল না। হঠাৎ এক সময়ে উঠিয়া পড়িয়া বলিল, গাড়ি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে, মুখুয্যেমশাই, আমি যাই, যদি থাকতে পারি আপনি ফিরে এলে দেখা করবো। যদি না পারি এই আমার শেষ নমস্কার রইলো। এই বলিয়া হেঁট হইয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া সে দ্রুত প্রস্থান করিল। একটা কথা বলিবারও সে বিপ্রদাসকে অবকাশ দিল না।

বারান্দা পার হইয়া সিঁড়ির মুখে আসিয়া সবিস্ময়ে দেখিতে পাইল, দ্বিজদাস দাঁড়াইয়া হাত জোড় করিয়া।

বন্দনা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, এ আবার কি?

একটা মিনতি আছে। দাদাকে সঙ্গে নিয়ে আপনাকে আমাদের দেশের বাড়িতে একবার যেতে হবে।

আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে? এর হেতু?

দ্বিজদাস কহিল, বলবো বলেই দাঁড়িয়ে আছি। একদিন বিনা আহ্বানেই আমাদের বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন, আজ আবার সেই দয়া আপনাকে করতে হবে।

বন্দনা এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিল, তারপর বলিল, কিন্তু আমাকে যাবার নিমন্ত্রণ করচে কে? মা, দাদা, না আপনি নিজে?

আমি নিজেই করচি।

কিন্তু আপনি ত ও-বাড়িতে তৃতীয় পক্ষ, ডাকবার আপনার অধিকার কি?

দ্বিজদাস বলিল, আর কোন অধিকার না থাক্ আমার বাঁচবার অধিকার আছে। সেই অধিকারে এই আবেদন উপস্থিত করলুম। বলুন মঞ্জুর করলেন? একান্ত প্রয়োজন না হলে কোন প্রার্থনাই আমি কারো কাছে করিনে।

বন্দনা বহুক্ষণ পর্যন্ত অন্য দিকে চাহিয়া রহিল, তার পরে বলিল, আচ্ছা, তাই যাবো, কিন্তু আমার মান-অপমানের ভার রইলো আপনার উপর।

দ্বিজদাস সকৃতজ্ঞ-কণ্ঠে কহিল, আমার সাধ্য সামান্য, তবু নিলুম সেই ভার।

বন্দনা বলিল, বিপদের সময়ে এ কথা ভুলবেন না যেন।

না, ভুলবো না।

২১

অনেকদিন পরে বিপ্রদাস নীচের অফিস-ঘরে আসিয়া বসিয়াছে। সম্মুখে টেবিলের 'পরে কাগজ-পত্রের স্তূপ—কতদিনের কত কাজ বাকি। দেহ ক্লান্ত, কিন্তু দ্বিজুর ভরসায় ফেলিয়া রাখাও আর চলে না। একটা খেরো-বাঁধানো মোটা খাতা টানিয়া লইয়া সেই পাতা উল্টাইতেছিল, বাহিরে মোটরের বাঁশী কানে গেল এবং অনতিবিলম্বে পূবের খোলা দরজা দিয়া বন্দনা প্রবেশ করিল। আজ একা নয়, সঙ্গে একটি অপরিচিত যুবক, পরণে ধুতি-পাঞ্জাবি, পায়ে ফুলকাটা কট্‌কি চটি এবং কাঁধ হইতে তির্য্যক ভঙ্গিতে জড়ানো মোটা সাদা চাদর। বয়স ত্রিশের নীচে, দেহের গঠন আর একটু দীর্ঘচ্ছন্দের হইলে অনায়াসে সুপুরুষ বলা চলিত। বিপ্রদাস অভ্যর্থনা করিতে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বন্দনা কহিল, মুখুয্যেমশাই, ইনিই মিস্টার চাউড্রি—বার-এ্যাট্‌ল। কিন্তু এখানে অশোকবাবু বলে ডাকলেও অফেন্স নিতে পারবেন না এই সর্ত্তে আলাপ করিয়ে দিতে রাজি হয়ে সঙ্গে এনেচি। আলাপ হবে, কিন্তু তার আগে আপন কর্ত্তব্যটা সেরে নিই—এই বলিয়া সে কাছে আসিয়া হেঁট হইয়া নমস্কার করিয়া বলিল, পায়ের ধূলোটা কিন্তু এঁর সুমুখে নিতে পারলুম না পাছে মনে করে বসেন ওঁদের সমাজের আমি কলঙ্ক। কিন্তু তাই বলে যেন অভিমানভরে আপনিও ভেবে নেবেন না নতুন কায়দাটা আমার মাসীর কাছে শেখা। তাঁর 'পরে আপনার প্রসন্নতার বহরটা আমার পরিমাপ করা কি না।

বিপ্রদাস কহিল, তোমার মাসীমার কাছে এইভাবেই আমার গুণ-গান করো নাকি? নবাগত যুবকটির প্রতি ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, বন্দনার মুখে আপনার কথা এত বেশি শুনেচি যে অসুস্থ না থাকলে আমি নিজেই যেতুম আলাপ করতে। দেখেই মনে হ'লো চেহারাটা পর্য্যন্ত চেনা, যেন কতবার দেখেচি। ভালোই হ'লো অযথা বিলম্ব না করে উনি নিজেই সঙ্গে করে আনলেন।

ভদ্রলোক প্রত্যুত্তরে কি-একটা বলিতে চাহিল, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই বন্দনা শাসনের ভঙ্গিতে তর্জ্জনী তুলিয়া কহিল, মুখুয্যেমশাই, অত্যুক্তি অতিশয়োক্তিকে ছাড়িয়ে প্রায় মিথ্যার কোঠায় এলো, এবার থামুন নইলে হাঙ্গামা করবো।

ইহার অর্থ?

ইহার অর্থ এই হয় যে আমাদের অতি-সাধারণদের মত সত্যি-মিথ্যে যা খুশি বানিয়ে বলা আপনারও চলে। আপনি মোটেই অসাধারণ ব্যক্তি নন,—ঠিক আমাদের মতোই সাধারণ মনুষ্য।

বিপ্রদাস কহিল, না। সকলকে জিজ্ঞাসা করো, তারা একবাক্যে সাক্ষ্য দেবে তোমার অনুমান অশ্রদ্ধেয়, অগ্রাহ্য।

বন্দনা বলিল, এবার তাদের কাছেই আপনাকে নিয়ে গিয়ে বাইরের ঐ সিংহ চর্ম্মটি দু'হাতে ছিঁড়ে ফেলে দেবো, তখন আসল মূর্ত্তিটা তারা দেখতে পাবে,—তাদের ভয় ভাঙবে। আমাকে আশীর্ব্বাদ করে বলবে তুমি রাজ রাণী হও।

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, আশীর্ব্বাদে আপত্তি নেই, এমন কি নিজে করতেও প্রস্তুত, কিন্তু আশীর্ব্বাদ ত তোমরা চাও না, বলো কুসংস্কার, বলো ও শুধু কথার কথা।

বন্দনা পুনরায় আঙুল তুলিয়া বলিল, ফের খোঁচা দেবার চেষ্টা! কে বললে গুরুজনদের আশীর্ব্বাদ আমরা চাইনে—কে বলেচে কুসংস্কার, এবার কিন্তু সত্যই রাগ হচ্ছে মুখুয্যেমশাই।

বিপ্রদাস গম্ভীর হইয়া বলিল, সত্যই রাগ হচ্ছে নাকি? তবে থাক্ এ-সব গোলমেলে কথা কিন্তু হঠাৎ সকালবেলাতেই আবির্ভাব কেন? কোন কাজ আছে নাকি?

বন্দনা কহিল, অনেক। প্রথম আপনার কৈফিয়ৎ নেওয়া। কেন আমার বিনা হুকুমে নীচে নেমে কাজ শুরু করেচেন?

করিনি, করবার সঙ্কল্প করেছিলুম মাত্র। এই রইলো—বলিয়া সেই মোটা খাতাটা বিপ্রদাস ঠেলিয়া দিলেন।

বন্দনা প্রসন্নমুখে কহিল, কৈফিয়ৎ satisfactory, অবাধ্যতা মার্জ্জনা করা গেল। ভবিষ্যতে এমনি অনুগত থাকলেই আমার কাজ চলে যাবে। এবার শুনুন মন দিয়ে। ততক্ষণ এর সঙ্গে বসে গল্প করুন—মুখুয্যেদের ঐশ্বর্য্যের বিবরণ, প্রজা শাসনের বহু

রোমাঞ্চকর কাহিনী—যা খুশি। আমি ওপরে যাচ্ছি অনুদিকে নিয়ে সমস্ত গুছিয়ে নিতে। কাল সকালের ট্রেনে আমরা বলরামপুর যাত্রা করবো, দিনে দিনে যাবো ঠাণ্ডা লাগার ভয় থাকবে না। মিস্টার চাউড্রির ইচ্ছে সঙ্গে যান—বড় ঘরের বড় রকমের যাগ-ক্রিয়া-কলাপ দীয়তাং ভুজ্যতাং ঘটা-পটা কখনো চোখে দেখেননি—আর কোথা থেকেই বা দেখবেন—

বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করিল, তুমি নিজে নিশ্চয়ই অনেক দেখেচো—

বন্দনা কহিল, এ প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর ও ভদ্ররুচি-বিগর্হিত। উনি দেখেননি এই কথাই হচ্ছিলো। তা শুনুন। ওঁকে অনুমতি দিয়েচি সঙ্গে যাবার, তাতে এত খুশী হয়েচেন যে তার পরে আমাকে সঙ্গে করে বোম্বাই পর্য্যন্ত পৌঁছে দিতে সম্মত হয়েচেন।

বিপ্রদাস মুখ অতিশয় গম্ভীর করিয়া কহিল, বলো কি? এতখানি ত্যাগ স্বীকার আমাদের সমাজে মেলে না, এ শুধু তোমাদের মধ্যেই পাওয়া যায়। শুনে বিস্ময় লাগচে।

বন্দনা বলিল, লাগবার কথাই যে। জপ-তপও আছে, যোল-আনা হিংসেও আছে। এই বলিয়া সে চোখের দৃষ্টিতে এক ঝলক বিদ্যুৎ ছড়াইয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, বিপ্রদাস তাহাকে ডাকিয়া কহিল, এ যেন কথামালার সেই কুকুরের ভুষি আগলানোর গল্প। খাবেও না, আর ষাঁড়ের দল এসে যে মনের সাধে চিবোবে তাও দেবে না। মানুষ বাঁচে কি কোরে বলো ত?

বন্দনা দ্বার-প্রান্তে থমকিয়া দাঁড়াইয়া কৃত্রিম রোষে ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, বলিল, ঠিক আমাদের মতোই সাধারণ মানুষ, কিচ্ছু তফাৎ নেই। লোকগুলো কেবল মিথ্যে ভয় করে মরে।

তুমি গিয়ে এবার তাদের ভয় ভেঙ্গে দিয়ে এসো।

তাই তো যাচ্ছি। এবং ভুষির সঙ্গে একজনের উপমা দেবার দুর্ব্বুদ্ধিরও শোধ নিয়ে আসবো—এই বলিয়া বন্দনা দীপ্ত কটাক্ষে পুনরায় তড়িৎ বৃষ্টি করিয়া দ্রুত-পদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বিপ্রদাস কহিল, মিস্টার—

অশোক সবিনয়ে বাধা দিল, না, না, চলবে না। ওটাকে বাদ দিতে বাধবে না বলেই ধুতি-চাদর এবং চটি জুতো পরে এসেচি বিপ্রদাসবাবু। উনিও ভরসা দিয়েছিলেন যে—

বিপ্রদাস মনে মনে খুশী হইয়া বলিল, ভালোই হ'লো অশোকবাবু, সম্বোধনটা সহজ দাঁড়ালো। পাড়াগাঁয়ের মানুষ, মনেও থাকে না, অভ্যেসও নেই, এবার স্বচ্ছন্দে আলাপ জমাতে পারবো। শুনলাম আমাদের পল্লীগ্রামের বাড়িতে যেতে

চেয়েছেন, সত্যিই যদি যান ত কৃতার্থ হবো। আমাদের সংসারে কর্ত্রী আমার মা, তাঁর পক্ষ থেকে আপনাকে আমি সসম্মানে আমন্ত্রণ করচি।

বিপ্রদাসের বিনয়-বচনে অশোক পুলকিত-চিত্তে বলিল, নিশ্চয় যাবো,—নিশ্চয় যাবো, কত দরিদ্র অনাথ আতুর আসবে নিমন্ত্রণ রাখতে, কত অধ্যাপক পণ্ডিত উপস্থিত হবেন বিদায় গ্রহণ করতে—আনন্দোৎসবে কত খাওয়া-দাওয়া, কত আসা-যাওয়া, কত বিচিত্র আয়োজন—

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, সমস্ত বাড়ানো কথা অশোকবাবু, বন্দনা শুধু রহস্য করেচে।

রহস্য করে তার লাভ কি বিপ্রদাসবাবু?

একটা লাভ আমাদের অপ্রতিভ করা। বলরামপুরের মুখুয্যেদের ওপর সে মনে মনে চটা। দ্বিতীয় লাভ আপনাকে সে কোন ছলে বোম্বায়ে টেনে নিয়ে যেতে চায়।

অশোক বলিল, প্রয়োজন হলে বোম্বাই পর্য্যন্ত আমাকে সঙ্গে যেতে হবে এ কথা আছে, কিন্তু মুখুয্যেদের 'পরে সে চটা, আপনাদের সে লজ্জিত করতে চায় এমন হতেই পারে না। কালও বলরামপুরে যাবার স্থির ছিল না, কিন্তু আপনাদের কথা নিয়েই ওর মাসীর সঙ্গে হয়ে গেল ঝগড়া। মাসী বললেন। বিপ্রদাসের মা সর্ব্বসাধারণের হিতার্থে যদি জলাশয় খনন করিয়ে থাকেন ত তাঁর প্রশংসা করি, কিন্তু ঘটা করে প্রতিষ্ঠা করার কোন অর্থ নেই,—ওটা কুসংস্কার। কুসংস্কারে যোগ দেওয়া আমি অন্যায় মনে করি। বন্দনা বললেন,—ওঁরা বড়লোক, বড়লোকদের কাজ-কর্ম্মে ঘটা তো হয়েই থাকে মাসীমা। তাতে আশ্চর্য্যের কি আছে? আমার পিসীমা বললেন, বড়লোকের অপব্যয়ে আশ্চর্য্যের কিছু নেই মানি কিন্তু ও-তো কেবল ও ই নয়, ওটা কুসংস্কার। তোমার যাওয়াতেই আমার আপত্তি। বন্দনা বললেন, আমি কিন্তু কুসংস্কার মনে করিনে মাসীমা। বরঞ্চ, এই মনে করি যে, যা জানিনে, জানার কখনো চেষ্টা করিনি, তাকে সরাসরি বিচার করতে যাওয়াই কুসংস্কার। ওর জবাব শুনে পিসীমা রাগে জ্বলে গেলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার বাবার অনুমতি নিয়েচো?

বন্দনা উত্তর দিলেন, বাবা বারণ করবেন না আমি জানি। দিদিরও স্বামী অসুস্থ, তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার ভার পড়চে আমার ওপর।

ভার দিলে কে শুনি? তিনি নিজেই বোধ হয়? প্রশ্ন শুনে বন্দনা যেন অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলেন। আমার মনে হ'লো তাঁর মাথায় দ্রুত রক্ত চড়ে যাচ্ছে, এবার হঠাৎ কি একটা বলে ফেলবেন, কিন্তু, সে-সব কিছুই করলেন না, শুধু আস্তে আস্তে বললেন, যে যা খুশি জিজ্ঞেস করলেই সে আমাকে জবাব দিতে হবে ছেলেবেলা থেকে এ-শিক্ষা আমার হয়নি মাসীমা। পরশু সকালে মুখুয্যে-

মশাইকে নিয়ে আমি বলরামপুরে যাবো এর বেশি তোমাকে বলতে পারবো না।

পিসীমা রাগ করে উঠে গেলেন। আমি বললুম, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন? আমার ভারি ইচ্ছে করে ঐ-সব আচার-অনুষ্ঠান চোখে দেখি। বন্দনা বললেন, কিন্তু সে-সব যে কুসংস্কার অশোকবাবু। চোখে দেখলেও যে আপনাদের জাত যায়। বললুম, যদি আপনার না যায় ত আমার যাবে না। আর যদি যায় ত দুজনের এক সঙ্গেই জাত যাক, আমার কোন ক্ষতি নেই।

বন্দনা বললেন, আপনি ত বিশ্বাস করেন না, সে-সব চোখে দেখলে যে মনে মনে হাসবেন।

বললুম, আপনিই কি বিশ্বাস করেন নাকি? তিনি বললেন, না করিনে, কিন্তু মুখুযোমশাই করেন। আমি কেবল আশা করি তাঁর বিশ্বাসই যেন একদিন আমারও সত্যি বিশ্বাস হয়ে ওঠে। বিপ্রদাসবাবু, আপনাকে বন্দনা মনে মনে পুজো করে, এত ভক্তি সে জগতে কাউকে করে না।

খবরটা অজানা নয়, নূতনও নয়, তথাপি অপরের মুখে শুনিয়া তাহার নিজের মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হইয়া গেল।

ক্ষণেক পরে প্রশ্ন করিল, আপনাদের যে বিবাহ-প্রস্তাব হয়েছিল সে কি স্থির হয়ে গেছে? বন্দনা সম্মতি দিয়েচেন?

না। কিন্তু অসম্মতি জানান নি।

এটা আশার কথা অশোকবাবু। চুপ করে থাকাটা অনেক ক্ষেত্রেই সম্মতির চিহ্ন।

অশোক কৃতজ্ঞ-চক্ষে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, নাও হতে পারে। অন্ততঃ নিজে আমি এখনো তাই মনে করি। একটু থামিয়া কহিল, মুস্কিল হয়েছে এই যে আমি গরীব, কিন্তু বন্দনা ধনবতী। ধনে আমার লোভ নেই তা নয়, কিন্তু পিসীমার মতো ঐটেই আমার একমাত্র লক্ষ্য নয়। এ কথা বোঝাবো কি করে যে পিসীমার সঙ্গে আমি চক্রান্ত করিনি।

এই লোকটির প্রতি মনে মনে বিপ্রদাসের একটা অবহেলার ভাব ছিল, তাহার বাক্যের সরলতায় এই ভাবটা একটু কমিল। সদয়কণ্ঠে কহিল, পিসির ষড়যন্ত্রে আপনি যে যোগ দেননি সত্যি হলে একথা বন্দনা একদিন বুঝবেই, তখন প্রসন্ন হতেও তার বিলম্ব হবে না, ধনের পরিমাণ নিয়েও তখন বাধা ঘটবে না।

অশোক উৎসুক-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, এ কি আপনি নিশ্চয় জানেন বিপ্রদাসবাবু?

ইহার জবাব দিতে গিয়া বিপ্রদাস দ্বিধায় পড়িল, একটু ভাবিয়া বলিল, ওর যতটুকু জানি তাইতো মনে হয়।

অশোক কহিল, আমার কি মনে হয় জানেন? মনে হয়, ওঁর নিজের প্রসন্নতার চেয়েও আমার ঢের বেশী প্রয়োজন আপনার প্রসন্নতায়। সে যেদিন পাবো, আমার না-পাবার কিছু থাকবে না।

বিপ্রদাস সহাস্যে কহিল, আমার প্রসন্ন দৃষ্টি দিয়ে স্বামী নির্ব্বাচন করবে এমন অদ্ভুত ইঙ্গিত আপনাকে দিলে কে—বন্দনা নিজে? যদি দিয়ে থাকে ত নিছক পরিহাস করেচে এই কথাই কেবল বলতে পারি অশোকবাবু!

না পরিহাস নয়, সত্য।

কে বললে?

অশোক এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া কহিল, এ-সব মুখ দিয়ে বলার বস্তু নয়, বিপ্রদাসবাবু। সেদিন মাসীমার সঙ্গে ঝগড়া করে বন্দনা আমার ঘরে এসে ঢুকলেন—এমন কখনো করেন না—একটা চৌকি টেনে নিয়ে বসে বললেন, আমাকে বোম্বায়ে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। বললুম, যখনি হুকুম করবেন তখনি প্রস্তুত। বললেন, যাচ্চি বলরামপুরে, সময় হলে তার পরে জানাবো। বললুম, তাই জানাবেন, কিন্তু মাসীমাকে অমন চটিয়ে দিলেন কেন? তাঁদের ঐ-সব পূজো-পাঠ, হোম-জপ, ঠাকুর-দেবতা সত্যিই ত আর বিশ্বাস করেন না, তবু বললেন, বিশ্বাস করতে পেলে বেঁচে যাই। কেন বললেন ও কথা? বন্দনা বললেন, মিথ্যে বলিনি অশোকবাবু, ওঁদের মতো সত্য বিশ্বাসে ঐ-সব যদি কখনো গ্রহণ করতে পারি আমি ধন্য হয়ে যাই। মুখুয্যেমশায়ের অসুখে সেবা করেছিনুম, তাঁর কাছে একদিন বিশ্বাসের বর চেয়ে নেবো। তার পরে শুরু হলো আপনার কথা। এত শ্রদ্ধা যে কেউ কাউকে করে, কারো শুভ-কামনায় কেউ যে এমন অনুক্ষণ মগ্ন থাকতে পারে এর আগে কখনো কল্পনাও করিনি। কথায় কথায় তিনি একদিনের একটা ঘটনার উল্লেখ করলেন। তখন আপনি অসুস্থ, আপনার পূজো-আহ্নিকের আয়োজন তিনিই করেন। সেদিন বেলা হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি আসতে কি একটা পায়ে ঠেকলো, যতই নিজেকে বোঝাতে চাইলেন ও কিছু নয়, ওতে পূজোর ব্যাঘাত হবে না, ততই কিন্তু মন অবুঝ হয়ে উঠতে লাগলো পাছে কোথা দিয়েও আপনার কাজে ত্রুটি স্পর্শ করে। তাই আবার স্নান করে এসে সমস্ত আয়োজন তাঁকে নূতন করে করতে হ'লো। আপনি কিন্তু সেদিন বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, বন্দনা, সকালে যদি তোমার ঘুম না ভাঙে ত অন্নদাদিদিকে দিও পূজোর সাজ করতে। মনে পড়ে বিপ্রদাসবাবু?

বিপ্রদাস মাথা নাড়িয়া বলিল, পড়ে।

অশোক বলিতে লাগিল, এমন কতদিনের কত ছোট-খাটো বিষয় গল্প করে বলতে বলতে সেদিন রাত্রি অনেক হয়ে গেল, শেষে বললেন, মাসী তাঁদের কুসংস্কারের খোঁটা দিলেন, আমি নিজেও একদিন দিয়েচি অশোকবাবু—কিন্তু আজ কোনটা

ভালো কোন্‌টা মন্দ বুঝতে আমার গোল বাধে। খাওয়ার বিচার ত কোন দিন করিনি, আজন্মের বিশ্বাস এতে দোষ নেই, কিন্তু এখন যেন বাধা ঠেকে। বুদ্ধি দিয়ে লজ্জা পাই, লোকের কাছে লুকোতে চাই, কিন্তু যখনই মনে হয় এ-সব উনি ভালোবাসেন না, তখনি মন যেন ওর থেকে মুখ ফিরিয়ে বসে।

শুনিতে শুনিতে বিপ্রদাসের মুখ পাংশু হইয়া আসিল, জোর করিয়া হাসির চেষ্টা করিয়া বলিল, বন্দনা বুঝি এখন খাওয়া-ছোঁয়ার বিচার আরম্ভ করেচে? কিন্তু সেদিন যে এসে দম্ভ করে বলে গেল মাসীর বাড়িতে গিয়ে ও আপন সমাজ, আপন সহজ বুদ্ধি ফিরে পেয়েচে, মুখুয্যেদের বাড়ির সহস্র প্রকারের কৃত্রিমতা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বেঁচে গেছে।

অশোক সবিস্ময়ে কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু বিঘ্ন ঘটিল। পর্দা সরাইয়া বন্দনা প্রবেশ করিয়া বলিল, মুখুয্যেমশাই, সমস্ত গুছিয়ে রেখে এলুম। কাল সকাল সাড়ে ন'টায় গাড়ি। পুজো-টুজো বাজে কাজগুলো ওর মধ্যে সেরে রাখবেন। এত বিড়ম্বনাও ভগবান আপনার কপালে লিখেছিলেন।

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, তাই হবে বোধ হয়।

বোধ হয় নয় নিশ্চয়। ভাবি এগুলো আপনার কেউ ঘুচোতে পারতো। তা শুনুন। কালকের সকালের খাবার ব্যবস্থাও করে গেলুম,—আমি নিজে এসে খাওয়াবো, তার পরে কাপড়-চোপড় পরাবো, তার পরে সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে যাবো। রোগা মানুষ কি-না তাই। চলুন অশোকবাবু, এবার আমরা যাই। পায়ের ধুলো কিন্তু আর নেবো না মুখুয্যেমশাই, ওটা কুসংস্কার। ভদ্র-সমাজে অচল। এই বলিয়া সে হাসিয়া হাত দুটা মাথায় ঠেকাইয়া বাহির হইয়া গেল।

২২

পরদিন সকালেই সকলে বলরামপুরের উদ্দেশে যাত্রা করিল। বাটীর কাছাকাছি আসিতে দেখা গেল দ্বিজদাস প্রায় রাজসূয় যজ্ঞের ব্যাপার করিয়াছে। সম্মুখের মাঠে সারি সারি চালা-ঘর—কতক তৈরি হইয়াছে—কতক হইতেছে—ইতিমধ্যে আহূত ও অনাহূতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, এখনো কত লোক যে আসিবে তাহার নির্দ্দেশ পাওয়া কঠিন।

বিপ্রদাসকে দেখিয়া মা চমকিয়া গেলেন—এ কি দেহ হয়েচে বাবা, একেবারে যে আধখানা হয়ে গেচিস্।

বিপ্রদাস পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, আর ভয় নেই মা, এবার সেরে উঠতে দেরি হবে না।

কিন্তু কলকাতায় ফিরে যেতেও আর দেবো না তা যত কাজই তোর থাক্। এখন থেকে নিজের চোখে-চোখে রাখবো।

বিপ্রদাস হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল।

বন্দনা তাঁহাকে প্রণাম করিলে দয়াময়ী আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, এসো মা, এসো—বেঁচে থাকো।

কিন্তু কণ্ঠস্বরে তাঁহার উৎসাহ ছিল না, বুঝা গেল এ শুধু সাধারণ শিষ্টাচার, তার বেশি নয়। তাহাকে আসার নিমন্ত্রণ করা হয় নাই, সে স্বেচ্ছায় আসিয়াছে, মা এইটুকুই জানিলেন। তিনি মৈত্রেয়ীর কথা পাড়িলেন। মেয়েটির গুণের সীমা নাই, দয়াময়ীর দুঃখ এই যে এক-মুখে তাহার ফর্দ্দ রচিয়া দাখিল করা সম্ভব নয়। বলিলেন, বাপ শেখাননি এমন বিষয় নেই, জানে না এমন কাজ নেই। বৌমার শরীরটা তেমন ভালো যাচ্চে না—তাই ও একাই সমস্ত ভার যেন মাথায় তুলে নিয়েচে। ভাগ্যে ওকে আনা হয়েছিল বিপিন, নইলে কী যে হোতো আমার ভাবলে ভয় করে।

বিপ্রদাস বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, বলো কি মা!

দয়াময়ী কহিলেন, সত্যি বাবা। মেয়েটার কাজ-কর্ম্ম দেখে মনে হয় কর্ত্তা যে বোঝা আমার ঘাড়ে ফেলে রেখে চলে গেছেন তাঁর আর ভাবনা নেই। বৌমা ওকে সঙ্গী পেয়ে সকল ভার স্বচ্ছন্দে বইতে পারবেন, কোথাও ত্রুটি ঘটবে না। এ-বছর ত আর হলো না, কিন্তু বেঁচে যদি থাকি আসচে বারে নিশ্চিন্ত-মনে কৈলাস-দর্শনে আমি যাবোই যাবো।

বিপ্রদাস নীরব হইয়া রহিল। দয়াময়ীর কথা ত মিথ্যা নয়, মৈত্রেয়ী হয়ত এমনি প্রশংসার যোগ্য, কিন্তু যশোগানেরও মাত্রা আছে, স্থান কাল আছে। তাঁহার লক্ষ্য যাই হোক, উপলক্ষ্যটাও কিন্তু চাপা রহিল না। একটা অকরুণ অসহিষ্ণু ক্ষুদ্রতা তাঁহার সুপরিচিত মর্য্যাদায় গিয়া যেন রূঢ় আঘাত করিল। হঠাৎ ছেলের মুখের পানে চাহিয়া দয়াময়ী নিজের এই ভুলটাই বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তখনি কি করিয়া যে প্রতিকার করিবেন তাহাও খুঁজিয়া পাইলেন না। দ্বিজদাস কাজের ভীড়ে অন্যত্র আবদ্ধ ছিল, খবর পাইয়া আসিয়া পৌঁছিল।

বিপ্রদাস কহিল, কি ভীষণ কাণ্ড করেচিস্ দ্বিজু, সামলাবি কি করে?

দ্বিজদাস বলিল, ভার ত আপনি নিজে নেননি দাদা, দিয়েচেন আমার ওপর। আপনার ভয়টা কিসের?

বন্দনা ইহার জবাব দিল, বলিল, ওঁর ভাবনা খরচের সব টাকাটা যদি প্রজাদের ঘাড়ে উস্বল না হয় তো তহবিলে হাত পড়বে। এতে ভয় হবে না দ্বিজুবাবু?

সকলেই হাসিয়া উঠিল, এবং এই রহস্যটুকুর মধ্য দিয়া মায়ের মনোভারটা যেন কমিয়া গেল, স্মিত-মুখে কৃত্রিম রুষ্টস্বরে বলিলেন, ওকে জ্বালাতন করতে তুমিও ঠিক তোমার বোনের মতই হবে বন্দনা। ও আমার পরম ধার্ম্মিক ছেলে, সবাই মিলে ওকে মিথ্যে খোঁটা দিলে আমার সয় না।

বন্দনা কহিল, খোঁটা মিথ্যে হলে গায়ে লাগে না, তাতে রাগ করা উচিত নয়।

মা বললেন, রাগ তো ও করে না,—ও শুনে হাসে।

বন্দনা কহিল, তারও কারণ আছে মা, মুখুয্যেমশাই জানেন পেটে খেলে পিঠে সইতে হয়, রাগারাগি করা মূর্খতা। ঠিক না মুখুয্যেমশাই?

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, ঠিক বই কি। মূর্খের কথায় রাগারাগি করা নিষেধ, শাস্ত্রে তার জন্য অন্য ব্যবস্থা আছে।

বন্দনা কহিল, মেজদি কিন্তু আমার চেয়ে মুখ্যু মুখুয্যেমশাই। বোধ হয় আপনার শাস্ত্রের এই ব্যবস্থার জোরেই সবাই আপনাকে এত ভক্তি করে। এই বলিয়া সে হাসিয়া মুখ ফিরাইল। দ্বিজদাস হাসি চাপিতে অন্যত্র চাহিয়া রহিল এবং দয়াময়ী নিজেও হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, বন্দনা মেয়েটা বড় দুষ্টু, ওর সঙ্গে কারো কথায় পারবার জো নেই।

একটু থামিয়া একটু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, কিন্তু দেখো মা, কর্ত্তাদের আমলে প্রজাদের ওপর এ-রকম যে একেবারেই হ'ত না তা বলিনে, কিন্তু তোমাকে ত বলেচি, বিপিন আমার পরম ধার্ম্মিক ছেলে, যা অন্যায়, যা ওর যথার্থ প্রাপ্য নয়, সে ও কিছুতে নিতে পারে না। কিন্তু ভয় আমার দ্বিজুকে, ও পারে।

বিপ্রদাস প্রতিবাদ করিয়া বলিল, এ তোমার অন্যায় কথা মা। দ্বিজু করবে প্রজা-পীড়ন! প্রজার পক্ষ নিয়ে ও আমাদের বিরুদ্ধেই একবার তাদের খাজনা দিতে নিষেধ করেছিল সে কথা কি তোমার মনে নেই?

মা বললেন, মনে আছে বলেই ত বলছি। যে ন্যায্য দেনা দিতে বারণ করে, অন্যায় আদায় সেই পারে বিপিন, অপরে পারে না। দয়া-মায়া ওর আছে,—একটু বেশি পরিমাণেই আছে মানি,—কিন্তু তবু দেখতে পাবি একদিন, ওর হাতেই প্রজারা দুঃখ পাবে ঢের বেশি।

না মা, পাবে না, তুমি দেখো।

দয়াময়ী কহিলেন, ভরসা কেবল তুই আছিস্ ব'লে। নইলে এমন কেউ নেই যে ওকে ঠিক পথে চালিয়ে যেতে পারবে। নইলে ও নিজেও একদিন ডুববে পরকেও ডোবাবে।

দ্বিজদাস এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল, এবার কথা কহিল, বলিল, তোমার শেষের কথাটা ঠিক হ'ল না মা। নিজে ডুববো সে হয়ত একদিন সত্যি হবে, কিন্তু পরকে ডোবাবো না এ তুমি নিশ্চয় জেনো।

মা বলিলেন, এর এটাও সুখের নয় দ্বিজু, ওটাও আনন্দের নয়। আসলে তোকে চালাবার একজন লোক থাকা চাই।

দ্বিজদাস কহিল, সেই কথাটা স্পষ্ট করে বলো যে সকলের ভাবনা ঘুচুক। আমাকে চালাবার কেউ একজন দরকার। কিন্তু সে যোগাড় তো তুমি প্রায় করে এনেচো মা।

মা বলিলেন, যদি সত্যই করে এনে থাকি সে তোর ভাগ্যি বলে জানিস্।

তর্ক-বিতর্কের মূল তাৎপর্যটা এবার সকলের কাছেই সুস্পষ্ট হইয়া পড়িল।

মা বলিতে লাগিলেন, এত বড় যে কাণ্ড করে তুললি কারো কথা শুনলিনে, বললি দাদার হুকুম; কিন্তু দাদা কি বলেছিল অশ্বমেধ করতে? এখন সামলায় কে বল্‌তো? ভাগ্যে মৈত্রেয়ী এসেছিল সেই তো শুধু ভরসা।

দ্বিজদাস বলিল, কাজটা আগে হয়ে যাক মা, তার পরে যাকে খুশি সনন্দ দিও, আমি আপত্তি করবো না, কিন্তু এখুনি তার তাড়াতাড়ি কি!

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, তখন সনন্দ সই করবে কে দ্বিজুবাবু, তৃতীয় পক্ষ নয় তো?

দ্বিজদাস কহিল, তৃতীয় পক্ষের সাধ্য কি! আজও মহাপরাক্রান্ত প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষ যে তেমনই বিদ্যমান। বলিতে দুইজনেই হাসিয়া ফেলিল।

বিপ্রদাস ও মা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিলেন কিন্তু অর্থ বুঝিলেন না।

অন্নদা আসিয়া বলিল, বন্দনাদিদি, বড়বাবুর ওষুধগুলো যে কাল গুছিয়ে তুললে সেই কাগজের বাক্সটা তো দেখতে পাচ্চিনে—হারালো না ত?

না, হারায়নি অনুদি, কলকাতার বাড়িতেই রয়ে গেছে।

দয়াময়ী ভয় পাইয়া বলিলেন, উপায় কি হবে বন্দনা, এত বড় ভুল হয়ে গেল।

বন্দনা কহিল, ভুল হয়নি মা, আসবার সময়ে সেগুলো ইচ্ছে করেই ফেলে এলুম।

ইচ্ছে করে ফেলে এলে? তার মানে?

ভাবলুম, ওষুধ অনেক খেয়েছেন আর না। তখন মা কাছে ছিলেন না তাই ওষুধের দরকার হয়েছিল, এখন বিনা ওষুধেই সেরে উঠবেন, একটুও দেরি হবে না।

কথাগুলো দয়াময়ীর অত্যন্ত ভাল লাগল, তথাপি বলিলেন, কিন্তু ভাল করোনি মা। পাড়াগাঁ জায়গা, ডাক্তার-বদ্যি তেমন মেলে না, দরকার হলে—

অন্নদা বলিল, দরকার আর হবে না মা। হলে উনি নিশ্চয় আনতেন, কখনো ফেলে আসতেন না। বন্দনাদিদি ডাক্তার-বদ্যির চেয়েও বেশি জানে।

দয়াময়ী প্রশংসমান চক্ষে নীরবে চাহিয়া রহিলেন। বন্দনা কহিল, অন্নুদির বাড়িয়ে বলা স্বভাব মা, নইলে সত্যিই আমি কিছু জানিনে। যা একটু শিখেচি সে শুধু মুখুয্যেমশায়ের সেবা করে।

অন্নদা বলিল, সে-যে কি সেবা মা সে শুধু আমি জানি। হঠাৎ একদিন কি বিপদেই পড়ে গেলুম। বাড়িতে কেউ নেই, বাসুর অসুখের তার পেয়ে দ্বিজু চলে এসেছে এখানে, দত্তমশাই গেছেন ঢাকায়; বিপিনের হ'ল জ্বর। প্রথম দুটো দিন কোনমতে কাটলো, কিন্তু তার পরের দিন জ্বর গেল ভয়ানক বেড়ে। ডাক্তার ডেকে পাঠালুম, সে ওষুধ দিলে, কিন্তু ভয় দেখালে চতুর্গুণ। মুখ্যু মেয়েমানুষ, কি যে করি, তোমাদেরও খবর দিতে পারিনে, বিপিন করলে মানা,—আকুল হয়ে ছুটে গেলুম বন্দনার কাছে ওঁর মাসীর বাড়িতে। কেঁদে বললুম, দিদি, রাগ করে থেকো না, এসো। তোমার মুখুয্যেমশাইয়ের বড় অসুখ। বন্দনাদিদি যেমন ছিলেন তেমনি এসে আমার গাড়িতে উঠলেন, মাসীমাকে বলবারও সময় পেলেন না। বাড়ি এসে বিপিনের ভার নিলেন। দিন-রাতে একটি ঘণ্টাও সে ক'টা দিন উনি জিরোতে পাননি। কেবল ওষুধ খাওয়ানোই তো নয়, সকালে পূজোর সাজ থেকে আরম্ভ করে রাত্তিরে মশারি ফেলে শুইয়ে আসা পর্য্যন্ত যা-কিছু সমস্ত। এখন বন্দনাদিদি যদি ওষুধ দিতে আর না চায় মা, অন্যথা করে কাজ নেই, ওতেই বিপিন সুস্থ হয়ে উঠবে।

বিপ্রদাস তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, সত্যিই সুস্থ হয়ে উঠবো মা, তোমরা ওকে আর বাধা দিও না, ওর সুবুদ্ধি হোক, আমাকে ওষুধ গেলানো বন্ধ করুক। আমি কায়মনে আশীর্বাদ করবো, বন্দনা রাজ-রাণী হোক।

দয়াময়ী নীরবে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া যেন স্নেহ ও মমতা উছলিয়া পড়িতে লাগিল।

ঝি আসিয়া কহিল, মা, বৌদিদি বলচেন কলকাতা থেকে যে-সব জিনিসপত্র এখন এলো কোন্ ঘরে তুলবেন?

দয়াময়ী জবাব দিবার পূর্ব্বেই বন্দনা বলিল, মা, আমি আপনার ম্লেচ্ছ-মেয়ে বলে আপনার এতবড় কাজে কি কোন ভারই পাবো না; কেবল চুপ করে বসে থাকবো? এমন কত জিনিস তো আছে যা আমি ছুঁলেও ছোঁয়া যায় না।

দয়াময়ী তাহার হাত ধরিয়া একেবারে বুকের কাছে টানিয়া আনিলেন, আঁচল হইতে একটা চাবির গোছা খুলিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, চুপ করে তোমাকে বসে থাকতেই বা দেব কেন মা? এই দিলুম তোমাকে আমার আপন ভাঁড়ারের চাবি যা বৌমা ছাড়া আর কাউকে দিতে পারিনে। আজ থেকে এ ভার রইলো তোমার।

কি আছে মা এ ভাঁড়ারে ?

এ চাবির গুচ্ছ অত্যন্ত পরিচিত, দ্বিজদাস কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, আছে যা ছোঁয়া-ছুঁয়ির নাগালের বাইরে, আছে সোনা-রূপো, টাকা-কড়ি, চেলি-গরদের জোড়। যা অতি বড় ধার্ম্মিক ব্যক্তিরও মাথায় তুলে নিতে আপত্তি হবে না তুমি ছুঁলেও।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, কি করতে হবে মা আমাকে ?

দয়াময়ী বললেন, অধ্যাপক-বিদায়, অতিথি-অভ্যাগতদের সম্মান-রক্ষা, আত্মীয়-স্বজনগণের পাথেয়র ব্যবস্থা,—আর ঐ সঙ্গে রাখবে এই ছেলেটাকে একটু কড়া শাসনে। এই বলিয়া তিনি দ্বিজদাসকে দেখাইয়া কহিলেন, আমি হিসেব বুঝিনে বলে ও আমাকে ঠকিয়ে যে কত টাকা নিয়ে অপব্যয় করেছে তার ঠিকানা নেই মা। এইটি তোমাকে বন্ধ করতে হবে।

দ্বিজদাস বলিল, দাদার সামনে এমন কথা তুমি বোলো না মা। উনি ভাববেন সত্যিই বা। খরচের খাতায় রীতিমত ব্যায়ের হিসেব লেখা হচ্ছে মিলিয়ে দেখলেই দেখতে পাবে।

দয়াময়ী বলিলেন, মেলাবো কোন্‌টা ? ব্যয়ের হিসেব লেখা হচ্ছে মানি, কিন্তু অপব্যয়ের হিসেব কে লিখচে বল্ তো ? আমি সেই কথাই বন্দনাকে জানাচ্ছিলুম।

বন্দনা বলিল, জেনেই বা কি করবো মা ? ওঁর টাকা উনি অপব্যয় করলে আমি আটকাবো কি করে।

দয়াময়ী কহিলেন, সে আমি জানিনে। তুমি ভার নিতে চেয়েছিলে, আমি ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হলুম; কিন্তু একটা কথা বলি বন্দনা, তোমাকেও একদিন সংসার করতে হবে, তখন অপব্যয় বাঁচানোর দায় এসে যদি হাতে ঠেকে জানিনে বলেই তো নিস্তার পাবে না।

বন্দনা দ্বিজদাসের প্রতি চাহিয়া কহিল, শুনলেন তো মায়ের হুকুম ?

দ্বিজদাস কহিল, শুনলুম বই কি। কিন্তু দাদা দিয়েচেন আমার ওপর খরচ করার ভার, মা দিলেন তোমাকে খরচ না করার ভার। সুতরাং খণ্ডযুদ্ধ বাধবেই, তখন দোষ দিলে চলবে না।

বন্দনা মাথা নাড়িয়া স্মিতমুখে বলিল, দোষ দেবার দরকার হবে না দ্বিজুবাবু, ঝগড়া আমাদের হবে না। আপনার টাকা নিয়ে আপনার সঙ্গেই মক্-ফাইট্ শুরু করবার ছেলেমানুষি আমার গেছে। বাঙলাদেশে এসে সে শিক্ষা আমার হয়েচে। ঝগড়ার আগে মায়ের দেওয়া ভার মার হাতেই ফিরিয়ে দিয়ে আমি সরে যাবো।

দয়াময়ী ঠিক না বুঝিলেও বুঝিলেন এ অভিমান স্বাভাবিক। ব্যথিত-কণ্ঠে

কহিলেন, ভার আমি ফিরে নেবো না মা, তোমাকেই এ বইতে হবে ; কিন্তু এখানে আর নয়, ভেতরে চলো, তোমার কাজ তোমাকে আমি বুঝিয়ে দিইগে। এই বলিয়া হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন।

সেদিন বন্দনা এ-বাড়িতে ঘণ্টা-কয়েক মাত্র ছিল, কোথায় কি আছে দেখিবার সুযোগ পায় নাই, আজ দেখিল মহলের পর মহলের যেন শেষ নাই। আশ্রিত আত্মীয়ের সংখ্যা কম নয়, বউ-ঝি নাতি-পুতি লইয়া প্রত্যেকের এক-একটি সংসার। ওদিকটায় আছে কাছারি-বাড়ি ও তাহার আনুষঙ্গিক যাবতীয় ব্যবস্থা, কিন্তু এ অংশে আছে ঠাকুরবাড়ি, রান্নাবাড়ি, দয়াময়ীর বিরাট গোশালা এবং উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত বাগান ও পুষ্করিণী। দ্বিতলের পূবের ঘরগুলো দয়াময়ীর, তাহারই একটার সম্মুখে বন্দনাকে আনিয়া তিনি বলিলেন, মা, এই ঘরটি তোমার, এরই সব ভার রইলো তোমার উপর।

ওধারের বারান্দায় বসিয়া সতী ও মৈত্রেয়ী কি কতগুলা দ্রব্য মনঃসংযোগে পরীক্ষা করিতেছিল, দয়াময়ীর কণ্ঠস্বরে মুখ তুলিয়া চাহিল, এবং বন্দনাকে দেখিতে পাইয়া দুজনেই কাজ ফেলিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সে যে সত্যিই আসিবে এ প্রত্যাশা কেহ করে নাই। দিদির পায়ের ধূলা লইয়া বন্দনা মৈত্রেয়ীকে নমস্কার করিল। মা বলিলেন, আমার এই ম্লেচ্ছ-মেয়েটিও কোন একটা কাজের ভার চায় বৌমা, চুপ করে বসে থাকতে ও নারাজ। তোমাদের দিয়েচি নানা কাজ, ওকে দিলুম আমার এই ভাঁড়ারের চাবি।

মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করিল, এ ভাঁড়ারে কি আছে মা ?

আছে এমন সব জিনিস যা ম্লেচ্ছ-মেয়েতে ছুঁলেও ছোঁয়া যায় না। এই বলিয়া দয়াময়ী সকৌতুকে হাসিয়া বন্দনাকে দিয়া ঘর খুলাইয়া সকলে ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মেঝের উপর থরে থরে সাজানো রূপার বাসন, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের মর্য্যাদা দিতে হইবে। কলিকাতা হইতে ভাঙাইয়া টাকা সিকি প্রভৃতি আনানো হইয়াছে, থলিগুলি স্তূপাকার করিয়া একস্থানে রাখা ; গরদ প্রভৃতি বহুমূল্য বস্ত্রসকল বস্তাবন্দী হইয়া এখনো পড়িয়া, খুলিয়া দেখার অবসর ঘটে নাই,—এ-সকল ব্যতীত দয়াময়ীর আলমারী সিন্দুকও এই ঘরে। হাত দিয়া দেখাইয়া হাসিয়া বলিলেন, বন্দনা, ওর মধ্যেই রয়েচে আমার যথাসর্ব্বস্ব, ওর 'পরেই দ্বিজুর আছে সবচেয়ে লোভ। ওইখানেই পাহারা দিতে হবে মা তোমাকে সবচেয়ে বেশি। আমার মতো তোমাকেও যেন ফাঁকি দিতে ও না পারে।

বন্দনার বিপন্ন মুখের পানে চাহিয়া সতী ভগিনীর হইয়া বলিল, এত বড় কাজের ভার দেওয়া কি ওকে চলবে মা ? অনেক টাকা-কড়ির ব্যাপার—তাহার কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই দয়াময়ী বলিলেন, অনেক টাকাকড়ির ব্যাপার বলেই

ওর হাতে চাবি দিলুম বৌমা। নইলে দ্বিজু আমাকে দেউলে করে দেবে।

কিন্তু ও যে বাইরে থেকে এসেচে মা?

সতীর এ কথাটাও শেষ হইল না, দয়াময়ী হাসিয়া বলিলেন, বাইরের থেকে একদিন তুমিও এসেছিলে আর তারও অনেক আগে এমনি বাইরে থেকে আমাকে আসতে হয়েছিল। ওটা আপত্তি নয় বৌমা। কিন্তু আর আমার সময় নেই আমি চললুম। এই বলিয়া তিনি ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

বন্দনা বলিল, তোমাদের বাড়িতে এসে এ-কি জালে জড়িয়ে পড়লুম মেজদি। আমি যে নিশ্বাস ফেলবার সময় পাব না।

তাই ত মনে হচ্ছে, বলিয়া সতী শুধু একটু হাসিল।

২৩

সংসারের বিপদ যে কোথায় থাকে এবং কোন পথে কখন যে আত্মপ্রকাশ করে ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কাজের মাঝখানে কল্যাণী আসিয়া কাঁদিয়া বলিল, মা, উনি বলচেন ওঁর সঙ্গে আমাকে এখুনি বাড়ি চলে যেতে। ট্রেনের সময় নেই—স্টেশনে বসে থাকবেন সে-ও ভালো তবু এ-বাড়িতে আর একদণ্ড না।

পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠার শাস্ত্রীয় ক্রিয়া এইমাত্র চুকিয়াছে, এইমাত্র দয়াময়ী মণ্ডপ হইতে বাটীতে আসিয়া পা দিয়াছেন। ভীষণ ব্যস্ততার মধ্যে তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন, মেয়ের কথাটা ভালো বুঝিতে পারিলেন না, হতবুদ্ধি হইয়া কহিলেন, কে বলচে তোমাকে যেতে—শশধর? কেন?

বড়দা ওঁকে ভয়ানক অপমান করেচেন—ঘর থেকে বার করে দিয়েচেন, এই বলিয়া কল্যাণী উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিতে লাগিল।

চারিদিকে লোকজন, কোথাও খাওয়ানোর আয়োজন, কোথাও গানের আসর, কোথাও ভিখারীদের বাদ-বিতণ্ডা, কোথাও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের শাস্ত্র-বিচার—অগণিত মানুষের অপরিমেয় কোলাহল,—উহারই মাঝখানে অকস্মাৎ এই ব্যাপার।

সতী ও মৈত্রেয়ী উপস্থিত হইল, বন্দনা ভাঁড়ারে চাবি দিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, আত্মীয়-কুটুম্বিনীগণের অনেকেই কৌতূহলী হইয়া উঠিল, শশধর আসিয়া

প্রণাম করিয়া বলিল, মা, আমরা চললুম। আসতে আদেশ করেছিলেন, আমরা এসেছিলুম, কিন্তু থাকতে পারলুম না।

কেন বাবা?

বিপ্রদাসবাবু তাঁর ঘর থেকে আমাকে বার করে দিয়েছেন।

তার কারণ?

কারণ বোধ করি এই যে তিনি বড়লোক। অহঙ্কারে চোখে-কানে দেখতে শুনতে পান না। ভেবেচেন নিজের বাড়িতে ডেকে এনে অপমান করা সহজ। কিন্তু ছেলেকে একটু বুঝিয়ে দেবেন আমার বাবাও জমিদারী রেখে গেছেন, সে-ও নিতান্ত ছোট নয়। আমাকেও ভিক্ষে করে বেড়াতে হয় না।

দয়াময়ী ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, বিপিনকে আমি ডেকে পাঠাচ্ছি বাবা, কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করি। আমার কাজ এখনো শেষ হ'লো না, ব্রাহ্মণ-ভোজন বাকী, বোষ্টম-ভিক্ষুকদের বিদায় করা হয়নি, তার আগেই যদি তোমরা রাগ করে চলে যাও শশধর, যে পুকুর এই মাত্র প্রতিষ্ঠা করলুম তাতেই ডুব দিয়ে মরবো তোমরা নিশ্চয় জেনো। বলিতে বলিতে তাঁহার দুই চোখে জল আসিয়া পড়িল।

শাশুড়ীর চোখের জলে বিশেষ ফল হইল না। ভদ্রসন্তান হইয়াও শশধরের আকৃতি ও প্রকৃতি কোনটাই ঠিক ভদ্রোচিত নয়। কাছে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইতে মন সঙ্কোচ বোধ করে। তাহার বিপুল দেহ ও বিপুলতর মুখমণ্ডল ক্রুদ্ধ বিড়ালের মত ফুলিতে লাগিল, বলিল, থাকতে পারি যদি বিপ্রদাসবাবু এখানে এসে সকলের সুমুখে হাত জোড় করে আমার কাছে ক্ষমা চান। নইলে নয়।

প্রস্তাবটা এত বড় অভাবিত যে শুনিয়া সকলে যেন বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল। বিপ্রদাস ক্ষমা চাহিবে হাত জোড় করিয়া! এবং সকলের সম্মুখে! কয়েক মুহূর্ত্ত সকলেই নির্ব্বাক, সহসা পাংশু-মুখে একান্ত অনুনয়ের কণ্ঠে সতী বলিয়া উঠিল, ঠাকুরজামাই, এখন নয় ভাই। কাজ-কর্ম্ম চুকুক, রাত্তিরে মা নিশ্চয় এর একটা বিহিত করবেন। তোমাকে অপমান করা কি কখনো হতে পারে? অন্যায় করে থাকলে তিনি নিশ্চয় ক্ষমা চাইবেন।

বন্দনার চোখের কোণ দুটা ঈষৎ স্ফুরিত হইয়া উঠিল, কিন্তু শান্ত-কণ্ঠে কহিল, তিনি অন্যায় ত কখন করেন না মেজদি।

সতী তাড়া দিয়া উঠিল, থাম বন্দনা। অন্যায় সবাই করে।

বন্দনা বলিল, না, তিনি করেন না।

শুনিয়া মৈত্রেয়ী জ্বলিয়া গেল, তীক্ষ্ণস্বরে কহিল, কি করে জানলেন? সেখানে ত আপনি ছিলেন না। উনি কি তবে বানিয়ে বলচেন?

বন্দনা ক্ষণকাল তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিল, বানিয়ে বলার কথা আমি বলিনি। আমি শুধু বলেচি মুখুয্যেমশাই অন্যায় করেন না।

মৈত্রেয়ী প্রত্যুত্তরে তেমনি বক্র-বিদ্রূপে কহিল, অন্যায় সবাই করে। কেউ ভগবান নয়। উনি বাবাকে অসম্মান করতে ছাড়েন নি।

বন্দনা বলিল, তা হলে শশধরবাবুর মত তাঁরও চলে যাওয়া উচিত ছিল, থাকা উচিত ছিল না।

মৈত্রেয়ী তীক্ষ্নস্বরে জবাব দিল, সে কৈফিয়ৎ আপনার কাছে দেবার নয়, মীমাংসা হবে দ্বিজুবাবুর সঙ্গে, যিনি আহ্বান করে এনেচেন।

সতী সরোষে তিরস্কার করিল, তোর পায়ে পড়ি বন্দনা, তুই যা এখান থেকে, নিজের কাজে যা।

শশধর দয়াময়ীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আমি কিন্তু ন্যায়-অন্যায়ের দরবার করতে আসিনি মা, এসেচি জানতে আপনার ছেলে জোড়-হাতে আমার কাছে ক্ষমা চাইবেন কি না! নইলে চললুম—এক মিনিটও থাকবো না। আপনার মেয়ে আমার সঙ্গে যেতে পারেন না-ও পারেন, কিন্তু তার পরে শ্বশুর বাড়ির নাম যেন না আর মুখে আনেন। এইখানে আজই তার শেষ হয় যেন।

এ কি সর্ব্বনেশে কথা! শশধরের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়—মেয়ে-জামাইকে বাড়ি আনিয়া এ কি ভয়ঙ্কর বিপদ! সুমুখে দাঁড়াইয়া কল্যাণী কাঁদিতে লাগিল, পরামর্শ দিবার লোক নাই, ভাবিবার সময় নাই, ত্রাসে লজ্জায় ও গভীর অপমানে দয়াময়ীর কর্ত্তব্য-বুদ্ধি আচ্ছন্ন হইয়া গেল, তিনি কি করিবেন ভাবিয়া না পাইয়া সভয়ে বলিলেন, তুমি একটু থাম বাবা, আমি বিপিনকে ডেকে পাঠাচ্ছি। আমি জানি কোথায় তোমার মস্ত বড় ভুল আছে, কিন্তু এই এক-বাড়ি লোকের মধ্যে এ কলঙ্ক প্রকাশ পেলে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে বাছা।

শশধর কহিল, বেশ, আমি দাঁড়িয়ে আছি, তাঁকে ডাকান। বিপ্রদাসবাবু মিথ্যে করেই বলুন এ কাজ তিনি করেন নি।

মিথ্যে কথা সে বলে না শশধর, এই বলিয়া দয়াময়ী বিপ্রদাসকে ডাকাইতে পাঠাইলেন। মিনিট-পাঁচেক পরে বিপ্রদাস আসিয়া দাঁড়াইল। তেমনি শান্ত, গম্ভীর ও আত্ম-সমাহিত। শুধু চোখের দৃষ্টিতে একটা উদাস ক্লান্ত ছায়া—তাহার অন্তরালে কি কথা যে প্রচ্ছন্ন আছে বলা কঠিন।

দয়াময়ী উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিয়া উঠিলেন, তোর নামে কি কথা শশধর বলে বিপিন। বলে, তুই নাকি ওকে ঘর থেকে বার করে দিয়েচিস। এ কি কখন সত্যি হতে পারে?

বিপ্রদাস বলিল, সত্যি বই কি মা।

ঘর থেকে বার করে দিয়েচিস আমার জামাইকে? আমার এই কাজের বাড়িতে?

হ্যাঁ, সত্যি বার করে দিয়েচি। বলেচি আর যেন না কখনো ও আমার ঘরে ঢোকে।

শুনিয়া দয়াময়ী বজ্রাহতের ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ এই অভিভূত ভাবটা কাটিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন?

সে তোমার না শোনাই ভালো মা।

সতী স্থির থাকিতে পারিল না, ব্যাকুল হইয়া নিবেদন করিল, আমরা কেউ শুনতে চাইনে, কিন্তু ঠাকুরজামাই কল্যাণীকে নিয়ে এখুনি চলে যেতে চাচ্ছেন, এই এক-বাড়ি লোকের মধ্যে ভেবে দেখো সে কত বড় কেলেঙ্কারী, ওঁকে বলো তোমার হঠাৎ অন্যায় হয়ে গেছে—বলো ওঁদের থাকতে।

বিপ্রদাস স্ত্রীর মুখের প্রতি এক মুহূর্ত্ত দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, হঠাৎ অন্যায় আমার হয় না সতী।

হয় হয়, হঠাৎ একটা অন্যায় সকলেরি হয়। বল না ওঁদের থাকতে।

বিপ্রদাস মাথা নাড়িয়া কহিল, না, অন্যায় আমার হয় নি।

স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনের মাঝে দয়াময়ী স্তব্ধ হইয়া ছিলেন, সহসা কে যেন তাঁহাকে নাড়া দিয়া সচেতন করিয়া দিল, তীব্র-কণ্ঠে কহিল, ন্যায়-অন্যায়ের ঝগড়া থাক্। মেয়ে-জামাই আমার চিরকালের মত পর হয়ে যাবে এ আমি সইবো না। শশধরের কাছে তুমি ক্ষমা চাও বিপিন।

সে হয় না মা, সে অসম্ভব।

সম্ভব-অসম্ভব আমি জানিনে। ক্ষমা তোমাকে চাইতেই হবে।

বিপ্রদাস নিরুত্তরে স্থির হইয়া রহিল। দয়াময়ী মনে মনে বুঝিলেন এ অসম্ভবকে আর সম্ভব করা যাইবে না, ক্রোধের সীমা রহিল না, বলিলেন, বাড়ি তোমার একার নয় বিপিন। কাউকে তাড়াবার অধিকার কর্ত্তা তোমাকে দিয়ে যাননি, ওরা এ-বাড়িতে থাকবে।

বিপ্রদাস কহিল, দেখো মা আমাকে ডেকে না পাঠিয়ে যদি তুমি এ আদেশ দিতে আমি চুপ করেই থাকতাম, কিন্তু এখন আর পারিনে। শশধর থাকলে এ বাড়ি ছেড়ে আমাকে চলে যেতে হবে। আর ফেরাতে পারবে না। কোনটা চাও বল?

জীবনে এমন ভয়ানক প্রশ্নের উত্তর দিতে কোনদিন কেহ তাঁহাকে ডাকে নাই, এত বড় দুর্ভেদ্য সমস্যার সম্মুখীন হইতেও কেহ বলে নাই। একদিকে মেয়ে-জামাই, আর এ দিকে দাঁড়াইয়া তাঁহার বিপিন। যে শিশুকে বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছেন, যে সকল আত্মীয়ের বড় আত্মীয়, দুঃখের সান্ত্বনা, বিপদের আশ্রয়—যে ছেলে তাঁর প্রাণাধিক প্রিয়। এ অমর্য্যাদা তাহাকে মৃত্যু দিবে কিন্তু সংকল্পচ্যুত করিবে না। বুঝিলেন সর্ব্বনাশের অতলস্পর্শ গহ্বর তাঁহার পায়ের নীচে, এ ভুলের প্রতিবিধান নাই,

প্রত্যাবর্ত্তনের পথ নাই—পরিণাম ইহার দৈবের মতই অমোঘ, নির্ম্মম ও অনন্যগতি। তথাপি নিজেকে শাসন করিতে পারিলেন না, অদম্য ক্রোধ ও অভিমানের ব্যত্যয় তাঁহাকে সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া দিল, কটুকণ্ঠে বলিলেন, এ তোমার অন্যায় জিদ বিপিন। তোমার জন্যে মেয়ে-জামাইকে অন্যের মত পর করে দেব এ হয় না বাছা। তোমার যা ইচ্ছে করগে। শশধর, এস তোমরা আমার সঙ্গে—ওর কথায় কান দেবার দরকার নেই। বাড়ি ওর একার নয়। এই বলিয়া তিনি কল্যাণী ও শশধরকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের পিছনে পিছনে গেল মৈত্রেয়ী, যেন ইহাদের সে আপন লোক।

মনে হইয়াছিল সতী বুঝি এইবার ভাঙ্গিয়া পড়িবে। কিন্তু তাহার অচঞ্চল দৃঢ়তায় বন্দনা ও বিপ্রদাস উভয়েই বিস্মিত হইল। তাহার চোখে জল নাই, কিন্তু মুখ অতিশয় পাণ্ডুর, বলিল, ঠাকুরজামাই কি করেচেন আমরা জানিনে, কিন্তু অকারণে তুমিও যে এত বড় কাণ্ড করোনি, তা নিশ্চয়ই জানি। ভেবো না, মনে মনে তোমাকে আমি এতটুকু দোষও কোনদিন দেব।

বিপ্রদাস চুপ করিয়া রহিল। সতী জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি আজই চলে যাবে?

না, কাল যাবো।

আর আসবে না এ-বাড়িতে?

মনে ত হয় না।

আমি? বাসু?

যেতে তোমাদেরও হবে। কাল না পার অন্য কোন দিন।

না, অন্য দিন নয়, আমরাও কালই যাবো। এই বলিয়া সতী বন্দনাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুই কি করবি বন্দনা, কালই যাবি?

বন্দনা বলিল, না। আমি তো ঝগড়া করিনি মেজদি, যে দল পাকিয়ে কালই যেতে হবে।

সতী বলিল, ঝগড়া আমিও করিনি বন্দনা, উনিও না; কিন্তু যেখানে ওঁর জায়গা হয় না সেখানে আমারও না। একটা দিনও না। তোর বিয়ে হলে এ কথা বুঝতিস্।

বন্দনা বলিল, বিয়ে না হয়েও বুঝি মেজদি, স্বামীর জায়গা না হলে স্ত্রীরও হয় না। কিন্তু ভুল ত হয়, না-বুঝে তাকেই স্বীকার করা স্ত্রীর কর্ত্তব্য, তোমার এ-কথা আমি মানবো না।

শাশুড়ির প্রতি সতীর অভিমানের সীমা ছিল না, বলিল, স্বামী থাকলে মানতিস্। বলিয়াই অশ্রু চাপিতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

বন্দনা কহিল, এ কি করলেন মুখুয্যেমশাই?

না করে উপায় ছিল না বন্দনা।

কিন্তু মায়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ এ যে ভাবতে পারা যায় না।

বিপ্রদাস বলিল, যায় না সত্যি, কিন্তু নতুন প্রশ্ন এসে যখন পথ আগলায় তখন নতুন সমাধানের কথাই ভাবতে হয়। এড়িয়ে চলবার ফাঁক থাকে না। তোমার মেজদি আমার সঙ্গে যাবেই—বাধা দেওয়া বৃথা। কিন্তু তুমি? আরও দু-চার দিন কি থাকবে মনে করেচো?

বন্দনা বলিল, কতদিন থাকতে হবে আমি জানিনে। কিন্তু নতুন প্রশ্ন আপনার যতই আসুক আমি কিন্তু সেই পুরনো পথেই তার উত্তর খুঁজে ফিরবো—যে পথ প্রথম দিনটিতে আমার চোখে পড়েছিল, যেদিন হঠাৎ এসে এ-বাড়িতে দাঁড়িয়েছিলুম, যার তুলনা কোথাও দেখিনি, যা আমার মনের ধারণা দিয়েচে চিরকালের মতো বদলে।

বিপ্রদাস ইহার উত্তর দিল না, শুধু ওষ্ঠপ্রান্তে তাহার একটুখানি ম্লান হাসির আভাস দেখা দিল। সে হাসি যেমন বেদনার তেমনি নিরাশার। কহিল, আমি বাইরে চললুম, আবার দেখা হবে।

অশ্রুবাষ্পে বন্দনার চোখ ভরিয়া উঠিয়াছে; বলিল, দেখা যদি হয় তখন শুধু দূর থেকে আপনাকে প্রণাম করবো। কঠোর আপনার প্রকৃতি, কঠিন মন,—না আছে স্নেহ, না আছে ক্ষমা। তখন বলতে যদি না পারি, সুযোগ যদি না হয় এখুনি বলে রাখি মুখুয্যেমশাই, যাদের নিয়ে চলে আমাদের ঘর-কন্না, হাসি-কান্না, মান-অভিমান তাদের নিয়েই যেন চলতে পারি, তাদেরই যেন আপনার ব'লে এ জীবনে ভাবতে শিখি। আলেয়ার আলোর পিছনে আর যেন না পথ হারাই। একটু থামিয়া বলিল, দূর থেকে যখনি আপনাকে মনে পড়বে তখনি একান্তমনে এই মন্ত্র জপ করবো—তিনি নির্ম্মল, তিনি নিষ্পাপ, তিনি মহৎ। মনের পাষাণ ফলকে তাঁর লেশমাত্র দাগ পড়ে না। জগতে তিনি একক, কারো আপন তিনি নন,—সংসারে কেউ তাঁর আপন হতে পারে না। এই বলিয়া দু'চোখে আঁচল চাপিয়া সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সেদিন কাজ-কর্ম্ম চুকিল অনেক রাত্রে। এ-গৃহের সুশৃঙ্খলিত ধারায় কোথাও কোন ব্যাঘাত ঘটিল না। বাহির হইতে কেহ জানিতে পারিল না সেই শৃঙ্খলের সবচেয়ে বড় গ্রন্থিই আজ চূর্ণ হইয়া গেল। প্রভাত হইতে অধিক বিলম্ব নাই, কর্ম্মক্লান্ত বৃহৎ ভবন একান্ত নীরব,—যে যেখানে স্থান পাইয়াছে নিদ্রামগ্ন,—ভাঁড়ারের গুরু দায়িত্ব সমাপন করিয়া বন্দনা শ্রান্তপদে নিজের ঘরে যাইতেছিল, চোখে পড়িল ওদিকে বারান্দার পাশে দ্বিজদাসের ঘরে আলো জ্বলিতেছে। দ্বিধা জাগিল এমন সময়ে যাওয়া উচিত কি-না, কাহারো চোখে পড়িলে সুবিচার সে করিবে না, নিন্দা হয়ত শতমুখে বিস্তার লাভ করিবে, কিন্তু থামিতে পারিল না, যে উদ্বেগ তাহাকে

সারাদিন চঞ্চল ও অশান্ত করিয়া রাখিয়াছে সে তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া গেল। রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিল, দ্বিজুবাবু এখনো জেগে আছেন?

ভিতর হইতে সাড়া আসিল, আছি। কিন্তু এমন সময়ে আপনি যে?

আসতে পারি।

স্বচ্ছন্দে!

বন্দনা দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া দেখিল রাশীকৃত কাগজপত্র লইয়া দ্বিজদাস বিছানায় বসিয়া। জিজ্ঞাসা করিল, আজকের হিসাব বুঝি। কিন্তু হিসেব ত পালাবে না দ্বিজুবাবু, এত রাত জাগলে শরীর খারাপ হবে যে।

দ্বিজদাস বলিল, হলে বাঁচতুম, এগুলো চোখে দেখতে হ'তো না।

খরচ অনেক হয়ে গেছে বুঝি? দাদার কাছে গুরুতর কৈফিয়ৎ দিতে হবে?

দ্বিজদাস কাগজগুলো একধারে ঠেলিয়া দিয়া সোজা হইয়া বসিল, বলিল, চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ। শ্রীগুরুর কৃপায় সেদিন আর এখন আমার নেই বন্দনা দেবী, যে দাদার কাছে কৈফিয়ৎ দেবো। এখন উল্টে কৈফিয়ৎ চাইবো আমি। বলবো, লাও শীগ্‌গির হিসেব—জলদি লাও রূপেয়া—কোথায় কি করেচো বলো।

বন্দনা অবাক হইয়া বলিল, ব্যাপার কি?

দ্বিজদাস মুষ্টিবদ্ধ দুই হাত মাথার উপরে তুলিয়া কহিল, ব্যাপার অতীব ভীষণ। মা দয়াময়ী আমাকে দয়া করুন, ভগ্নিপতি শশধর আমার সহায় হোন—সাবধান বিপ্রদাস। তোমাকে এবার আমি ধনে-প্রাণে বধ করবো। আমাদের হাতে আর তোমার নিস্তার নেই।

বন্দনার চিন্তা উদ্দাম হইয়া উঠিল, তবু সে না হাসিয়া পারিল না, বলিল, সবটাতেই হাসি-তামাসা! আপনি এক মুহূর্ত্ত সিরিয়াস হতে জানেন না দ্বিজুবাবু?

দ্বিজদাস বলিল, জানিনে? তবে আনো শশধরকে, আনো—না, তাঁরা থাক্‌। দেখবে, হাসি-তামাসা পালাবে চক্ষের নিমিষে সাহারায়, গাম্ভীর্য্যে মুখমণ্ডল হয়ে উঠবে বুনো-ওলের মত ভয়াবহ। পরীক্ষা করুন।

বন্দনা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিল, কহিল, আপনি তা হলে শুনেচেন সব?

সব নয়, যৎ-কিঞ্চিৎ। সব জানেন দাদা, কিন্তু সে গহন অরণ্য। আর জানে শশধর। সে বলবে বটে, কিন্তু সমস্ত মিথ্যে করে বানিয়ে বলবে।

বন্দনা ব্যাকুল-কণ্ঠে বলিল, যা জানেন আমাকে বলতে পারেন না দ্বিজুবাবু? আমি সত্যি বড় ভয় পেয়েচি।

দ্বিজদাস কহিল, ভয় পাওয়া বৃথা। দাদার সঙ্কল্প টলবে না,—তাঁকে আমরা হারালাম।

দীপালোকে দেখা গেল এইবার অশ্রুজলে দু'চক্ষু তাহার টল্ টল্ করিতেছে, ঘাড় ফিরাইয়া কোনমতে মুছিয়া আবার সে সোজা হইয়া বসিল।

বন্দনা গাঢ়স্বরে কহিল, বিচ্ছেদ এত সহজেই আসবে দ্বিজুবাবু, সত্যিই ঠেকান যাবে না?

দ্বিজদাস মাথা নাড়িয়া বলিল, না। ও-বস্তু যখন আসে তখন এমনি অবাধে এমনি দ্রুতই আসে, বারণ কিছুতে মানে না। যারা কাঁদবার সে কাঁদে, কিন্তু শেষ ঐখানে। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, আপনি জানতে চাইছিলেন হেতু। বিস্তারিত জানিনে, কিন্তু যতটুকু জানি সে শুধু আপনাকেই বলবো, আর সাহায্য যদি কখনো চাইতে হয়, যেখানেই থাকুন সে কেবল আপনার কাছেই চাইব।

কেবল আমার কাছেই কেন?

তার কারণ হাত যদি পাততেই হয় মহতের দ্বারে হাত পাতাই শাস্ত্রের বিধান।

কিন্তু মহৎ কি আর কেউ নেই?

হয়ত আছে, কিন্তু ঠিকানা জানিনে। দাদার কথা তুলবো না, কিন্তু চিরদিন হাত পাতার অভ্যাস ছিল বৌদির কাছে, কিন্তু সে-পথ বন্ধ হ'লো। আপনি তাঁর বোন, আমার দাবী তাঁর থেকে।

কিন্তু মা?

দ্বিজদাস বলিল, রথ যখন দ্রুত চলে মা তার অসাধারণ সারথি, কিন্তু চাকা যখন কাদায় বসে মা তখন নিরুপায়। নেমে এসে ঠেলতে তিনি পারেন না। সে দুর্দ্দিনে যাব আপনার কাছে। দেবেন না ভিক্ষে?

ভিক্ষের বিষয় না জেনে বলবো কি করে দ্বিজুবাবু?

সে নিজেও জানিনে বন্দনা, সহজে চাইতেও যাব না। যখন কোথাও মিলবে না যাব শুধু তখনি।

বন্দনা বহুক্ষণ অধোমুখে থাকিয়া মুখ তুলিয়া কহিল, যা জানতে চেয়েছিলুম বললেন না?

দ্বিজদাস বলিল, সমস্ত জানিনে, যা জানি তাও হয়ত অভ্রান্ত নয়। কিন্তু একটা বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই যে দাদা আজ সর্ব্বস্বান্ত। সমস্ত গেছে।

বন্দনা চমকিয়া উঠিল—মুখুয্যেমশাই সর্ব্বস্বান্ত? কি করে এমন হলো দ্বিজুবাবু?

দ্বিজদাস বলিল, খুব সহজেই এবং সে ঐ শশধরের ষড়যন্ত্রে। সাহা-চৌধুরী কোম্পানী হঠাৎ যেদিন দেউলে হ'লো দাদারও সর্ব্বস্ব ডুবল সেই গহ্বরে! অথচ, এ শুধু বাইরের ঘটনা,—যেটুকু চোখে দেখতে পাওয়া গেল। ভিতরে গোপন রইলো অন্য ইতিহাস।

বন্দনা ব্যাকুল হইয়া কহিল, ইতিহাস থাক দ্বিজুবাবু, শুধু ঘটনার কথাই বলুন। বলুন সর্ব্বস্ব যাওয়া সত্যি কি-না।

হ্যাঁ, সত্যি। ওখানে কোন ভুল নেই।

কিন্তু মেজদি? বাসু? তাদেরও কিছু রইলো না নাকি?

না। রইলো বৌদির শুধু বাপের বাড়ির আয়। সামান্য ঐ ক'টা টাকা।

কিন্তু সে তো মুখুয্যেমশাই ছোঁবেন না দ্বিজুবাবু!

না। তার চেয়ে উপোসের ওপর দাদার বেশি ভরসা। যে কটা দিন চলে।

উভয়েই নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। মিনিট-কয়েক পরে বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু আপনি? আপনার নিজের কি হ'লো?

দ্বিজদাস বলিল, পরম নির্ভয়ে ও নিরাপদে আছি। দাদা আপনি ডুবলেন, কিন্তু আমাকে রাখলেন ভাসিয়ে। জলকণাটি পর্য্যন্ত লাগতে দিলেন না গায়ে। বলবেন, এ অসম্ভব সম্ভব হ'লো কি করে? হ'লো মায়ের সুবুদ্ধি, দাদার সাধুতা এবং আমার নিজের শুভ-গ্রহের কল্যাণে। গল্পটা বলি শুনুন। এই শশধর ছিল দাদার বাল্যবন্ধু, সহপাঠি। দু'জনের ভালোবাসার অন্ত নেই। বড় হয়ে দাদা এর সঙ্গে দিলেন কল্যাণীর বিয়ে। এই ঘটকালিই দাদার জীবনের অক্ষয় কীর্ত্তি। শোনা গেল, শশধরের বাপের মস্ত জমিদারী, বিপুল অর্থ ও বিরাট কারবার। অতবড় বিত্তশালী ব্যক্তি পাবনা অঞ্চলে কেউ নেই। বছর-চারেক গেল, হঠাৎ একদিন শশধর এসে জানালো জমিদারী, ঐশ্বর্য্য, কারবার অতলে তলাতে আর বিলম্ব নেই,—রক্ষা করতে হবে। মা বললেন, রক্ষা করাই উচিত, কিন্তু দ্বিজু আমার নাবালক, তার টাকায় ত হাত দিতে পারা যাবে না বাবা। সে বললে, বছর ঘুরবে না মা, শোধ হয়ে যাবে। মা বললেন, আশীর্ব্বাদ করি তাই যেন হয়, কিন্তু নাবালকের সম্পত্তি কর্ত্তার একান্ত নিষেধ।

কল্যাণী কেঁদে এসে দাদার পায়ে গিয়ে পড়লো। বলল, দাদা, বিয়ে দিয়েছিলে তুমিই, আজ ছেলেমেয়ে নিয়ে ভিক্ষে করে বেড়াবো দেখবে তুমি চোখে? মা পারেন, কিন্তু তুমি? যেখানে ওঁর ধর্ম্ম, যেখানে ওঁর বিবেক ও বৈরাগ্য, যেখানে উনি আমাদের সকলের বড় কল্যাণী সেইখানেই দিলে আঘাত। দাদা অভয় দিয়ে বললেন, তুই বাড়ি যা বোন, যা করতে পারি আমি করবো। সেই অভয় মন্ত্র জপতে জপতে কল্যাণী বাড়ি ফিরে গেল। তার পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত বন্দনা। কিন্তু চেয়ে দেখুন ভোর হয়েচে, এই বলিয়া খোলা জানালার দিকে সে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

বন্দনা উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু ঐ কাগজগুলো আপনার কি?

দ্বিজদাস বলিল, আমার নির্ভয়ে থাকার দলিল। আসবার সময়ে দাদা সঙ্গে এনেছিলেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি আপনিও কি আমাদের আজই ফেলে চলে যাবেন?

ঠিক জানিনে দ্বিজুবাবু। কিন্তু আর সময় নেই আমি চললুম। আবার দেখা হবে, এই বলিয়া সে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

২৪

মেজদিদিকে জোর করিয়া একটা চেয়ারে বসাইয়া বন্দনা তাহার পায়ে আলতা পরাইয়া দিতেছিল। এই মঙ্গলাচারটুকু অন্নদা তাহাকে শিখাইয়া দিয়া নিজে আত্মগোপন করিয়াছে। তাহার চোখ রাঙা, অবিরত অশ্রুবর্ষণে চোখের পাতা ফুলিয়াছে—বন্দনার প্রশ্নের উত্তরে সে সংক্ষেপে বলিয়াছিল, বৌকে মুখ দেখাতে আমি পারবো না।

তুমি পারবে না কেন অনুদি, তোমার লজ্জা কিসের?

আমার লজ্জা এই জন্যে যে, এর আগে মরিনি কেন? শুধু দ্বিজুকেই ত মানুষ করিনি বন্দনাদিদি, বিপিনকেও করেছিলুম। ওর মা যখন মারা গেল কার হাতে দিয়েছিল তার ছ'মাসের ছেলেকে? আমার হাতে। সেদিন কোথায় ছিলেন দয়াময়ী? কোথায় ছিল তাঁর মেয়ে-জামাই। বলিতে বলিতে সে মুখে আঁচল চাপিয়া দ্রুতপদে অন্যত্র সরিয়া গেল। মেঝেয় বসিয়া নিজের জানুর উপর দিদির পা দুটি রাখিয়া বন্দনার আলতা পরানো যেন আর শেষ হইতে চাহে না।

টপ করিয়া এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু সতীর পায়ের উপর পড়িল। হেঁট হইয়াও সে বন্দনার মুখ দেখিতে পাইল না। কিন্তু হাত বাড়াইয়া তাহার চোখ মুছাইয়া বলিল, তুই কেন কাঁদচিস্ বল তো বন্দনা?

বন্দনা তেমনি নত-মুখে বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে কহিল, কাঁদচে ত সবাই মেজদি। আমি ত একা নয়।

সবাই কাঁদচে বলে তোকেও কাঁদতে হবে, এত লেখা-পড়া শিখে এই বুঝি তোর যুক্তি হ'লো?

দিদির কথা শুনিয়া বন্দনা মুহূর্তের জন্য মুখ তুলিয়া চাহিল, বলিল, যুক্তি দেখিয়ে কাঁদতে হবে নইলে মানুষ কাঁদবে না, তোমার যুক্তিটা বুঝি এই মেজদি?

সতী হাত দিয়া তাহার মাথাটা নাড়িয়া দিয়া সস্নেহে কহিল, তর্কবাগীশের সঙ্গে তর্কে পারবার জো নেই। তা বলিনি রে, তা আমি বলিনি। ওরা ভেবেচে আমার বুঝি সব গেলো, তাই ওদের কান্না, কিন্তু সত্যি তা নয়। আমার এক দিকে রয়েচেন স্বামী অন্য দিকে ছেলে—সংসারে কোন ক্ষতিই আমার হয়নি ভাই, আমার জন্যে তুই শোক করিস্‌নে। দুঃখ আমার নেই।

বন্দনা বলিল, দুঃখ যেন তোমার নাই থাকে মেজদি। কিন্তু তোমার দুঃখটাই সংসারে সব নয়। তোমার কতখানি গেলো সে তুমি জানো, কিন্তু কেঁদে কেঁদে যারা চোখ অন্ধ করলে তাদের লোকসান কে পুরাবে বলো ত?

একটু থামিয়া বলিল, মুখুয্যেমশাই পুরুষমানুষ, যা খুশি উনি বলুন, কিন্তু যাবার ক্ষণে আজ শুক্‌নো চোখে যেন তুমি বিদায় নিও না দিদি। সে ওদের বড় বিঁধবে।

কাদের বিঁধবে রে বন্দনা?

কাদের? জানো না তুমি তাদের? তোমার ন'বছর বয়সে এসেছিলে এই পরের বাড়িতে, সেই বাড়িতে বছরের পর বছর ধরে তোমার আপনার করে দিলে যারা, আজকের একটা ধাক্কাতেই তাদের ভুলে গেলে মেজদি? তোমার শাশুড়ি, তোমার দেওর, তোমার সংসারের দাস-দাসী, আশ্রিত-পরিজন, ঠাকুরবাড়ি, অতিথিশালা, গুরু-পুরুত—এদের অভাব পূর্ণ হবে শুধু স্বামী-পুত্র দিয়ে? আর কেউ নেই জীবনে—শুধু এই?

বন্দনা বলিতে লাগিল, এ কাদের মুখের কথা জানো মেজদি, যে সমাজে আমরা মানুষ হয়েচি তাদের। তুমি ভেবেচো স্বামী-ভক্তির এই শেষ কথা? স্ত্রীর এর বড়ো ভাববার কিছু নেই? এ তোমার ভুল। কলকাতায় চলো আমার মাসীর বাড়িতে, দেখবে এ-কথা সেখানে পুরানো হয়ে আছে—এর বেশি তারা ভাবেও না, করেও না। অথচ,—কথার মাঝখানে সে থামিয়া গেল। তাহার হঠাৎ মনে হইল কে যেন পিছনে দাঁড়াইয়া, ফিরিয়া দেখিল দ্বিজদাস। কখন যে সে নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে উভয়ের কেহই টের পায় নাই। লজ্জা পাইয়া বন্দনা কি-যেন বলিতে গেল, দ্বিজদাস থামাইয়া দিয়া কহিল, ভয় নেই, মাসীকেও চিনিনে তাঁর দলের কাউকেও জানিনে—আপনার কথা তাঁদের কাছে প্রকাশ পাবে না। কিন্তু আসলে আপনার ভুল হচ্চে। পৃথিবীতে জন্তু-জানোয়ারের দল আছে, তাদের আচরণ ফরমুলায় বাঁধা যায়, কিন্তু মানুষের দল নেই। এক জোটে এমন গড়পড়তা বিচার তাদের চলে না। সকাল থেকে আজ এই কথাটাই ভাবছিলুম। মাসীর দল থেকে টেনে এনে অনায়াসে আপনাকে দাদার দলে ভর্ত্তি করা যায়, আবার দয়াময়ীর দল থেকে বার করে স্বচ্ছন্দে ঐ মৈত্রেয়ীকে আপনার মাসীর দলে চালান করা চলে। বাজি রেখে বলতে পারি কোথাও এক তিল বিভ্রাট বাধবে না। বাঃ রে মানুষের মন! বাঃ রে তার প্রকৃতি!

সতী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, এ কথার মানে ঠাকুরপো?

দ্বিজদাস ততোধিক বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, তোমার কাছেও মানে? দ্বিজুর কাজ, দ্বিজুর কথার মানেই যদি থাকবে বৌদি, এতকাল দয়াময়ী বিপ্রদাসের

দরবারে না গিয়ে তোমার কাছেই তার সব আর্জি পেশ হ'তো কেন? মানে বোঝায় গরজ তোমার নেই বলেই ত? আজ যাবার দিনেও সেইটুকুই থাক্ বৌদি, ঠিক-বেঠিকের চুল:চেরা বিচারে কাজ নেই। এই বলিয়া সুমুখে আসিয়া তাহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল। এমন সে করে না। পায়ের কাঁচা আলতার রঙ তাহার কপালে লাগিয়াছে, সতী ব্যস্ত হইয়া আঁচলে মুছাইয়া দিতে গেল, সে ঘাড় নাড়িয়া মাথা সরাইয়া বলিল, দাগ আপনিই মুছে যাবে বৌদি, একটা দিন থাকে থাক্। কথাটা কিছুই নয়, দ্বিজু হাসিয়াই বলিল, কিন্তু শুনিয়া বন্দনার দু'চোখ জলে ভরিয়া গেল। লুকাইতে গিয়া সে আর মুখ তুলিতে পারিল না।

দ্বিজদাস বলিল, আমি এসেছিলুম তাগাদা দিতে। সময় হয়ে আসচে, দাদা ব্যস্ত হয়ে পড়েচেন। জিনিসপত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়েচে, বাসুকে জামা-কাপড় পরিয়ে গাড়িতে বসিয়ে দিয়েচি, মাঙ্গলিকের আয়োজন কে করে দিলে জানিনে, কিন্তু তাও হাতের কাছে পেয়ে গেলুম। ভয় হয়েছিল অন্নদি হয়ত ডুবে মরেচেন, কিন্তু সন্দেহ হচ্চে কোথাও বেঁচেই আছেন। নইলে ওগুলো এলো কি করে? কিন্তু খুঁজে পাওয়া যখন তাকে যাবে না তখন খুঁজেও কাজ নেই। ওদিকে দয়াময়ীর মহল অর্গলবদ্ধ। সঙ্কট-উত্তরণের যে পন্থা তিনি অবলম্বন করেচেন তাতে করবার কিছুই নেই। তবে শ্রীমতী মৈত্রেয়ীকে বলে যেতে পারো যথাসময়ে মা'র কানে তা পৌঁছবে। কিন্তু আমি বলি প্রয়োজন নেই। এবার তুমি একটু তৎপর হয়ে গাড়িতে গিয়ে বসবে চলো বৌদি, তোমাদের ট্রেনে তুলে দিয়ে এসে আমি নিস্তার পাই, একটু কাজে মন দিতে পারি।

সতী ম্লান হাসিয়া কহিল, আমাকে বিদায় করতে ঠাকুরপোর ভারি তাড়া।

আমার কাজ পড়ে রয়েচে যে।

কি কাজ শুনি?

এর আগে কখনো ত শুনতে চাওনি বৌদি। যখন যা চেয়েচি জিজ্ঞাসা না করেই চিরকাল দিয়ে এসেচ। এ তোমার শোনার যোগ্য নয়।

সতী এবং বন্দনা উভয়েই ক্ষণকাল নীরবে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল, তার পরে সতী বলিল, তুমি যাও ঠাকুরপো, আর আমার দেরি হবে না। বন্দনাকে কহিল, তুইও এখানে বেশি দেরি করিসনে বোন,—যত শীঘ্র পারিস্ বোম্বায়ে ফিরে যা। কলকাতায় যাবার দরকার নেই, কাকা সেখানে একলা রয়েছেন মনে রাখিস।

বন্দনা দ্বিজুর মতো পায়ে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল, পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল, বলিল, না মেজদি, মাসীর বাড়িতে আর না। সেদিকের পাঠ উঠিয়ে দিয়েই বেরিয়েছিলুম এ কখনো ভুলব না। এই বলিয়া সে আঁচলে অশ্রু মুছিয়া কহিল, হয়ত

কালই বোম্বায়ে ফিরবো, কিন্তু তুমিও যাবার আগে এই ভরসা দিয়ে যাও মেজদি, আবার যেন শীঘ্র তোমাদের দেখতে পাই।

সতী মনে মনে কি আশীর্ব্বাদ করিল সে-ই জানে, হাত বাড়াইয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিল, হাসিমুখে বলিল, সে তো তোর নিজের হাতে বন্দনা। কাকাকে বলিস্ বিয়ের নেমন্তন্নপত্র দিতে, যেখানে থাকি গিয়ে হাজির হবোই। একটুখানি থামিয়া বোধ হয় মনে মনে চিন্তা করিল বলা উচিত কি না, তার পরে বলিল, ভারি সাধ ছিল এ বাড়িতে তুই পড়বি। ঠাকুরপোর হাতে তোকে সঁপে দিয়ে তোর হাতে সংসারের ভার বাসুর ভার সব তুলে দিয়ে মায়ের সঙ্গে কৈলাস-দর্শনে যাবো, ফিরতে না পারি না-ই পারলুম, কিন্তু মানুষ ভাবে এক হয় আর। এই বলিয়া সে চুপ করিল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় কহিল, এ-বাড়িতে আমি যা পেয়েছিলুম জগতে কেউ তা পায় না। আবার সবচেয়ে বেশী করে পেয়েছিলুম আমার শাশুড়িকে। কিন্তু তাঁর সঙ্গেই বিচ্ছেদ ঘটলো সবচেয়ে বেশি। যাবার আগে প্রণাম করতে পেলুম না, দোর বন্ধ, চৌকাটের ধুলো মাথায় তুলে নিয়ে বললুম, মা, এই কাঠের ওপরে তোমার পায়ের ধুলো লেগে আছে, এই আমার—কথা শেষ করিতে পারিল না, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া এইবার সে ভাঙিয়া পড়িল, তাহার দু'চোখ বাহিয়া দর দর ধারে অশ্রু নামিয়া আসিল। মিনিট দুই-তিন গেল সামলাইতে, আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিল, আর পেলুম না খুঁজে আমার অনুদিকে। সে আমার মায়েরও বড় বন্দনা। আমরা চলে গেলে তাকে বলিস ত রে, আমি রাগ করে গেছি। আবার দু'চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া আসিল, আবার সে আঁচলে মুছিয়া ফেলিল। একটা বিড়াল পুষিয়াছিল, নাম নিমু। কাজ-কর্ম্মের বাড়িতে সেটা যে কোথায় গিয়াছে ঠিকানা নাই। সকাল হইতে কয়েকবার মনে পড়িয়াছে, এখনও তাহাকে মনে পড়িল। বলিল, নিমুটা যে কোথায় ডুব মারলে দেখে যেতে পেলুম না। অনুদিকে বলিস ত বন্দনা। অথচ, একটু পূর্ব্বেই জোর করিয়া বলিয়াছিল, তাহার এক দিকে রহিলেন স্বামী, অন্য দিকে সন্তান—সংসারের কোন ক্ষতিই তাহার হয় নাই! কথাটা কত বড়ই না মিথ্যা!

বৌদি করচো কি? বাহির হইতে দ্বিজদাসের আর এক দফা তাগাদা আসিল।

যাচ্ছি ভাই হয়েচে—বলিয়া সতী তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল।

* * * *

স্টেশন হইতে দ্বিজদাস যখন একাকী ফিরিয়া আসিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। ঘরে ঘরে তেমনি আলো জলিয়াছে, তেমনিভাবেই লোক-জন আপন-আপন কাজে ব্যস্ত, এই বৃহৎ পরিবারের কোথায় কি বিপ্লব ঘটিয়াছে কেহ জানেও না। বাহিরের মহলে উপরে বিপ্রদাসের বসিবার ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ,—

ও-দিকটা অন্ধকার। এমন কত দিনই আলো জ্বলে না, বিপ্রদাস থাকেন কলকাতায়, অভাবনীয় কিছু নয়। সিড়ির বাঁ দিকের ঘরটায় থাকে অশোক, জানালা দিয়া চোখে পড়িল ইজি চেয়ারে পা ছড়াইয়া বাতির আলোকে সে নিবিষ্ট-চিত্তে কি একখানা বই পড়িতেছে। কলেজ কামাই করিয়া অক্ষয়বাবু আজও আছেন, তাঁর ঘরটা শেষের দিকে, তিনি ঘরে আছেন কিংবা বায়ু-সেবনে বহির্গত হইয়াছেন জানা গেল না। মোটর হইতে প্রাঙ্গণে পা দিয়াই দ্বিজদাসের চোখে পড়িয়াছিল ত্রিতলের লাইব্রেরী ঘরটা। সন্ধ্যার পর এ ঘরটা প্রায় থাকে অন্ধকার, আজ কিন্তু খোলা জানালা দিয়া আলো আসিতেছে। তাহার সন্দেহ রহিল না এখানে আছে বন্দনা। বই পড়িতে নয়, চোখ মুছিতে। লোকের সংস্রব হইতে আত্মরক্ষা করিতে সে এই নির্জ্জনে আশ্রয় লইয়াছে। আজ রাত্রিটা কোনমতে কাটাইয়া কাল সে চলিয়া যাইবে সুদূর বোম্বাই অঞ্চলে,—যেখানে মানুষ হইয়া সে এত বড় হইয়াছে—যেখানে আছে তাহার পিতা, আত্মীয়-স্বজন, তাহার কত দিনের কত বন্ধু এবং বান্ধবী। কোনদিন কোন ছলে কখন যে এ গ্রামে তাহার আবার আসা সম্ভব ভাবাও যায় না। না আসুক কিন্তু এ-বাড়ি সহজে সে ভুলিবে না। বিচিত্র এ দুনিয়া,—কত অদ্ভুত অভাবিত ব্যাপারই না এখানে নিমিষে ঘটে। একটা একটা করিয়া সেই প্রথম দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত সকল কথাই দ্বিজুর মনে পড়িল। সেই হঠাৎ আসা আবার তেমনি হঠাৎ রাগ করিয়া যাওয়া। মধ্যে শুধু ঘণ্টাখানেক আলাপ-আলোচনা। সেদিন বন্দনা সহাস্যে বলিয়াছিল, শুধু চোখের পরিচয়টাই নেই দ্বিজুবাবু, নইলে দেওরের গুণাগুণ লিখে পাঠাতে মেজদি কখনো আলস্য করেননি। আমি সমস্ত জানি, আপনার সম্বন্ধে আমার কিছু অজানা নেই। যতদিন যত জ্বালিয়েছেন বাড়িশুদ্ধ লোককে তার সমস্ত খবর পৌঁছেচে আমার কাছে। দ্বিজদাস জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমরা কেউ কারুকে চিনিনে, তবু আপনার কাছে আমার দুর্নাম প্রচার করার সার্থকতা ছিল কি? বন্দনা হাসিয়া জবাব দিয়াছিল, বোধ করি আসলে মেজদিদি আপনাকে দেখতে পারেন না,—এ তারই প্রতিশোধ।

তার পরে দুজনে হাসিয়া কথাটাকে পরিহাসে রূপান্তরিত করিয়াছিল, কিন্তু সেদিন উভয়ের কেহই ভাবে নাই এ ছিল সতীর দ্বিজুর প্রতি বন্দনার চিত্ত আকর্ষণের কৌশল। যদি কখনো বোনটিকে কাছে আনা যায়, যদি কখনো তাহার হাতে দিয়া অশান্ত দেবরটিকে শাসন মানান চলে। কিন্তু সে ঘটিল না, তাহার গোপন বাসনা গোপনেই রহিয়া গেল,—আজও দুজনের কেহই সে-সব চিঠির অর্থ খুঁজিয়া পাইল না।

দ্বিজদাস সোজা উপরে উঠিয়া গেল। পর্দ্দা সরাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া

দেখিল বন্দনার কোলের উপর বই খোলা, কিন্তু সে জানালার বাহিরে চাহিয়া স্থির হইয়া আছে। একটা ছত্রও পড়িয়াছে কি না সন্দেহ, বুঝিয়াও শুধু কথা আরম্ভ করিবার জন্যই সে প্রশ্ন করিল, কি বই পড়ছিলেন?

বন্দনা, বই মুড়িয়া টেবিলে রাখিল, দাঁড়াইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার ফিরতে এত দেরি হ'লো যে? কলকাতার গাড়িত গেছে কোনকালে।

দ্বিজদাস বলিল, দেরি হোক তবু ত ফিরেচি। না ফিরলেও ত পারতুম।

বন্দনা বলিল, অনায়াসে।

দ্বিজদাস এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল, ঠিক এই কথাটাই আমার প্রথম মনে হয়েছিল। গাড়ি ছেড়ে দিলে জানালায় গলা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাসু হাত নাড়তে লাগলো, ক্রমশঃ তার ছোট্ট হাতখানি গেল বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে। প্রথমে মনে হ'লো গেলেই হ'তো ওদের সঙ্গে—

বন্দনা কহিল, আপনি বাসুকে ভারি ভালবাসেন, না?

দ্বিজদাস একটু ভাবিয়া বলিল, দেখুন জবাব দেবো কি, এ-সব জিনিসেরই আমি বোধ হয় স্বরূপ জানিনে। প্রকৃতিটা এত রুক্ষ, এমন নীরস যে, দু'দণ্ডেই সমস্ত উবে গিয়ে শুকনো বালি আবার তেমনি ধূ ধূ করে। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে চোখে একবার জল এলো, কিন্তু তখনি আবার আপনিই শুকলো,—বাষ্পের চিহ্নও রইলো না।

বন্দনা কহিল, এ এক প্রকার ভগবানের আশীর্ব্বাদ।

দ্বিজদাস বলিতে লাগিল, কি জানি, হতেও পারে। অথচ, এই বাসুর ভয়েই মা কাল থেকে ঘরে দোর দিয়ে আছেন। নইলে দাদার জন্যেও না। বৌদিদির জন্যেও না। মা ভাবেন বাসুকে বুঝি তিনি মানুষ করেচেন, কিন্তু হিসেব করলে দেখতে পাবেন ওর বয়সের অর্দ্ধেক কাল কেটেচে ওঁর তীর্থবাসে। তখন কার কাছে থাকতো ও? আমার কাছে। টাইফয়েড জ্বরে কে জেগেচে ষাট দিন? আমি। আজ যাবার সময় কে দিলে সাজিয়ে? আমি। ওর জামা-কাপড় থাকে আমার আলমারিতে, ওর বই-শ্লেটের জায়গা হ'লো আমার টেবিলে, ওর শোবার বিছানা আমার খাটে। মা টানাটানি করে নিয়ে যান—কিন্তু কত রাতে ঘুম ভেঙে ও পালিয়ে এসেচে আমার ঘরে।

বন্দনা নির্নিমেষে চাহিয়াছিল, বলিল, তবুও চোখের জল শুকিয়ে যেতে এক মুহূর্ত্তের বেশি লাগে না।

দ্বিজদাস কহিল, এই আমার স্বভাব। ওকে নিয়ে আমার ভাবনা শুধু এই যে, সে পড়বে গিয়ে তার বাপ-মায়ের হাতে। আপনি বলবেন, জগতে এই ত স্বাভাবিক, এতে ভয়ের কি আছে? কিন্তু স্বাভাবিক বলেই বিপদ হয়েচে এই যে, এত বড়ো উল্টো কথাটা মানুষকে আমি বোঝাবো কি করে!

বন্দনা এ-কথা বলিল না যে, বুঝাইবার প্রয়োজনই বা কি ? অন্যপক্ষে বাপ-মায়ের বিরুদ্ধে এত বড় অভিযোগ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করাও তাহার কঠিন, বিশেষতঃ বিপ্রদাসের বিরুদ্ধে। কিন্তু তর্ক না করিয়া সে নীরব হইয়াই রহিল।

পরক্ষণে বক্তব্য স্পষ্টতর করিতে দ্বিজদাস কহিল, একটা সান্ত্বনা বৌদি রইলেন কাছে নইলে দাদার হাতে দিয়ে আমার তিলার্দ্ধ শান্তি থাকতো না।

বন্দনা কহিল, আপনি তো নির্ব্বিকার, বাসুর ভালোমন্দ নিয়ে আপনার মাথাব্যথা কিসের ? যা হয় তা হোক না ?

শুনিয়া দ্বিজদাসের মুখের উপর সুতীক্ষ্ণ বেদনার ছায়া পড়িল, কিন্তু সে মৌন হইয়া রহিল।

বন্দনা কহিল, দাদার প্রতি গভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার কথা একদিন আপনার নিজের মুখে শুনেছিলুম। সেও কি ওই চোখের জলের মতো এক নিমিষে শুকিয়ে গেল ? কিংবা যে লোক নিজের দোষে সর্ব্বস্বান্ত হয় তাকে বিশ্বাস করা চলে না এই কি অবশেষে বলতে চান ?

দ্বিজদাস বিস্ময় ও ব্যথায় অভিভূত চক্ষে ক্ষণকাল তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল, তাহার পরে দুই হাত এক করিয়া ললাট স্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, না, সে আমি বলিনি। আমি বলছিলুম তৃষ্ণার জলের জন্যে মানুষে সমুদ্রের কাছে গিয়ে যেন না হাত পাতে। কিন্তু দাদার সম্বন্ধে আর আলোচনা নয়, বাইরের লোক তা বুঝবে না।

এ কথায় বন্দনা অন্তরে অত্যন্ত আহত হইল, কিন্তু প্রতিবাদেরও কিছু খুঁজিয়া না পাইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

দ্বিজদাস একেবারে অন্য কথা পাড়িল, জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি কালই বোম্বায়ে যাবেন ?

বন্দনা বলিল, হাঁ।

অশোকবাবুই নিয়ে যাবেন ?

হাঁ, তিনিই।

দ্বিজদাস বলিল, বোম্বাই-মেল এখান থেকে বেশি রাতে যায়, কাল আপনাদের আমি স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসবো। কিন্তু দিনের বেলায় থাকতে পারবো না, একটু কাজ আছে।

বাবাকে একটা তার করে দেবেন ?

আচ্ছা।

মিনিট-দুই নীরব থাকিয়া, ইতস্ততঃ করিয়া দ্বিজদাস কহিল, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো ভাবি, কিন্তু নানা কারণে দিন বয়ে যায়, জিজ্ঞাসা করা

আর হয় না। কাল চলে যাবেন, সময় আর পাবো না। যদি রাগ না করেন বলি।

বলুন।

দেরি হইতে লাগিল।

বন্দনা কহিল, রাগ করবো না, আপনি নির্ভয়ে বলুন।

দ্বিজদাস বলিল, কলকাতার বাড়ি থেকে মা একদিন রাগ করে বৌদিদিকে নিয়ে হঠাৎ চলে এলেন আপনার মনে পড়ে?

পড়ে।

কারণ না জেনে আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। মন খুব খারাপ ছিল, আমার ঘরে এসে সেদিন একটা কথা বলেছিলেন যে আমাকে আপনার ভাল লাগে। মনে পড়ে?

পড়ে। কিন্তু খুব লজ্জার সঙ্গেই পড়ে।

সে কথার মূল্য কিছু নেই?

না।

দ্বিজদাস ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, আমিও তাই ভাবি। ওর মূল্য কিছু নেই।

একটু পরে কহিল, বৌদি বলছিলেন আপনার মাসীর ইচ্ছে অশোকের সঙ্গে আপনার বিবাহ হয়। সে কি স্থির হ'য়ে গেছে?

বন্দনা বলিল, আমাদের পারিবারিক কথা। বাইরের লোকের সঙ্গে এ আলোচনা চলে না।

দ্বিজদাস বলিল, আলোচনা ত নয়, শুধু একটা খবর।

বন্দনা তিক্তকণ্ঠে কহিল, আপনার সঙ্গে এমন কোন আত্মীয়-সম্বন্ধ নেই যাতে এ প্রশ্ন আপনি করতে পারেন। দ্বিজুবাবু, আপনি শিক্ষিত লোক, এ কৌতূহল আপনার লজ্জাকর।

শুনিয়া দ্বিজদাস সত্যিই লজ্জা পাইল, তাহার মুখ ম্লান হইয়া গেল। বলিল, আমার ভুল হয়েছে বন্দনা, স্বভাবতঃ আমি কৌতূহলী নই, পরের কথা জানবার লোভ আমার খুব কম। কিন্তু কি করে জানিনে আমার মনে হ'তো যে-কথা সংসারে কাউকে বলতে পারিনে আপনাকে পারি। যে-বিপদে কাউকে ডাকা চলে না আপনাকে চলে। আপনি—

তাহার কথার মাঝখানেই বন্দনা হাসিয়া বলিল, কিন্তু এই যে বললেন দাদার আলোচনা বাইরের লোকের সঙ্গে করতে আপনি চান না। আমি তো পর, একেবারে বাইরের লোক।

দ্বিজদাস কহিল, তাই যদি হয়, তবে আপনিই বা কেন তাঁর সম্বন্ধে আমাকে

অশ্রদ্ধার খোঁটা দিলেন? জানেন না কি হচ্ছে আমার? দীপালোকে স্পষ্ট দেখা গেল তাহার চোখের কোণদু'টা অশ্রুবাষ্পে ছল্ ছল্ করিয়া আসিয়াছে।

মৈত্রেয়ী ঘরে ঢুকিল। বলিল, দ্বিজুবাবু, আপনি কখন বাড়ি এলেন আমরা তো কেউ জানতে পারিনি?

দ্বিজদাস ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল, জানবার দরকার হয়েছিল নাকি?

মৈত্রেয়ী কহিল, বেশ কথা। আপনি কাল খাননি, আজ খাননি,—এ আর কেউ না জানুক আমি জানি। চলুন মা'র ঘরে।

কিন্তু মা'র দরজা ত বন্ধ।

মৈত্রেয়ী বলিল, বন্ধই ছিল, কিন্তু আমি ছাড়িনি। মাথা খোঁড়া-খুঁড়ি করে দোর খুলিয়েচি, তাঁকে স্নান করিয়েচি, আহ্নিক করিয়েচি, জোর করে দুটো ফল মুখ গুঁজে দিয়ে খাইয়ে তবে ছেড়েচি। বলছিলেন, দ্বিজু না খেলে খাবেন না। বললাম, সে হবে না মা, আপনার এ আদেশ আমি মানতে পারবো না। কিন্তু তখন থেকে সবাই আমরা আপনার পথ চেয়ে আছি। চলুন আপনার খাবার রেখে এসেচি মা'র ঘরে।

দ্বিজদাস অবাক হইয়া রহিল। ইহার এত কথা সে পূর্ব্বে শোনে নাই। বলিল, চলুন।

মৈত্রেয়ী বন্দনাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, আপনিও আসুন। মা আপনাকে ডাকচেন। এই বলিয়া সে দ্বিজদাসকে এক প্রকার গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল। সকলের পিছনে গেল বন্দনা।

নিজের ঘরের মধ্যে দয়াময়ী ছিলেন বিছানায় শুইয়া। অনুজ্জ্বল দীপালোকে তাহার শোকাচ্ছন্ন মুখের প্রতি চাহিলে ক্লেশ বোধ হয়। পরিস্ফীত দুই চক্ষু আরক্ত, সদ্যস্নাত আর্দ্র কেশগুলি আলুথালু বিপর্য্যস্ত। শিয়রে বসিয়া কল্যাণী হাত বুলাইয়া দিতেছিল, অন্য দিকে একটা চেয়ারে শশধর, দূরে আর একটা চেয়ারে বসিয়া অক্ষয়বাবু। দ্বিজদাস ঘরে ঢুকিতেই দয়াময়ী মুখ ফিরিয়া শুইলেন, এবং পরক্ষণেই একটা অস্ফুট ক্রন্দনের অবরুদ্ধ আক্ষেপে তাঁহার সর্ব্বদেহ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল। বন্দনা নীরবে ধীরে ধীরে গিয়া তাহার পায়ের কাছে বসিল, এতবড় ব্যথার দৃশ্য বোধ করি সে কখনো কল্পনা করিতেও পারিত না। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সকলেই নির্ব্বাক, এই স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া প্রথমে কথা বলিল শশধর। বলিল, কাল থেকে শুনচি মা খেয়েই আছো,—যা হোক দু'টো মুখে দাও।

দ্বিজদাস বলিল, হাঁ।

মেঝের উপর ঠাঁই করিয়া মৈত্রেয়ী সযত্নে খাবার গুছাইয়া দিতেছিল, সেইদিকে চাহিয়া শশধর পুনশ্চ কহিল, তোমার ফিরতে দেরি হ'ল যে! তাঁরা গেলেন তো সেই আড়াইটার গাড়িতে?

হাঁ।

শশধর একটুখানি হাসির ভান করিয়া বলিল, অথচ, কলকাতার বাড়িটা তো শুনেচি তোমার।

দ্বিজদাস কহিল, আমার বাড়িতে দাদার প্রবেশ নিষেধ নাকি?

শশধর কহিল, তা বলিনি। বরঞ্চ তিনিই যেন এই ভাবটা দেখিয়ে গেলেন। এ-বাড়ি ছেড়েও তো তাঁর যাবার দরকার ছিল না, একটা মিটমাট করে নিলেই তো পারতেন।

দ্বিজদাস বলিল, মিটমাটের পথ যদি খোলা ছিল আপনি করে নিলেন না কেন?

আমি করে নেবো? শশধর অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, এ কি রকম প্রস্তাব? আমাকে অপমান করলেন তিনি আর মিটমাট করবো আমি? মন্দ যুক্তি নয়! এই বলিয়া সে টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল। হাসি থামিলে দ্বিজদাস বলিল, যুক্তি মন্দ দিইনি শশধরবাবু। মেয়েরা কথায় বলে পর্ব্বতের আড়ালে থাকা। দাদা ছিলেন সেই পর্ব্বত, আপনি ছিলেন তাঁর আড়ালে। এখন মুখোমুখি দাঁড়ালুম আমি আর আপনি। মান-অপমানের পালা সাঙ্গ হয়ে তো যায়নি—মাত্র শুরু হ'লো।

তার মানে?

মানে এই যে, আমি আপনার বাল্যবন্ধু বিপ্রদাস নই—আমি দ্বিজদাস।

শশধরের মুখের হাসি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইল, ভয়ানক গম্ভীর-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তোমার কথার অর্থ কি বেশ খুলে বল দিকি?

দাদার বন্ধু বলিয়া শশধর 'তুমি' বলিয়া ডাকিলেও দ্বিজদাস তাহাকে 'আপনি' বলিয়াই সম্বোধন করিত, বলিল, আপনার এ-কথা মানি যে অর্থ আজ স্পষ্ট হওয়াই ভালো। আমার দাদা সেই জাতের মানুষ যারা সত্য-রক্ষার জন্যে সর্ব্বস্বান্ত হয়, আশ্রিতের জন্য গায়ের মাংস কেটে দেয়, ওদের আদর্শ বলে কি-এক অদ্ভুত বস্তু আছে যার জন্যে পারে না এমন কাজ নেই,—ওরা একধরণের পাগল,—তাই এই দুর্দশা। কিন্তু আমি নিতান্ত সাধারণ মানুষ, আপনার সঙ্গে বেশি প্রভেদ নেই। ঠিক আপনার মতই আমার হিংসা আছে, ঘৃণা আছে, প্রতিশোধ নেবার শয়তানি বুদ্ধি আছে, সুতরাং দাদাকে ঠকিয়ে থাকলে আপনাকেও ঠকাবো, তাঁর নাম জাল করে থাকলে স্বচ্ছন্দে আপনাকে জেলে পাঠাবো,—অন্ততঃ চেষ্টার ত্রুটি হবে না যতক্ষণ পর্য্যন্ত না দু'পক্ষই একদিন পথের ভিখারি হয়ে দাঁড়াই। বিজ্ঞ-জনের মুখে শুনি এমনিই নাকি এর পরিণতি। তাই হোক।

শশধর উচ্চৈস্বরে বলিয়া উঠিল, মা, শুনেছেন আপনার দ্বিজুর কথা? ওর যা মুখে আসে বলতে ওকে বারণ করে দিন।

দ্বিজদাস বলিল, মাকে নালিশ জানিয়ে লাভ নেই শশধরবাবু। উনি জানেন

আমি বিপিন নই,—মাতৃবাক্য দ্বিজুর বেদবাক্য নয়। দ্বিজু তাল ঠুকে স্পর্দ্ধার অভিনয় করে না একথা মা বোঝেন।

কাহারো মুখে কথা নাই, উভয়ের অকস্মাৎ এইরূপ বাদ-প্রতিবাদ যেন সম্পূর্ণ অভাবিতপূর্ব বিস্ময়ে ও ভয়ে সকলেই স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। শশধর বুঝিল ইহা পরিহাস নয় অতিশয় কঠোর সংকল্প। উত্তর দিতে গিয়া তাহার কণ্ঠস্বরে পূর্ব্বের প্রবলতা ছিল না, তথাপি জোর দিয়াই বলিয়া উঠিল, এই শেষ। এখানে আর আমি জলগ্রহণ পর্য্যন্ত করবো না।

দ্বিজদাস বলিল, কি করে করছিলেন এতক্ষণ এই ত আশ্চর্য্য শশধরবাবু।

কল্যাণী কাঁদিয়া বলিল, ছোড়দা, অবশেষে তুমিই কি আমাদের মারতে চাও? মায়ের পেটের ভাই তুমি, তুমিই করবে আমাদের সর্ব্বনাশ?

দ্বিজদাস বলিল, তুই ভাবিস্ চোখের জল ফেলে বার বার এড়ানো যায় সর্ব্বনাশ? কোথাও বিচার হবে না, তোদেরই হবে বারংবার জিৎ? দাদা নেই বটে, তবুও, খেতে যখন পাবিনে আসিস্ আমার কাছে, তখন তোর কান্না শুনবো,—এখন নয়।

দয়াময়ী নিঃশব্দে অনেক সহিয়াছিলেন আর পারিলেন না, চীৎকার করিয়া উঠিলেন, দ্বিজু, তুই যা এখান থেকে। এমনি করে গালি-গালাজ করতে কি বিপিন তোকে শিখিয়ে দিয়ে গেল?

কে শিখিয়ে দিলে বলচো? বিপিন?

হ্যাঁ, সে-ই। নিশ্চয় সে।

দ্বিজদাসের ওষ্ঠাধর মুহূর্ত্তের জন্য কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, বলিল, আমি যাচ্ছি। কিন্তু মা, নিজেকে অনেক ছোট করেচো, আর ছোট ক'রোনা। এই বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

নিজের ঘরে আসিয়া দ্বিজদাস চুপ করিয়া বসিয়াছিল, ঘণ্টা-দুই পরে মৈত্রেয়ী আসিয়া প্রবেশ করিল, তাহার হাতে খাবারের পাত্র, বলিল, খাবার সব নতুন করে তৈরী করে নিয়ে এলুম, খেতে বসুন। এই ঘরের ঠাঁই করে দিই?

এ আপনাকে কে বলে দিলে?

কেউ না। কাল থেকে আপনি খাননি সে কি আমি জানিনে?

এত লোকের মধ্যে আপনার জানার প্রয়োজন?

মৈত্রেয়ী মাথা হেঁট করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। জবাব না পাইয়া দ্বিজদাস বলিল, আচ্ছা, ঐখানে রেখে যান। এখন ক্ষিদে নেই, যদি হয় পরে খাবো।

মৈত্রেয়ী ঘরের একধারে আসন পাতিয়া খাবার রাখিয়া সমস্ত সযত্নে ঢাকা দিয়া চলিয়া গেল। পীড়াপীড়ি করিল না, বলিল না যে ঠাণ্ডা হইয়া গেলে খাওয়ার অসুবিধা ঘটিবে।

রাত্রি বোধ করি তখন বারোটা বাজিয়াছে, দ্বিজদাস চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল। সামান্য কিছু খাইয়া শুইয়া পড়িবে এই মনে করিয়া হাত-মুখ ধুইতে বাহিরে আসিয়া দেখিল দ্বারের বাহিরে কে-একজন বসিয়া আছে। বারান্দার স্বল্প আলোকে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে?

আমি মৈত্রেয়ী।

দ্বিজদাসের বিস্ময়ের সীমা নাই, কহিল, এত রাত্রে আপনি এখানে কেন?

খেতে বসে যদি কিছু দরকার হয় তাই বসে আছি।

এ আপনার ভারি অন্যায়। একে ত প্রয়োজন নেই, আর যদি বা হয় বাড়িতে আর কি কেউ নেই?

মৈত্রেয়ী মৃদু-কণ্ঠে বলিল, ক'দিন নিরন্তর পরিশ্রমে সকলেই ক্লান্ত। কেউ জেগে নেই, সবাই ঘুমিয়ে পড়েচে।

দ্বিজদাস বলিল, আপনি নিজেও ত কম খাটেননি, তবে ঘুমোলেন না কেন?

মৈত্রেয়ী উত্তর দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

দ্বিজদাসের রুক্ষ স্বর এবার অপেক্ষাকৃত অনেকটা নরম হইয়া আসিল, বলিল, এ-ভাবে বসে থাকাটা বিশ্রী দেখতে। আপনি ভেতরে এসে বসুন, যতক্ষণ খাই তদারক করুন। এই বলিয়া সে মুখ-হাত ধুইতে জলের ঘরে চলিয়া গেল।

ইতিপূর্ব্বে মৈত্রেয়ীর সহিত দ্বিজদাস কম কথাই কহিয়াছে। প্রয়োজন হয় নাই, ইচ্ছাও করে নাই। এখন আলাপটা কিভাবে চালাইবে ভাবিতে ভাবিতে ফিরিয়া আসিয়া দেখে, না আছে খাবারের পাত্র না আছে মৈত্রেয়ী নিজে। ব্যাপারটা ইতিমধ্যে কি ঘটিল অনুমান করিবার পূর্ব্বেই কিন্তু সে ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, ঢাকা খুলে দেখি সমস্ত শুকিয়ে শক্ত হয়ে উঠেচে, তাই আবার আনতে গিয়েছিলুম। বসুন।

দ্বিজদাস কহিল, ধুঁয়া উঠচে দেখচি। এত রাত্রে ও-সব আবার পেলেন কোথায়?

মৈত্রেয়ী বলিল, ঠিক করে রেখে এসেছিলুম। যখনি বললেন খেতে দেরি হবে, তখনি জানি এ-সব না রাখলে হয়ত খাওয়াই হবে না।

দ্বিজদাস ভোজনে বসিয়া প্রথমে রন্ধন-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিয়া জানিল ইহার কতকগুলি মৈত্রেয়ীর স্বহস্তের তৈরী! সেগুলি বারবার অনুরোধ করিয়া সে দ্বিজদাসকে বেশি করিয়া খাওয়াইল। এ-বিদ্যায় সে ব্যুৎপন্ন—জানে কি করিয়া খাওয়াইতে হয়।

দ্বিজদাস হাসিয়া কহিল, বেশি খেলে অসুখ করবে যে।

না, করবে না। কাল থেকে উপোস করে আছেন, একে বেশি খাওয়া বলে না।

কিন্তু আমিই ত কেবল না খেয়ে নেই, এ-বাড়িতে বোধ করি অনেকেই আছেন।

মৈত্রেয়ী বলিল, অনেকের কথা জানিনে, কিন্তু যাকে যে কি করে দুটো খাওয়াতে পেরেচি সে শুধু আমিই জানি। আমি না থাকলে কতদিন যে তিনি দোর বন্ধ করে অনাহারে থাকতেন আমার ভাবলে ভয় হয়। কিন্তু আমাকে 'আপনি' বলবেন না, শুনলে বড় লজ্জা করে। আমি কত ছোট।

দ্বিজদাস কহিল, সেই ভালো, তোমাকে আর 'আপনি' বলবো না। কিন্তু তুমি অন্নদাদিদির খবর নিয়েছিলে?

মৈত্রেয়ী কহিল, তার আবার কি হ'লো? সেও কি না খেয়ে আছে না কি?

এতক্ষণ মৈত্রেয়ীর কথাগুলি তাহার বেশ লাগিতেছিল, একটা প্রসন্নতার বাতাস এই দুঃখের মধ্যেও যেন তাহার মনটাকে মাঝে মাঝে স্পর্শ করিয়া যাইতেছিল, কিন্তু এই শেষ কথাটায় চিত্ত তাহার মুহূর্তে বিরূপ হইয়া উঠিল, কহিল, অনুদির সম্বন্ধে এ-ভাবে কথা বলতে নেই। হয়ত শুনেচো সে আমাদের দাসী, কিন্তু এ-বাড়িতে তাঁর চেয়ে বড় আমার কেউ নেই। আমাদের মানুষ করেচেন।

মৈত্রেয়ী বলিল, তা শুনেচি। কিন্তু কত বাড়িতেই ত পুরনো দাস-দাসী ছেলেপুলে মানুষ করে, তাতে নতুন কি আছে? আচ্ছা আপনার খাওয়া হয়ে গেলে তাঁর খবর নেবো।

দ্বিজদাস নিরুত্তরে ক্ষণকাল তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। হঠাৎ মনে হইল, সত্যই ত, এমন কত পরিবারেই ঘটিয়া থাকে, যে ভিতরের কথা জানে না, তাহার কাছে শুধু বাহিরের ঘটনায় একান্ত বিস্ময়কর ইহাতে কি আছে। কঠোর বিচার হাল্কা হইয়া আসিল, কহিল, অনুদি না খেয়ে থাকলেও এত রাত্রে আর খাবেন না। তাঁর জন্য আজকে ব্যস্ত হবার দরকার নেই।

আবার কয়েক মিনিট নিঃশব্দে কাটিলে দ্বিজদাস জিজ্ঞাসা করিল, মৈত্রেয়ী, পরকে এমন সেবা করতে শিখলে তুমি কার কাছে? তোমার মার কাছে কি?

মৈত্রেয়ী বলিল, না, আমার দিদির কাছে। তাঁর মতো স্বামীকে যত্ন করতে আমি কাউকে দেখিনি।

দ্বিজদাস হাসিয়া বলিল, স্বামী কি পর? আমি পরকে যত্ন করবার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলুম।

ওঃ—পর? বলিয়াই মৈত্রেয়ী হাসিয়া সলজ্জে মুখ নীচু করিল।

দ্বিজদাস বলিল, আচ্ছা, বলো তোমার দিদির কথা।

মৈত্রেয়ী বলিল, দিদি কিন্তু বেঁচে নেই। তিন বছর হ'লো একটি ছেলে আর দুটি মেয়ে রেখে মারা গেছেন। চৌধুরীমশাই কিন্তু একটা বছরও অপেক্ষা করলেন না, আবার বিয়ে করলেন। কত বড় অন্যায় বলুন ত!

দ্বিজদাস বলিল, পুরুষমানুষে তাই করে। ওরা অন্যায় মানে না।

আপনিও তাই করবেন নাকি?

আগে একটাই ত করি তার পরে অন্যটার কথা ভাববো।

মৈত্রেয়ী বলিল, এমন করে বললে ত চলবে না। তখন আপনার বৌদিদি ছিলেন, কিন্তু এখন তিনি নেই। মাকে দেখবে কে?

দ্বিজদাস বলিল, কে দেখবে জানিনে মৈত্রেয়ী, হয়ত মেয়ে-জামাই দেখবে, হয়ত আর কেউ এসে তাঁর ভার নেবে,—সংসারে কত অসম্ভবই যে সম্ভব হয় কেউ নির্দ্দেশ করতে পারে না। আমাদের কথা থাক্, তোমার নিজের কথা বলো।

কিন্তু আমার নিজের কথা ত কিছু নেই।

কিছুই নেই? একেবারে কিচ্ছু নেই?

মৈত্রেয়ী প্রথমে একটু জড়সড় হইয়া পড়িল, তার পরে একটু হাসিয়া বলিল, ও আমি বুঝেছি। আপনি চৌধুরীমশায়ের কথা কারো কাছে শুনেচেন বুঝি? ছি ছি, কি নির্লজ্জ মানুষ, দিদি মরতে প্রস্তাব করে পাঠালেন আমাকে বিয়ে করবেন।

তার পরে?

মৈত্রেয়ী বলিল, চৌধুরীমশায়ের অনেক টাকা, বাবা-মা দুজনেই রাজি হয়ে গেলেন, বললেন, আর কিছু না হোক লীলার ছেলে-মেয়েগুলো মানুষ হবে। যেন সংসারে আমার আর কিছু কাজ নেই দিদির ছেলে মানুষ করা ছাড়া। বললুম, ও কথা তোমরা মুখে আনলে আমি গলায় দড়ি দেবো।

কেন, এতে আপত্তি তোমার কিসের?

আপত্তি হবে না? জগতে এত বড় অশান্তি আর-কিছু আছে নাকি?

দ্বিজদাস বলিল, এ-কথা তোমার সত্যি নয়। জগতে সকল ক্ষেত্রেই অশান্তি আসে না মৈত্রেয়ী। আমার মা দাদাকে মানুষ করেছিলেন।

মৈত্রেয়ী বলিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তার ফল হ'লো কি। আজকের মত দুঃখের ব্যাপার এ-বাড়িতে আর কখনো এসেচে কি?

দ্বিজদাস স্তব্ধ হইয়া রহিল। ইহার কথা মিথ্যা নয়, কিন্তু সত্যিও কিছুতে নয়। মিনিট দুই-তিন অভিভূতের মত বসিয়া অকস্মাৎ যেন তাহার চমক ভাঙিয়া গেল, বলিল, মৈত্রেয়ী, প্রতিবাদ আমি করবো না। এ-পরিবারে মহাদুঃখ এলো সত্যি, তবু জানি, তোমার এ-কথা সাধারণ মেয়েদের অতি তুচ্ছ সাংসারিক হিসাবের চেয়ে বড় নয়। বলিয়াই সে উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার খাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল।

পরদিন সমস্ত দুপুর-বেলা সে বাড়ি ছিল না, কি কাজে কোথায় গিয়াছিল সে-ই.

জানে। সন্ধ্যার অন্ধকারে নিঃশব্দে বাড়ি ফিরিয়া সোজা গিয়া দাঁড়াইল বন্দনার গৃহের সম্মুখে, ডাকিল, আসতে পারি?

কে, দ্বিজবাবু? আসুন।

দ্বিজদাস ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল বন্দনার বাক্স গুছানো শেষ হইয়াছে, যাত্রার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ। কহিল, সত্যিই চললেন তা হলে? একটা দিনও বেশি রাখা গেল না?

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বন্দনার ইচ্ছা হইল না বলে, তবু বলিতেই হইল,—যেতেই ত হবে, একটা দিন বেশি রেখে আমাকে লাভ কি বলুন?

দ্বিজদাস বলিল, লাভের কথা ত ভাবিনি, শুধু ভেবেচি সবাই গেল—এত বড় বাড়িতে বন্ধু আর কেউ রইলো না।

বন্দনা কহিল, পুরনো বন্ধু যায়, নতুন বন্ধু আসে এমনিই জগৎ দ্বিজুবাবু। সেই আশায় ধৈর্য্য ধরে থাকতে হয়,—চঞ্চল হলে চলে না।

দ্বিজদাস উত্তর দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

বন্দনা বলিল, সময় বেশি নেই, কাজের কথা দুটো বলে নিই। শুনেচেন বোধ হয় শশধরবাবু কল্যাণীকে নিয়ে চলে গেছেন?

না শুনিনি, কিন্তু অনুমান করেছিলুম।

যাবার পূর্ব্বে এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত তাদের খাওয়াতে পারা গেল না। দু'জনে এসে মাকে প্রণাম করে বললেন, আমরা চললুম। মা বললেন, এসো। তার পর অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন। এই বলিয়া বন্দনা নীরব হইল। যে কারণে তাহার যাওয়া, যে-সকল কথা মায়ের সম্মুখে দ্বিজু গত রাত্রে বলিয়াছিল, তাহার উল্লেখ মাত্র করিল না।

কয়েক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, মা ভারি ভেঙে পড়েচেন। দেখলে মায়া হয়,—লজ্জায় করো কাছে যেন মুখ দেখাতে পারেন না। মৈত্রেয়ী ওঁর যে সেবা করচে বোধ হয় আপন মেয়েতে তা পারে না! মা সুস্থ হয়ে যদি ওঠেন সে শুধু ওর যত্নে। মেয়েটি বেশ ভাল, কিছুদিন ওকে ধরে রাখার চেষ্টা করবেন এই আমার অনুরোধ।

তাই হবে।

দ্বিজুবাবু, যাবার আগে আর একটি অনুরোধ করে যাবো?

করুন।

আপনাকে বিয়ে করতে হবে।

কেন?

বন্দনা বলিল, এই বৃহৎ পরিবার নইলে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে। আপনাদের

অনেক ক্ষতি হ'লো জানি, কিন্তু যা রইলো সেও অনেক। আপনাদের কত দান, কত সৎ কাজ, কত আশ্রিত-পরিজন, কত দীন-দরিদ্রের অবলম্বন আপনারা,—আর সে কি শুধু আজ'! কত দীর্ঘকাল ধরে এই ধারা বয়ে চলেচে। আপনাদের পরিবারে —কোনদিন বাধা পায়নি, সে কি এখন বন্ধ হবে? দাদার ভুলে যা গেলো,সে ছিল বাহুল্য, সে ছিল প্রয়োজনের অতিরিক্ত। যাক সে। যা রেখে গেলেন শান্তমনে তাকেই যথেষ্ট বলে নিন। সেই অবশিষ্ট আপনার অক্ষয় অজস্র হোক, প্রতিদিনের প্রয়োজনে ভগবান অভাব না রাখুন, আজ বিদায় নেবার পূর্ব্বে তাঁর কাছে এই প্রার্থনা জানাই।

দ্বিজদাসের চোখে জল আসিয়া পড়িল।

বন্দনা বলিতে লাগিল, আপনার বাবা অখণ্ড ভরসায় দাদার ওপর সর্ব্বস্ব রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু তা রইলো না। পিতার কাছে অপরাধী হয়ে রইলেন। কিন্তু সেই ত্রুটি যদি দৈন্য এনে তাঁদের পুণ্য কর্ম্ম বাধাগ্রস্ত করে, কোনদিন মুখুয্যেমশাই নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারবেন না। এই অশান্তি থেকে তাঁকে আপনার বাঁচাতে হবে।

দ্বিজদাস অশ্রু সংবরণ করিয়া বলিল, দাদার কথা এমন করে কেউ ভাবেনি বন্দনা, আমিও না। এ কি আশ্চর্য্য!

ভাগ্য ভালো যে বাতিদানের ছায়ার আড়ালে সে বন্দনার মুখের চেহারা দেখিতে পাইল না। বলিল, দাদার জন্যে সকল দুঃখই নিতে পারি, কিন্তু তাঁর কাজের বোঝা বইবো কি করে—সাহস পাইনে যে! সেই সব দেখতেই আজ বেরিয়েছিলুম। তাঁর ইস্কুল, পাঠশালা, টোল, মুসলমানদের ছেলেদের জন্যে মকতব,—আর সেই কি দু'একটা? অনেকগুলো। প্রজাদের জল নিকাশের একটা খাল কাটা হচ্চে, বহুদিন ধরে তার টাকা যোগাতে হবে। কাগজপত্রের সঙ্গে একটা দীর্ঘ তালিকা পেয়েচি—শুধু দানের অঙ্ক। তারা চাইতে এলে কি যে বলব, জানিনে।

বন্দনা কহিল, বলবেন তারা পাবে। তাদের দিতেই হবে। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, এতকাল তিনি কিছুই কি কাউকে জানাননি?

না।

এর কারণ?

দ্বিজদাস বলিল, সুকৃতি গোপন করার উদ্দেশ্যে নয়। কিন্তু জানাবেন কাকে? সংসারে তাঁর বন্ধু কেউ ছিল না। দুঃখ যখন এসেচে একাকী বহন করেচেন, আনন্দ যখন এসেচে তাকেও উপভোগ করেচেন একা। কিংবা জানিয়ে থাকবেন হয়ত তাঁর ঐ একটি মাত্র বন্ধুকে।—এই বলিয়া সে উপরের দিকে চাহিয়া কহিল,

কিন্তু সে খবর আত্মীয় স্বজন জানবে কি করে! জানেন শুধু তিনি আর তাঁর ঐ অন্তর্যামী।

বন্দনা কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিল, আচ্ছা দ্বিজুবাবু, আপনার কি মনে হয় মুখুয্যেমশাই কাউকে কোনদিন ভালবাসেননি? কোন মানুষকেই না?

দ্বিজদাস বলিল, না, সে তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। মানুষের সংসারে এত বড় নিঃসঙ্গ একলা মানুষ আর নেই। তার পরে বহুক্ষণ অবধি উভয়েই নীরব হইয়া রহিল।

বন্দনা জোর করিয়া একটা ভার যেন ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল, বলিল, তা হোকগে দ্বিজুবাবু। তাঁর সমস্ত কাজ আপনাকে তুলে নিতে হবে,—একটিও ফেলতে পারবেন না।

কিন্তু আমি তো দাদা নই, একলা পারবো কেন বন্দনা?

একলা তো নয় দু'জনে নেবেন। তাই ত বলেচি আপনাকে বিয়ে করতে হবে।

কিন্তু ভালো না বাসলে আমি বিয়ে করবো কি করে?

বন্দনা আশ্চর্য্য হইয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, এ কি বলচেন দ্বিজুবাবু। এ-কথা ত আমাদের সমাজে শুধু আমরাই বলে থাকি। কিন্তু আপনাদের পরিবারে কে কবে ভালোবেসে বিয়ে করেচে যে আপনার না হলে নয়? এ ছলনা ছেড়ে দিন।

দ্বিজদাস বলিল, এ বিধি আমাদের বাড়ির নয় বটে, কিন্তু সেই নজিরই কি চিরদিন মানতে হবে? তাতেই সুখী হবো এ বিশ্বাস আর নেই।

বন্দনা বলিল, বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তর্ক চলে না, সুখের জামিন নিতেও পারবো না, কারণ সে ধন যাঁর হাতে তাঁর ঠিকানা জানিনে। অদ্ভুত তাঁর বিচারপদ্ধতি,—তত্ত্ব-অন্বেষণ বৃথা। কিন্তু বিয়ের আগে নয়ন-মন-রঞ্জন পূর্ব্বরাগের খেলা খেললুম অনেক, আবার একদিন সে অনুরাগ দৌড় দিলে যে কোন্ গহনে সে প্রহসনও দেখতে পেলুম অনেক। আমি বলি ও ফাঁদে পা দিয়ে কাজ নেই দ্বিজুবাবু, সোনার মায়া-মৃগ যে-বনে চরে বেড়াচ্চে বেড়াক, এ-বাড়িতে সমাদরে আহ্বান করে এনে কাজ নেই।

দ্বিজদাস মৃদু হাসিয়া কহিল, তার মানে সুধীরবাবু দিয়েচেন আপনার মন ভয়ানক বিগড়ে।

বন্দনাও হাসিয়া বলিল, হাঁ। কিন্তু মনের তখনও যেটুকু বাকী ছিল বিগড়ে দিলেন আপনি, আবার তার পরে এলেন অশোক। এখন পোড়া অদৃষ্টে উনি টিকে থাকলে বাঁচি।

উনি কে? অশোক? তাঁকে আপনার ভয়টা কিসের?

ভয়টা এই যে তিনিও হঠাৎ ভালোবাসতে শুরু করেচেন।

কেউ ভালবাসার ধার দিয়েও যাবে না এই বুঝি আপনার সঙ্কল্প?

হাঁ, এই আমার প্রতিজ্ঞা। বিয়ে যদি কখনো করি, মস্ত সুখের আশায় যেন সমস্ত বিড়ম্বনায় না পা দিই। তাই অশোকবাবুকে কাল সতর্ক করে দিয়েচি। আমাকে ভালোবাসলেই আমি ছুটে পালাবো।

শুনে তিনি কি বললেন?

বললেন না কিছুই, শুধু দু'চোখ মেলে চেয়ে রইলেন। দেখে বড় দুঃখ হ'লো দ্বিজুবাবু।

দুঃখ যদি সত্যিই হয়ে থাকে ত আজো আশা আছে; কিন্তু জানবেন এ-সব শুধু মাসীর বাড়ির ঘোরতর প্রতিক্রিয়া,—শুধু সাময়িক।

বন্দনা বলিল, অসম্ভব না হতেও পারে। কিন্তু শিখলুম অনেক। ভাবি, ভাগ্যে এসেছিলুম কলকাতায় নইলে কত জিনিস ত অজানা থেকে যেতো।

দ্বিজদাস কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, বেশি সময় আর নেই, এবার শেষ উপদেশ আমাকে দিয়ে যান কি আমাকে করতে হবে।

বন্দনা পরিহাসের ভঙ্গিতে মাথাটা বার-কয়েক নাড়িয়া বলিল, উপদেশ চাই? সত্যিই চাই নাকি?

দ্বিজদাস বলিল, হাঁ। সত্যিই চাই। আমি দাদা নই, আমার বন্ধুর প্রয়োজন, উপদেশের প্রয়োজন। বিবাহ করতে আমাকে বলে গেলেন, আমি তাই করবো। কিন্তু ভালোবাসা না পাই, বন্ধুত্ব না পেলে যত ভার দিয়ে গেলেন, আমি বইবো কি করে?

দ্বিজুর মুখে পরিহাসের আভাস মাত্র নাই, এ কণ্ঠস্বর বন্দনাকে বিচলিত করিল, কহিল, ভয় নেই দ্বিজুবাবু, বন্ধু আসবে, সত্যিকার প্রয়োজনে ভগবান তাকে আপনার দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে যাবেন, এ বিশ্বাস রাখবেন।

প্রত্যুত্তরে দ্বিজু কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু বাধা পড়িল। বাহির হইতে মৈত্রেয়ীর সাড়া পাওয়া গেল—দ্বিজুবাবু আছেন এ ঘরে? মা আপনাকে একবার ডাকচেন।

দ্বিজু উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, বারোটায় গাড়ি, এগারোটায় বার হতে হবে। ঠিক সময়ে এসে ডাক দেবো। মনে থাকে যেন। এই বলিয়া সে ব্যস্ত হইয়া বাহির হইয়া গেল।

বন্দনার নির্বিঘ্নে বোম্বাই পৌছান-সংবাদের উত্তরে দিনকয়েক পরে দ্বিজদাসের নিকট হইতে জবাব আসিয়াছিল যে, সে কাজে ব্যস্ত থাকায় যথাসময়ে চিঠি লিখিতে পারে নাই। বন্দনা নিজের চোখে যেমন দেখিয়া গিয়াছে সমস্ত তেমন চলিতেছে। বিশেষ করিয়া জানাইবার কিছু নাই। মৈত্রেয়ীর পিতা কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সে নিজে এখনও এবাড়িতেই আছে। মায়ের সেবা-যত্নের ত্রুটি ধরিবার কিছু নাই, সংসারের ভারও তাহারি উপর পড়িয়াছে, ভালোই চালাইতেছে। বাড়ির সকলেই তাহার প্রতি খুশী। দ্বিজদাসের নিজের পক্ষ হইতে আজিও অভিযোগের কারণ ঘটে নাই। পরিশেষে, বন্দনা ও তাহার পিতার শুভকামনা করিয়া ও যথাবিধি নমস্কারাদি জানাইয়া সে পত্র সমাপ্ত করিয়াছে।

ইহার পরে তিন মাসেরও অধিক সময় কাটিয়াছে, কিন্তু কোন পক্ষ হইতেই আর পত্রাদির আদান-প্রদান হয় নাই। বিপ্রদাসের, মেজদিদির, বাসুর সংবাদ জানিতে মাঝে মাঝে বন্দনার মন উতলা হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু জানিবার উপায় খুঁজিয়া পায় নাই। নিজে হইতে তাঁহারা আজও খবর দেন নাই,—কোথায় আছেন, কেমন আছেন সমস্তই অপরিজ্ঞাত। ইহারই প্রার্থনা করিতে দ্বিজদাসকে অনুরোধ করিয়া চিঠি লেখার লজ্জা এত বড় যে, শত ইচ্ছা সত্ত্বেও একাজ তাহার কাছে অসাধ্য ঠেকিয়াছে। এখন বলরামপুরের স্মৃতির তীক্ষ্ণতা ও বেদনার তীব্রতা দুই-ই অনেক লঘু হইয়া গেছে, কিন্তু সেখান হইতে চলিয়া আসার পরে সে প্রায় ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম করিয়াছিল। কিন্তু দিনের পর দিন ধরিয়া ব্যথাতুর বিক্ষুব্ধ চিত্ত-তল ধীরে ধীরে যতই শান্ত হইয়া আসিয়াছে ততই উপলব্ধি করিয়াছে তাহার সম্বন্ধ কোন সত্যিকার সম্বন্ধ নহে। একত্রবাসের সেই দুঃখে-সুখে ভরা অনির্ব্বচনীয় দিনগুলি বিচিত্র ঘনিষ্ঠতায় মনের মধ্যে যতই কেন-না নিবিড়তা মোহ সঞ্চার করিয়া থাক্, আয়ু তার ক্ষণস্থায়ী। একথা বুঝিতে তাহার বাকী নাই যে, এই আচারনিষ্ঠ প্রাচীন-পন্থী মুখুয্যে-পরিবারের কাছে সে আবশ্যকও নয়, আপনারও নয়, উভয় পক্ষের শিক্ষা সংস্কার ও সামাজিক পরিবেষ্টনে যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে তাহা যেমন সত্য তেমন কঠিন।

ইতিমধ্যে স্বামীর কর্ম্মস্থল পাঞ্জাব হইতে মাসী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। শরীর ভাল নয়। পাঞ্জাবের চেয়ে বোম্বাইয়ের জল-বাতাস ভালো এবুদ্ধি তাঁহাকে কোন্ ডাক্তার দিয়াছে তা তিনিই জানেন। কিন্তু আসিয়াছেন স্বাস্থ্যের অজুহাতে। বোম্বাই আসিবার পূর্ব্বে বন্দনা দেখা করিয়া আসে নাই। এ অভিযোগ তাঁহার

মনের মধ্যে ছিল, কিন্তু বোনঝির মেজাজের যেটুকু পরিচয় পাইয়াছেন তাহাতে ভগিনীপতি রে সাহেবের দরবারে প্রকাশ্যে নালিশ রুজু করিবার সাহস ছিল না, তথাপি খাবার টেবিলে বসিয়া কথাটা তিনি ইঙ্গিতে পাড়িলেন। বলিলেন, মিস্টার রে, এটা আপনি লক্ষ্য করেছেন কি-না জানিনে, কিন্তু আমি অনেক দেখেচি বাপ-মায়ের এক ছেলে কিংবা এক মেয়ে এমনি একগুঁয়ে হয়ে ওঠে যে তাদের সঙ্গে পেরে ওঠা যায় না।

সাহেব তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিলেন, এবং দেখা গেল দৃষ্টান্ত তাঁহার হাতের কাছেই মজুত আছে। সানন্দে তাহার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, এই যেমন আমার বুড়ী। একবার না বললে হাঁ বলায় সাধ্য কার? ওর ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি।

বন্দনা কহিল, তাই বুঝি তোমার অবাধ্য মেয়েকে ভালবাস না বাবা?

সাহেব সজোরে প্রতিবাদ করিলেন, তুমি আমার অবাধ্য মেয়ে? কোনদিন না। কেউ বলতে পারে না।

বন্দনা হাসিয়া ফেলিল,—এই মাত্র যে তুমিই বললে বাবা।

আমি? কখনো না।

শুনিয়া মাসী পর্য্যন্ত না হাসিয়া পারিলেন না।

বন্দনা প্রশ্ন করিল, আচ্ছা বাবা, তোমার মতো আমার মাও কি আমাকে দেখতে পারতেন না?

সাহেব বলিলেন, তোমার মা? এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার কতবার ঝগড়া হয়েচে। ছেলেবেলায় তুমি একবার আমার ঘড়ি ভেঙেছিলে। তোমার মা রাগ করে কান মলে দিলেন, তুমি কাঁদতে কাঁদতে পালিয়ে এলে আমার কাছে। আমি বুকে তুলে নিলাম। সেদিন তোমার মার সঙ্গে আমি সারাদিন কথা কইনি। বলিতে বলিতে তিনি পূর্ব্বস্মৃতির আবেগে উঠিয়া আসিয়া মেয়ের মাথাটি বুকের কাছে টানিয়া লইয়া ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিলেন।

বন্দনা বলিল, ছেলেবেলার মতো এখন কেন ভালবাস না বাবা?

সাহেব মাসীকে আবেদন করিলেন—শুনলেন মিসেস্ ঘোষাল, বুড়ীর কথা?

বন্দনা কহিল, কেন তবে যখন তখন বলো আমার বিয়ে দিয়ে ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে ফেলতে চাও? আমি বুঝি তোমার চোখের বালি?

শুনছেন মিসেস্ ঘোষাল, মেয়েটার কথা?

মাসী বলিলেন, সত্যি বন্দনা। মেয়ে বড় হলে বাপ-মায়ের কি যে বিষম দুশ্চিন্তা নিজের মেয়ে হলে একদিন বুঝবি।

আমি বুঝতে চাইনে মাসীমা।

কিন্তু পিতার কর্ত্তব্য রয়েচে যে মা। বাপ-মা তো চিরজীবী নয়। সন্তানের ভবিষ্যৎ না ভাবলে তাঁদের অপরাধ হয়। কেন যে তোমার বাবা মনের মধ্যে শান্তি পান না সে শুধু যারা নিজেরা বাপ-মা তারাই জানে। তোমার বোন প্রকৃতির যতদিন না আমি বিয়ে দিতে পেরেচি ততদিন খেতে পারিনি, ঘুমোতে পারিনি। কত রাত্রি যে জেগে কেটেচে সে তুমি বুঝবে না, কিন্তু তোমার বাবা বুঝবেন। তোমার মা বেঁচে থাকলে তাঁরও আমার দশাই হ'তো।

রে সাহেব মাথা নাড়িয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, খুব সত্যি মিসেস্ ঘোষাল।

মাসী তাঁহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, আজ ওর মা বেঁচে থাকলে বন্দনার জন্য আপনাকে তিনি অস্থির করে তুলতেন। আমি নিজেই কম করেচি ওঁকে। এখন মনে করলেও লজ্জা হয়।

সাহেব সায় দিয়া বলিলেন, দোষ নেই আপনার। ঠিক এমনিই হয় যে।

মাসী বলিতে লাগিলেন, তাই তো জানি। কেবলি ভাবনা হয় নিজেদের বয়স বাড়চে,—মানুষের বেঁচে থাকার তো স্থিরতা নেই—বেঁচে থাকতে মেয়েটার যদি না কোন উপায় করে যেতে পারি হঠাৎ কিছু একটা ঘটলে কি হবে। ভয়ে উনি ত একরকম শুকিয়ে উঠেছিলেন।

বন্দনা আর সহিতে পারিল না, চাহিয়া দেখিল তাহার বাবার মুখও শুকাইয়া উঠিয়াছে, খাওয়া বন্ধ হইয়াছে, বলিল, তুমি মেশোমশাইকে অকারণে নানা ভয় দেখিয়েচো মাসীমা, আবার আমার বাবাকেও দেখাচ্চো। কি এমন হয়েচে বলো ত? বাবা এখনো অনেক দিন বাঁচবেন। তাঁর মেয়ের জন্য যা ভালো, করে যাবার সময় ঢের পাবেন। তুমি মিথ্যে ভাবনা বাড়িয়ে দিও না বাবার।

মাসী দমিবার পাত্রী নহেন। বিশেষতঃ রে সাহেব তাহাকেই সমর্থন করিয়া কহিলেন, তোমার মাসীমা ঠিক কথাই বলেচেন বন্দনা। সত্যিই ত আমার শরীর ভালো নয়, সত্যিই ত এ দেহকে বেশি বিশ্বাস করা চলে না। উনি আত্মীয়, সময় থাকতে উনি যদি সতর্ক না করেন কে করবে বলো ত? এই বলিয়া তিনি উভয়ের প্রতিই চাহিলেন। মাসী কটাক্ষে চাহিয়া দেখিলেন বন্দনার মুখ ছায়াচ্ছন্ন হইয়াছে, অপ্রতিভ-কণ্ঠে ব্যস্ত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, এ বলা অত্যন্ত অসঙ্গত মিস্টার রে। আপনার একশ বছর পরমায়ু হোক আমরা সবাই প্রার্থনা করি, আমি শুধু বলতে চেয়েছিলুম—

সাহেব বাধা দিলেন—না, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। সত্যিই স্বাস্থ্য আমার ভালো না। সময়ে সাবধান না হওয়া, কর্ত্তব্যে অবহেলা করা আমার পক্ষে সত্যিই অন্যায়।

বন্দনা গূঢ় ক্রোধ দমন করিয়া বলিল, আজ বাবার খাওয়া হবে না মাসীমা।

মাসী বলিলেন, থাক্ এ-সব আলোচনা মিস্টার রে। আপনার খাওয়া না হলে আমি ভারি কষ্ট পাবো।

সাহেবের আহারের রুচি চলিয়া গিয়াছিল, তথাপি জোর করিয়া একটুকরা মাংস কাটিয়া মুখে পুরিলেন। অতঃপর খাওয়ার কার্য্য কিছুক্ষণ ধরিয়া নীরবেই চলিল।

সাহেব প্রশ্ন করিলেন, জামাইয়ের প্র্যাক্‌টিস কি রকম হচ্ছে মিসেস্ ঘোষাল ?

মাসী জবাব দিলেন, এই ত আরম্ভ করেচেন। শুনতে পাই মন্দ না।

আবার কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিলে তিনি মুখের গ্রাসটা গিলিয়া লইয়া কহিলেন, প্র্যাক্‌টিস্ যাই হোক মিস্টার রে, আমি এইটেই খুব বড় মনে করিনে। আমি বলি তার চেয়েও ঢের বড় মানুষের চরিত্র। সে নির্ম্মল না হলে কোন মেয়েই কোনদিন যথার্থ সুখী হতে পারে না।

তাতে আর সন্দেহ আছে কি ?

মাসী বলিতে লাগিলেন, আমার মুস্কিল হয়েচে আমার বাপের বাড়ির শিক্ষা-সংস্কার, তাঁদের দৃষ্টান্ত আমার মনে গাঁথা। তার থেকে এক তিল কোথাও কম দেখলে আর সইতে পারিনে। আমার অশোককে দেখলে সেই নৈতিক আবহাওয়ার কথা মনে পড়ে, ছেলেবেলায় যার মধ্যে আমি মানুষ। আমার বাবা, আমার দাদা —এই অশোকও হয়েচে ঠিক তাঁদের মতো। তেমনি সরল, তেমনি উদার, তেমনি চরিত্রবান।

রে-সাহেব সম্পূর্ণ মানিয়া লইলেন, বলিলেন, আমারও ঠিক তাই মনে হয়েছে মিসেস ঘোষাল। ছেলেটি অতি সৎ। ছ' সাত দিন এখানে ছিল, তার ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। এই বলিয়া তিনি কন্যাকে সাক্ষ্য মানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বলিস্ বুড়ী, অশোককে আমাদের কি ভালই লেগেছিল। যেদিন চলে গেল আমার ত সমস্ত দিন মন খারাপ হয়ে রইলো।

বন্দনা স্বীকার করিয়া কহিল, হাঁ বাবা, চমৎকার মানুষ। যেমন বিনয়ী তেমনি ভদ্র। আমার ত কোন অনুরোধে কখনো না বলেননি। আমাকে বোম্বায়ে তিনি না পৌঁছে দিলে আমার বিপদ হ'তো।

মাসী বলিলেন, আর একটা জিনিস বোধ হয় লক্ষ্য করেচো বন্দনা, ওর খবরি নেই। সেটি আজকালকার দিনে দুঃখের সঙ্গে বলতেই হয় যে আমাদের মধ্যে অনেকেরই দেখতে পাওয়া যায়।

বন্দনা সহাস্যে কহিল, তোমার বাড়িতে কোন খবের দেখা তো কোনদিন পাইনি মাসীমা।

মাসী হাসিয়া বলিলেন, পেয়েচো ব কি মা। তুমি অতি বুদ্ধিমতী, তোমাকে ঠকাবে তারা কি কোরে ?

শুনিয়া রে-সাহেবও হাসিলেন, কথাটি তাহার বড় ভালো লাগলো। বলিলেন, এত বুদ্ধি সচরাচর মেলে না মিসেস ঘোষাল। বাপের মুখে একথা গর্ব্বের মতো শুনতে, কিন্তু না বলেও পারিনে।

বন্দনা বলিল, এ প্রসঙ্গ তুমি বন্ধ করো মাসীমা, নইলে বাবাকে সামলানো যাবে না। তুমি এক-মেয়ের দোষগুলোই দেখচো কিন্তু দেখোনি যে এক-মেয়ের বাপদের মতো দাম্ভিক লোকও পৃথিবীতে কম। আমার বাবার ধারণা ওঁর মেয়ের মতো মেয়ে সংসারে আর দ্বিতীয় নেই।

মাসী বলিলেন, সে-ধারণার আমিও বড় অংশীদার বন্দনা। শাস্তি পেতে হলে আমারও পাওয়া উচিত।

পিতার মুখে অনির্ব্বচনীয় পরিতৃপ্তির মৃদু হাসি, কহিলেন, আমি দাম্ভিক কি না জানিনে, কিন্তু জানি কন্যা-রত্নে আমি সত্যিই সৌভাগ্যবান। এমন মেয়ে কম বাপেই পায়।

বন্দনা বলিল, বাবা, কই আজ তো তুমি একটিও সন্দেশ খেলে না? ভালো হয়নি বুঝি?

সাহেব প্লেট হইতে আধখানা সন্দেশ ভাঙিয়া লইয়া মুখে দিলেন, বলিলেন, সমস্ত বুড়ীর নিজের হাতের তৈরি। এবার কলকাতা থেকে ফিরে পর্য্যন্ত ও সমস্ত খাওয়া-দাওয়া বদলে দিয়েচে। ডাল্না, সুক্ত, মাছের ঝোল, দই, সন্দেশ আরও কত কি। কার কাছে শুনে এসেচে জানিনে, কিন্তু বাড়িতে মাংস প্রায় আনতে দেয় না। বলে বাবার ওতে অসুখ করে। দেখুন মিসেস ঘোষাল, এই সব বাঙলা খাওয়া খেয়ে মনে হয় যেন বুড়ো বয়সে আছি ভালো। বেশ যেন একটু ক্ষিদে বোধ করি।

বন্দনা বলিল, মাসীমার অভ্যেস নেই, হয়ত কষ্ট হয়।

মাসী এই গূঢ় বিদ্রূপ লক্ষ্য করিলেন না, কহিলেন, মা—না, কষ্ট হবে কেন, এ আমার ভালোই লাগে। শুধু আবহাওয়ার চেঞ্জই ত নয়, খাবার চেঞ্জও বড় দরকার। তাই বোধ করি শরীর আমার এত শীঘ্র ভালো হয়ে গেল।

ভালো হয়েচে, না মাসীমা?

নিশ্চয় হয়েচে। কোন সন্দেহ নেই।

তা হলে আর কিছুদিন থাকো। আরও ভালো হোক।

কিন্তু বেশিদিন থাকবার যে জো নেই বন্দনা। অশোক লিখেচে এ মাসের শেষেই সে পাঞ্জাবে চেঞ্জের জন্যে আসবে। তার আগে আমার তো ফিরে যাওয়া চাই।

ভোজন-পর্ব্ব সমাধা হইয়াছিল, সাহেব উঠি উঠি করিতেছিলেন,—মাসী মনে মনে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। এই প্রস্তাব উত্থাপনের স্বপক্ষে অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া

আনিয়াছেন, তাহা চক্ষু-লজ্জায় ভ্রষ্ট হইতে দিলে ফিরিয়া আনা হয়ত দুরূহ হইবে। সঙ্কোচ অতিক্রম করিয়া বলিলেন, মিস্টার রে, একটা কথা ছিল, যদি সময় না—

সাহেব তৎক্ষণাৎ বসিয়া পড়িয়া কহিলেন, না না, সময় আছে বই কি। বলুন কি কথা।

মাসী বলিলেন, আমি শুনেচি বন্দনার অমত নেই। অশোক অর্থশালী নয় সত্য, কিন্তু সুশিক্ষা ও চরিত্রবলে struggle করে একদিন ও উঠবেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আপনি যদি ওকে আপনার মেয়ের অযোগ্য বিবেচনা না করেন—

সাহেব আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, কিন্তু সে কি করে হতে পারে মিসেস ঘোষাল? অশোক আপনার ভাই-পো, সম্পর্কে সেও তো বন্দনার মামাতো ভাই।

মাসী বলিলেন, শুধু নামে, নইলে বহু দূরের সম্বন্ধ। আমার দিদিমা এবং বন্দনার মায়ের দিদিমা দুজনে বোন ছিলেন, সেই সম্পর্কেই বন্দনার আমি মাসী। এ বিবাহ নিষিদ্ধ হতে পারে না মিস্টার রে।

সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, বোধ হয় মনে মনে কি একটা হিসাব করিলেন, তারপর বলিলেন, অশোককে যতটুকু আমি নিজে দেখেচি এবং যতটুকু বন্দনার মুখে শুনেচি তাতে অযোগ্য মনে করিনে। মেয়ের বিয়ে একদিন আমাকে দিতেই হবে, কিন্তু তার নিজের অভিমত জানা দরকার।

মাসী স্নেহের কণ্ঠে উৎসাহ দিয়া কহিলেন, লজ্জা কোরো না মা, বল তোমার বাবাকে কি তোমার ইচ্ছে।

বন্দনার মুখ পলকের জন্য রাঙা হইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণে সুস্পষ্ট স্বরে বলিল, আমার ইচ্ছেকে আমি বিসর্জ্জন দিয়েছি মাসীমা। সে খোঁজ করার দরকার নেই।

সাহেব সভয়ে কহিলেন, এর মানে?

বন্দনা বলিল, মানে ঠিক তোমাদের আমি বুঝিয়ে বলতে পারবো না বাবা। কিন্তু তাই বলে ভেবো না যেন আমি বাধা দিচ্চি। একটু থামিয়া কহিল, আমার সতী দিদির বিয়ে হয়েছিল তাঁর ন'বছর বয়সে। বাপ-মা যাঁর হাতে তাঁকে সমর্পণ করলেন মেজদিদি তাঁকেই নিলেন, নিজের বুদ্ধিতে বেছে নেননি। তবু ভাগ্যে যাঁকে পেলেন সে-স্বামী জগতে দুর্ল্লভ। আমি সেই ভাগ্যকেই বিশ্বাস করবো বাবা। বিপ্রদাসবাবু সাধুপুরুষ, আসবার আগে আমাকে আশীর্ব্বাদ করে বলেছিলেন যেখানে আমার কল্যাণ ভগবান সেখানেই আমাকে দেবেন। তাঁর সেই কথা কখনো মিথ্যে হবে না। তুমি আমাকে যা আদেশ করবে আমি তাই পালন করবো। মনের মধ্যে কোন সংশয়, কোন ভয় রাখবো না।

সাহেব বিস্ময়ে স্থির হইয়া তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন, মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না।

মাসী বলিলেন, বিয়ের সময় তোমার মেজদি ছিলেন বালিকা, তাই তাঁর মতামতের প্রশ্নই ওঠেনি। কিন্তু তুমি তা নও, বড় হয়েচো, নিজের ভাল-মন্দের দায়িত্ব তোমার নিজের এমন চোখ বুজে ভাগ্যের খেলা দেখা ত তোমার সাজে না বন্দনা!

সাজে কি না জানিনে মাসীমা, কিন্তু তাঁর মতো তেমনি করেই ভাগ্যকে আমি প্রসন্নমনে মেনে নেবো।

কিন্তু এমন উদাসীনের মতো কথা বললে তোমার বাবা মনঃস্থির করবেন কি করে?

যেমন করে ওঁর দাদা করেছিলেন সতীদিদির সম্বন্ধে, যেমন করে ওঁর সকল পূর্ব্বপুরুষরাই দিয়েচেন তাঁদের ছেলে-মেয়েদের বিবাহ, আমার সম্বন্ধে বাবা তেমনি করেই মনঃস্থির করুন।

তুমি নিজে কিছুই দেখবে না, কিছুই ভাববে না?

ভাবা-ভাবি, দেখা-দেখি অনেক দেখলুম মাসীমা। আর না। এখন নির্ভর করবো বাবার আশীর্ব্বাদের আর সেই ভাগ্যের পরে, যার শেষ কেউ আজও দেখতে পায়নি।

মাসী হতাশ হইয়া একটুখানি তিক্তকণ্ঠে বলিলেন, ভাগ্যকে আমরাও মানি, কিন্তু তোমার সমাজ, শিক্ষা, সংস্কার সব ডুবিয়ে দিয়ে মুখুয্যেদের এই ক'দিনের সংস্রব যে তোমাকে এতখানি আচ্ছন্ন করবে তা ভাবিনি। তোমার কথা শুনলে মনে হয় না যে তুমি আমাদের সেই বন্দনা। যেন একেবারে আমাদের থেকে পর হয়ে গেছো।

বন্দনা বলিল, না মাসীমা, আমি পর হয়ে যাইনি। তাঁদের আপনার করতে আমার কাউকে পর করতে হবে না এ-কথা নিশ্চয় জেনে এসেচি। আমাকে নিয়ে তোমরা কোন শঙ্কা কোরো না।

মাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, তা হলে অশোককে আসতে একটা টেলিগ্রাম করে দিই?

দাও। আমার কোন আপত্তি নেই। এই বলিয়া বন্দনা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মিস্টার রে, আ   র নাম করেই তবে টেলিগ্রামটা পাঠাই—বলিয়া মাসী মুখ তুলিয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন সাহেবের দুই চোখ অকস্মাৎ বাষ্পাকুল হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কারণ খুঁজিয়া পাইলেন না এবং সাহেব ধীরে ধীরে যখন বলিলেন, টেলিগ্রাম আজ থাক্ মিসেস ঘোষাল, তখনও হেতু বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, থাকবে কেন মিস্টার রে, বন্দনা ত সম্মতি দিয়ে গেল!

না না, আজ থাক্, বলিয়া তিনি নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। এই নীরবতা এবং

ঐ অশ্রুজল মাসীকে ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ করিল। একজন প্রবীণ পদস্থ লোকের এইরূপ সেন্টিমেণ্টালিটি তাঁহার অসহ্য। কিন্তু জিদ করিতেও সাহস করিলেন না। মিনিট-দুই চুপ করিয়া থাকিয়া সাহেব বলিলেন, ওর বাপের ভাবনা আমি ভেবেচি, কিন্তু ওর মা নেই, তাঁর ভাবনাও আমাকেই ভাবতে হবে মিসেস ঘোষাল। একটু সময় চাই।

মাসী মনে মনে বলিলেন, আর একটা স্টুপিড সেন্টিমেণ্টালিটি। সাহেব অনুমান করিলেন কি-না জানি না, কিন্তু এবার জোর করিয়া একটু ম্লান হাসিয়া বলিলেন, মুস্কিল হয়েচে ওর কথা আমরা কেউ ভালো বুঝতে পারিনে। শুধু আজ নয়, বাঙলা থেকে আসা পর্য্যন্তই মনে হয় ঠিক যেন ওকে বুঝতে পারিনে। ও সম্মতি দিলে বটে কিন্তু সে—ও, না ওর নতুন রিলিজন ভেবেই পেলুম না।

নতুন রিলিজন মানে?

মানে আমিও জানিনে। কিন্তু বেশ দেখতে পাই বাঙলা থেকে ও কি যেন একটা সঙ্গে করে এনেচে, সে রাত্রি-দিন থাকে ওকে ঘিরে। ওর খাওয়া গেছে বদলে, কথা গেছে বদলে, ওর চলা-ফেরা পর্য্যন্ত মনে হয় যেন আগেকার মতো নেই। ভোরবেলায় স্নান করে আমার ঘরে গিয়ে পায়ের ধূলো মাথায় নেয়। বলি, বুড়ী, আগে তো তুই এ-সব করতিস্‌নে?

তখন জানতুম না বাবা। এখন তোমার পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে দিন আরম্ভ করি। বেশ বুঝতে পারি সে আমাকে সমস্ত দিন সমস্ত কাজে রক্ষে করে চলে। বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু পুনরায় অশ্রুসজল হইয়া উঠিল।

মাসী মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, এ-সব নতুন ধাচ শিখে এসেচে ও মুখুয্যেদের বাড়িতে। জানেন ত তাঁরা কি-রকম গোঁড়া? কিন্তু এ-কে রিলিজন বলে না, বলে কুসংস্কার। ও পূজো-টুজো করে নাকি?

সাহেব বলিলেন, জানিনে করে কি না। হয় ত করে না। কুসংস্কার বলে আমারও মনে হয়েচে, নিষেধ করতেও গেছি, কিন্তু বুড়ী আগেকার মতো আর তো তর্ক করে না, শুধু চুপ করে চেয়ে থাকে। আমারও মুখ যায় বন্ধ হয়ে—কিছুই বলতে পারিনে।

মাসী বলিলেন, এ আপনার দুর্ব্বলতা! কিন্তু নিশ্চিত জানবেন একে রিলিজন বলে না, বলে শুধু সুপারস্টিশন? একে প্রশ্রয় দেওয়া অন্যায়! অপরাধ!

সাহেব দ্বিধাভরে আস্তে আস্তে বলিলেন, তাই হবে বোধ হয়। রিলিজন কথাটা মুখেই বলি, কখনো নিজেও চর্চ্চা করিনি, এর নেচার কি তা-ও জানিনে, শুধু মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবি মেয়েটাকে এমন আগাগোড়া বদলে দিলে কিসে? সে হাসি নেই, আনন্দের চঞ্চলতা নেই, বর্ষাদিনের ফুটন্ত ফুলের মতো পাপড়িগুলি যেন জলে

ভিজে। কখনো ডেকে বলি, বুড়ি, আমাকে লুকোসনে মা, তোর ভেতরে কোন অসুখ করেনি ত? অমনি হেসে মাথা দুলিয়ে বলে, না বাবা, আমি ভালো আছি, আমার কোন অসুখ নেই। হাসিমুখে ঘরের কাজে চলে যায়, আমার কিন্তু বুকের পাঁজরা ভেঙে পড়তে চায় মিসেস ঘোষাল! ঐ একটি মেয়ে, মা নেই, নিজের হাতে মানুষ করে এত বড়টি করেচি,—সর্ব্বস্ব দিয়েও যদি আমার সেই বন্দনাকে আবার তেমনি ফিরে পাই—

মাসী জোর দিয়া বলিলেন, পাবেন। আমি কথা দিচ্ছি পাবেন। এ শুধু একটা সাময়িক অবসাদ, ধর্ম্মের ঝোঁক হলেও হতে পারে, কিন্তু অত্যন্ত অসাড়। কেবল ওঁদের সংসর্গের আসার ক্ষণিক বিকার। বিবাহ দিন, সমস্ত দুদিনেই সেরে যাবে। চিরদিনের শিক্ষাই মানুষের থাকে মিস্টার রে, দুদিনের যা তিক দুদিনেই ফুরোয়।

সাহেব আশ্বস্ত হইলেন, তথাপি সন্দেহ ঘুচিল না। বলিলেন ও কোথায় কার কাছে কি প্রেরণা পেলে জানিনে, কিন্তু শুনেচি সে যদি আসে সত্যিকার মানুষ থেকে কিছুতে সে ঘোচে না। মানুষের চিরদিনের অভ্যাস দেয় একমুহূর্ত্তে বদলে। নেশা গিয়ে মেশে রক্তের ধারায়, সমস্ত জীবনে তার আর ঘোর কাটে না! সেই আমার ভয় মিসেস ঘোষাল।

প্রত্যুত্তরে মাসী একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিলেন, বলিলেন, বাজে বাজে। আমি অনেক দেখেচি মিস্টার রে—দুদিন পরে আর কিছু থাকে না। আবার যা'কে তাই হয়। কিন্তু বাড়তে দেওয়াও চলবে না,—আজই অশোককে একটা তার করে দিই—সে এসে পড়ুক।

আজই দেবেন?

হাঁ, আজই। এবং আপনার নামেই।

সাহেব মৃদুকণ্ঠে সম্মতি জানাইয়া বলিলেন, যা ভালো হয় করুন। আমি জানি অশোক ভালো ছেলে। চরিত্রবান, সৎ—তা নইলে ওকে নিয়ে বন্দনা কিছুতে আসতে রাজি হ'তো না।

মাসী এই কথাটাকেই আর একবার ফাঁপাইয়া ফুলাইয়া বলিতে গেলেন, কিন্তু বাধা পড়িল। বন্দনা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, বাবা, আজ হাজি সাহেবের মেয়েরা আমায় চায়ের নেমতন্ন করেচে। দুপুরবেলা যাবো, বিকালে অফিসের ফেরত আমাকে বাড়ি নিয়ে এসো।

মাসী প্রশ্ন করিলেন, তাঁদের বাড়িতে তুমি ত কিছু খাবে না বন্দনা?

না মাসীমা।

কেন?

আমার ইচ্ছে করে না। বাবা, তুমি ভুলে যাবে না তো?

না মা, তোমাকে আনতে ভুলে যাবো এমন কখন হয়? এই বলিয়া সাহেব একটু হাসিলেন। বলিলেন, অশোক আসচেন। তাঁকে আজ একটা তার করে দেবো।

বেশ ত বাবা, দাও না।

মাসী বলিলেন, আমিই জোর করে তাকে আনচি। দেখো, এলে যেন না অসম্মান হয়!

তোমার ভয় নেই মাসীমা, আমরা কারো অসম্মান করিনে। অশোকবাবু নিজেই জানেন।

মেয়ের কথা শুনিয়া সাহেব প্রসন্নমুখে বলিলেন, অফিসের পথে আজই তাকে একটা টেলিগ্রাম করে দেবো বুড়ী। আজ শুক্রবার সোমবারেই সে এসে পৌঁছতে পারবে যদি না কোন ব্যাঘাত ঘটে।

দরওয়ান ডাক লইয়া হাজির হইল। অসংখ্য সংবাদ-পত্র, নানা স্থানের চিঠি-পত্রও কম নয়। কিছুদিন হইতে ডাকের প্রতি বন্দনার ঔৎসুক্য ছিল না। সে জানিত প্রতিদিন আশা করিয়া অপেক্ষা কর বৃথা। তাহাকে মনে করিয়া চিঠি লিখিবার কেহ নাই। চলিয়া যাইতেছিল, সাহেব ডাকিয়া বলিলেন, এই যে তোমার নামের দু-খানা। আপনারও একখানা রয়েচে মিসেস ঘোষাল।

নিজের চেয়েও পরের চিঠিতে মাসীর কৌতূহল বেশি। মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া বলিলেন, একখানা ত দেখচি অশোকের হাতের লেখা। ওটা কার?

এই অকারণ প্রশ্নের উত্তর বন্দনা দিল না, চিঠি দুখানা হাতে লইয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

সাহেব মুচকিয়া হাসিয়া বলিলেন, অশোকের সঙ্গে দেখচি চিঠি-পত্র চলে। তার করে দিই সে আসুক। ছেলেটি সত্যিই ভালো। তাকে বিশ্বাস না করলে বন্দনা কখনও চিঠি লিখত না।

প্রত্যুত্তরে মাসীও সগর্বে একটু হাসিলেন। অর্থাৎ জানি আমি অনেক কিছুই।

বিকালে অফিসের পথে হাজি-সাহেবের বাড়ি ঘুরিয়া রে-সাহেব একাকী ফিরিয়া আসিলেন। বন্দনা সেখানে যায় নাই। মাসী সুমুখেই ছিলেন, মুখ ভার করিয়া বলিলেন, বন্দনা চিঠি নিয়ে সেই যে নিজের ঘরে ঢুকেচে আর বার হয়নি।

সাহেব উদ্বিগ্ন মুখে প্রশ্ন করিলেন, খায়নি?

না। সকালে সেই যে দুটো ফল খেয়েছিল আর কিছু না।

সাহেব ত্রুতপদে কন্যার ঘরের দরজায় গিয়া ঘা দিলেন, বুড়ী!

বন্দনা কবাট খুলিয়া দিল। তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া পিতা স্তব্ধ হইয়া রহিলেন,—কি হয়েচে রে?

বন্দনা কহিল, বাবা, আজ রাত্রের গাড়িতে আমি বলরামপুর যাবো।

বলরামপুর? কেন?

দ্বিজুবাবু একখানা চিঠি লিখেচেন,—পড়বে বাবা?

তুই পড় মা, আমি শুনি, বলিয়া সাহেব চৌকি টানিয়া লইয়া বসিলেন। বন্দনা তাঁহাকে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া যে চিঠিখানা পড়িয়া শুনাইল তাহা এই—

সুচরিতাসু,

আপনার যাবার দিনটি মনে পড়ে। উঠানে গাড়ি, দাঁড়িয়ে বললেন, মাঝে মাঝে খবর দিতে। বললুম, কুঁড়ে মানুষ আমি, চিঠি-পত্র লেখা সহজে আসেও না, ভালো লিখতেও জানিনে। এ ভার বরঞ্চ আর কাউকে দিয়ে যান।

শুনে অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলেন, তারপর গাড়িতে গিয়ে উঠে বসলেন, দ্বিতীয় অনুরোধ করলেন না। হয়ত ভাবলেন অসৌজন্য যাকে এমন সময়েও একটা ভালো কথা মুখে আনতে দেয় না তাকে আর বলবার কি আছে?

আমি এমনিই বটে। তবু আশা ছিল লিখতেই যদি হয় এমন কিছু লিখতে পারি যা খবরের চেয়ে বড়। সে লেখা যেন অনায়াসে আমার সকল অপরাধের মার্জ্জনা চেয়ে নিতে পারে।

মনে ভাবতুম মানুষের জন্যে কি শুধু অভাবিত দুঃখই আছে, অভাবিত সুখ কি জগতে নেই?

দাদার ইষ্ট-দেবতাও চোখ বুজেই থাকবেন, চেয়ে কখনো দেখবেন না? অঘটন যা ঘটল সেই হবে চিরস্থায়ী, তাকে টলাবার শক্তি কোথাও নেই?

দেখা গেল নেই,—সে শক্তি কোথাও নেই। না টললেন ভগবান, না টললে তাঁর ভক্ত। নির্বাক নিষ্কম্প দীপ-শিখা আজও তেমনি উর্দ্ধমুখে জ্বলছে, জ্যোতির কণামাত্র অপচয়ও ঘটেনি।

এ প্রসঙ্গ কেন তাই বলি। তিন দিন হ'লো দাদা বাড়ি ফিরে এসেচেন। সকালে যখন গাড়ি থেকে নামলেন তাঁর পিছনে নামলে বাসু। খালি পা, গলায় উত্তরীয়। গাড়ি ফিরে চলে গেলো আর কেউ নামলো না। সকালের রোদে ছাদে দাঁড়িয়েছিলুম, চোখের সুমুখে সমস্ত পৃথিবী হয়ে এলো অন্ধকার ঠিক অমাবস্যা রাত্রির মতো। বোধ করি মিনিট দুই হবে, তার পরে আবার সব দেখতে পেলুম, আবার সব স্পষ্ট হয়ে এলো। এমন যে হয় এর আগে আমি জানতুম না।

নীচে নেমে এলুম, দাদা বললেন, তোর বৌদি কাল সকালে মারা গেছেন বিজু। হাতে টাকাকড়ি বিশেষ নেই, সামান্যভাবে তাঁর শ্রাদ্ধের আয়োজন করে দে।

মা কোথায়?

ঢাকায়। তাঁর মেয়ের বাড়িতে।

ঢাকায়? একটু চুপ করে থেকে বললেন, কি জানি আসতে হয়ত পারবেন না, কিন্তু মাতুদায় জানিয়ে বাসু তাঁকে চিঠি দেয় যেন।

বললুম, দেবে বই কি।

বাসু ছুটে এসে আমার গলা জড়িয়ে বুকে মুখ লুকালো। তার পরে কেঁদে উঠলো। সে-কান্নারও যেমন ভাষা নেই, চিঠিতে সে প্রকাশ করারও তেমনি ভাষা নেই। শিকারের জন্তু মরার আগে তার শেষ নালিশ রেখে যায় যে ভাষায় অনেকটা তেমনি। তাকে কোলে নিয়ে ছুটে পালিয়ে এলুম নিজের ঘরে। সে তেমনি করেই কাঁদতে লাগলো বুকে মুখ রেখে। মনে মনে বললুম, ওরে বাসু, লোকসানের দিক দিয়ে তুই যে বেশি হারালি তা নয়, আর একজনের ক্ষতির মাত্রা তোকেও ছাপিয়ে গেল। তবু তোকে বোঝাবার লোক পাবি, কিন্তু সে পাবে না। শুধু একটা আশা বন্দনা যদি বোঝেন।

এমন কতক্ষণ গেল। শেষে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললুম, ভয় নেই রে মা না থাক্ বাপ না থাক্ কিন্তু রইলুম আমি। ঋণ তাঁদের শোধ দিতে পারবো না, কিন্তু অস্বীকার করবো না কখনো। আজ সবচেয়ে ব্যথা সবচেয়ে ক্ষতির দিনে রইলো তোর কাকার শপথ।

কিন্তু এ নিয়ে আর কথা বাড়াবো না, কথার আছেই বা কি! ছেলেবেলায় বাবা বলতেন গোঁয়ার, মা বলতেন চুয়াড়ে, কতবার রাগ করেচেন দাদা—অনাদরে অবহেলায় কতদিন এ-বাড়ি হয়ে উঠেচে বিষ, তখন বৌদিদি এসেচেন কাছে, বলেচেন, ঠাকুরপো, কি চাই বলো ত ভাই? রাগ করে জবাব দিয়েচি, কিছু চাইনে বৌদি' আমি চলে যাবো এখান থেকে।

কবে গো?

আজই।

শুধু হেসে বলেচেন, হুকুম নেই যাবার। যাও তো দেখি আমার অবাধ্য হয়ে।

আর যাওয়া হয়নি। কিন্তু সেই যাবার দিন যখন সত্যি এলো তখন তিনি গেলেন চলে। ভাবি, কেবল আমার জন্যেই হুকুম? তাঁকে হুকুম করবার কি কেউ ছিল না জগতে?

দাদাকে জিজ্ঞাসা করলুম, কি করে ঘটলো? বললেন, কলকাতেই শরীর খারাপ হলো—বোধ হয় মনে মনে খুবই ভাবতো—নিয়ে গেলাম পশ্চিমে। কিন্তু

সুবিধে কোথাও হ'লো না। শেষে হরিদ্বারে পড়লেন জ্বরে, নিয়ে চলে এলাম কাশীতে। সেইখানেই মারা গেলেন। ব্যাস্।

জিজ্ঞাসা করলুম, চিকিৎসা হয়েছিল দাদা?

বললেন, যথাসম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু এই যথাটুকু যে কতটুকু সে দাদা নিজে ছাড়া আর কেউ জানে না।

ইচ্ছে হ'লো বলি, আমাকে এত বড় শাস্তি দিলেন কেন? কি করেছিলুম আমি? কিন্তু তাঁর মুখের পানে চেয়ে এ প্রশ্ন আমার মুখে এলো না।

জিজ্ঞাসা করলুম, তিনি কাউকে কিছু বলে যাননি দাদা?

বললেন, হাঁ। মৃত্যুর ঘণ্টা-দশেক পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চেতনা ছিল, জিজ্ঞেস করলুম, সতী মাকে কিছু বলবে?

বললে, না।

আমাকে?

না।

দ্বিজুকে?

হাঁ। তাকে আমার আশীর্ব্বাদ দিও। বোলো সবই রইলো।

ছুটে পালিয়ে এলুম বৌদিদির শূন্য ঘরে। ছবি তোলাতে তার ভারি লজ্জা ছিল, শুধু ছিল একখানি লুকানো তার আলমারির আড়ালে। আমারি তোলা ছবি। সুমুখে দাঁড়িয়ে বললুম, ধন্য হয়ে গেছি বৌদি, বুঝেচি তোমার হুকুম। এত শীঘ্র চলে যাবে ভাবিনি, কিন্তু কোথাও যদি থাক দেখতে পাবে তোমার আদেশ অবহেলা করিনি। শুধু এই শক্তি দিও, তোমার শোকে কারো কাছে আমার চোখের জল যেন না পড়ে। কিন্তু আজ এই পর্য্যন্ত তার কথা।

এবার আমি। যাবার সময় অনুরোধ করেছিলেন বিবাহ করতে। কারণ, এত ভার একলা বইতে পারব না—সঙ্গীর দরকার। সেই সঙ্গী হবে মৈত্রেয়ী এই ছিল আপনার মনে। আপত্তি করিনি, ভেবেছিলুম সংসারে পনেরো আনা আনন্দই যদি ঘুচলো এক আনার জন্যে আর টানাটানি করবো না। কিন্তু সে-ও আর হয় না—বৌদিদির মৃত্যু এনে দিলে অলঙ্ঘ্য বাধা। কিসের বাধা? মৈত্রেয়ী ভার নিতে পারে, পারে না সে বোঝা বইতে। এটা জানতে পেরেচি। কিন্তু আমার এবার সেই বোঝাই হ'লো ভারি। তবু বলব বিপদের দিনে সে আমাদের অনেক করেচে, তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সময় যদি আসে তার ঋণ ভুলবো না।

কাল অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে বাসু উঠলো কেঁদে। তাকে ঘুম পাড়িয়ে গেলুম দাদার ঘরে। দেখি তখনো জেগে বসে বই পড়ছেন।—কি বই দাদা? দাদা বই মুড়ে রেখে হেসে বললেন, কি করতে এসেচিস বল্? তাঁর পানে চেয়ে যা বলতে

এসেছিলুম বলা হ'লো না। ভাবলুম ঘুমের ঘোরে বাসু কেঁদেচে তাতে বিপ্রদাসের কি? অন্য কথা মনে এলো, বললুম, শ্রাদ্ধের পর কোথায় থাকবেন দাদা? কলকাতায়?

বললেন, না রে; যাব তীর্থভ্রমণে।

ফিরবেন কবে?

দাদা আবার একটু হেসে বললেন, ফিরবো না।

স্তব্ধ হয়ে তাঁর মুখের পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। সন্দেহ রইলো না যে এ সঙ্কল্প টলবে না। দাদা সংসার ত্যাগ করবেন।

কিন্তু অনুনয়-বিনয় কাঁদা-কাটা কার কাছে? এই নিষ্ঠুর সন্ন্যাসীর কাছে? তার চেয়ে অপমান আছে?

কিন্তু বাসু?

দাদা বললেন, হিমালয়ের কাছে একটা আশ্রমের খোঁজ পেয়েছি। তারা ছোট ছেলেদের ভার নেয়। শিক্ষা দেয় তারাই।

তাদের হাতে তুলে দেবেন ওকে? আর আমি করলুম মানুষ? তার পর দুই হাতে কান চেপে পালিয়ে এলুম ঘর থেকে। তিনি কি জবাব দিলেন শুনিনি।

বাসুর পাশে বসে সমস্ত রাত ভেবেচি। কোথায় যে এর কূল কিছুতে খুঁজে পাইনি। মনে পড়ল আপনাকে। বলে গিয়েছিলেন, বন্ধুর যখন হবে সত্যিকারের প্রয়োজন তখন ভগবান আপনি পৌঁচে দেবেন তাকে দোর-গোড়ায়। বলেছিলেন এ-কথা বিশ্বাস করতে। কে বন্ধু, কবে সে আসবে জানিনে, তবু বিশ্বাস করে আছি আমার এই একান্ত প্রয়োজনে একদিন আসবেই।

বিপ্রদাস

পড়া শেষ হইলে দেখা গেল সাহেবের চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। রুমাল বাহির করিয়া মুছিয়া বলিলেন, আজই যাও মা, আমি বাধা দেব না। দরওয়ান আর তোমার বুড়ো হিমুও সঙ্গে যাক।

বন্দনা হেঁট হইয়া তাঁর পায়ের ধূলা লইল, বলিল, যাবার উদ্যোগ করিগে বাবা, আমি উঠি।

২৬

ম্যানেজার বিরাজ দত্ত মোটর লইয়া স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। বন্দনাকে সসম্মানে ট্রেন হইতে নামাইয়া গাড়িতে আনিয়া বসাইলেন।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, মা আজও বাড়ি এসে পৌছননি দত্তমশাই ?

না দিদি।

মৈত্রেয়ী ?

না, তাঁকে ত কেউ আনতে যায়নি।

বাসু ভাল আছে ?

আছে।

মুখুয্যেমশাই ? দ্বিজুবাবু ?

বড়বাবু ভাল আছেন, কিন্তু ছোটবাবুকে দেখলে তেমন ভালো বোধ হয় না।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, জ্বর-টর হয়নি ত ?

দত্ত বলিলেন, ঠিক জানিনে দিদি। কিন্তু সমস্ত কাজকর্ম্ম করেই ত বেড়াচ্ছেন।

বন্দনা কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, দত্তমশাই, আমার মনে হয় মা হয়ত এ দুঃখের মধ্যে আসবেন না। কিন্তু দুঃখ যতই হোক শ্রাদ্ধের আয়োজন ত করতে হবে। কিন্তু হচ্চে কি ?

হচ্চে বই কি দিদি। কর্ত্তাবাবুর শ্রাদ্ধে যেমন হয়েছিল প্রায় তেমনি ব্যবস্থাই হচ্চে।

কথাটা ভাল বুঝিতে না পারিয়া বন্দনা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, কার মত বলচেন, মুখুয্যেমশায়ের পিতৃশ্রাদ্ধের মত ? তেমনি বড় আয়োজন ?

দত্ত বলিলেন, হাঁ, প্রায় তেমনই। গেলেই দেখতে পাবেন। বাবু ডেকে বললেন, দ্বিজু, পাগলামি করিস্‌নে, সব জিনিসেরই একটা মাত্রা আছে। ছোটবাবু বললেন, মাত্রা আছে জানি, কিন্তু মাত্রাবোধ সকলের এক নয় দাদা। বড়বাবু হেসে বললেন, কিন্তু তুই যে সকলের মাত্রাই ডিঙিয়ে যাচ্চিস্‌ দ্বিজু। ছোটবাবু বললেন, তা হলে আপনাদের কাছে মিনতি এই একটিবারের জন্তে আমাকে ক্ষমা করুন। আমি মাত্রা লঙ্ঘন করতে পারবো, কিন্তু বৌদিদির মর্য্যাদা লঙ্ঘন করতে পারবো না।

এর পরে আর কেহ কথা কয় নি. এখন আপনি যদি কিছু করতে পারেন। খরচ বিশ-পঁচিশ হাজারের কম যাবে না।

খরচ কি সব ছোটবাবুর ?

হাঁ, তাই তো।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, এ কি তাঁর পক্ষে খুব বেশী মনে হয় দত্তমশাই ?

বিরাজ দত্ত বলিলেন, খুব বেশী না হলেও সম্প্রতি গেলও যে অনেক দিদি। এখন সামলে চলার প্রয়োজন। এর উপর নতুন বিপদ আসতেই বা কতক্ষণ ?

আবার নতুন বিপদ কিসের ?

দত্ত ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, আপনি কি শোনেননি জামাইবাবুর সঙ্গে মামলা বেঁধেচে ? এ-সব বস্তুর পরিণাম ত জানেন, ফলাফল কেহ্ বলতে পারে না।

তবে নিষেধ করেননি কেন ?

নিষেধ ? এ তো বড়বাবু নয় দিদি, যে নিষেধ মানবেন। একে নিষেধ করতে শুধু একজনই ছিলেন তিনি এখন স্বর্গে। বলিয়া বিরাজ দত্ত নিশ্বাস ফেলিলেন।

বন্দনা আর কোন প্রশ্ন করিল না। বাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল সুমুখের মাঠের একদিকে কাঠ কাটিয়া স্তূপাকার করা হইয়াছে। যে-সকল চালা-ঘর দয়াময়ীর ব্রতোপলক্ষ্যে সেদিন তৈরি হইয়াছিল, সেগুলো মেরামত হইতেছে, বাহির প্রাঙ্গণে বিরাট মণ্ডপ নির্ম্মিত হইতেছে, তথায় বহু লোক বিবিধ কাজে নিযুক্ত। বিরাজ দত্ত অত্যুক্তি করে নাই বন্দনা তাহা বুঝিল।

গাড়ি হইতে নামিয়া সে সোজা উপরে গিয়া উঠিল। প্রথমেই গেল দ্বিজদাসের ঘরে। একটা বালিশে হেলান দিয়া সে বিছানায় শুইয়াছিল, পর্দ্দা সরানোর শব্দে চোখ মেলিয়া উঠিয়া বসিল, বলিল, বন্ধু আপনি এলো আমার ঘরের দোড়গোড়ায়।

বন্দনা বলিল, হাঁ এলোই ত। কিন্তু এমন সময়ে শুয়ে কেন ?

দ্বিজদাস বলিল, চোখ বুজে তোমাকেই ধ্যান করিছিলুম আর মনে মনে বলছিলুম, বন্দনা, দুঃখের সীমা নেই আমার। দেহে নেই বল, মনে নেই ভরসা, বোধ করি আর ঠেলতে পারব না, নৌকা মাঝখানেই ডুববে। ও-পারে পৌছনো আর ঘটবে না।

বন্দনা বলিল, ঘটতেই হবে। তোমাকে ছুটি দিয়ে এইবার নৌকা বাইবার ভার নেবো আমি।

তাই নাও। রাগ করে চলে যেও না।

বন্দনা কাছে আসিয়া গড় হইয়া প্রণাম করিল, তাহার পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই দুজনের চোখ দিয়াই জল পড়িতে লাগিল। এমনভাবে প্রণাম করা তাহার এই প্রথম। বলিল, তোমার চোখেও জল আসে এ আমি জানতুম না।

দ্বিজদাস বলিল, আমিও না। বোধ করি তার আসার পথটা এতকাল বন্ধ ছিল।

প্রথম খুললো যেদিন মৈত্রেয়ীকে ডেকে এনে সংসারের ভার দিতে বলে তুমি চলে গেলে। আড়ালে চোখ মুছে ফেলে মনে মনে বললুম, এত বড় আঘাত যে স্বচ্ছন্দে করতে পারে তার কাছে কখনো ভিক্ষে চাইবো না। কিন্তু সে পণ আমার রইলো না। বৌদিদি গেলেন স্বর্গে, শশধরের সঙ্গে মামলা বাধতে মা চলে গেলেন মেয়ের বাড়িতে; দাদা জানালেন সংসার-ত্যাগের সঙ্কল্প, এক মিনিটের ভূমিকম্পে যেন সমস্ত হয়ে গেল ধূলিসাৎ। এ ও সয়েছিল, কিন্তু শুনলুম যখন বাড়ি ছেড়ে বাসু যাবে কোন-একটা অজানা আশ্রমে সে আর সইলো না। একবার ভাবলুম যা কিছু আছে কল্যাণীর ছেলেদের দিয়ে আমিও যাবো আর এক দিকে, তখন হঠাৎ মনে পড়লো তোমার যাবার আগের শেষ কথাটা—বলেছিলে বিশ্বাস করতে, বলেছিলে আমার একান্ত প্রয়োজনে বন্ধু আপনি আসবে আমার দোর-গোড়ায়। ভাবলুম, এই ত আমার শেষ প্রয়োজন, আর প্রয়োজন হবে কবে? তাই লিখলুম তোমাকে চিঠি। সন্দেহ আসতে চায় মনে, জোর করে তাড়িয়ে দিয়ে বলি আসবেই বন্ধু। নইলে মিথ্যে হবে তার কথা, মিথ্যে হয়ে যাবে বৌদিদির শেষের আশীর্ব্বাদ। যে-বোঝা তিনি ফেলে গেলেন সে-বোঝা বইবো আমি কোন্ জোরে। বলিতে বলিতে দু'ফোঁটা অশ্রু আবার গড়াইয়া পড়িল।

বন্দনা কহিল, সবাই বলে তুমি অবাধ্য। একা বৌদির ছাড়া আর কারো কথা শোননি।

দ্বিজদাস বলিল, এই তোমার ভয়? কিন্তু কেন-যে শুনিনি বৌদি বেঁচে থাকলে এঁর জবাব দিতেন। এই বলিয়া সে নিজের চোখ মুছিয়া ফেলিল।

বন্দনা চুপ করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত তাহার প্রতি চাহিয়া বলিল, জবাব পেয়েছি তোমার, আর আমার শঙ্কা নাই। এই বলিয়া সে দ্বিজদাসের হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া আবার কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বলিল কেবল তোমার চারপাশেই যে ভূমিকম্প হয়েচে তাই নয়, আমার মধ্যেও এমনি প্রবল ভূমিকম্প হয়ে গেছে। যা ভূমিসাৎ হবার তা ধূলোয় লুটিয়েচে, যা ভাঙবার নয়, টলবার নয়, সেই অটলকেই আজ ফিরে পেলুম। এবার যাই দাদার কাছে। যাবার দিনে আমাকে তিনি আশীর্ব্বাদ করে বলেছিলেন, বন্দনা, তোমার যে আপন, আমার আশীর্ব্বাদ যেন তাকেই একদিন তোমার হাতে এনে দেয়। সাধুর বাক্য আমি অবিশ্বাস করিনি, নিশ্চয় জেনেছিলুম এ-কথা তার সত্য হবেই। শুধু ভাবিনি, সে আশীর্ব্বাদ এমন দুঃখের ভেতর দিয়ে সেই আপন জনকে এনে দেবে। যাই, গিয়ে তাঁকে প্রণাম করিগে।

দ্বিজু, বন্দনা এসেচে, না? বলিয়া সাড়া দিয়া অন্নদা আসিয়া প্রবেশ করিল।

এসেচি অন্নুদি, বলিয়া বন্দনা ফিরিয়া চাহিল। অন্নদার গভীর শোকাচ্ছন্ন মুখের প্রতি চাহিয়া বন্দনা চমকিয়া উঠিল, কাছে গিয়া তাহার বুকের উপর মাথা রাখিয়া অস্ফুটে কহিল, তোমার ও-মূর্ত্তি আমি ভাবতেও পারিনি অন্নুদি, তার পরেই হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। অন্নদার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। ধীরে ধীরে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার পিঠের উপর হাত বুলাইয়া মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল, হঠাৎ আর চলে যেও না দিদি, দিনকতক থাকো। আর তোমাকে কি বলবো আমি।

বন্দনা কথা কহিল না, বুকের উপর তেমনি মুখ লুকাইয়া মাথা নাড়িয়া শুধু সায় দিল। এমনিভাবে আবার বহুক্ষণ গেল। তার পরে মুখ তুলিয়া আঁচলে চোখ মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাসু কোথায় অন্নুদি?

চাকরেরা তাকে পুকুরে স্নান করাতে নিয়ে গেছে।

তাকে রেঁধে দেয় কে?

অন্নদা কহিল, দ্বিজু। ওরা দুজনে একসঙ্গে শোয়। বলিতে বলিতে আবার তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল, মুছিয়া কহিল, মা তো শুধু বাসুর মরেনি, ওরও মরেছে। আবার চোখ মুছিয়া বলিল, সবাই বলে অকালে অসময়ে বাড়ির বৌ মরেছে, ছেলেমানুষের শ্রাদ্ধে এত ঘটা কেন? ওকে সবাই করে মানা—বাহুল্য দেখে তাদের গা যায় জ্বলে, ভাবে এযে বাড়াবাড়ি! জানে না ত সে ছিল ওর আর এক জন্মের মা। কোন ছলে সে মর্য্যাদায় ঘা লাগলে ওর সইবে কি করে?

দ্বিজদাস বন্দনাকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া কহিল, আর ভয় নেই অন্নুদি, বন্দনা এসেচেন, এবার সমস্ত বোঝা ওর মাথায় ফেলে দিয়ে আমি আড়াল হয়ে যাবো।

অন্নদা বলিল, পরের মেয়ে এত বোঝা বইবে কেন ভাই?

পরের মেয়েরাই ত বোঝা বয় অন্নুদি। ওঁকে ডেকে এনে বলেচি, এত দুঃখের ভার বইতে আমি পারবো না, এর ওপর বাসু যদি যায় তো রইলো তোমাদের বলরামপুরের মুখুয্যে-বাড়ি, রইলো তাদের সাতপুরুষের অভিমান,—শশধরের ছেলেদের ডেকে এনে সংসারে আমি ইস্তফা দেবো। দাদাই শুধু পারে তাই নয়, দ্বিজুও পারে। সন্ন্যাস নিতে পারবো না বটে, ও আমি বুঝিনে—কিন্তু টাকাকড়ির বোঝা অনায়াসে ফেলে দিয়ে যাবো।

অন্নদা বন্দনার হাত দুটি ধরিয়া কহিল, পারবে না দিদি বিপিনের মত করতে? পারবে না বাসুকে বাড়িতে রাখতে?

পারবো অন্নুদি।

আর এই যে বাবুদের সর্ব্বনেশে মামলা জামাইবাবুর সঙ্গে, পারবে না থামাতে?

হাঁ, এ-ও পারবো অন্নুদি। ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, উনি কোনদিন আমার অবাধ্য হবেন না, এই সর্ত্তেই এ বাড়ির ছোটবৌ হতে রাজি হয়েচি অন্নুদি।

কথাটা অন্নদা ভাল বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। বন্দনা বলিল, যা গেছে সে তো গেছেই। এর উপর কি মাকেও হারাতে হবে? মকদ্দমা না থামলে তাঁকে ফিরিয়ে আনবো আমি কি করে?

দ্বিজদাস বালিসের তলা হইতে চাবির গোছাটা বাহির করিয়া বন্দনার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া কহিল, এই নাও। অবাধ্য হবো না সেই সর্ত্তই তোমার কাছে আজ করলুম।

বন্দনা চাবির গুচ্ছ আঁচলে বাঁধিল।

এইবার অন্নদা ইহার তাৎপর্য্য বুঝিল। বন্দনাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া স্থির হইয়া রহিল, তাহার দুই চোখ বহিয়া শুধু বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

বন্দনা বিপ্রদাসের ঘরে ঢুকিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। বলিল, বড়দা, এলুম।

এই নূতন সম্বোধন বিপ্রদাসের কানে ঠেকিল। কিন্তু এ লইয়া কিছু না বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, শুনেছিলুম তুমি আসচো, তোমার বাবার তার পাওয়া গিয়েছিল পথে কষ্ট হয়নি ত?

না।

সঙ্গে কে এল?

আমাদের দরওয়ান আর আমার বুড়ো চাকর হিমু।

বাবা ভাল আছেন?

হাঁ।

বিপ্রদাস একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, দ্বিজু কি পাগলামি করচে দেখলে।

বন্দনা কহিল, আপনি শ্রাদ্ধের কথা বলচেন ত? কিন্তু পাগলামি হবে কেন? আয়োজন এত বড়ই ত চাই। এ নইলে তাঁর মর্য্যাদা ক্ষুন্ন হ'তো যে!

কিন্তু সামলাতে পারবে কেন বন্দনা?

উনি না পারলেও আমি পারবো বড়দা।

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিলেন, সে শক্তি তোমার আছে মানি, কিন্তু মেজাজ বিগড়োলেই মুস্কিল। হঠাৎ রাগ করে চলে না গেলে বাঁচি।

বন্দনা বলিল, সেদিন এসেছিলুম পরের মত, মাথায় কোন ভার ছিল না। কিন্তু আজ এসেচি এ-বাড়ির ছোট-বউ হয়ে। রাগিয়ে দিলে রাগ করতেও পারি, কিন্তু আর চলে যাবো কেমন করে? সে পথ বন্ধ হয়ে গেল যে! এই বলিয়া সে চাবির

গোছা দেখাইয়া কহিল, এই দেখুন এ-বাড়ির সর্ব আলমারী-সিন্দুকের চাবি। আপনি তুলে নিয়ে আঁচলে বেঁধেছি।

আনন্দ ও বিস্ময়ে বিপ্রদাস নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলেন। বন্দনা বলিতে লাগিল, আপনাকে আমার লজ্জা করে বলবার, গোপন করে বলবার কিছু নেই। ভগবানের কাছে যেমন মানুষের নেই লুকোবার কিছু ঠিক তেমনি। মনে পড়ে কি আপনার আশীর্ব্বাদ? যাবার দিনে আমাকে বলেছিলেন, যে তোমার যথার্থ আপন তাকেই তুমি পাবে একদিন। সেদিন থেকে গেছে আমার চঞ্চলতা, শান্তমনে কেবল এই কথাই ভেবেচি, যিনি জিতেন্দ্র, যিনি আজন্ম-শুদ্ধ সত্যবাদী সাধু, তাঁর আশীর্ব্বাদে আর আমার ভয় নেই। যিনি আমার স্বামী তাঁকে আমি পাবোই। দুই চক্ষু তাহার অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

বিপ্রদাস কাছে আসিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিয়া নীরবে আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং আজ এই প্রথম দিন বন্দনা তাঁহার পায়ের উপর বহুক্ষণ মাথা পাতিয়া নমস্কার করিল। উঠিয়া দাঁড়াইলে বিপ্রদাস কহিলেন, আজ যাকে তুমি পেলে বন্দনা, তার চেয়ে দুর্লভ ধন আর নেই। এ কথাটা আমার চিরদিন মনে রেখো।

বন্দনা কহিল, রাখবো বড়দা। একদিনও ভুলবো না।

একটু থামিয়া কহিল, একদিন অসুখে আপনার সেবা করেছিলুম পুরস্কার দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন নিইনি,—মনে পড়ে সে কথা?

পড়ে।

আজ সেই পুরস্কার চাই। বাসুকে আমি নিলুম।

বিপ্রদাস হাসিমুখে বলিলেন, নাও।

তাকে শেখাবো আমাকে মা বলে ডাকতে।

তাই করো। ওর মা এবং বাপ দু'জনকেই আজ রেখে গেলাম তোমার মধ্যে। আর রেখে গেলাম এই মুখুয্যে-বাড়ির বৃহৎ মর্য্যাদাকে তোমার হাতে।

বন্দনা ক্ষণকাল মাথা হেঁট করিয়া এই ভার যেন নীরবে গ্রহণ করিল, তার পরে কহিল, আর একটি প্রার্থনা। নিজেকে চিনতে না পেরে একদিন আপনার কাছে অপরাধ করেছিলুম। ভুল ভেঙেচে, আজ তার মার্জ্জনা চাই।

মার্জ্জনা অনেকদিন করেচি বন্দনা। আমি জানতাম তোমার অন্তর যাকে একান্ত-মনে চেয়েচে একদিন তাকে তুমি চিনবেই। তাই আমার কাছে তোমার কোন লজ্জা নেই।

বন্দনার চোখে আবার জল আসিতেছিল, জোর করিয়া নিবারণ করিয়া বলিল, আরও একটি ভিক্ষে। আমাদের সংসারে কি একদিনও থাকবেন না আর? অভিমানে সঙ্কোচে কোনদিন মন পূর্ণ করে আপনাকে যত্ন করতে পাইনি, কিন্তু সে

বাধা ত ঘুচলো ; আর ত আমার লজ্জা নেই—কিছুদিন থাকুন না আমার কাছে? দু'দিন পুজো করি। এই বলিয়া সজল চক্ষে চাহিয়া রহিল—তাহার আকুল কণ্ঠস্বর যেন অন্তর ভেদ করিয়া বাহিরে আসিল।

বিপ্রদাস হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিলেন।

বন্দনা বলিল, এই হাসিমুখের মৌনতাকেই আমি সবচেয়ে ভয় করি 'বড়দা। কি কঠোর আপনার মন, একে না পারা যায় গলাতে, না পারা যায় টলাতে। দেবেন না উত্তর?

বিপ্রদাস এবার হাসিয়া ফেলিলেন। যেমন স্নিগ্ধ, তেমনি সুন্দর, তেমনি নির্ম্মল। তাঁহাকে এমন করিয়া হাসিতে বন্দনা যেন এই প্রথম দেখিল। বলিল, উত্তর পেলুম, আর আপনাকে আমি পীড়াপীড়ি করব না। কিন্তু মনকে শান্ত করি কি করে বলে দিন। এ যে কেবলি কেঁদে উঠতে চায়।

বিপ্রদাস বলিলেন, মন আপনি শান্ত হবে বন্দনা, যেদিন নিঃসংশয়ে বুঝবে তোমার দাদা দুঃখের মাঝে ঝাঁপ দিতে গৃহত্যাগ করেনি। কিন্তু তার আগে নয়।

কিন্তু এ আমি বুঝবো কেমন ক'রে?

শুধু আমাকে বিশ্বাস করে। জানো ত দিদি, আমি মিছে কথা বলিনে।

বন্দনা চুপ করিয়া রহিল। মিনিট-দুই পর গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তাই হবে। আজ থেকে প্রাণপণে বোঝাবো নিজেকে, বড়দা সত্যি কথাই বলে গেছেন, সত্যবাদী তিনি, মিছে কথায় ভুলিয়ে চলে যাননি। যেখানে আছে মানুষের চরম শ্রেয়ঃ, সেই তীর্থেই তিনি যাত্রা করেছেন।

বিপ্রদাস কহিলেন, হাঁ। তোমার মনকে বুঝিয়ে বোলো যা সবচেয়ে সুন্দর সবচেয়ে সত্য, সবচেয়ে মধুর, বড়দা সেই পথের সন্ধানে বার হয়েছেন। তাঁকে বাধা দিতে নেই, তাঁকে ভ্রান্ত বলতে নেই, তাঁর তরে শোক করা অপরাধ।

বন্দনার চোখে আবার জল আসিয়া পড়িল, তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, তাই হবে, তাই হবে। এ-জীবনে আর যদি কখনো দেখা না পাই, তবু বলবো তিনি ভ্রান্ত ন'ন, তাঁর তরে শোক করা অপরাধ।

পর্দ্দার ফাঁক দিয়া মুখ বাড়াইয়া বিরাজ দত্ত বলিলেন, দিদি, একটা জরুরি কথা আছে, একবার আসতে হবে যে।

যাই বিরাজবাবু। বড়দা, আসি এখন, বলিয়া বন্দনা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সতীর শ্রাদ্ধের কাজ ঘটা করিয়া শেষ হইল। ভিক্ষুক কাঙালী সতীসাধ্বী জয়গান করিয়া গৃহে ফিরিল, সকলেই বলিল, মুখুয্যে-বাড়ির কাজ এমনি করেই হয়, এর ছোট-বড় নেই।

সকালে স্নান সারিয়া বন্দনা প্রণাম করিতে বিপ্রদাসের ঘরে ঢুকিয়া বিস্ময়ে থমকিয়া দাঁড়াইল—তাঁহার পাশে বসিয়া দয়াময়ী। ভোরের ট্রেনে বাড়ি ফিরিয়াছেন, এখনো কেহ জানে না। মায়ের মূর্ত্তি দেখিয়া বন্দনার বুকে আঘাত লাগিল। সোনার বর্ণ কালি হইয়াছে, মাথার ছোট ছোট চুলগুলি রুক্ষ, ধূলিমাখা, চোখ বসিয়াছে, কপালে রেখা পড়িয়াছে—দুঃখ-শোকের এমন ব্যথার ছবি বন্দনা কখনো দেখে নাই। তাহার মনে পড়িল সেদিনের সেই ঐশ্বর্য্যবতী সর্ব্বময়ীকর্ত্রী বিপ্রদাসের মাকে। ক'টা দিনই বা! আজ সমস্ত মহিমা যেন তাঁহার পথের ধূলায়। কাছে গিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, কখন এলেন মা, আমি জানতে পারিনি ত।

দয়াময়ী তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন, বলিলেন, আমার আসার খবর কিসের জন্যে বন্দনা? তখন আসতো বিপ্রদাসের মা, তাই দেশের ছেলে-বুড়ো সবাই টের পেতো। বিপিন, কাজ ত চুকে গেছে বাবা, চল্ না মায়ে-পোয়ে আজই বেরিয়ে পড়ি।

শুনিয়া বিপ্রদাস হাসিয়া কহিলেন, তোমার ভয় নেই মা, মায়ে-পোয়ে যাত্রার বিঘ্ন ঘটবে না, কিন্তু আজই হয় না। বন্দনার বাবা আসবেন কাল, তোমার ছোটবৌয়ের হাতে সংসার বুঝিয়ে না দিয়ে যাবে কেমন করে?

দয়াময়ী অনেকক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিলেন, তাই হোক বিপিন। সহ্য হবে না আমার, এমন মিথ্যে মুখে আর আনবো না। কিন্তু ক'টা দিন আর বাকি?

কেবল সাতটা দিন মা। আবার আজকের দিনেই আমরা যাত্রা শুরু করবো।

বন্দনা কহিল, মা বাড়ির ভেতরে আপনার ঘরে চলুন।

দয়াময়ী মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিলেন—তোমার এই কথাটি রাখতে পারবো না মা। যে ক'টা দিন থাকবো, এইখানেই থাকবো, আবার যাবার দিন এলে এই বাইরের ঘর থেকেই দু'জনে বার হয়ে যাবো। ভেতরে যা কিছু রইলো সে সব তোমার রইলো মা।

বন্দনা পীড়াপীড়ি করিল না, শুধু আবার একবার তাঁহার পদধূলি লইয়া নতমুখে বাহির হইয়া গেল।

বিপ্রদাসের পত্র পাইয়া রে-সাহেব এক সপ্তাহের ছুটি লইয়া বলরামপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মেয়েকে দ্বিজুর হাতে অর্পণ করিয়া আবার কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া গেলেন।

এ বিবাহে নহবৎ বাজিল না, বরযাত্রী-কন্যাযাত্রীর বিবাদ বাধিল না, মেয়েরা উলু দিল অস্ফুটে, শাঁক বাজিল চাপা সুরে,—বাসর-গৃহ রহিল স্তব্ধ, মৌন।

নিরালা কক্ষে দ্বিজদাসের বিষণ্ণ মুখের পানে চাহিয়া বন্দনা প্রশ্ন করিল, কি ভাবচো বল তো?

দ্বিজদাস বলিল, ভাবচি তোমার কথা, ভাবচি আমার চেয়ে তুমি অনেক বড়।

কেন?

নইলে পারতে না। সর্ব্বনাশ বাঁচাতে কি দুঃখের পথ হেঁটেই না তুমি আমার কাছে এলে।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, তুমি আসতে না?

না।

বন্দনা বলিল, মিছে কথা। কিন্তু আমি কি ভাবছিলুম জানো? তোমার গলায় মালা পরিয়ে দিতে দিতে ভাবছিলুম, আমি এমন-কি সুকৃতি করেছিলুম যাতে তোমার মত স্বামী পেলুম! পেলুম বাসুকে, মাকে, বড়দাদাকে। আর পেলুম এই বৃহৎ পরিবারের বিপুল ভার। কিন্তু যে সমাজের মেয়ে আমি, তার প্রাপ্য কতটুকু জানো?

দ্বিজদাস কহিল, না।

বন্দনা বলিতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। কহিল, কিন্তু আজ নয়। নিজের পরম সৌভাগের দিনে অন্যের দৈন্যকে কটাক্ষ করবো না। অপরাধ হবে।

হবে না, তুমি বলো।

বন্দনা মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিল, কহিল আজ তুমি ক্লান্ত, একটু ঘুমোও, তোমার মাথায় আমি হাত বুলিয়ে দিই।

মিনিট-দুই পরে বলিল, আমার মেজদির কথা মনে পড়ে? সেদিন বড়দার সঙ্গে তখনি চলে যেতে চাইলেন দেখে বললুম, তুমি ত ঝগড়া করোনি মেজদি, তুমি কেন যাবে? মেজদি বললেন, যেখানে স্বামীর স্থান হয় না, সেখানে স্ত্রীরও না। একটা দিনের জন্যেও না। তোর স্বামী থাকলে একথা বুঝতিস। সেদিন হয়ত ঠিক এ-কথা বুঝিনি, কিন্তু আজ বুঝচি তুমি না থাকলে আমি একটা দিনও সেখানে থাকতে পারিনে।

একটু থামিয়া বলিল, এই ত ঘণ্টা-কয়েক আগে পুরুতের সঙ্গে গোটা কয়েক শব্দ উচ্চারণ করে গেলুম, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন আমার দেহের প্রতি রক্তকণাটি পর্য্যন্ত বদলে গেচে।

দ্বিজদাস চোখ মেলিয়া তাহার মুখের পানে চাহিল। তাহার হাতখানি নিজের বুকের উপর টানিয়া লইয়া আবার চোখ বুজিল। কোন কথা কহিল না।

রবিবার ঘুরিয়া আসিল। বিপ্রদাস ও দয়াময়ীর যাবার দিন আজ। তীর্থভ্রমণ দয়াময়ীর একদিন সমাপ্ত হইবে; সেদিন সংসারের আকর্ষণ হয়ত এই গৃহেই আবার তাহাকে টানিয়া আনিবে, কিন্তু যাত্রা শেষ হইবে না আর বিপ্রদাসের, আর ফিরাইয়া আনিবে না তাঁহাকে এ-গৃহে। এ-কথা শুনিয়াছে অনেকে। কেহ বিশ্বাস করিয়াছে, কেহ করে নাই।

প্রাঙ্গণে মোটর দাঁড়াইয়া। কাছে-দূরে বাটীর সকলেই উপস্থিত। মেয়েরা দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতেছে, বিপ্রদাস উঠিতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দ্বিজুকে দেখচিনে কেন?

কে একজন বলিল, তিনি বাড়ি নেই, কি-একটা কাজে বাইরে গেছেন শুনিয়া, বিপ্রদাস হাসিয়া বলিলেন, পালিয়েচে। সেটা শুধু মুখেই গোঁয়ার, নইলে ভীতুর অগ্রগণ্য।

বন্দনার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল বাসু। বলিল, তুমি কবে আবার আসবে বাবা? একটু শীগ্‌গির করে এসো।

বিপ্রদাস হাসিয়া তাহার মাথায় একবার হাত বুলাইয়া দিলেন, এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না।

বন্দনা শাশুড়ীর পায়ের ধূলা লইল। তিনি বলিলেন, বাসু রইলো ছোট বৌমা, আর রইলেন মন্দিরে তোমার শ্বশুরকুলের রাধাগোবিন্দজী। ফিরে কখনো এলে তোমার কাছ থেকে এঁদের নেবো। এই বলিয়া তিনি আঁচলে চোখ মুছিলেন।

বন্দনা দূর হইতে বিপ্রদাসকে প্রণাম করিল। তারপরে কাছে আসিয়া সজল-চক্ষে বাষ্পরুদ্ধ স্বরে কহিল, কলকাতায় পুজোর ঘরে যে-মূর্ত্তি একদিন আপনার লুকিয়ে দেখেছিলুম, আজ আবার সেই মূর্ত্তিই আমার চোখে পড়লো বড়দা। আর আমার শোক নেই, ঠিকানা আপনার নাইবা পেলুম, জানি মনের মধ্যে যেদিন ডাক দেবো আসতেই হবে আপনাকে। যতই না না বলুন, এ-কথা কোনমতেই মিথ্যে হবে না।

বিপ্রদাস শুধু একটু হাসিলেন। যেমন করিয়া ছেলের উত্তর এড়াইয়া গেলেন, তেমনি করিয়া বন্দনারও।

গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

রমা

রমা

(পল্লী-সমাজ)

নাট্যোল্লিখিত চরিত্র

পুরুষ

বেণী ঘোষাল ... জমিদার

রমেশ ঘোষাল ... ঐ খুল্লতাত-পুত্র

মধু পাল — মুদী

বনমালী পাড়ুই — হেডমাস্টার

যতীন — যদুনাথ মুখুয্যের কনিষ্ঠ পুত্র, রমার ভাই

গোবিন্দ গাঙুলী
ধর্ম্মদাস চাটুয্যে
ভৈরব আচার্য্য
দীননাথ ভট্টাচার্য্য
ষষ্ঠীচরণ
পরান হালদার
—গ্রামবাসিগণ

ভজুয়া — রমেশের হিন্দুস্থানী দরোয়ান

গোপাল সরকার — ঐ সরকার

দীনু ভট্টাচার্য্যের ছেলে মেয়েরা, ভৃত্য, অন্যান্য প্রতিবাসিগণ, বাঁড়ুয্যে, নাপিত, যাত্রী, কর্ম্মচারী, ভিখারিগণ, কুলদা, কৃষকগণ, আকবর, গহর, ওস্মান, বৈষ্ণব, সরকার, সনাতন হাজরা, জগন্নাথ, নরোত্তম, দরোয়ান, ইত্যাদি।

স্ত্রী

বিশ্বেশ্বরী — বেণীর মা

রমা — যদু মুখুয্যের কন্যা

রমার মাসি, সুকুমারী, খান্ত, ক্ষেঁদী, নন্দার মা, ভিখারিণীগণ, বৈষ্ণবী, লক্ষ্মী, ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[৺ যদুনাথ মুখুয্যে মহাশয়ের বাটীর পিছনের দিক। খিড়কীর দ্বার খোলা, সম্মুখে অপ্রশস্ত পথ। চারিদিকে আম-কাঁঠালের বাগান। এবং অদূরে পুষ্করিণীর বাঁধানো ঘাটের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। সকাল বেলায় রমা ও তাহার মাসী স্নানের জন্য বাহির হইয়া আসিল এবং ঠিক সেই সময়েই বেণী ঘোষাল আর একদিক দিয়া প্রবেশ করিল। রমার বয়স বাইশ-তেইশের বেশি নয়। অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল বলিয়া হাতে কয়েকগাছি চুড়ি ছিল, এবং থানের পরিবর্ত্তে সরু পাড়ের কাপড় পরিত। বেণীর বয়সও পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের অধিক হইবে না]

বেণী। তোমার কাছেই যাচ্ছিলেম রমা।

মাসী। তা খিড়কীর দোর দিয়ে কেন বাছা ?

রমা। তোমার এক কথা মাসী। বড়দা ঘরের লোক, ওঁর আবার সদর-খিড়কী কি ? কিছু দরকার আছে বুঝি ? তা ভেতরে গিয়ে একটু বসুন না, আমি চট্ করে ডুবটা দিয়া আসি।

বেণী। বসবার যো নেই দিদি, ঢের কাজ। কিন্তু কি করবে স্থির করলে ?

রমা। কিসের বড়দা ?

বেণী। আমার ছোটখুড়োর শ্রাদ্ধের কথাটা বোন। রমেশ ত কাল এসে পৌঁছেচে। বাপের শ্রাদ্ধ নাকি খুব ঘটা করেই করবে। যাবে নাকি ?

রমা। আমি যাবো তারিণী ঘোষালের বাড়ি !

বেণী। সে ত জানি দিদি, আর যেই কেন যাক, তোরা কিছুতেই সে বাড়িতে পা দিবিনে ! তবে শুনতে পেলাম ছোঁড়া নিজে গিয়ে সমস্ত বাড়ি বলে আসবে। বজ্জাতি বুদ্ধিতে সে তার বাপের ওপরে যায়। যদি সত্যিই আসে কি বলবে ?

রমা। আমি কিছুই বলবো না বড়দা;—বাইরের দরওয়ান তার জবাব দেবে।

মাসী। দরওয়ান কেন লা, আমি বলতে জানিনে ? নচ্ছার ব্যাটাকে এমনি বলাই বোলব যে, বাছাধন জন্মে কখনো আর মুখুয্যেবাড়িতে মাথা গলাবে না। তারিণী ঘোষালের ছেলে ঢুকবে নেমতন্ন করতে আমার বাড়িতে। আমি কিছুই ভুলিনি বেণীমাধব। তারিণী এই ছেলের সঙ্গেই আমার রমার বিয়ে দিতে চেয়েছিল।

তখনো ত যতীন জন্মায়নি, ভেবেছিলো যদু মুখুয্যের সমস্ত বিষয়টা তা হলে মুঠোর মধ্যে আসবে। বুঝলে না বাবা বেণী!

বেণী। বুঝি বই কি মাসী, সব বুঝি।

মাসী। বুঝবে বই কি বাবা, এ ত পড়েই রয়েছে। আর তা যখন হ'ল না তখন ঐ ভৈরব আচায্যিকে দিয়ে কি জপ-তপ, তুক-তাক্ করিয়ে মায়ের কপালে আমার এমনি আগুন জ্বেলে দিলে যে, ছ'মাস পেরুল না বাছার হাতের নোয়া মাথার সিঁদুর ঘুচে গেল। ছোট জাত হয়ে চায় কি না যদু মুখুয্যের মেয়েকে বৌ করতে। তেমনি হারামজাদার মরণও হয়েচে! সদরে গেল মকর্দ্দমা করতে আর ঘরে ফিরতে হ'ল না। এক ব্যাটা, তার হাতের আগুনটুকু পর্য্যন্ত পেলে না। ছোট জাতের মুখে আগুন!

রমা। কেন মাসী, তুমি লোকের জাত তুলে কথা কও? তারিণী ঘোষাল বড়দারই ত আপনার খুড়ো। বামুন মানুষকে ছোট জাত বল কি করে? তোমার মুখে যেন কিছু বাধে না।

বেণী। (সলজ্জে) না রমা, মাসী সত্যি কথাই বলেচেন। তুমি বড় কুলীনের মেয়ে, তোমাকে কি আমরা ঘরে আনতে পারি বোন? ছোটখুড়োর এ-কথা মুখে আনাই বেয়াদপি। আর তুক-তাকের কথা যদি বল ত সে সত্যি। দুনিয়ায় ছোট-খুড়ো আর ভৈরবের অসাধ্য কাজ কিছু নেই। রমেশ আসতে না আসতেই ঐ ব্যাটাই ত জুটে গিয়ে হয়েচে তার মুরুব্বি।

মাসী। সে ত জানা কথা বেণী। ছোঁড়া বছর দশ-বারো ত দেশে আসেনি;—সেই যে মামারা এসে কাশী না কোথায় নিয়ে গেল আর কখনো এ-মুখো হতে দিলে না। এতকাল ছিল কোথায়? করছিল কি?

বেণী। কি করে জানবো মাসী। ছোটখুড়োর সঙ্গে তোমাদেরও যে ভাব আমাদেরও তাই। শুনচি, এতদিন বোম্বাই না কোথায় ছিল। কেউ বলচে ডাক্তারি পাস করেচে, কেউ বলচে উকিল হয়েচে,—আবার কেউ বলচে সব ফাঁকি। ছোঁড়া নাকি পাঁড় মাতাল। যখন বাড়ি এসে পোঁছল, তখন চোখ দুটো ছিল নাকি জবাফুলের মত রাঙা।

মাসী। বটে! তা হলে ত তাকে বাড়ি ঢুকতে দেয়াই যায় না।

বেণী। কিছুতে না। হাঁ রমা, তোমার রমেশকে মনে পড়ে?

রমা। (সলজ্জে মৃদু হাসিয়া) এ ত সেদিনের কথা বড়দা। তিনি আমার চেয়ে বছর-চারেকের বড়। এক পাঠশালায় পড়েচি, একসঙ্গে খেলা করেচি, ওঁদের বাড়িতেই ত থাকতাম। খুড়িমা আমাকে মেয়ের মত ভালবাসতেন।

মাসী। তার ভালবাসার মুখে আগুন। ভালবাসা ছিল কেবল কাজ হাঁসিল

করবার জন্যে। তাদের ফন্দিই ছিল কোনমতে তোকে হাত করা। কম ধড়িবাজ ছিল রমেশের মা!

বেণী। তাতে আর সন্দেহ কি। ছোটখুড়িও যে—

রমা। দেখো মাসী, তোমাদের আর যা ইচ্ছে বল, কিন্তু খুড়িমা আমার স্বর্গে গেছেন, তাঁর নিন্দে আমি কারও মুখ থেকে সইতে পারবো না।

মাসী। বলিস্ কি লো? একেবারে এতো?

বেণী। তা বটে, তা বটে। ছোটখুড়ি ভাল-মানুষের মেয়ে ছিলেন। তাঁর কথা উঠলে মা আজও চোখের জল ফেলেন! তা সে যাক, এই ত স্থির রইল দিদি, নড়-চড় হবে না ত?

রমা। (হাসিয়া) না। বড়দা, বাবা বলতেন আগুনের শেষ, ঋণের শেষ, আর শত্রুর শেষ কখনো রাখিস্‌নে রমা। তারিণী ঘোষাল জ্যান্তে, আমাদের কম জ্বালা দেয়নি,—বাবাকে পর্য্যন্ত জেলে দিতে গিয়েছিল। আমি কিছুই ভুলিনি বড়দা, যতদিন বেঁচে থাকবো ভুলবো না। রমেশ সেই শত্রুরই ছেলে। আমরা ত নয়ই— আমাদের সংস্রবে যারা আছে তাদের পর্য্যন্ত যেতে দেব না।

বেণী। এই ত চাই। এই তো তোমার যোগ্য কথা।

রমা। আচ্ছা বড়দা, এমন করা যায় না যে কোন ব্রাহ্মণ না তার বাড়ি যায়? তা হলে—

বেণী। আরে, সেই চেষ্টাই ত করচি বোন। তুই শুধু আমার সহায় থাকিস্, আর আমি কোন চিন্তা করিনে। রমেশকে এই কুঁয়াপুর থেকে না তাড়াতে পারি ত আমার নামই বেণী ঘোষাল নয়। তারপরে রইলাম আমি আর ঐ আচায্যি ব্যাটা। ছোটখুড়ো আর বেঁচে নেই, দেখি তাকে কে রক্ষা করে।

রমা। (হাসিয়া) রক্ষে করবেন বোধ করি রমেশ ঘোষাল। কিন্তু আমি বলে রাখলেন বড়দা, আমাদের শত্রুতা করতে ইনিও কম করবেন না।

বেণী। (এদিক-ওদিক চাহিয়া এবং কণ্ঠস্বর আরও মৃদু করিয়া) রমা, আসলে কথা হচ্চে বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপার সে আজও কিছুই বোঝে না। বাঁশ নুইয়ে ফেলতে চাও ত এই সময়। পেকে উঠলে আর হবে না তা তোমাকে নিশ্চয় বলে দিচ্চি। দিন-রাত মনে রাখতে হবে এ তারিণী ঘোষালের ছেলে, আর কেউ নয়। চেপে বসলে আর—

[অন্তরাল হইতে গম্ভীর কণ্ঠের ডাক আসিল,—"রাণী কই রে?"
রমা চকিত হইয়া উঠিল। এবং পরক্ষণেই দ্বারের ভিতর দিয়া রমেশ
প্রবেশ করিল। তাহার রুক্ষ মাথা, খালি পা, উত্তরীয়টা মাথায়
জড়ান। বেণীর প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই—]

রমেশ। এই যে বড়দা এখানে! বেশ, চলুন। আপনি নইলে করবে কে? সারা গাঁ আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্চি। রাণী কৈ? বাড়ির মধ্যে দেখি কেউ নেই। ঝি বললে এই দিক গেছে—

[রমা নতমুখে দাঁড়াইয়াছিল, সহসা তাহাকে পাইয়া]

রমেশ। আরে এই যে! ইস! কত বড় হয়েচো! ভালো আছো তো? আমাকে চিনতে পারচো না বুঝি? আমি তোমাদের রমেশদা।

রমা। (মুখ তুলিয়া চাহিল না, কিন্তু অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল) আপনি ভাল আছেন?

রমেশ। হাঁ আমি ভাল আছি। কিন্তু আমাকে 'আপনি' কেন রাণী? বেণীর দিকে চাহিয়া) রমার একটি কথা আমি কোনদিন ভুলতে পারিনি বড়দা। মা যখন মারা গেলেন তখন ও ছোট, কিন্তু তখনি আমার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলেছিল, তুমি কেঁদো না রমেশদা, আমার মাকে আমরা দুজনে ভাগ করে নেব। তোমার বোধ হয় মনে পড়ে না না? আমার মাকে মনে পড়ে ত!

[রমা নিরুত্তর, লজ্জায় যেন তাহার মাথা আরও হেঁট হইয়া গেল]

রমেশ। কিন্তু আর তো সময় নেই ভাই। যা করবার করে দাও,—যাকে বলে একান্ত নিরাশ্রয় আমি তাই হয়েই আবার তোমাদের দোর-গোড়ায় ফিরে এসে দাঁড়িয়েচি। তোমরা না গেলে এতটুকু ব্যবস্থা পর্য্যন্ত হয়ত হবে না।

মাসী। (কাছে আসিয়া রমেশের মুখের দিকে চাহিয়া) তুমি বাপু তারিণী ঘোষালের ছেলে না?

[রমেশ নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল]

মাসী। আগে ত দেখনি, চিনতে পার না বাছা,—আমি রমার আপনার মাসী! কিন্তু এমন বেহায়া পুরুষমানুষ তোমার মত আর দেখিনি। যেমন বাপ তেমনিই কি ব্যাটা! বলা নেই কহা নেই, একটা গেরস্তর বাড়ির খিড়কীতে ঢুকে উৎপাত করতে সরম হয় না তোমার?

রমা। কি বকৃচো মাসী, নাইতে যাও না।

[বেণীর নিঃশব্দে প্রস্থান]

মাসী। নে রমা বকিসনে। যে কাজ করতেই হবে তাতে তোদের মত আমার চক্ষুলজ্জা হয় না। বলি, বেণীর অমন কোরে পালানোর কি দরকার ছিল? বলে গেলেই ত হোত, আমরা বাপু তোমার গোমস্তাও নই, খাস-তালুকের প্রজাও নই যে, তোমার কর্ম্মবাড়িতে জল তুলতে ময়দা মাখতে যাবো। তারিণী মরেচে লোকের হাড় জুড়িয়েছে। একথাটা বলার বরাত আমাদের

মত দুজন মেয়েমানুষের ওপর না দিয়ে নিজে বলে গেলেই ত পুরুষের মত কাজ হোতো?

[রমেশ নির্ব্বাক পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল]

মাসী। যাই হোক, বামুনের ছেলেকে আমি চাকর-বাকর দিয়ে অপমান করতে চাইনে, একটু হুঁস করে কাজ কোরো। কচি খোকাটি নও যে লোকের বাড়িতে ঢুকে আবদার করে বেড়াবে। রাণী কি? রাণী ওর নাম নাকি? তোমার বাড়িতে আমার রমা কখনো পা ধুতে যেতে পারবে না। এই তোমাকে আমি বলে দিলাম।

রমেশ। তোমাকে মা বলতেন রাণী, ছেলেবেলার সেই ডাকটাই মনে ছিল রমা। আমি জানতাম না যে, আমাদের বাড়িতে তুমি যেতেই পারো না। না জেনে যে উপদ্রব করে গেলাম সে জন্য আমাকে তুমি ক্ষমা ক'রো রমা।

[রমেশের প্রস্থান ও বেণীর আবির্ভাব]

বেণী। (তাহার সমস্ত মুখ খুশীতে ভরিয়া গিয়াছে) হাঁ, শোনালে বটে মাসী। আমাদের সাধ্যিই ছিল না অমন করে বলা। এ কি চাকর-বাকরদের কাজ রমা? আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখলাম কি-না, ছোঁড়া মুখখানা যেন আষাঢ়ের মেঘের মত করে বেরিয়ে গেল। এই ত ঠিক হ'ল।

মাসী। হ'ল ত জানি, কিন্তু মেয়েমানুষের ওপর ভার না দিয়ে, না সরে গিয়ে নিজে বললেই তো আরো ভাল হোত। আর নাই যদি বলতে পারতে, আমি কি বলতাম দাঁড়িয়ে থেকে শুনে গেলে না কেন বাছা?

রমা। দুঃখ কোরো না মাসী, উনি না শুনুন আমরা শুনেছি। যে যতই বলুক না কেন, এতখানি বিষ জিভ দিয়ে ছড়াতে তোমার মত আর কেউ পেয়ে উঠত না।

মাসী। কি বললি লা?

রমা। কিছু না। বলি, রান্না-বান্না কি আজ হবে না? যাও না, ডুবটা দিয়ো এসো না।

[পুষ্করিণীর উদ্দেশে রমার দ্রুতপদে প্রস্থান]

বেণী। ব্যাপার কি মাসী?

মাসী। কি করে জানবো বাছা? ও রাজা-রাণীর মেজাজ বোঝা কি আমাদের মত দাসী-বাঁদীর কর্ম্ম।

[প্রস্থান]

[গোবিন্দ গাঙুলীর প্রবেশ]

গোবিন্দ। ভ্যালা যা হোক। সকাল থেকে সারা গাঁ-টা খুঁজে বেড়াচ্ছি

বেণীবাবু গেল কোথায়! বলি শুনেচ খবরটা? বাবাজী কাল ঘরে পা দিয়েই ছুটেছিলেন নন্দীদের ওখানে। এ যদি না দুদিনে উচ্ছন্ন যায় ত আমার গোবিন্দ গাঙুলী নাম তোমরা বদলে রেখো। নবাবী কাণ্ড-কারখানার ফর্দ শোন ত অবাক হয়ে যাবে। তারিণী ঘোষাল সিকি পয়সা রেখে মরেনি তা জানি, তবে এত কেন? হাতে থাকে কর, না থাকে বিষয় বন্ধক দিয়ে কে কবে ঘটা করে বাপের শ্রাদ্ধ করে তা ত কখনো শুনিনি বাবা। আমি তোমাকে নিশ্চয় বলচি বেণীমাধববাবু, এ ছোঁড়া নন্দীদের গদী থেকে অন্ততঃ পাঁচটি হাজার টাকা দেনা করেচে।

বেণী। বল কি! তা হলে কথাটা ত বার করে নিতে হচ্ছে গোবিন্দখুড়ো?

গোবিন্দ। (মৃদু হাস্য করিয়া) সবুর করো না বাবাজী, একবার ভাল করে ঢুকতেই দাও না। তার পরে নাড়ীর খবর ফেড়ে বার করে আনবো—তখন বুঝবে গোবিন্দ গাঙুলীকে। এর মধ্যে অনেক কথাই শুনতে পাবে বাবাজী, অনেক শালাই লাগিয়ে যাবে,—কিন্তু চেনো ত খুড়োকে? সেইটুকু মনে মনে বুঝো, এখন আর কিছু ফাঁস করচিনে।

বেণী। রমার কাছে গিয়েছিলাম।

গোবিন্দ। তা জানি। কি বলে সে?

বেণী। তারা ত নয়ই, তাদের সম্পর্কে যে যেখানে আছে তারা পর্য্যন্ত না।

গোবিন্দ। ব্যস! ব্যস! আর দেখতে হবে না।

বেণী। কিন্তু তোমরা যে—

গোবিন্দ। উতলা হও কেন বাবাজী, আগে ঢুকি। উদ্যোগ আয়োজনটা একটু ভাল করে করাই, তখন না,—ছাদ্দ-গড়ানো কাকে বলে একবার বাইরে দাঁড়িয়ে দেখো!

বেণী। তবে যে শুনি—

গোবিন্দ। অমন ঢের শুনবে বাবাজী, অনেক ব্যাটা এসে অনেক রকম করে লাগাবে। কিন্তু গোবিন্দখুড়োকে চেনো ত? ব্যস! ব্যস!

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[রমেশের বহির্ব্বাটী। চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দার একধারে ভৈরব আচার্য্য থান ফাড়িয়া কাপড় পাট করিয়া গাদা দিতেছে। চণ্ডী-মণ্ডপের অভ্যন্তরে বসিয়া গোবিন্দ গাঙুলী ধূমপান করিতেছে এবং আড়চোখে চাহিয়া বস্ত্ররাশির মনে মনে সংখ্যা-নিরূপণ করিতেছে। কর্ম্মবাড়ি। আসন্ন শ্রাদ্ধকৃত্যের বহুবিধ আয়োজন চারিদিকে বিক্ষিপ্ত। নানা লোক নানা কাজে ব্যস্ত। সময় অপরাহ্ণ।]

[রমেশের প্রবেশ]

রমেশ। (গোবিন্দ গাঙুলীর প্রতি সবিনয়ে) এই যে আপনি এসেচেন।

গোবিন্দ। আসবো বইকি বাবা, আসবো বইকি! এ যে আমার আপনার কাজ রমেশ।

[নেপথ্যে কাশির শব্দ। কাশিতে কাশিতে চারটি ছেলে-মেয়ে লইয়া ধর্ম্মদাস চাটুয্যের প্রবেশ। তাঁহার কাঁধের উপর মলিন উত্তরীয়, নাকের উপর এক জোড়া ভাঁটার মত মস্ত চশমা পিছনে দড়ি দিয়া বাঁধা। সাদা চুল, সাদা গোঁফ তামাকের ধুঁয়ায় তাম্রবর্ণ। অগ্রসর হইয়া রমেশের মুখের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া কোন কথা না কহিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। রমেশ চিনিল না ইনি কে। কিন্তু যেই হোন, ব্যস্ত হইয়া হাত ধরিতেই]

ধর্ম্মদাস। (কাঁদিয়া) না বাবা রমেশ, তারিণী যে এমন করে ফাঁকি দিয়ে পালাবে তা স্বপ্নেও জানিনে। কিন্তু আমারও এমন চাটুয্যে-বংশে জন্ম ন যে কারু ভয়ে মুখ দিয়ে মিথ্যে কথা বেরুবে। আসবার সময় তোমার আপন জাঠতুতো ভাই বেণী ঘোষালের মুখের উপর কি বলে এলাম জানো? বললাম, রমেশ যেমন শ্রাদ্ধের আয়োজন করেচে, এমন করা চুলোয় যাক, এ-অঞ্চলে কেউ চোখেও দেখেনি। আমার নামে অনেক শালা অনেক রকম তোমার কাছে লাগিয়ে যাবে বাবা, কিন্তু এটা নিশ্চয় জেনো, এই ধর্ম্মদাস শুধু ধর্ম্মেরই দাস, আর কারও নয়।

[এই বলিয়া গোবিন্দর হস্ত হইতে হুঁকোটা ছিনাইয়া লইয়া এক-টান্ দিয়াই প্রবল বেগে কাশিয়া ফেলিলেন]

রমেশ। না না, বলেন কি, বলেন কি—

[প্রত্যুত্তরে ধর্ম্মদাস ঘড়্ ঘড়্ করিয়া কত কি বলিলেন, কিন্তু কাশির ধমকে তাহার একটা বর্ণও বুঝা গেল না। গোবিন্দ সর্ব্বাগ্রে আসিয়াছিলেন, সুতরাং এই নবীন জমিদারটিকে ভাল ভাল কথা বলিবার সুযোগ তাঁহারই ছিল, অথচ নষ্ট হইতেছে বুঝিয়া তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলেন]

গোবিন্দ। কাল সকালে, বুঝলে ধর্ম্মদাসদা, এখানে আসবো বলে বেরিয়েও আসা হল না। বেণীর ডাকাডাকি—গোবিন্দখুড়ো, তামাক খেয়ে যাও। একবার ভাবলেম কাজ নেই,—তার পরে মনে হ'ল ভাবখানা বেণীর দেখেই যাইনে। বেণী কি বললে জানো বাবা রমেশ, বলে খুড়ো, তোমরা ত দেখচি হয়েচ রমেশের মুরুব্বি, বলি লোকজন খাবে-টাবে ত? আমিই বা ছাড়ি কেন, —তুমি বড়লোক আছো না-আছো, আমার রমেশও কারো চেয়ে খাটো নয়। তোমার ঘরে ত একমুঠো চিড়ের পিত্যেশ কারু নেই। বললাম, বেণীবাবু, এই ত পথ—দাঁড়িয়ে একবার কাঙ্গালী-বিদেয়ের ঘটাটা দেখো। কালকের ছেলে রমেশ, কিন্তু বুকের পাটা ত বলি একে। কিন্তু তাও বলি ধর্ম্মদাসদা, আমাদের সাধ্যই বা কি! যাঁর কাজ তিনিই ওপর থেকে করাচ্চেন। তারিণীদা শাপভ্রষ্ট দিকপাল ছিলেন বই ত নয়।

[ধর্ম্মদাসের কিছুতেই কাশি থামে না, আর তাহারই সম্মুখে গোবিন্দ বেশ বেশ কথাগুলি এই অপরিপক্ক তরুণ জমিদারটিকে বলিয়া যাইতেছে দেখিয়া আরও ভাল বলিবার চেষ্টায় ধর্ম্মদাস যেন আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিল]

গোবিন্দ। তুমি ত আমার পর নও বাবা, নিতান্ত আপনার। তোমার মা ছিলেন আমার সাক্ষাৎ পিসতুত বোনের আপনার খুড়তুতো ভগ্নী। রাধানগরের বাঁড়ুয্যে-বাড়ি,—সে সব-তারিণীদা জানতেন। তাই যে-কোন কাজ-কর্ম্মে—মামলা-মকর্দ্দমা করতে, সাক্ষী দিতে—ডাক গোবিন্দকে—

ধর্ম্মদাস। কেন বাজে বকিস্ গোবিন্দ? খক্ খক্ খক্—খ—আমি আজকের নই, না জানি কি? সে বছর সাক্ষী দেবার কথায় বললি, আমার জুতো নেই,খালি-পায়ে যাই কি করে? খক্ খক্—তারিণী অমনি আড়াই টাকা দিয়ে জুতো কিনে দিলে। তুই তাই পায়ে দিয়ে সাক্ষী দিয়ে এলি কি না বেণীর হয়ে! খক্-খক্ খক্—খ—

গোবিন্দ। (চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া) এলুম?

ধর্ম্মদাস। এলিনে?

গোবিন্দ। দূর মিথ্যেবাদী।

ধর্ম্মদাস। মিথ্যেবাদী তোর বাবা।

গোবিন্দ। (ভাঙা ছাতি লইয়া লাফাইয়া উঠিল) তবে রে শালা!

ধর্ম্মদাস। (বাঁশের লাঠি উঁচাইয়া) ও শালার আমি—খক্ খক্ খক্—খ—ও শালার আমি সম্পর্কে বড় ভাই হই কি না, তাই শালার আক্কেল দেখ। (কাশি)

গোবিন্দ। ওঃ—শালা আমার বড় ভাই!

[চারিদিকের লোক ছুটিয়া আসিল, ছেলে-মেয়েরা হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল, এবং রমেশ দ্রুতপদে তাহাদের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল]

রমেশ। এ কি এ! আপনারা উভয়েই প্রাচীন—ব্রাহ্মণ—এ কি কাণ্ড!

ভৈরব। (উঠিয়া আসিয়া রমেশের প্রতি) প্রায় শ'চারেক কাপড় ত হল, আরও চাই কি?

[রমেশ নিরুত্তর]

ভৈরব। ছিঃ গাঙুলীমশাই, বাবু একেবারে অবাক হয়ে গেছেন। আপনি কিছু মনে করবেন না বাবু, এমন ঢের হয়। বৃহৎ কাজ-কর্ম্মের বাড়িতে কত ঠ্যাঙা-ঠেঙি রক্তারক্তি পর্য্যন্ত হয়ে যায়—আবার যে কে সেই হয়। নিন চাটুয্যেমশাই, দেখুন দিকি আরও থান ফাড়বো কি না?

গোবিন্দ। হয়ই তো! হয়ই তো! ঢের হয়। নইলে বিরদ কর্ম্ম বলেচে কেন। সে বছর তোমার মনে আছে ভৈরব, যদু মুখুয্যেমশাইয়ের কন্যা রমার গাছ-পিতিষ্ঠের দিন সিধে নিয়ে, রাঘব ভট্চায্যে আর হারান চাটুয্যেতে মাথা ফাটাফাটি হয়ে গেল! কিন্তু আমি বলি ভৈরব ভায়া, বাবাজীর এ কাজটা ভাল হচ্চে না। ছোটলোকদের কাপড় দেওয়া আর ভস্মে ঘি ঢালা এক কথা। তার চেয়ে বামুনদের একজোড়া আর ছেলেদের একখানা করে দিলে নাম হোত। আমি বলি বাবাজী সেই যুক্তিই করুন। কি বল ধর্ম্মদাসদা?

ধর্ম্মদাস। গোবিন্দ মন্দ যুক্তি বলেনি বাবাজী। ওদের মিছে দেওয়া। নইলে আর শাস্তরে ব্যাটাদের ছোটলোক বলেচে কেন! বুঝলে না বাবা রমেশ?

রমেশ। হাঁ, বুঝেচি বই কি।

ভৈরব। তা হলে কি এই কাপড়েই হবে?

রমেশ। বোধ হয় হবে না। বলা যায় না কত কাঙ্গালী আসবে, আপনি বরঞ্চ আরও দু'শ কাপড় ঠিক করে রাখুন।

গোবিন্দ। তা নইলে কি হয়? তুমি একা আর কত পারবে ভায়া, চল আমিও যাই।

[বলিতে বলিতে গোবিন্দ বস্ত্ররাশির কাছে অগ্রসর হইয়া গেল, এবং উপবেশন করিয়া কাপড় গুছাইতে লাগিল। ধর্ম্মদাস এই অবকাশে

রমেশকে একধারে টানিয়া লইয়া গিয়া কানে কানে বলিতে লাগিল।
ওদিকে গোবিন্দ উদ্‌গ্রীব হইয়া আড়চোখে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।]

ধর্ম্মদাস। এ দেশ বড় খারাপ বাবা, ভাঁড়ার-টাঁড়ার কাউকে দিয়ে বিশ্বেস কোরো না। তেল, নুন, ঘি, ময়দা অর্দ্ধেক সরিয়ে ফেলবে। আমি এখুনি গিয়ে তোমার পিসিমাকে পাঠিয়ে দিচ্চি বাবা, একটি কুটো তোমার নষ্ট হবে না।

রমেশ। যে-আজ্ঞে—

[মুণ্ডিত-শ্মশ্রু শীর্ণকায় ও প্রাচীন দীননাথ ভট্টাচার্য্য প্রবেশ করিলেন।
ইঁহার সঙ্গেও দুই-তিনটি ছেলে-মেয়ে। মেয়েটি সকলের বড়, পরণে
একখানি শতচ্ছিন্ন ডুরে কাপড়]

দীননাথ। কৈ গো বাবাজী, কোথায় গো?

গোবিন্দ। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) এস দীনুদা, বোস। বড় ভাগ্যি আমাদের যে আজ তোমার পায়ের ধুলো পড়লো। ছেলেটা একা সারা হয়ে যায় তা তোমার ত—

[ধর্ম্মদাস কটু-মটু করিয়া তাহার প্রতি চাহিল]

গোবিন্দ। তা তোমরা ত কেউ এদিক মাড়াবে না দাদা।

দীনু। আমি ত ছিলাম না ভায়া, তোমার বৌঠাকরুণকে আনতে তাঁর বাপের বাড়ি গিয়েছিলাম। বাবাজী কোথায়? শুনচি নাকি ভারি আয়োজন হচ্ছে। পথে ও গাঁয়ের হাটে শুনে এলাম খাইয়ে দাইয়ে ছেলে-বুড়োর হাতে নাকি ষোল পাত লুচি আর চার জোড়া করে সন্দেশ দেওয়া হবে।

গোবিন্দ। (গলা খাটো করিয়া) তা ছাড়া হয়ত একখানা করে কাপড়ও—

[রমেশের প্রবেশ]

দীনুদা, এই আমার রমেশ। তা তোমাদের পাঁচজনের বাপ-মায়ের আশীর্ব্বাদে যোগাড়-সোগাড় ত এক রকম করচি, কিন্তু বেণী একেবারে উঠে-পড়ে লেগেচে। এই আমার কাছেই দু'বার লোক পাঠিয়েচে। তা আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলে, রমেশের সঙ্গে আমার নাড়ীর টান রয়েচে, কিন্তু এই যে দীনুদা, ধর্ম্মদাসদা এঁরাই কি বাবা তোমাকে ফেলতে পারবেন? দীনুদা ত পথ থেকে শুনতে পেয়ে ছুটে আসছেন। ওরে, ও ষষ্ঠীচরণ, তামাক দে না রে! বাবা রমেশ, একবার এদিকে এসো দিকি, একটা কথা বলে নিই।

[ভৃত্য আসিয়া দীনুর হাতে হুঁকা দিয়া গেল এবং গোবিন্দ
রমেশকে আর একদিকে সরাইয়া লইয়া গিয়া চাপা গলায়]

গোবিন্দ। ভেতরে বুঝি ধর্ম্মদাস-গিন্নি আসচে? খবরদার বাবা, খবরদার— বিটলে বামুন যতই ফোসলাক, কখনো তার হাতে ভাঁড়ার-টাঁড়ার দিও না, মাগী

অর্দ্ধেক ফাঁক করে দেবে। বলি, তোমার ভাবনা কি বাবা? তোমার যে আপনার মামী রয়েচে আমি গিয়েই তাকে পাঠিয়ে দিচ্চি, নাড়ীর টানে সে যেমন করবে আর কি কেউ তেমন পারবে? না, কখনো পারে?

[শিশু দু'টা ছুটিয়া আসিয়া দীনুর কাঁধের উপর ঝুলিয়া পড়িল]

শিশুরা। বাবা সন্দেশ খাবো।

দীনু। (একবার রমেশ ও একবার গোবিন্দের প্রতি চাহিয়া) সন্দেশ কোথায় পাব রে? সন্দেশ কই?

[দীনুর মেয়ে অন্তরালে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া]

দীনুর মেয়ে। কেন, ঐ যে হচ্চে বাবা—

[বাকী ছেলেমেয়েরা নাকি কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া ধর্ম্মদাসকে ঘিরিয়া ধরিল]

ছেলেমেয়েরা। আঁমরাও দাঁদামশাই—

রমেশ। (অগ্রসর হইয়া) বেশ ত, বেশ ত, ও আচায্যিমশাই, বিকেলবেলায় ছেলেরা সব বাড়ি থেকে বেরিয়েচে, খেয়ে ত আসেনি। (অন্তরালবর্ত্তী ময়রার উদ্দেশ্যে) ওহে ও, কি নাম তোমার? নিয়ে এস ত ঐ থালাটা এদিকে। আচায্যি-মশাই, দেখুন ত যেন দেরি না হয়।

[ভৈরব আচার্য্য ভিতরে চলিয়া গেল এবং ক্ষণকাল পরেই ময়রা সন্দেশের থালা আনিতেই ছেলেরা উপুড় হইয়া পড়িল—বাঁটিয়া দিবার অবকাশ দেয় না এমনি ব্যস্ত করিয়া তুলিল। ছেলেদের খাওয়া দেখিতে দেখিতে দীননাথের শুষ্ক-দৃষ্টি সজল ও তীব্র হইয়া উঠিল]

দীনু। ওরে ও খেঁদি, খাচ্ছিস্ ত খুব, সন্দেশ হয়েছে কেমন বল্ দিকি?

খেঁদি। বেশ বাবা—

[এই বলিয়া সে চিবাইতে লাগিল]

দীনু। (মৃদু হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া) হাঁঃ—তোমাদের আবার পছন্দ। মিষ্টি হলেই হ'ল। হাঁ হে কারিকর, এ কড়াটা কেমন নাবালে? কি বল গোবিন্দ ভায়া, এখনো রোদ একটু আছে বলে মনে হচ্চে না?

ময়রা। আজ্ঞে, আছে বই কি। এখনো ঢের বেলা আছে, এখনো সন্ধ্যে-আহ্নিকের—

দীনু। তবে কই দাও দিকি গোবিন্দ-ভায়াকে একটা চেখে দেখুক, কেমন কলকাতার কারিগর তোমরা—

[ময়রা গোবিন্দ ও দীনু উভয়কেই সন্দেশ দিতে গেল]

দীনু। না না, আমাকে আবার কেন? তবে, আধখানা—আধখানার বেশি

নয়। (হুঁকা রাখিয়া দিয়া) ওরে ও ষষ্ঠীচরণ, একটু জল আন্ দিকি বাবা, হাতটা ধুয়ে ফেলি।

রমেশ। (ভিতরের দিকে চাহিয়া) ওরে, অমনি ভিতর থেকে গোটা চারেক রেকাবী নিয়ে আসিস্ ষষ্ঠী।

গোবিন্দ। সন্দেশের চেহারা দেখেই বোধ হচ্চে হয়েছে ভাল। কি হে, ময়রার পো, পাকটা একটু নরমই রাখলে বুঝি?

ময়রা। আজ্ঞে হাঁ, এ কড়াটা একটু নরমই রেখেচি!

গোবিন্দ। (হাস্য করিয়া) আমরা বুঝি কি-না। তাকালেই ধরে দিতে পারি কোন্‌টা কেমন।

ময়রা। আজ্ঞে, আপনারা বুঝবেন না ত বুঝবে কারা।

[ষষ্ঠীচরণ ও আর একজন ভৃত্য রেকাবী, জলের গ্লাস প্রভৃতি আনিয়া উপস্থিত করিল, ময়রা সন্দেশের থালাটা সম্মুখে আনিয়া রাখিল, এবং ব্রাহ্মণদিগের পাত্রে তুলিয়া দিতে লাগিল। কাহারও মুখে কথা নাই, ছেলে-মেয়েরা এবং ধর্ম্মদাস, গোবিন্দ ও দীনু গোগ্রাসে গিলিতেছে এবং দেখিতে দেখিতে সমস্ত থালাটাই নিঃশেষিত হইয়া গেল।]

দীনু। হাঁ, কলকাতার কারিকর বটে। কি বল ধর্ম্মদাসদা?

[ধর্ম্মদাসের কণ্ঠস্বর সন্দেশের তাল ভেদ করিয়া বেশ স্পষ্ট বাহির হইল না, কিন্তু বুঝা গেল মতের অনৈক্য নাই]

গোবিন্দ। (নিশ্বাস ফেলিয়া) হাঁ, ওস্তাদি হাত বটে!

ময়রা। যদি কষ্টই করলেন ঠাকুরমশাই, তা হলে মিহিদানাটাও অমনি পরখ করে দিন।

দীনু। মিহিদানা! কই আনো দিকি বাপু।

ময়রা। এই যে আনি।

[এই বলিয়া সে চক্ষের পলকে এক থালা মিহিদানা আনিয়া হাজির করিল এবং ব্রাহ্মণদিগের পাত্রে উজাড় করিয়া দিল। মিহিদানা শেষ হইয়া আসিতে বিলম্ব হইল না]

দীনু। (হাত বাড়াইয়া মেয়ের প্রতি) ওরে ও খেঁদি, ধর দিকি মা, এই দুটো মিহিদানা।

খেঁদি। আমি আর খেতে পারবো না বাবা।

দীনু। পারবি পারবি। এক ঢোঁক জল খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নে দিকি, মুখ মেরে গেছে বই ত না। না পারিস্ আঁচলে একটা গেরো দিয়ে রাখ, কাল সকালে উঠে খাস্।

[এই বলিয়া মেয়ের হাতে গুঁজিয়া দিল]

দীনু। (ময়রার প্রতি) হাঁ বাপু, খাওয়ালে বটে। যেন অমৃত। তা বেশ হয়েছে, মিষ্টি বুঝি দু'রকম করলে বাবাজী?

ময়রা। আজ্ঞে না, রসগোল্লা, ক্ষীরমোহন—

দীনু। অ্যাঁ, ক্ষীরমোহন? কই, সে তো বার করলে না বাপু? (বিস্মিত রমেশের মুখের প্রতি চাহিয়া) হাঁ খেয়েছিলাম বটে রাধানগরের বোসেদের বাড়ি, আজও যেন মুখে লেগে রয়েচে। বললে বিশ্বাস করবে না বাবাজী, ক্ষীরমোহন খেতে আমি বড্ড ভালবাসি।

রমেশ। (হাসিয়া) আজ্ঞে না, অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই। ওরে ষষ্ঠী, ভেতরে বোধ করি আচায্যিমশাই আছেন, যা ত কিছু ক্ষীরমোহন তাঁকে আনতে বলে আয় দিকি। [ষষ্ঠীচরণের প্রস্থান]

গোবিন্দ। (উদ্বিগ্নকণ্ঠে) অ্যাঁ? মিষ্টি কি সব বাইরে পড়ে নাকি? না না, এ তো ভাল না।

ধর্ম্মদাস। চাবি? চাবি? ভাঁড়ারের চাবি কার কাছে?

গোবিন্দ। বলি, ভৈরো আচায্যির হাতে নয় ত?

[ষষ্ঠীচরণের প্রবেশ]

ষষ্ঠী। এখন আর ভাঁড়ার-ঘর খোলা হবে না বাবু, ক্ষীরমোহন বার হবে না।

রমেশ। আঃ, বল্‌গে যা আমি আনতে বলচি।

গোবিন্দ। দেখলে ধর্ম্মদাসদা, আচায্যির আক্কেল। এ যে দেখি মায়ের চেয়ে মাসীর বেশি দরদ। সেই জন্মেই আমি বলি—

ষষ্ঠী। আচায্যিমশায়ের দোষ কি? ও-বাড়ি থেকে গিন্নি-মা এসে ভাঁড়ার বন্ধ করে ফেলেচেন। এ তাঁরই হুকুম।

ধর্ম্মদাস ও গোবিন্দ। কে? বেণীবাবুর মা? ও-বাড়ির বড় গিন্নিঠাকরুণ?

রমেশ। জ্যাঠাইমা—এসেচেন নাকি?

ষষ্ঠী। হাঁ বাবু। তিনি এসেই ছোট বড় দুটো ভাঁড়ারই তালা-বন্ধ করে ফেলেচেন। চাবি তাঁরই আঁচলে।

গোবিন্দ। দেখলে ধর্ম্মদাসদা ব্যাপারখানা? বলি মতলবটা বুঝলে ত।

দীনু। এ মতলব বোঝা আর শক্ত কি ভায়া! তালা-বন্ধ করে চাবি নিজের কাছে রেখেচেন, তার মানে ভাঁড়ার আর কারো না হাতে পড়ে। তিনি সমস্তই ত জানেন।

গোবিন্দ। বোঝ না-সোঝ না, তুমি কথা কও কেন বল ত? তুমি এসব ব্যাপারের কি জানো যে হঠাৎ মানে করতে এসেচ?

দীনু। আরে. এতে বোঝা-বুঝিটা আছে কোনখানে? শুনচো না গিন্নী-মা স্বয়ং এসে তালা বন্ধ করেছেন? এতে কথা কইবে আবার কে?

গোবিন্দ। ঘরে যাও না ভট্‌চায। যে-জন্যে ছুটে এলে, গুষ্টিবর্গ মিলে খেলে, বাঁধলে,—আর কেন? ক্ষীরমোহন পরশু খেয়ো. আজ বাড়ি যাও, আমাদের ঢের কাজ।

রমেশ। আপনার হ'ল কি গাঙুলীমশাই? যাকে-তাকে এমন খামোকা আপমান করচেন কেন?

[ধমক খাইয়া গোবিন্দ লজ্জিত হইল। পরে শুষ্ক হাস্য করিয়া]

গোবিন্দ। অপমান আবার কাকে করলাম বাবাজী? ভাল, ওকেই জিজ্ঞাসা করে দেখ না ঠিক সত্যি কথাটি বলেচি কি না? ও ডালে-ডালে বেড়ায় যদি, আমি পাতায়-পাতায় ঘুরি যে। দেখলে ধর্ম্মদাসদা. দীনে বামনার আস্পর্দ্ধা? আচ্ছা—

রমেশ। আচ্ছা কি?

দীনু। (রমেশের প্রতি) না বাবা, গোবিন্দ সত্য কথাই বলেচেন। আমি বড় গরীব সে এদিকের সবাই জানে। ওঁদের মত আমার জমি-জমা চাষ-বাস কিছুই নেই, এক রকম চেয়ে-চিন্তে ভিক্ষে-শিক্ষে করেই আমাদের দিন চলে।—ভাল জিনিস ছেলেপিলেদের কিনে খাওয়াবার মত ক্ষমতা তো ভগবান দেননি, তাই বড়-ঘরে কাজকর্ম্ম হলে ওরা খেয়ে বাঁচে। কিছু মনে কোরো না বাবা, তারিণীদাদা বেঁচে থাকলে আমাদের তিনি খাওয়াতে বড় ভালবাসতেন।

[দীনুর দু'চক্ষু জলে ভরিয়া টপ্‌ টপ্‌ করিয়া দু' ফোঁটা অশ্রু সকলের সম্মুখেই ঝরিয়া পড়িল। দীনু মলিন ও ছিন্ন উত্তরীয় প্রান্তে তাহা মুছিয়া ফেলিল।]

গোবিন্দ। আহা! তারিণীদাদা শুধু তোমাকে খাওয়াতেই ভালবাসতেন। শুনলে ধর্ম্মদাসদা, শুনলে কথা?

দীনু। আমি কি তাই বলচি গোবিন্দ? আমার মত গরীব-দুঃখী কেউ কখনো তারিণীদার কাছ থেকে খালি হাতে ফেরেনি।

রমেশ। ভট্‌চায্যিমশাই, এই দুটো দিন আমার ওপরে একটু দয়া রাখবেন। আর যদি খাঁদুর মা এ-বাড়িতে একবার পায়ের ধুলো দিতে পারেন ত ভাগ্য বলে মানব।

দীনু। আমি বড় গরীব বাবা, আমি বড় দুঃখী। আমাকে এমন করে বললে যে আমি লজ্জায় মরে যাই—

[ভৃত্যের প্রবেশ]

ভৃত্য। বাবু, গিন্নি-মা একবার ভেতরে ডাকচেন।

রমেশ। যাই।

দীনু। বাবা, আমরা তা হলে এখন আসি।

রমেশ। আসুন, কিন্তু আমার প্রার্থনা যেন ভুলে যাবেন না।

দীনু। না বাবা, প্রার্থনা বলচ কেন, এ তোমার দয়া।

[ছেলেদের লইয়া দীনুর প্রস্থান]

গোবিন্দ। বাবা রমেশ, আমিও এখন তাহলে আসি। সন্ধ্যে-আহ্নিক ঠাকুরের শীতল দেওয়া—

রমেশ। কিন্তু গাঙুলীমশাই—

গোবিন্দ। কিছু বলতে হবে না বাবা, এ আমার আপনার কাজ। তুমি না ডাকলেও আমাকে নিজে এসে সমস্ত করতে হ'তো। কাল সকালেই তোমার মামীকে পাঠিয়ে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হতে পারব।

ধর্ম্মদাস। তুই বড় বাজে বকিস্ গোবিন্দ।

গোবিন্দ। কোন ভাবনা নেই রমেশ, ভাঁড়ার-টাড়ার যা কিছু—

ধর্ম্মদাস। ভাঁড়ারের জন্যে তোর এত মাথা ব্যথা কেন বস্ ত ?

গোবিন্দ। এ আমাদের নিজের কাজ বাবা। আমি আর ধর্ম্মদাসদা-আমরা দু'ভাই তোমার ডাকার অপেক্ষা রাখিনি—আপনারাই এসে উপস্থিত হয়েচি। হয়েচি কি না ?

ধর্ম্মদাস। বলি শোন রমেশ, আমরা বেণী ঘোষাল নই, আমাদের জন্মের ঠিক আছে।

রমেশ। আঃ—কি বলচেন আপনারা ?

[জ্যাঠাইমা অন্তরাল হইতে একটুখানি মুখ বাহির করিয়া]

জ্যাঠাইমা। ওরা অমনিই বলে রমেশ! শিক্ষা আর সঙ্গদোষে জানেও না যে কি ওরা বললে। [গোবিন্দ ও ধর্ম্মদাসের দ্রুতপদে প্রস্থান]

রমেশ। জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা। হাঁরে আমিই। বলি চিনতে পারিস্ ত ?

[বলিতে বলিতে তিনি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বয়স পঞ্চাশের কম নয়, কিন্তু কিছুতেই চল্লিশের বেশি বলিয়া মনে হয় না। মাথার চুলগুলি ছোট করিয়া ছাঁটা, দুই-একগাছি কুঞ্চিত হইয়া কপালের উপর পড়িয়াছে। একদিন যে রূপের খ্যাতি এ-অঞ্চলে প্রসিদ্ধ ছিল, আজিও সেই অনিন্দ্যসৌন্দর্য্য তাঁহার নিটোল পরিপূর্ণ দেহটিকে বর্জ্জন করিয়া দূরে যাইতে পারে নাই দেখিয়া আজও মনে হয় তাঁহার সকল অবয়ব যেন শিল্পীর সাধনার ধন।]

রমেশ। একদিন যে-ছেলেকে তুমি মানুষ করেছিলে, আর একদিন বড় হয়ে ফিরে এসে সে-ই তোমাকে চিনতে পারবে না এই কি তোমার রমেশের কাছে আশা কর জ্যাঠাইমা?

জ্যাঠাইমা। না, সে আশঙ্কা করিনি রমেশ। তবুও ত তোরই মুখ থেকে না শুনে পারিনে বাবা, জ্যাঠাইমাকে তোর মনে আছে।

রমেশ। মনে আছে মা, খুব বড় করেই তোমাকে মনে আছে। কিন্তু যা পারতাম নিজেই করতাম, তুমি কেন এ-বাড়িতে এলে?

জ্যাঠাইমা। তুই ত আমায় ডেকে আনিস্‌নি বাবা, যে তোর কাছে তার কৈফিয়ৎ দেব।

রমেশ। ডেকে আনব কি মা, মা বলে যে তোমার কোলেই সকলের আগে ছুটে গিয়েছিলাম। কিন্তু বাড়ি নেই বলে ত তুমি দেখা করনি জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা। সেই অভিমানেই বুঝি নিজের বাড়ি থেকে আজ আমাকে বিদায় করতে চাস্ রমেশ?

রমেশ। অভিমান! যার মা নেই, বাপ নেই, নিজের জন্মভূমিতে যে নিরাশ্রয়, বিদেশী,—বিনাদোষে যাকে প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজন বাড়ি থেকে দূর করে দেয় তার অভিমানের দাম কি জ্যাঠাইমা?

জ্যাঠাইমা। আমার কাছেও তার দাম নেই রমেশ?

রমেশ। না নেই। আজ নিজের ছেলেকেই শুধু ছেলে বলে জেনে রেখেচ। কিন্তু আর একটা মা-মরা ছেলেকে যে একদিন ঠিক তেমনি কোরেই মানুষ করতে হয়েছিল সে-কথা আজ ভুলে গেছ।

জ্যাঠাইমা। এমনি কোরে শূল বিঁধে তুই কথা বলবি রমেশ? ঘরে-বাইরে এই শাস্তি পাব বলেই কি তোদের দুজনকে মানুষ করেছিলাম রে?

রমেশ। ঘরে-বাইরে! তাই ত বটে! (হঠাৎ পায়ের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া) আমাকে ক্ষমা ক'রো জ্যাঠাইমা, আমি প্রাণের জ্বালায় তোমার এই দিকটার পানে চেয়ে দেখিনি।

[জ্যাঠাইমা রমেশকে তুলিয়া ডান হাত দিয়া তাহার
চিবুক স্পর্শ করিলেন]

জ্যাঠাইমা। জানি বাবা।

রমেশ। কিন্তু আর তুমি এ-বাড়িতে এসো না। আমার সব সইবে, কিন্তু আমার জন্যে দুঃখ পাবে এ আমার সইবে না জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা। এ তোর অন্যায় রমেশ। দুঃখ সওয়াই যদি দরকার হয় ত তোরও সইবে, আমারও সইবে। ফাঁকি দিয়ে আরামের চেষ্টা করলে, তার ফাঁক দিয়ে শুধু

আয়ামই বার হয়ে যায় না বাবা, ঢের বেশি দুঃখ হুড়্মুড়্ কোরে ঢুকে পড়ে। আমাকে বারণ করবার মতলব তুই করিস্‌নে। তা ছাড়া তোর নিষেধ শুনবোই বা কেন?

রমেশ। তোমাকে ভুলেছিলাম জ্যাঠাইমা, তাই নিষেধ করবার স্পর্দ্ধা করেচি। আমার কথা তুমি শুনো না—যা তোমার ভাল মনে হবে তাই করো।

জ্যাঠাইমা। তাইতো করবো।

রমেশ। কোরো। কত ঝড়-বাদল, কত দুর্য্যোগ তোমার মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে—দূর থেকে মাঝে মাঝে আমি তার খবর পেয়েচি। কিন্তু কিছুতেই তোমাকে বদলাতে পারেনি। তোমার অনির্ব্বাণ তেজের আগুন তোমার বুকের মধ্যে তেমনি দপ্ দপ্ করে জ্বলচে।

জ্যাঠাইমা। তুই থাম্, ছেলে-মুখে বুড়ো কথা বলিস্‌নে—তা শোন্। তোর বড়দার কাছে একবার গিয়েছিলি?

[রমেশ অধোমুখে নীরব]

জ্যাঠাইমা। বাড়ি নেই বলে দেখা করেনি বুঝি?

[রমেশ তেমনি নিরুত্তর]

জ্যাঠাইমা। না-ই করুক, আর একবার যা। (ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া) আমি জানি রে, সে তোদের উপর প্রসন্ন নয়, কিন্তু তোর কাজ ত তোকে করা চাই! সে বড় ভাই—তার কাছে হেঁট হতে তোর লজ্জা নেই। তা ছাড়া এটা মানুষের এমনি দুঃসময় বাবা, যে-কোন লোকের হাতে-পায়ে ধরে মিটমাট্ করে নেওয়াই মনুষ্যত্ব। লক্ষ্মী মানিক আমার—যা আর একবার। এখন হয়ত সে বাড়িতেই আছে।

রমেশ। তুমি আদেশ করলেই যাব জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা। আর ছাখ, রমাদের ওখানেও একবার যা।

রমেশ। গিয়েছিলাম।

জ্যাঠাইমা। গিয়েছিলি? তোকে সে চিনতে পেরেছিল ত?

রমেশ। বোধ হয় পেরেছিল। নইলে অপমান করে বাড়ি থেকে দূর করে দেবে কেন?

জ্যাঠাইমা। অপমান করে দূর করে দিলে? রমা?

রমেশ। অপমানটা বোধ করি তার তেমন মনঃপূত হয়নি। তাই বলে দিয়েচে এবার এলে দরওয়ান দিয়ে বার করে দেবে।

জ্যাঠাইমা। রমা বলেচে? এ যে নিজের কানে শুনলেও বিশ্বাস হয় না রমেশ।

রমেশ। বড়দা ছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করে দেখো জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা। বেণী ছিল? তবে, হবেও বা। (এক মুহূর্ত্ত পরে) কিন্তু ঠিক বলচিস্ রমেশ, রমা বললে বাড়ি ঢুকলে দরওয়ান দিয়ে বার করে দেবো। আমাকে ভাঁড়াস্‌নে বাবা, ঠিক করে বল্।

রমেশ। হাঁ জ্যাঠাইমা, তাই। তবে, নিজে না বলে কে তার মাসি আছে তার মুখ দিয়েই বলিয়েচে।

জ্যাঠাইমা। (নিশ্বাস ফেলিয়া) ওঃ—তাই বল। নইলে রাতও মিথ্যে দিনও মিথ্যে রমেশ, এত বড় গর্হিত কথা তার গলায় ছুরি দিলেও সে তোকে বলতে পারত না। এ সেই মাসির কথা, তার নয়।

রমেশ। তবে কি তাদের বাড়িতেও আমাকে যেতে হুকুম করো জ্যাঠাইমা? রমাকে কি তুমি এমনি করেই জান?

জ্যাঠাইমা। জানি। কিন্তু যেতে আর বলিনে। তোর বাপের সঙ্গে তাদের চিরদিন মামলা-মোকদ্দমা চলেচে, তাদের শত্রু বললেও মিথ্যে বলা হয় না, তবুও আমি জানি ও-কথা রমা বলেনি। অমন মেয়ে বাবা, লক্ষ কোটীর মধ্যেও সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। ও আছে বলে তবুও এই গ্রামের মধ্যে একটুখানি ধর্ম্ম বেঁচে আছে।

রমেশ। তাকে দেখে ত সে-কথা মনেও হ'ল না জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা। হঠাৎ হয়ও না, তবুও এ-কথা সত্যি রমেশ। তা সে যাই হোক সেখানে যখন যাওয়াই হতে পারে না তখন তা নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই। কিন্তু এতক্ষণ যাঁরা এখানে ছিলেন ও আমি আসামাত্রই যাঁরা সরে গেলেন তাঁদের তুই বিশ্বেস করিস্‌নে বাবা, তাঁদের আমি চিনি।

রমেশ। কিন্তু তাঁরাই ত এ বিপদে আমার সবচেয়ে আপনার লোক জ্যাঠাইমা। তাঁদের বিশ্বাস না করলে কাদের করবো?

জ্যাঠাইমা। তাই ত ভাবছি বাবা, এ-কথার জবাব দেবই বা কি। হাঁ রে তোর নেমন্তন্ন-ফর্দ্দ তৈরি হয়ে গেছে?

রমেশ। না, এখনো হয়নি।

জ্যাঠাইমা। সেইটে একটু বুঝে-সুঝে করিস্ রমেশ। এ গ্রামে, আর এই গ্রামেই বা বলি কেন, সব গ্রামেই এই। এ ওর সঙ্গে খায় না, ও তার সঙ্গে কথা কয় না,—একটা কাজ-কর্ম্ম পড়ে গেলে মানুষের আর দুশ্চিন্তার অন্ত থাকে না। কাকে বাদ দিয়ে কাকে রাখা যায়, এর চেয়ে শক্ত কাজ আর নেই।

রমেশ। কেন এ-রকম হয় জ্যাঠাইমা?

জ্যাঠাইমা। সে অনেক কথা বাবা। যদি থাকিস্ এখানে, আপনিই সব জানতে পারবি! কারুর সত্যিকার দোষ-অপরাধ আছে, কারুর মিথ্যে অপবাদ আছে, তা

ছাড়া মামলা-মোকদ্দমা, মিথ্যে সাক্ষী দেওয়া নিয়েও মস্ত দলাদলি। আমি যদি তোর এখানে দু'দিন আগে আসতাম রমেশ, এত উদ্যোগ-আয়োজন কিছুই করতে দিতাম না। কি যে সেদিন হবে আমি তাই শুধু ভাবচি।

[এই বলিয়া তিনি নিশ্বাস মোচন করিলেন]

রমেশ। তোমার দীর্ঘশ্বাসের মর্ম্ম বোঝা কঠিন জ্যাঠাইমা, কিন্তু আমার সঙ্গে ত এর কোন যোগ নেই। আমাকে বিদেশী বললেই হয়,—কারো সঙ্গে শত্রুতাও নেই, দলাদলিও নেই,—আমি কাউকে অপমান করতে পারব না, সকলকেই সসম্ভ্রমে আহ্বান করে আনব।

জ্যাঠাইমা। উচিত ত তাই। কিন্তু—যাই হোক, সকলের মত নিয়ে এ কাজটা করিস্ বাবা, নইলে ভারি গণ্ডগোল হবে। মা বিপদ-তারিণী।

রমেশ। তুমি কি এখ্‌খুনি চলে যাচ্ছ?

জ্যাঠাইমা। না এখ্‌খুনি নয়! দু'একটা কাজ পড়ে আছে সেগুলো সেরে ফেলেই যাবো। কিন্তু চাবি আমার সঙ্গে রইলো রমেশ, কাল সকালেই আমি নিজে এসে ভাঁড়ার খুলব।

[প্রস্থান]

[ধর্ম্মদাস, গোবিন্দ ও পরাণ হালদারের প্রবেশ]

গোবিন্দ। (রমেশের প্রতি) বাবা, এই পরাণ মামাকে ধরে নিয়ে এলাম। আসতে কি চায়! কিন্তু আমিও ছাড়নে-বালা নই! বলি বেণীই জমিদার আর, আমার ভাগ্‌নে রমেশ নয়? (উপরের দিকে মুখ তুলিয়া) তারিণীদা, স্বর্গে বসে সমস্তই দেখচো শুনচো, কিন্তু এই তোমার কাছে প্রতিজ্ঞে করচি আমি, এই উঠোনের ওপর বেণীর যদি না এমনি করে নাক রগড়াতে পারি ত আমার নামই গোবিন্দ গাঙুলী নয়।

ধর্ম্মদাস। আহা, তুই থাম না গোবিন্দ। (কাশিতে কাশিতে) সে আমি ঠিক করে নেব।

(অকস্মাৎ বেণী ঘোষাল প্রবেশ করিল)

বেণী। এই যে রমেশ, একবার এলাম—বড় জরুরি কাজ—মা এসেছেন নাকি?

গোবিন্দ। আসবে বই কি বাবা, একশ'বার আসবে। এ ত তোমারই বাড়ি! তাই ত আমি রমেশ বাবাজীকে সকাল থেকে বলচি, রমেশ ঝগড়া-বিবাদ তারিণীদার সঙ্গেই যাক্—আর কেন? তোমরা দু'ভাই এক হও, আমরা দেখে চোখ জুড়োই! তা ছাড়া বড়গিন্নী ঠাকরুণ যখন স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়েছেন, তখন—

বেণী। মা এসেছেন?

গোবিন্দ। শুধু আসা কেন, ভাঁড়ার-টাঁড়ার, করা-কর্ম্ম যা কিছু তিনিই ত করচেন। আর তিনি না করলে করবেই বা কে?

[সকলেই নীরব হইয়া রহিল]

গোবিন্দ। (নিশ্বাস ফেলিয়া) নাঃ গাঁয়ের মধ্যে বড়গিন্নী-ঠাকরুণের মত মানুষ কি আর আছে? না হবে? না বেণীবাবু, সামনে বললে খোসামোদ করা হবে, কিন্তু যে যাই বলুক, গাঁয়ে যদি লক্ষ্মী থাকেন ত সে তোমার মা। এমন মা কি কারু হয়?

[এই বলিয়া পুনশ্চ একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন]

বেণী। আচ্ছা—

গোবিন্দ। শুধু আচ্ছা নয় বেণীবাবু। আসতে হবে, করতে হবে, সমস্ত ভার তোমার ওপর। ভাল কথা, সবাই আপনারা ত উপস্থিত আছেন, নেমন্তন্নটা কি-রকম করা হবে একটা ফর্দ্দ করে ফেলা হোক। কি বল রমেশ বাবাজী? ঠিক কি না হালদার-মামা? ধর্ম্মদাসদা চুপ করে থাকলে হবে না,—কাকে বলতে হবে, কাকে বাদ দিতে হবে জান ত সব।

রমেশ। বড়দা, একবার পায়ের ধুলো যদি দিতে পারেন—

বেণী। মা যখন এসেচেন তখন আমার আসা না-আসা--কি বলোগোবিন্দ খুড়ো?

রমেশ। আপনাকে আমি পীড়াপীড়ি করতে চাইনে বড়দা, যদি অসুবিধে না হয় ত একবার দেখে-শুনে যাবেন।

বেণী। সে ত ঠিক। আমার মা যখন এসেচেন তখন আমার আসা-না-আসা—কি বল হালদার-মামা? তা মাকে একটু শীগ্‌গির যেতে বোলো রমেশ, বিশেষ দরকারী কাজ, আমারও এখন দাঁড়াবার জো নেই—প্রজারা সব—

[বলিতে বলিতে বেণীর দ্রুতপদে প্রস্থান]

গোবিন্দ। (নেপথ্যে গলা বাড়াইয়া দেখিয়া লইয়া) আরে বেণী, ঘোষাল! তুই পাতায়-পাতায় বেড়াস্ ত আমি তার গিয়ে শিরে-শিরে ফিরি। আমার নাম গোবিন্দ গাঙুলী! নিজের চোখে দেখতে এসেচে মা এসেচে কি না। বুঝি না বটে! (রমেশের প্রতি) আর দেখলে বাবা রমেশ, কেমন তোফা মিষ্টি মোলায়েম কথাগুলি শুনিয়ে দিলাম! যেন মিছরির ছুরি। আর বলবার জো নেই যে কর্ম্মবাড়িতে গিয়ে খাতির পাইনি। লোকের কাছে যে বলে বেড়াবে, রমেশ না হয় ছেলেমানুষ, কিন্তু তার মামা গোবিন্দ গাঙুলী ত উপস্থিত ছিল। বৃহৎ কাজে-কর্ম্মে কর্ম্ম-কর্ত্তা হয়ে থাকা সহজ ব্যাপার নয় বাবা, এক একটা চাল ভাবতে মাথা ঘুরে যায়!

ধর্ম্মদাস। তুই বড় বকিস্ গোবিন্দ। থাম্ না?

[একদিক দিয়া সুকুমারী ও তাহার মা ক্ষান্ত প্রবেশ করিয়া বাটীর অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। পরান হালদার কঠিন-চক্ষে তাহাদের নিরীক্ষণ করিলেন মুহূর্ত্তে ভৃত্য ষষ্ঠীচরণ প্রবেশ করিল]

পরাণ। ওরা বাড়ির মধ্যে গেল কারা ?

ষষ্ঠী। ক্ষান্ত বামুন-ঠাকরুণ আর তাঁর মেয়ে।

পরাণ। যা ভেবেচি তাই। ওদের বাড়ি ঢুকতে দিল কে ?

ষষ্ঠী। আচায্যিমশাই ডেকে এনেচেন। দু'দিন ধরে সমস্ত কাজ-কর্ম্ম করচেন।

পরাণ। ওরা যদি খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করে থাকে ত কোন ব্রাহ্মণই এখানে জলগ্রহণ করতে পারবে না।

[ক্ষান্ত আড়ালে দাঁড়াইয়া বোধ হয় শুনিতেছিল, তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া আসিল]

ক্ষান্ত। কেন শুনি হালদার-ঠাকুরপো ? (রমেশের প্রতি) হাঁ বাবা, তুমিও ত গাঁয়ের একজন জমিদার, বলি সমস্ত দোষই কি এই ক্ষেন্তি বামনীর মেয়ের ? মাথার উপর আমাদের কেউ নেই বলে কি যতবার ইচ্ছে শাস্তি দেবে ? (গোবিন্দকে দেখাইয়া) ঐ উনি মুখুয্যে-বাড়ির গাছ-পিতিষ্ঠের সময় জরিমানা বলে দশ টাকা আদায় করেন নি ? গাঁয়ের ষোল-আনা মনসা-পুজোর নামে দু'জোড়া পাঁঠার দাম ধরে নেননি। তবে কতবার ঐ এককথা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে চান শুনি ?

গোবিন্দ। যদি আমারই নামটাই করলে ক্ষান্তমাসি, তবে সত্যি কথা বলি বাছা, খাতিরের কথা কইবার লোক গোবিন্দ গাঙ্গুলী নয়, সে দেশশুদ্ধ লোকে জানে। তোমার মেয়ের প্রায়শ্চিত্তও হয়েছে, সামাজিক দণ্ডও করেচি,—সব মানি। কিন্তু যজ্ঞিতে কাঠি দিতে ত আমরা হুকুম দিই নি ? মরলে ওকে পোড়াতে আমরা কাঁধ দেব, কিন্তু—

ক্ষান্ত। মরলে তোমার নিজের মেয়েকে কাঁধে করে পোড়াতে যেয়ো বাছা, আমার মেয়ের ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। বলি হাঁ, গোবিন্দ, নিজের গায়ে হাত দিয়ে কি কথা কও না ? তোমার ছোট ভাজের কাশীবাসের কথা মনে পড়ে না ? হালদার-ঠাকুরপোর বেয়ানের তাঁতী অপবাদ ছিল না ? সে-সব বড়লোকের বড় কথা বুঝি ?

গোবিন্দ। তবে রে হারামজাদা মাগী—

ক্ষান্ত। (অগ্রসর হইয়া, মারবি নাকি রে ? ক্ষেন্তি বামনীকে ঘাঁটালে ঠগ বাছতে গাঁ উজোড় হয়ে যাবে। বলি এতেই হবে, না আরও বলবো ?

[ভৈরব আচার্য্য দ্রুতপদে প্রবেশ করিয়া]

ভৈরব। এতেই হবে মাসী, আর কাজ নেই। (ভিতরের দিকে চাহিয়া)

সুকুমারী, চল দিদি, এসো মাসী আমার সঙ্গে বাড়ির ভেতরে গিয়ে বসবে চল।

[ভৈরব ও ক্ষান্তর প্রস্থান]

গোবিন্দ। দেখলে পরাণ-মামা, আমাদের অপমান করে ওদের বাড়ির ভেতরে বসাতে নিয়ে চলল। দেখলে ভৈরবের আস্পর্দ্ধা! আচ্ছা—

পরাণ। আমাদের বিনা হুকুমে ঐ দুটো ভ্রষ্টা মাগীদের কেন বাড়ি ঢুকতে দেওয়া হল, রমেশ তার কৈফিয়ৎ দিক। নইলে কেউ আমরা জলস্পর্শ করব না।

জ্যাঠাইমা। (দ্বারের নিকট হইতে) রমেশ!

রমেশ। তুমি কি এখনো আছ জ্যাঠাইমা?

জ্যাঠাইমা। আছি বই কি! গোবিন্দ গাঙ্গুলীকে বল্ যে ক্ষান্ত-ঠাকুরঝি আর সুকুমারীকে আদর করে আমি ডেকে আনিয়েচি, আচায্যিমশাই নয়। তাঁদের খামোকা অপমান করার কোন দরকার ছিল না।

পরাণ। কিন্তু ওদের দূর করে না দিলে আমরা কেউ জলগ্রহণ করতে পারব না।

জ্যাঠাইমা। সে পরশুর কথা। আজ আমার কর্ম্ম-বাড়িতে চেঁচামেঁচি হাঁকাহাঁকি করতে আমি নিষেধ করচি। আমি সকলকেই নিমন্ত্রণ করব, কাউকে বাদ দিতে পারব না।

পরাণ। কিন্তু আমরা কেউ এখানে জলটুকু পর্য্যন্ত মুখে দিতে পারব না।

জ্যাঠাইমা। আমাকে ভয় দেখাতে বারণ কর্ রমেশ। দেশে অনাথ আতুর কাঙালের অভাব নেই। আয়োজন আমার ব্যর্থ হবে না, বরঞ্চ সার্থক হবে।

রমেশ। (ব্যাকুলকণ্ঠে) কিন্তু সমস্ত এঁরা পণ্ড কোরে দিতে চায়। এর সকল দায় যে তোমার মাথায় পড়বে জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা। এ তোর অন্যায় রমেশ। আমার বাড়ির কাজের দায়িত্ব আমার মাথায় পড়বে না ত কি পরের মাথায় পড়বে? এখন ওঁদের যেতে বলে দে। ঢের কাজ পড়ে আছে, নষ্ট করবার মত সময় নেই।

[জ্যাঠাইমা অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। সদর দ্বার দিয়া গোবিন্দ, ধর্ম্মদাস ও পরাণ হালদার ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল]

রমেশ। ভেবেছিলাম বুঝি আমার কেউ নেই,—কিন্তু সবাই আছে যার তুমি আছ জ্যাঠাইমা।

তৃতীয় দৃশ্য

গ্রাম্য পথ

[দীনু ভট্চায শ্রাদ্ধবাটী হইতে নিমন্ত্রণ খাইয়া ঘরে ফিরিতেছে। সঙ্গে পটল, ন্যাড়া, বুড়ী প্রভৃতি বালক-বালিকা। সকলেরই এক হাতে ছোট-বড় পুঁটুলি, অন্য হাতে খুরিতে করিয়া দধি, ক্ষীর প্রভৃতি]

খেঁদি। (সভয়ে) বাবা, ভোজো আসচে—

[শুনিয়া সকলে চকিত হইয়া উঠিল। রমেশের ভৃত্য ভজুয়া প্রবেশ করিল]

দীনু। এই যে ভজুয়াবাবু, কোথায় যাওয়া হচ্ছে ?

ভজুয়া। আরে এ-সব কি লিয়ে যাচ্ছে ভটচায-মোশা—

দিনু। কিছুই নয় বাবা,—এই দুটো এটো-কাঁটা,—পাড়ার ছোটলোক গরীব দুঃখীর ছেলেমেয়ে আছে ত গেলেই সব হাত পেতে দাঁড়াবে, তাদের দেবার জন্যে—

ভজুয়া। আরে, কমতি কি আছে। পুরি মিঠাই কেত্না গরীব-দুঃখী উহই বইঠকে খা রহো—

দীনু। খাচ্চে বইকি বাবা, খাচ্চে বই কি। রাজার ভাণ্ডার, অভাব কি ! তবে সবাই কি আসতে পারবে ? তাদের জন্যেই দুটো-একটা—

ভজুয়া। হাঁ, হাঁ, ঠিক ঠিক। বড়ি খারাপ গাঁও ভটচায, কিত্না গুলমাল ই উঠে তো উ বসে,ই ভাগে তো উ খিঁচকে লাগে—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

দীনু। হয় বাবা হয়, বিরদ কাজে-কর্ম্মে—বুড়ী, পটলার হাতটা একবার বদলে নে মা—আমাদের গাঁ ত তবু পদে আছে বাবা—হোরে, পথ-পানে চেয়ে চল্ না। হোঁচট খেয়ে দইয়ের ভাঁড়টা ফেলে দিবি যে। যে কাণ্ড দেখে এলাম খেঁদির মামার বাড়িতে,—বিশ ঘর বামুন-কায়েতের বাস নেই বাবা—দশটা দলাদলি। পটলা, হাঁ করে স্বগ্গ-পানে তাকিয়ে যাচ্ছিস্ যে ? তবে একটা কথা বলতে পারি বাবা, ভিক্ষে-শিক্ষে করতে অনেক জায়গাতেই ত যাই, অনেকে অনুগ্রহও করেন, আমি দেখেচি তোমার বাবুর মত ছেলে-ছোকরাদেরই যা কিছু দয়া-মায়া আছে। নেই কেবল বুড়ো বেটাদের। বাগে পেলেই একজন আর একজনের গলায় পা দিয়ে জিভ বার করে তবে ছাড়ে।

[এই বলিয়া নিজের জিভ বাহির করিয়া দেখাইল]

ভজুয়া। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

দীনু। এই গোবিন্দ গাঙুলী—এ ব্যাটার পাপের কথা মুখে আনলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। জাল করতে, মিথ্যে সাক্ষী দিতে, মিথ্যে মকদ্দমা সাজাতে ওর জুড়ি নেই—সবাই ওকে ভয় করে। বেণীবাবু হাত-ধরা—কাজেই কেউ একটা কথা কইতে সাহস করে না। ও-ই পাঁচজনের জাত মেরে বেড়াচ্চে।

ভজুয়া। সব দেশে এমনি আছে ভটচায, হামার গাঁয়ে ভি বহুত গুলমাল। আরে জিলা ত—মগর, হমার বাবুজীসে কোই সক্‌বে নহি।

দীনু। না বাবা, কেউ পারবে না তা আমিও বলে দিচ্ছি। খেঁদি, একটু পা চালিয়ে চল্ না। তুই যে—

ভজুয়া। হমার বাবু কি মানুষ আছে, দেওতা আছে।

দীনু। হাঁ বাবা, রমেশ আমার দেবতাই বটে। পটলা, আবার হাঁ কোরে দাঁড়ায়। তা ভজুয়াবাবু কোথায় যাচ্চ ?

ভজুয়া। আচায্যি-ঠাকুরকে বাড়ি।

দীনু। তা যাও যাও, একটু তরন্ত যাও। আমরাও আসি বাবা।

[সকলের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

[মধু পালের মুদির দোকান। কেনা-বেচা চলিতেছে]

প্রথম খরিদ্দার। এক পয়সার তেল দিতে কি বেলা কটিয়ে দেবে নাকি ?

মধু। এই যে দিই।

২য় খরিদ্দার। এক পয়সার হলুদ দিতে কি বুড়ো হয়ে যাবে পালদা ?

মধু। এই যে রে ভাই দিচ্ছি। একলা মানুষ—

৩য় খরিদ্দার। দু'পয়সার মুশুর ডালের জন্মে দেখচি এবেলা আর রান্না চড়ানো হবে না !

মধু। হবে গো খুড়ো হবে, এই নাও না।

[রমেশের প্রবেশ]

মধু। (গলা বাড়াইয়া দেখিয়া) অ্যাঁ ! এ যে আমাদের ছোটবাবু ! প্রাতঃ-পেন্নাম হই। (এই বলিয়া সে একটা মোড়া-হাতে বাহির হইয়া আসিল) আমার সাত-পুরুষের ভাগ্যি যে দোকানে আপনার পায়ের ধূলো পড়লো। বসুন।

রমেশ। শ্রাদ্ধের দরুণ দশটা টাকা বাকী পড়ে আছে, তুমিও যাও না, আমারও পাঠানো হয় না। আজ ভাবলাম নিজেই গিয়ে দিয়ে আসি। এই নাও।

মধু। (হাত পাতিয়া গ্রহণ করিয়া) এ ত আমাদের বাপ-দাদারাও কখনো শোনেনি বাবু, মানুষের বাড়ি বয়ে এসে টাকা দিয়ে যায়!

রমেশ। (মোড়ায় উপবেশন করিয়া) দোকান কেমন চলচে মধু?

মধু। কেমন করে আর ভাল চলবে বাবু? দু'আনা চার আনা এক টাকা পাঁচ সিকে করে প্রায় ষাট-সত্তর টাকা বিলেত পড়ে গেছে। এই ও-বেলায় দিয়ে যাচ্ছি বলে আর ছ'মাসেও আদায় হবার জো নেই—এ কি, বাঁড়ুয্যেমশাই যে! কবে এলেন? প্রাতঃপেন্নাম হই।

[বাঁড়ুয্যেমশায়ের বাঁ হাতে একটা গাড়ু, পায়ের নখে, গোড়ালিতে
কাদার দাগ, কানে পৈতা জড়ানো, ডান হাতে কচুপাতায় মোড়া
চারটি কুচো চিংড়ী]

বাঁড়ুয্যে। (কাল রাত্তিরে এলাম) তামাক খা দিকি মধু।

[এই বলিয়া গাড়ু রাখিয়া হাতের কুচো চিংড়ী মেলিয়া ধরিলেন]

বাঁড়ুয্যে। সৈরুবী জেলেনীর আক্কেল দেখলি মধু, খপ্ করে হাতটা আমার ধরে ফেললে হে, কালে কালে কি হ'ল বল্ দিকি রে, এই কি এক পয়সার চিংড়ী? বামুনকে ঠকিয়ে ক'কাল খাবি মাগী, উচ্ছন্ন যেতে হবে না?

মধু। হাত ধরে ফেললে আপনার?

বাঁড়ুয্যে। আড়াইটি পয়সা শুধু বাকী, তাই বলে খামোকা হাটসুদ্ধ লোকের সামনে হাত ধরবে আমার! কে না দেখলে বল! মাঠ থেকে বসে এসে গাড়ুটি মেজে; নদীতে হাত-পা ধুয়ে মনে করলাম হাটটা একবার ঘুরে যাই। মাগী এক চুবড়ি মাছ নিয়ে বসে,—স্বচ্ছন্দে বললে কিনা কিছু নেই ঠাকুর, যা ছিল সব উঠে গেছে। আরে, আমার চোখে ধুলো দিতে পারিস? ডালাটা ফস্ কোরে তুলে ফেলতেই দেখি না,—অমনি খপ্ কোরে হাতটা চেপে ধরে ফেললে! তোর সাবেক আড়াইটা আর আজকের একটা—এই সাড়ে তিনটে পয়সা নিয়ে আমি কি গাঁ ছেড়ে পালাব? কি বলিস্ মধু?

মধু। তাও কি হয়।

বাঁড়ুয্যে। তবে তাই বল্ না। গাঁয়ে কি শাসন আছে? নইলে ষষ্ঠে জেলের ধোপা-নাপতে বন্ধ কোরে চাল কেটে তুলে দেওয়া যায় না? (হঠাৎ রমেশের প্রতি চাহিয়া) বাবুটি কে মধু?

মধু। আমাদের ছোটবাবু যে! শ্রাদ্ধের দরুণ দশটি টাকা বাকী ছিল বলে বাড়ি বয়ে দিতে এসেচেন।

বাঁড়ুয্যে। অ্যাঁ, রমেশ বাবাজী? বেঁচে থাকো বাবা, হাঁ, এসে শুনলাম একটা কাজের মত কাজ করেচ বটে। এমন খাওয়া-দাওয়া এ-অঞ্চলে কখনো হয়নি। কিন্তু বড় দুঃখ রইলো চোখে দেখতে পেলাম না। পাঁচ শালার ধাপ্পায় পড়ে কলকাতায় চাকরি করতে গিয়ে হাড়ির হাল। আরে ছি, সেখানে মানুষ থাকতে পারে!

মধু। (তামাক সাজিয়া হুঁকা তাঁহার হাতে দিল) তার পরে? একটা চাকরি-বাকরি হয়েছিল ত?

বাঁড়ুয্যে। হবে না? এ কি ধান দিয়ে লেখাপড়া শেখা আমার? কিন্তু হলে কি হবে। যেমন ধোঁয়া, তেমনি কাদা। বাইরে বেরিয়ে গাড়ি চাপা না পড়ে যদি ঘরে ফিরতে পারিস ত জানবি তোর বাপের পুণ্যি। কখনো গিয়েছিলি সেখানে?

মধু। আজ্ঞে না। মেদিনীপুর সহরটা একবার দেখেচি।

বাঁড়ুয্যে। আরে দূর ব্যাটা পাড়াগেঁয়ে ভূত। কিসে আর কিসে! তোর রমেশবাবুকে জিজ্ঞেস কর না সত্যি না মিছে। না মধু, খেতে না পাই ছেলে-পুলের হাত ধরে ভিক্ষে করব,—বামুনের ছেলের তাতে কিছু আর লজ্জা নেই,—কিন্তু বিদেশে যাবার নামটি যেন না কেউ আমার কাছে করে। বললে বিশ্বেস করবিনে, সেখানে শুষনি-কলমি, চালতা, আমড়া, থোড়, মোচা পর্য্যন্ত কিনে খেতে হয়। পারবি খেতে?—এই একটি মাস না খেয়ে যেন রোগা ইঁদুরটি হয়ে গেছি।

[এই বলিয়া তিনি হুঁকাটা মধুর হাতে দিয়া উঠিয়া গিয়া মধুর তেলের ভাঁড় হইতে খানিকটা তেল বাঁ হাতের তেলোয় লইয়া অর্দ্ধেকটা দুই নাক ও কানের গর্ত্তে ঢালিয়া দিয়া বাকীটা মাথায় মাখিয়া ফেলিলেন]

বাঁড়ুয্যে। বেলা হ'ল, অমনি ডুবটা দিয়ে একেবারে ঘরে যাই। এক পয়সার নুন দে দিকি মধু, পয়সাটা বিকেলবেলা দিয়ে যাব।

মধু। আবার বিকেলবেলা।

[মধু অপ্রসন্ন মুখে দোকানে উঠিয়া ঠোঙায় করিয়া নুন দিল]

বাঁড়ুয্যে। (নুন হাতে লইয়া) তোরা সব হলি কি মধু? এ যে গালে চড় মেরে পয়সা নিস্ দেখি। (এই বলিয়া নিজেই এক খামচা নুন ঠোঙায় দিয়া রমেশের প্রতি মৃদু হাসিয়া) ঐ ত একই পথ,—চল না বাবাজী, গল্প করতে করতে যাই।

রমেশ। আমার একটু দেরি আছে।

বাঁড়ুয্যে। তবে থাক্।

[এই বলিয়া গাড়ু লইয়া গমনোদ্যত হইলেন]

মধু। বাঁড়ুয্যেমশাই, সেই ময়দার পয়সা পাঁচ আনা কি অমনি—

বাঁড়ুয্যে। হাঁ রে মধু, তোদের কি লজ্জা-সরম, চোখের চামড়া পর্য্যন্ত নেই ? পাঁচ ব্যাটা-বেটির মতলবে কলকাতা যাওয়া-আসা করতে পাঁচ-পাঁচটা টাকা আমার গলে গেলো, আর, এই কি তোদের তাগাদা করবার সময় হ'ল ? কারো সর্ব্বনাশ, আর কারো পৌষ মাস, বটে ! দেখলে বাবা রমেশ, এদের ব্যাভারটা একবার দেখলে ?

মধু। [লজ্জিত হইয়া] অনেক দিনের—

বাঁড়ুয্যে। হ'লই বা অনেক দিনের। এমন করে সবাই মিলে পিছনে লাগলে ত আর গাঁয়ে বাস করা যায় না।

[এই বলিয়া তিনি একরকম রাগ করিয়াই নিজের জিনিষপত্র লইয়া চলিয়া গেলেন। এবং পরক্ষণে বনমালী পাঁড়ুই ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া রমেশের পায়ের কাছে ভূমিষ্ট প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন]

রমেশ। আপনি কে ?

বনমালী। আপনাদের ভৃত্য, বনমালী পাঁড়ুই। গ্রামের মাইনার ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক।

রমেশ। [সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া] আপনি ইস্কুলের হেড মাস্টার ?

বনমালী। আপনার ভৃত্য। দু'দিন আপনাকে প্রণাম জানাতে গিয়েও দেখা হয়নি।

রমেশ। আপনার ইস্কুলের ছাত্রসংখ্যা কত ?

বনমালী। বিয়াল্লিশ জন। গড়ে দু'জন পাশ হয়। একবার নারায়ণ বাঁড়ুয্যের সেজ ছেলে জলপানি পেয়েছিল।

রমেশ। বটে ?

বনমালী। আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু এ-বছর চাল ছাওয়া না হলে বর্ষার জল আর বাইরে পড়বে না।

রমেশ। সমস্তই আপনাদের মাথায় পড়বে ?

বনমালী। আজ্ঞে হাঁ। সে এখনো দেরি আছে। কিন্তু সম্প্রতি আমরা কেউ তিন মাসের মাইনে পাইনি। মাস্টাররা বলচেন ঘরের খেয়ে বনের মোষ আর বেশিদিন তাড়ানো যাবে না।

রমেশ। আপনার মাইনে কত ?

বনমালী। ছাব্বিশ। পাই তেরো টাকা পোনের আনা।

রমেশ। ছাব্বিশ টাকা মাইনে, আর পান তেরো টাকা পোনের আনা, এর মানে ?

বনমালী। গভর্নমেণ্টের হুকুম কিনা। তাই ছাব্বিশ টাকার রসিদ লিখে সব-ইন্‌স্পেক্‌টারকে দেখাতে হয়। নইলে সরকারী সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়।

রমেশ। এতে ছেলেদের কাছে আপনার সম্মানহানি হয় না?

বনমালী। না, এ দেশাচার। তা ছাড়া ছেলেরা আমাকে বাঘের মত ভয় করে! বেতিয়ে পিঠ লাল করে দিই।

রমেশ। দেবার কথাই। আর সব মাস্টারের মাইনে কত?

বনমালী। তেইশ টাকা।

রমেশ। তেইশ! একজনের না তিনজনের?

বনমালী। তিনজনের। ন'টাকা, আট টাকা আর ছ'টাকা। এও বেণীবাবু দিতে নারাজ। তিনি বলেন, আট টাকাটা সাত টাকা হলেই হয় ভাল।

রমেশ। সে ঠিক। কর্ত্তা বুঝি তিনিই?

বনমালী। হাঁ, তিনিই সেক্রেটারি। কিন্তু কখনো একটি পয়সাও দেন না যদু মুখুয্যেমশাইয়ের কন্যা রমা,—সতীলক্ষ্মী তিনি—তাঁর দয়া না থাকলে ইস্কুল অনেক দিন পূর্ব্বেই বন্ধ হয়ে যেত।

রমেশ। বলেন কি? এ ত শুনিনি।

বনমালী। হাঁ, শুধু তাঁর দয়াতেই ইস্কুল চলে ছোটবাবু, আর কারো নয়। একটি ভাইও তাঁর এই স্কুলে পড়ে। এ-বছর তিনিই চাল ছাইয়ে দেবেন বলেছিলেন, কিন্তু কেন যে দিলেন না বলতে পারিনে। হয়ত কেউ ভাঙ্‌চি দিয়েছে।

রমেশ। তাও হয় নাকি? আচ্ছা, আজ আপনি যান, আপনার বেলা হয়ে যাচ্ছে, কাল আপনাদের ইস্কুল আমি দেখতে যাব।

বনমালী। যে আজ্ঞে। আপনাদের দয়া হলে আর আমাদের ভাবনা কি?

[এই বলিয়া সে আর একবার হেঁট হইয়া প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল, এবং অন্য পথ দিয়া গোপাল সরকার ও ভজুয়া দ্রুতবেগে প্রবেশ করিল।]

রমেশ। হঠাৎ আপনি এমন ব্যস্ত হয়ে যে সরকারমশাই?

গোপাল। বেণীবাবু ত অত্যন্ত অত্যাচার শুরু করে দিলেন। প্রত্যহ এ ত সহ্য যায় না ছোটবাবু!

রমেশ। ব্যাপার কি?

গোপাল। কাপাসডাঙার বাইশ-বিঘের বন্দটা এখনো ভাগ হয়নি, মুখুয্যেদের সঙ্গে যৌথ আছে। এক অংশ তাদের, এক অংশ বেণীবাবুর, আর এক অংশ আমাদের। সেদিন পাড়ের অত বড় তেঁতুলগাছটা কাটিয়ে তাঁরা দু অংশে ভাগ করে নিলেন, আমাদের একটা টুকরো পর্য্যন্ত দিলেন না। আপনাকে জানালাম, আপনি বললেন তুচ্ছ একটু কাঠের জন্যে ত আর ঝগড়া করা যায় না।

রমেশ। বাস্তবিক, এত সামান্য জিনিসের জন্যে কি বড়দার সঙ্গে ঝগড়া করা যায় সরকারমশাই?

গোপাল। সেই জোরে আজ বেণীবাবু জোর করে গড় পুকুরের মাছ ধরে নিয়ে গেছেন। বোধ করি মুখুয্যে-বাড়িতে এতক্ষণ তার অংশ ভাগ হচ্চে।

রমেশ। কিন্তু ঠিক জানেন এতে আমাদের অংশ আছে?

গোপাল। তবে কি মিছেই এ-কাজে মাথার চুল পাকালাম ছোটবাবু?

রমেশ। কিন্তু সবাই যে বলে রমা বড় ধর্ম্মনিষ্ঠ মেয়ে! তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন না কেন?

গোপাল। শুনলাম তিনি হেসে বলেচেন, ছোটবাবুকে বোলো বিষয়টা তাঁর হাতে দিয়ে একটা মাস-হারা নিয়ে যেখানকার মানুষ সেখানে চলে যেতে। জমিদারী রক্ষে করা ভীতু লোকের কাজ নয়।

রমেশ। তবে বুঝি চুরি করাটাই সে মস্ত সাহসের কাজ বলে ঠাউরেচে। ভজুয়া, সঙ্গে তোর লাঠি আছে?

ভজুয়া। (লাঠি আস্ফালন করিয়া) হুজুর।

রমেশ। সমস্ত মাছ গিয়ে কেড়ে নিয়ে আয়। একা পারবি ত?

ভজুয়া। (মাথা নত করিয়া) সির্ফ হুকুমকা নোকর হুজুর।

[এই বলিয়া প্রস্থানোদ্যত হইল]

গোপাল। (অকস্মাৎ অত্যন্ত ভয় পাইয়া) এ যে সত্যি-সত্যিই ফৌজদরা বেধে যাবে ছোটবাবু!

রমেশ। উপায় কি?

গোপাল। হঠাৎ একটা কাজ করে ফেলা কি ভাল হবে ছোটবাবু?

রমেশ। তবে কি আপনি করতে বলেন?

গোপাল। আমি বলি,—আমি বলি,—থানায় একটা ডাইরী করে, না হয়, ভাল করে একবার জিজ্ঞেসা কোরে—

রমেশ। তবে সেই ভাল সরকারমশাই। আমার মত ভীতু লোকের এর বেশী কিছু করা উচিতও নয়। ও-বাড়ির মাইজীকে চিনিস্ ত ভজুয়া? চিনিস্! বেশ তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞেসা করে আয় গড়পুকুরের মাছে আমার অংশ আছে কি না। যদি বলেন—আছে, নিয়ে আসিস্। যদি বলেন—নেই, শুধু চলে আসবি। আমার নিশ্চয় বিশ্বাস সরকারমশাই, সামান্য দুটো মাছের জন্যে রমা মিছে কথা বলবে না।

[ভজুয়ার দ্রুতপদে প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

[বেণী ঘোষালের বাটীর অন্তঃপুরে বিশ্বেশ্বরীর গৃহ।
রমা প্রবেশ করিয়া সম্মুখের দাসীকে দেখিতে পাইল]

রমা। জ্যাঠাইমা কোথায় নন্দর মা?

দাসী। পুজোর ঘর থেকে এখনো বার হয়নি। ডেকে দেব দিদি?

রমা। তাঁর পুজোর ব্যাঘাত করে? না না, আমি আসচি। তিনি বেরুলে তাঁকে খবর দিয়ো যে আমি এসেচি।

দাসী। আচ্ছা দিদি।

[দাসী প্রস্থান করিল, এবং পরক্ষণে অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া
যতীন প্রবেশ করিল]

যতীন। দিদি!

রমা। (চমকিয়া মুখ ফিরিয়া) অ্যাঁ, তুই কোথা থেকে রে?

যতীন। তোমার পেছনে পেছনে এসেচি, তুমি দেখতে পাওনি!

[এই বলিয়া সে রমাকে জড়াইয়া ধরিল]

রমা। কি দুষ্টু ছেলে রে তুই! বেলা হ'ল ইস্কুলে যাবিনে?

যতীন। আমাদের যে আজ ছুটি দিদি।

রমা। ছুটি কিসের রে? আজ ত সবে বুধবার।

যতীন। হ'লই বা বুধবার! বুধ, বেস্পতি, শুক্কুর, শনি, রবি—একেবারে পাঁচ দিন ছুটি।

রমা। কেন রে যতীন?

যতীন। আমাদের ইস্কুলের চাল ছাওয়া হচ্ছে যে। তার পর চুনকাম হবে, কত বই আসবে,—চার-পাঁচটা চেয়ার টেবিল এসেচে,—একটা আলমারি, একটা বড় ঘড়ি এসেচে,—একদিন তুমি গিয়ে দেখে এসো না দিদি।

রমা। বলিস্ কিরে?

যতীন। সত্যি দিদি। রমেশবাবু এসেচেন না—তিনি সব করে দিচ্ছেন। আরও কত কি তিনি করে দেবেন বলেচেন। রোজ দু'ঘণ্টা করে এসে আমাদের পড়িয়ে যান।

রমা। হাঁ রে যতীন, তোকে, তিনি চিনতে পারেন?

যতীন। হাঁ—

রমা। কি বলে তাঁকে তুই ডাকিস্ ?

যতীন। ডাকি ? আমরা ছোটবাবু বলি।

রমা। (ভাইটিকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া) ছোটবাবু কি রে ? তিনি যে তোর দাদা হ'ন।

যতীন। যাঃ—

রমা। যা কি রে ? বেণীবাবুকে যেমন বড়দা বলে ডাকিস্, এঁকে তেমনি ছোড়দা বলে ডাকতে পারিস্‌নে ?

যতীন। আমার দাদা হ'ন তিনি ? সত্যি বলচ দিদি ?

রমা। সত্যি বলচি রে, তোর ছোড়দা হ'ন তিনি।

যতীন। বাড়ি যাবো দিদি ? নরু, হারা, সন্তা,—এদের সব গিয়ে বলে আসবো ?

[রমা ঘাড় নাড়িয়া নিষেধ করিল]

যতীন। এতদিন তিনি কোথায় ছিলেন দিদি ?

রমা। এতদিন লেখাপড়া শিখতে বিদেশে ছিলেন। তুই বড় হলে তোকেও এমনি কোরে বিদেশে গিয়ে থাকতে হবে যতীন, আমাকে ছেড়ে পারবি ত থাকতে ?

যতীন। (বার দুই-তিন অনিশ্চিতভাবে মাথা নাড়িল) ছোড়দার সমস্ত পড়া শেষ হয়ে গেছে দিদি ?

রমা। হাঁ ভাই, তাঁর সব পড়া সাঙ্গ হয়ে গেছে।

যতীন। কি করে তুমি জানলে ?

রমা। (ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া) নিজের পড়া শেষ না হলে কি কেউ পরের ছেলের জন্যে এত দিতে পারে ? এটুকু বুঝি তুই বুঝতে পারিস্‌নে ?

যতীন। (মাথা নাড়িয়া জানাইল সে পারে) আচ্ছা, ছোড়দা কেন আমাদের বাড়ি আসেন না দিদি, বড়দা ত রোজ রোজ যান ?

রমা। তুই তাঁকে ডেকে আনতে পারিসনে ?

যতীন। এখুনি যাব দিদি ?

রমা। (ভয়-ব্যাকুল দুই হাতে তাহাকে বুকে জড়াইয়া) ওরে, কি পাগল ছেলে রে তুই ! খবরদার যতীন, কখ্‌খনো এমন কাজ করিস্‌নে ভাই, কখ্‌খনো করিস্‌নে।

যতীন। তোমার চোখে জল এলো কেন দিদি ? তুমি বারণ করলে ত আমি কখ্‌খনো কিছু করিনে।

রমা। (চোখ মুছিয়া ফেলিয়া) তা ত কর না জানি। তুমি আমার লক্ষ্মী মানিক ছোট্ট ভাই কি না,—তাই।

যতীন। বাড়ি চল না দিদি !

রমা। তুই এখন যা, আমি একটুখানি পরে যাবো ভাই।

[যতীন প্রস্থান করিল]

[বিশ্বেশ্বরী প্রবেশ করিলেন]

রমা। আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী। এ-সব তোরা কি করেচিস্ মা? বেণীর চুরি-করার কাজে তুই কি করে সাহায্য করলি রমা?

রমা। আমি ত একাজ করতে তাঁকে বলিনি জ্যাঠাইমা!

বিশ্বেশ্বরী। স্পষ্ট বলনি বটে, তবুও অপরাধ তোমার কম হয়নি রমা।

রমা। কিন্তু তখন যে আর উপায় ছিল না জ্যাঠাইমা। ভজুয়া লাঠি-হাতে বাড়ির মধ্যে গিয়ে যখন দাঁড়ালো তখন মাছ ভাগ হয়ে গিয়েছিল। বড়দা তাঁর ভাগ নিয়ে চলে আসছিলেন, পাড়ার পাঁচজনেও দুটো-একটা নিয়ে ঘরে ফিরছিলেন।

বিশ্বেশ্বরী। কিন্তু আসলে মাছ আদায় করতে সে যায়নি রমা। রমেশ মাছ-মাংস ছোঁয় না, এতে তার প্রয়োজন নেই। সে শুধু তোমারই কাছে জানতে পাঠিয়েছিল কাপাসডাঙার গড়পুকুরে তার অংশ আছে কি না। নেই, এ-কথা তুই বললি কি কোরে মা? [রমা অধোমুখে নিরুত্তর]

বিশ্বেশ্বরী। তোমার 'পরে যে তার কত শ্রদ্ধা, কত বিশ্বাস, সে তুমি জান না বটে, কিন্তু আমি জানি। সেদিন তেঁতুলগাছটা কাটিয়ে তোমরা দু'ঘরে ভাগ কোরে নিলে; গোপাল সরকারের কথাতেও রমেশ কান দিলে না, বললে, আমার ভাগ থাকলে আমি পাবই। রমা কখনো আমাকে ঠকিয়ে নেবে না। কিন্তু কাল যা করেচ মা, তাতে একটা কথা তোমাকে আজ বলে রাখি মা। বিষয়-সম্পত্তির দাম যত বেশিই হোক, এই মানুষটির প্রাণের দাম তার অনেক বেশি। কারও কথায়, কোন বস্তুর লোভেই, রমা, চারিদিকের আঘাত দিয়ে এ-জিনিসটি নষ্ট কোরো না। যা হারাবে তা আর কোনদিন পূর্ণ হবে না।

রমেশ। (নেপথ্যে) জ্যাঠাইমা!

বিশ্বেশ্বরী। কে, রমেশ? আয় বাবা এই ঘরে আয়।

[রমেশ প্রবেশ করিতেই রমা আনতমুখে ঈষৎ আড় হইয়া বসিল]

বিশ্বেশ্বরী। হঠাৎ এমন দুপুরবেলা যে রে?

রমেশ। দুপুরবেলা না এলে যে তোমার কাছে একটু বসতে পাইনে জ্যাঠাইমা। তোমার কত কাজ। হাসলে যে? আচ্ছা, তোমার মনে পড়ে জ্যাঠাইমা, ঠিক এমনি দুপুরবেলায় ছেলেবেলায় একদিন চোখের জলে তোমার কাছে বিদায় নিয়েছিলাম। আজও তেমনি নিতে এলাম। কিন্তু এই বোধ হয় শেষ নেওয়া জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা। বালাই, ষাট! ও কি কথা বাবা? আয় আমার কাছে এসে বোস।

[রমেশ তাঁহার কাছে গিয়া বসিয়া একটুখানি হাসিল, কিন্তু জবাব দিল না। বিশ্বেশ্বরী পরমস্নেহে তাহার মাথায় গায়ে হাত বুলাইয়া দিয়া কহিলেন —]

বিশ্বেশ্বরী। শরীরটা কি এখানে ভাল থাকচে না বাবা?

রমেশ। এ যে খোট্টার দেশের ডাল-রুটির শরীর জ্যাঠাইমা, এ কি এত শীঘ্র খারাপ হয়? তা নয়। তবে, এখানে আমি আর একদিনও টিকতে পারচিনে। আমার সমস্ত প্রাণ যেন কেবলই খাবি খেয়ে উঠচে।

বিশ্বেশ্বরী। শুনে বাঁচলাম বাবা, তোর শরীর খারাপ হয়নি। কিন্তু এই যে তোর জন্মস্থান, এখানে টিকতে পারচিস্ না কেন বল্ দেখি?

রমেশ। সে আমি বলবো না। আমি নিশ্চয় জানি, তুমি সমস্তই জান।

বিশ্বেশ্বরী। সব না জানলেও কতক জানি বটে, কিন্তু ঠিক সেই জন্যেই তোকে আমি কোথাও যেতে দেব না রমেশ।

রমেশ। কিন্তু এখানে কেউ আমাকে চায় না জ্যাঠাইমা।

বিশ্বেশ্বরী। চায় না বলেই তোর পালান চলবে না রমেশ। এই যে ডাল-রুটি খাওয়া দেহের বড়াই করছিলি সে কি শুধু পালানোর জন্যে? হাঁ রে, গোপাল সরকার বলছিল কি একটা রাস্তা মেরামতের জন্যে তুই চাঁদা তুলছিলি। তার কি হ'লো?

রমেশ। আচ্ছা, এই একটা কথাই তোমাকে বলি। কোন্ পথটা জান? যেটা পোস্টাফিসের সুমুখ দিয়ে বরাবর স্টেশনে গেছে। বছর-পাঁচেক পূর্ব্বে বৃষ্টিতে ভেঙে এখন একটা প্রকাণ্ড গর্ত্ত হয়ে আছে। লোক পা পিছলে হাত-পা ভেঙে পার হয়, কিন্তু মেরামত করে না। গোটা-কুড়ি টাকা মাত্র খরচ, কিন্তু এর জন্যে আজ আট-দশ দিন ঘুরে ঘুরেও আট-দশটা পয়সা পাইনি। কাল মধুর দোকানের সামনে দিয়ে রাত্রে আসচি, কানে গেল কে একজন আর সকলকে বারণ করে দিয়ে বলচে, তোরা কেউ একটা পয়সাও দিস্‌নে। জুতো পায়ে মস্‌মসিয়ে হাঁটা, দু'চাকার গাড়িতে ঘুরে বেড়ান,—ওরই ত গরজ। কেউ কিছু না দিলে আপনিই সারাবে। না করে 'বাবু-বাবু' বলে একটুখানি পিঠে হাত বোলানো। ব্যস।

বিশ্বেশ্বরী। (হাসিয়া) ওরা অমন বলে। তাই দে না বাপু সারিয়ে। তোর দাদামশায়ের ত ঢের টাকা পেয়েচিস্।

রমেশ। (রাগিয়া উঠিয়া) কিন্তু কেন দেবো? আমার ভারি দুঃখ হচ্চে যে, না বুঝে অনেকগুলো টাকা এদের ইস্কুলের জন্যে খরচ করে ফেলেচি। এ-গাঁয়ের কারও জন্যে কিছু করতে নেই। এরা এত নীচ যে এদের দান করলে এরা বোকা মনে করে। ভাল করলে গরজ ঠাওরায়। এদের ক্ষমা করাও অপরাধ। ভাবে ভয়ে ছেড়ে দিলে।

[শুনিয়া বিশ্বেশ্বরী হাসিতে লাগিলেন]

রমেশ। হাসচ যে জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী। না হেসে কি করি বল্‌ত বাছা? হঁ্যা রে, রাগ করে তুই এই লোকগুলোকেই ছেড়ে যেতে চাস্‌? আহা, এরা যে কত দুঃখী, কত দুর্ব্বল, কত অবোধ তা যদি জানতিস্‌ রমেশ, এদের ওপর অভিমান করতে তোর আপনিই লজ্জা হোতো। (রমার প্রতি) তুমি যে সেই থেকে ঘাড় হেঁট করে বসে আছ মা,—হঁ্যা রমেশ, তোরা দুই ভাই-বোন কি কথা কোস্‌নে?

রমা। (তেমনি অধোমুখে) আমি ত বিরোধ রাখতে চাইনে জ্যাঠাইমা। রমেশদা—

রমেশ। (চমকিয়া) এ কে, রমা নাকি? একলা এসেচেন, না সঙ্গে মাসীটিকেও এনেচেন?

বিশ্বেশ্বরী। এ তোর কি কথা রমেশ? তোদের ভাল কোরে চেনা-শুনা নেই বলেই—

রমেশ। রক্ষে কর জ্যাঠাইমা, এর বেশি চেনা-শোনার আশীর্ব্বাদ আর কোরো না। বাড়ি গিয়ে মাসীটিকে যদি পাঠিয়ে দেন ত তোমাকে আমাকে দু'জনকেই চিবিয়ে খেয়ে তিনি ঘরে ফিরবেন! বাপরে পালাই—

বিশ্বেশ্বরী। যাসনে রমেশ, শুনে যা। কথা শোন।

রমেশ। (থমকিয়া দাঁড়াইয়া) না জ্যাঠাইমা, আমি সমস্ত শুনেচি। যারা অহঙ্কারের স্পর্দ্ধায় তোমাকে পর্য্যন্ত মাড়িয়ে চলতে চায় তাদের হয়ে তুমি একটা কথাও বোলো না। তোমাকে অপমান করা আমার সইবে না।

[দ্রুতপদে প্রস্থান]

রমা। (বিশ্বেশ্বরীর মুখের প্রতি চাহিয়া সহসা কাঁদিয়া ফেলিল) তোমাকে অপমান করতে আমি মাসীকে পাঠিয়ে দিই, এ কলঙ্ক আমার কেন জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী। (রমাকে কাছে টানিয়া লইয়া) তোমাকে ও ভুল বুঝেচে মা, যা সত্যি সে ও একদিন জানবেই জানবে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[তারকেশ্বরের গ্রাম্য পথ। প্রভাতবেলায় এইমাত্র সূর্য্যোদয় হইয়াছে। রমা নিকটস্থ কোন একটা পুষ্করিণী হইতে স্নান সারিয়া আর্দ্র-বস্ত্রে গৃহে ফিরিতেছিল, রমেশের সহিত তাহার একেবারে মুখোমুখি দেখা হইয়া গেল। একবার সে মাথায় আঁচল টানিয়া দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ভিজা কাপড় টানা গেল না। তখন সে তাড়াতাড়ি হাতের জলপূর্ণ ঘটিটি নামাইয়া রাখিয়া সিক্ত বসনতলে দুই বাহু বুকের উপর জড়ো করিয়া হেঁট হইয়া দাঁড়াইল।]

রমা। আপনি এখানে যে ?

রমেশ। (এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া) আপনি কি আমাকে চেনেন ?

রমা। চিনি। আপনি কখন তারকেশ্বরে এলেন ?

রমেশ। এইমাত্র গাড়ি থেকে নেমেচি। আমার মামার বাড়ির মেয়েদের আসবার কথা ছিল, কিন্তু তাঁরা কেউ আসেননি।

রমা। এখানে কোথায় আছেন ?

রমেশ। কোথাও না। পূর্ব্বে কখনো আসিনি, আজকের দিনটা কোনমতে কোথাও কাটাতে হবে। যা হোক একটা আশ্রয় খুঁজে নেবো।

রমা। সঙ্গে ভজুয়া আছে ত ?

রমেশ। না, একাই এসেচি।

রমা। বেশ যা হোক। (এই বলিয়া রমা হাসিয়া হঠাৎ মুখ তুলিতেই আবার দু'জনের চোখাচোখি হইল। সে মুখ নীচু করিয়া মনে মনে একটু দ্বিধা করিয়া শেষে বলিল) তবে আমার সঙ্গেই আসুন। (এই বলিয়া ঘটিটা তুলিয়া লইয়া অগ্রসর হইতে উদ্যত হইল।)

রমেশ। আমি যেতে পারি, কারণ, এতে দোষ থাকলে আপনি কখনই ডাকতেন না। আপনাকে যে আমি চিনি না তাও নয়। কিন্তু কিছুতেই স্মরণ করতে পারচিনে। মনে হচ্ছে যেন কখনো স্বপ্নে দেখে থাকব। আপনার পরিচয় দিন।

রমা। আসুন! পথে যেতে যেতে আমার পরিচয় দেব। স্বপ্ন কবেকার দেখা মনে পড়ে ?

রমেশ। না। সঙ্গে আপনার আত্মীয় কেউ নেই ?

রমা। না, দাসী আছে, সে বাসায় কাজ করচে, চাকরটা গেছে বাজারে। তা ছাড়া আমি ত প্রায়ই এখানে আসি,—সমস্তই চিনি।

রমেশ। কিন্তু আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন কেন ?

রমা। নইলে আপনার খাওয়া-দাওয়ার ভারি কষ্ট হবে।

রমেশ। হ'লই বা। তাতে আপনার কি ?

রমা। পুরুষমানুষকে সব বুঝোন যায়, যায় না শুধু এই কথাটি। আমি রমা।

রমেশ। রমা ?

রমা। হঁ্যা। যার সঙ্গে পরিচয় থাকাও আপনার ঘৃণার বস্তু,—সেই।

রমেশ। কিন্তু আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ?

রমা। আমার বাসায়। সেখানে মাসী নেই, ভয় নেই, আসুন।

[উভয়ের প্রস্থান]

[পরক্ষণে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের প্রবেশ। নাপিত ও তাহাকে দ্রুতপদে অনুসরণ করিয়া অপর এক ব্যক্তি। মুখে প্রচুর দাড়ি-গোঁফ ও মাথায় সুদীর্ঘ কেশ, খানিকটা ক্ষুর দিয়া কামানো। এই লোকটি মানোত করিয়া ঠাকুরের কাছে চুল-দাড়ি দিতে আসিয়াছিল।]

যাত্রী। (ব্যস্তভাবে) নাপিত, নাপিত, তুমি নাপিত নাকি হে ? দাও ত দাদা একটু কামিয়ে। খপ্ করে একটা ডুব দিয়ে বাবার পুজোটুকু সেরে দিয়ে আসি। বাবার থান, নইলে তুটো পয়সা মজুরী নয়—এই সিকিটি নিয়ে দাও দাদা খপ্ করে। সাড়ে বারটার গাড়ি ধরতে হবে,—ঘরে ছেলেটার আবার তু'দিন জ্বর। দাও দাও, এখানেই বসে যাবো না কি ?

নাপিত। (সিকিটি হাতে লইয়া বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া পরে ট্যাঁকে গুঁজিয়া বার তুই তাহার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া) এই যে! দাড়ি-চুল কে এঁটো করে দিয়েচে দেখচি ?

যাত্রী। এঁটো ? এঁটো কি রকম ? দেখচো বাবার দাড়ি-চুল, এ কি আমার ? এঁটো কি রকম ?

নাপিত। (হাত দিয়া দেখাইয়া) এই ত খাবলে তুইই এঁটো করে দিয়েচে।

যাত্রী। এঁটো হয়ে গেল ? এক ব্যাটা নাপতে সিকিটা হাতে নিয়ে এইটুকু ক্ষুর বুলিয়ে দিয়ে বলে কর্ত্তার সিকিটা অমনি দাও। বললুম, কর্ত্তা আবার কে ? এই ত গদিতে পাঁচ সিকে জমা দিয়ে হুকুম নিয়ে আসচি। বলে, দেখগে তবে আর কোথাও। সিকি ত গেছেই, রাগ করে উঠে এলুম। দাও দাদা, তোমার বাপ-মায়ের কল্যাণে—

নাপিত। আর গণ্ডা-আষ্টেক পয়সা বার কর দিকি। তার চার আনা, কর্ত্তার চার আনা।

যাত্রী। আবার তার চার আনা, কর্ত্তার চার আনা? মানুষ-জনকে কি পাগল করে দেবে না কি? দাও তবে আমার সিকি ফিরিয়ে, আমি তার কাছে গিয়েই কামাব।

নাপিত। যাবে যাও না। আমি কি তোমাকে ধরে রেখেচি নাকি?

যাত্রী। (রাগতভাবে) সিকি ফিরিয়ে দাও বলচি।

নাপিত। কিসের সিকি শুনি? এতক্ষণ দর-দস্তুর করলি মাগ্‌না নাকি?

যাত্রী। আবার তুই-তোকারি?

নাপিত। ওঃ—গুরুঠাকুর এসেচেন? এ তারকেশ্বরের থান, মনে রাখিস্? চোখ রাঙাবি ত গলা-ধাক্কা খাবি। কোন বাবা তোকে কামিয়ে দেয় যা না।

[ছেলের হাত ধরিয়া একটি প্রৌঢ়া গোছের স্ত্রীলোক ও তাহার আঁচল ধরিয়া মন্দিরের দুইজন কর্ম্মচারীর দ্রুতপদে প্রবেশ]

১ম কর্ম্মচারী। অ্যাঁ! বাবাকে ঠকানো! ঠকানোর আর জায়গা পাস্‌নি মাগী? মোটে পাঁচ সিকে মানোত?

প্রৌঢ়া। (কাতর-কণ্ঠে) না বাবা ঠকাইনি। যা মানোত করেছিলুম তাই জমা দিয়েচি।

২য় কর্ম্মচারী। কবে মানোত করেছিলি বল্, বল্ শুনি?

প্রৌঢ়া। বছর তিনেক আগে, সেই বানের সময়। সত্যি বলচি বাবা—

২য় কর্ম্মচারী। সত্যি বলচ? মিথ্যেবাদী কোথাকার। বছর তিনের মধ্যে ঘরে আর ব্যারাম-স্যারাম হয়নি? আর মনোত করবার দরকার হয়নি? কথ্‌খনো না। দে মাগী বুকে হাত দে। মনে করে ছাখ্। ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর করিস্—এ যে-সে দেবতা নয়, স্বয়ং তারকনাথ।

প্রৌঢ়া। (অত্যন্ত ভয় পাইয়া) শাপ-মন্যি দিও না বাবা, এই আর একটি টাকা নিয়ে—

১ম কর্ম্মচারী। (হাত পাতিয়া গ্রহণ করিয়া) একটি টাকা? অন্ততঃ আরো পাঁচ টাকা মানোত করেছিলি। ছাখ ভেবে। বাবার কৃপায় আমরা সব জানতে পারি, আমাদের ঠকান্ যায় না।

২য় কর্ম্মচারী। দে না মা টাকা ক'টা ফেলে। ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর করিস্, কেন আর বাবার কোপে পড়বি? তোর ব্যাটার কল্যাণে দে, দিয়ে দে ফেলে।

প্রৌঢ়া। (কাঁদ-কাঁদ হইয়া) টাকা যে আর নেই বাবা। কোথায় পাব টাকা?

১ম কর্ম্মচারী। কেন ঐ ত তোর গলায় সোনার কবচ রয়েচে। ওটা পোদ্দারের

দোকানে রেখে কি আর পাঁচটা টাকা পাবিনে? সঙ্গে না হয় লোক দিচ্ছি, দোকান দেখিয়ে দেব, তার পরে একদিন ফিরে এসে খালাস্ করে নিয়ে যাবি।

[একজন স্ত্রীলোককে ঘিরিয়া ৫।৭ জন ভিখারিণীর প্রবেশ]

১ম ভিখারিণী। দে মা তোর ব্যাটা-বেটির কল্যাণে—

২য় ভিখারিণী। দে মা একটি পয়সা তোর মেয়ে-জামাইয়ের কল্যাণে—

৩য় ভিখারিণী। দে মা তোর বাপ-মায়ের—

৪র্থ ভিখারিণী। দে মা তোর স্বামী-পুত্তুরের—

[সকলে মহা ঠেলাঠেলি টানাটানি করিতে লাগিল]

চুলওয়ালা যাত্রী। চাইনে দাড়ি-চুল দিতে। চাইনে মানোত শোধ করতে।

মানোতওয়ালা প্রৌঢ়া। এ যে আমার ইষ্টি-কবচ বাবা! বাঁধা দেব কি করে?

ভিখারীতাড়িত স্ত্রীলোক। ওগো কি সর্ব্বনাশ! কে আমার আঁচল কেটে নিলে?

ভিখারির দল। তোর স্বামী-পুত্তুরের কল্যাণে দে একটা পয়সা। দে একটা আধলা—

১ম কর্ম্মচারি। ব্যাটা-বেটি নিয়ে ঘর করিস্ বাছা। বাবার থান।

নাপিত। কামাবে যে গো?

যাত্রী। কামাবো? রইল তারকনাথ মাথায়। চললুম ঘরে ফিরে।

[প্রস্থান]

ভিখারীতাড়িত স্ত্রীলোক। ঘরে ফিরব কি করে গো! কে আঁচল কেটে নিলে।

ভিখারীর দল। দে মা একটা পয়সা। দে মা একটা আধলা।

[বলিতে বলিতে ঠেলিয়া লইয়া গেল]

মানোতওয়ালা প্রৌঢ়া। দোহাই বাবা তারকনাথ, আমার ইষ্টি-কবচটি আর নিয়ো না।

[ছেলের হাত ধরিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান]

১ম কর্ম্মচারী। এক টাকার বেশী হোল না আদায়।

২য় কর্ম্মচারী। নেই মাগীর আর কিছু।

[প্রস্থান]

নাপিত। যাক্, চার গণ্ডা পয়সাই কোন্ মাথা খুড়লে মেলে?

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[তারকেশ্বরের বাসাবাটী। সামান্য রকমের একটা বিছানা পাতা,
তাহাতে বসিয়া রমেশ। রমা ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ করিল]

রমা। বেশ আপনি! রান্নাঘরে যেই গেছি আর একটু তরকারি আনতে, অমনি উঠে হাত-মুখ ধুয়ে দিব্বি ভালমানুষটির মত বিছানায় এসে বসেচেন! কেন উঠলেন বলুন ত?

রমেশ। ভয়ে।

রমা। ভয়ে! কার ভয়ে? আমার?

[এই বলিয়া সে অদূরে উপবেশন করিল]

রমেশ। সে ভয় তো ছিলই, তা ছাড়া আর একটা আছে। আজ জ্বরের মত ঠেকচে।

রমা। জ্বরের মত ঠেকচে? এ-কথা আগে বললেন না কেন? স্নান করে ভাত খেতে বসলেনই বা কোন্ বুদ্ধিতে?

রমেশ। খুব সহজ বুদ্ধিতে। যে আয়োজন, এবং যে যত্ন করে খেতে দিলে তাকে না বলে ফেরাবোই বা কোন্ সুবিবেচনায়? ভাবলাম, হোকগে জ্বর,—ওষুধ খেলেই সারবে। কিন্তু এ অন্ন না খেয়ে যদি ফাঁকে পড়ি, এ ফাঁক এ-জীবনে আর ভরবে না।

রমা। যান। এই বিদেশে সত্যিই যদি জ্বর হয়ে পড়ে, বলুন ত সে কত বড় অন্যায়?

রমেশ। অন্যায় ত আছেই। কিন্তু যে-রাণীকে এতটুকু দেখে গেছি তার স্বহস্তের রান্না ত্যাগ করাটাই কি কম অন্যায় হ'তো?

রমা। তবু ঐ কথা! এ বিদেশে ত কোন আয়োজনই করতে পারিনি।

রমেশ। আয়োজনের কথা কে ভাবচে? ভাবচি শুধু যত্নের কথাটুকু। এ আমি কোথায় পেতাম?

রমা। (সলজ্জ) কেন, আপনার যত্ন করবার লোকের কি অভাব আছে না কি?

রমেশ। কোথায় পাব বল ত? ছেলেবেলায় মা মারা গেছেন, তার পরে জ্যাঠাইমার হাত থেকে গিয়ে পড়লাম বহু দূরে মামার বাড়িতে। মামীমা বেঁচে নেই, সমস্ত বাড়িটাই যেন হোটেল। সেখান থেকে পড়তে গেলাম এলাহাবাদে—

সেও হোটেল। তার পরে গেলাম ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে। সেখানে বহুকাল কাটল, কিন্তু ছেলেবেলার সেই হোটেলবাসের দুঃখ আর ঘুচল না। খেতে হও খাও,—বাধা দেবারও শত্রু নেই, এগিয়ে দেবারও মিত্র নেই।

[রমা নীরব]

রমেশ। শরীর অসুস্থ, সাধ মিটিয়ে আজ খেতে পারলাম না, তবু মনে হচ্চে যেন জীবনের এই প্রথম সুপ্রভাত, এ জীবনের সমস্ত ধারাটা যেন এই একটা বেলার মধ্যেই একেবারে বদলে গেল।

রমা। (অধোমুখে) কি সমস্ত বাড়িয়ে বলচেন বলুন ত ?

রমেশ। বাড়ানোর শক্তি থাকলে বাড়াতাম, কিন্তু সে সাধ্য নেই।

রমা। ভাগ্যে নেই, নইলে এর বেশি শক্তি থাকলে আমাকে ছুটে পালাতে হ'তো। আমারও ভাগ্য ভাল যে, ঘরে ফিরে গিয়ে নিন্দে করবেন না, বলে বেড়াবেন না যে ওদের রমা এমনি যে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে পেট-ভরে দুটো খেতেও দেয়নি।

রমেশ। না রাণী, নিন্দে করব না, সুখ্যাতি করেও বেড়াব না! আজকের দিনটা আমার নিন্দে-সুখ্যাতির বাইরে। বাস্তবিক, খাওয়া জিনিসটার মধ্যে যে পেট-ভরানোর অতিরিক্ত আরও কিছু আছে, আজকের পূর্ব্বে এ-কথা যেন আমি জানতামই না।

রমা। আজই বুঝি প্রথম জানলেন ?

রমেশ। তাই ত জানলাম।

রমা। কিন্তু এরও ঢের বেশি জানবার আছে। সেদিনটায় আমাকে কিন্তু একটা খবর পাঠিয়ে দেবেন।

রমেশ। এ-কথার মানে ?

রমা। সব কথার মানে যে জানতেই হবে, তারই বা কি মানে আছে রমেশদা ? আচ্ছা, সত্যি বলুন ত, আমাকে কি একেবারেই চিনতেই পারেননি ?

রমেশ। কি করেই বা পারব বল ত ? সেই ছেলেবেলায় দেখা। ফিরে এসে ত তোমার মুখ দেখতে পাইনি। যখনি চেষ্টা করেচি তখনি হয়ত মুখ ফিরিয়ে নিয়েচ, না হয় তো অন্য দিকে চেয়ে আছ। তাই ত আজ হঠাৎ মনে হয়েছিল, এ মুখ বোধ হয় কখনো স্বপ্নে দেখে থাকব। এমন স্বপ্ন ত—

রমা। আচ্ছা, আপনি রাত্রে কি খান ?

রমেশ। যা জোটে তাই।

রমা। আচ্ছা, আপনি এত আগোছাল কেন বলুন তো ? শুনি, জিনিস-পত্র কোথায় থাকে কোথায় যায়, কোন ঠিকানা নেই। কিছুর ওপরেই যেন মায়া-মমতা নেই। সমস্তই যেন শূন্যে ভেসে বেড়ায়।

রমেশ। এত নিন্দে কার কাছে শুনলে?

রমা। সে শুনেই বা আপনার হবে কি? ফিরে গিয়ে তার সঙ্গে ঝগড়া করবেন না কি?

রমেশ। আমি কি কেবল ঝগড়া করেই বেড়াই?

রমা। তাই ত করেন। এসে পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে ত কেবল ঝগড়া করেই বেড়াচ্ছেন। মাসিই কি বাড়ির মালিক নাকি, না, আমি তাঁকে শিখিয়ে দিই যে তিনি বারণ করেচেন বলেই আমাদের মুখ দেখা পর্য্যন্ত বন্ধ করেচেন? পুকুরের মাছ কি আমি চুরি করেছিলাম যে, আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন তার কৈফিয়ৎ চাইতে?

রমেশ। কৈফিয়ৎ ত নয়, একটা জবাব। কিন্তু সে জবাবের তো কোন অমর্য্যাদা হয়নি রাণী!

রমা। হয়নি। কিন্তু, হয়নি বলেই ত তার সমস্ত অমর্য্যাদার বোঝা গিয়ে চেপেচে আজ আমার মাথায়। এর ভার কি আমি তা জানিনে, না, এ শাস্তি আমি বুঝিনে? গ্রামে যে যা করবে আপনার বিরুদ্ধে আমিই কি হ'ব তার দায়ী? আপনার সমস্ত বিতৃষ্ণা কি গিয়ে পড়বে শুধু আমারই ওপরে? এই ন্যায় বুঝি শিখে এসেচেন বিদেশ থেকে?

[দাসীর প্রবেশ]

দাসী। দিদি, নটবর কি জিনিস-পত্র সব বাঁধবে? নইলে ছ'টার গাড়ি ত ধরা যাবে না।

রমা। তার তাড়াতাড়ি কি কুমুদা?

দাসী। যে মেঘ করেচে দিদি, রাত্তিরে হয়ত ভয়ানক জল হবে।

রমা। হ'লই বা। মাঠে বসে ত আর তোরা নেই।

দাসী। না, তাই বলচি।

[দাসীর প্রস্থান]

রমেশ। তোমাদের বুঝি সন্ধ্যার গাড়িতে যাবার কথা?

রমা। হাঁ। আর আপনার?

রমেশ। আমার? আমার ত কোনমতে কালকের দিনটা এখানে থাকতেই হবে।

রমা। একে শরীর ভাল নয়, তাতে বর্ষাকাল, থাকবেন কোথায়?

রমেশ। যেখানে হোক। যারা সব পূজো দিতে আসে তারা থাকে কোথায়?

রমা। তাদের জায়গা আছে। আপনি ত পূজো দেবেন না, আপনাকে থাকতে দেবে কেন?

রমেশ। (হাসিয়া) তাদের গায়ে কি নাম লেখা থাকে নাকি?

রমা। (হাসিয়া) থাকে। ভক্ত-লোকেরা বাবার কৃপায় পড়তে পারে। অভক্তদের তারা দূর করে দেয়। বিছানা-টিছানা কিছুই সঙ্গে আনেননি ত?

রমেশ। না। বিছানা তাঁদের আনবার কথা।

রমা। খাসা ব্যবস্থা। দেহ অসুস্থ, আকাশে জল এলো বলে, সঙ্গে চাকর নেই, একটা বিছানা নেই, খাবার বন্দোবস্ত নেই, অথচ চিন্তার বালাইটুকু পর্য্যন্ত নেই। কারা কোথা থেকে কবে আসবেন, তার প্রতি নির্ভর। একেবারে পরমহংস অবস্থা। এমন হোল কি করে?

রমেশ। যাদের কেউ কোথাও নেই, তাদের আপনিই হয়।

রমা। তাই ত দেখচি। না হয় আজ এই বাড়িতেই থাকুন।

রমেশ। কিন্তু যাঁর বাড়ি—

রমা। তাঁর আপত্তি নেই। অপদার্থ মানুষগুলোকে তিনি দয়া করেন। থাকতেও দেন।

রমেশ। তোমাকে কিন্তু এই বিছানাটা রেখে যেতে হবে রমা।

রমা। তা যাব। কিন্তু ফিরিয়ে দেবেন,—হারিয়ে ফেলবেন না যেন।

রমেশ। বিছানা হারাব কি রকম? আমাকে তুমি কি যে ভাব তার ঠিকানা নেই, কে আমার সম্বন্ধে তোমার মন একেবারে বিগড়ে দিয়েচে।

রমা। (হাসিয়া) কে আর দেবে, হয়ত মাসিই দিয়েচে। কিন্তু তিনি এখানে নেই, আপনি নির্ভয়ে বিশ্রাম করুন। আমি ততক্ষণ কাজ কর্ম্ম একটু সেরে নিই।

[এই বলিয়া সে যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল]

রমেশ। যাঁর বাড়ি তাঁর সঙ্গে একটা পরিচয় না হলে—

রমা। তাঁর সঙ্গে আপনার এই এতটুকু বয়স থেকে পরিচয় আছে। ভাবনার কারণ নেই, ছেলেবেলায় যাকে রাণী বলে ডাকতেন—এ তারই বাড়ি।

রমেশ। বাড়ি তোমার? এখানে বাড়ি কিসের জন্যে?

রমা। বললাম ত। জায়গাটা আমার বড় ভাল লাগে, প্রায় আসি,—তাই।

রমেশ। ঠাকুর-দেবতার প্রতি তোমার খুব ভক্তি, না?

রমা। একে আর ভক্তি বলে না। তবু যতদিন বেঁচে আছি চেষ্টা করতে হবে ত।

[দাসীর প্রবেশ]

দাসী। টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি শুরু হ'লো দিদি, যেতে কষ্ট হবে।

রমা। তবে না-ই গেলি আজ। নটবরকে বোলে দে, কাল যাওয়া হবে।

দাসী। বাঁচি তা হলে। কিন্তু যাবার কথা, বাড়িতে যে তাঁরা ভাববেন?

রমা। মাঝে মাঝে একটু ভাবা ভাল কুমুদা। তুই যা, আমি যাচ্চি।

[দাসীর প্রস্থান।]

রমেশ। কেবল আমার জন্যই তোমাদের যাওয়া হোল না।

রমা। আপনার জন্যে নয়, আপনার অসুখের জন্যে। মুখ দেখে বেশ বোঝা যাচ্চে, হয়ত জর হবে। এ অবস্থায় ফেলেই বা যাই কি করে?

রমেশ। আমি ত তোমার কেউ নই রমা, বরঞ্চ পথের কাঁটা। তবু এক গ্রামের লোক বলে যে যত্ন আজ তোমার কাছে পেলাম তা মুখে বলবার নয়।

রমা। তা হলে না-ই বা বললেন। আর দু'দিন বাদে ভুলে গেলেও অভিযোগ করব না।

[এই বলিয়া সে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল]

রমেশ। তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি রমা, তুমি সুখী হও, দীর্ঘজীবী হও—

রমা। (সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া) এইবার কিন্তু সত্যিই রাগ করব রমেশদা। আমি হিন্দুর বিধবা,—আমাকে দীর্ঘজীবী হতে বলা শুধু অভিশাপ দেওয়া। আমাদের কোন শুভাকাঙ্ক্ষীই কোনদিন এ আশীর্ব্বাদ আমাদের করে না। এখন আমি চললাম।

[দ্রুতপদে প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

[গ্রাম্য পথ। সময় অপরাহ্ণ। তিন দিন উপর্য্যুপরি ও অবিশ্রাম বারিপাতে পুষ্করিণী-খাল-বিল-নালা সমস্তই জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেছে। পথ অতিশয় কর্দ্দমাক্ত। ক্ষণকাল মাত্র বৃষ্টির বিরাম পড়িয়াছে। লাঠি ও ছাতি হাতে বেণী ও গোবিন্দ প্রবেশ করিল। দুর্গম পথের চিহ্ন তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যমান]

গোবিন্দ। (অন্তরাল হইতে উচ্চকণ্ঠে) বলি, কিসের এত খাতির হে? কুটুমের দল এসেচেন আবদার নিয়ে বাঁধ কাটিয়ে জল নিকেশ করে দাও, মাঠ হেজে যাবে! গেল, গেলই! ছোটলোক ব্যাটাদের আস্পর্দ্ধার কথা শুনে হাসব কি কাঁদব ভেবে পাইনে বড়বাবু।

বেণী। বল ত খুড়ো! চাষা ব্যাটাদের একশো বিঘের মাঠ হেজে যাবে, জল বার করে দাও। সুমুখের বিলটার যে বছর সালিয়ানা দুশো টাকার জলকর বিলি হয়। একটা মাছও কি তা হলে থাকবে?

গোবিন্দ। তাও কি কখনো থাকে? ছোটলোক ব্যাটারা, দুটো টাকার মুখ কখনো একসঙ্গে দেখিস্‌নে তোরা,—জানিস্, দু-দুশো টাকার লোকসান কাকে বলে? বলি, লোক-জন সব মোতায়েন রেখেছ ত? লুকিয়ে-চুরিয়ে ব্যাটারা কোথাও কেটেকুটে দেবে না ত? বলা যায় না বড়বাবু। প্রাণের দায়ে শালারা সব পারে।

বেণী। দরওয়ান আর গোপাল নস্করকে পাঠিয়েচি পাহারা দিতে। আর খবর পাঠিয়েচি রমার পীরপুরের প্রজা আকবর লেঠেল আর তার দুই ব্যাটাকে। একশো জনের মোয়াড়া আটকাতে পারে তারা।

গোবিন্দ। ঠিক করেচ বাবা। কল্‌কেটি সেজে ফুঁ দিচ্চি, আর তোমার চাকর গিয়ে হাজির। বলি ভিজতে ভিজতে কেন রে হরি? বলে, বড়বাবু তোমাকে ডাকচে। মিথ্যে বলব না বাবা, হাতের হুঁকো হাতে রইল, একবার টানবার সময় হল না। ছাতি আর ছড়িটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। তোমার খুড়ি বললে, এ দুর্য্যোগে যাও কোথা? বললুম, থাম্ মাগী, আবার পিছু ডাকে। দেখচিস্ বড়বাবু ডাকতে পাঠিয়েচে না? তবে আবার সুযোগ-দুর্য্যোগ কি?

বেণী। জান ত খুড়ো তোমার পরামর্শ ছাড়া আমি এক-পা কোথাও চলিনে। আমার কাছে কান্নাকাটি কোরে যখন হোল না, তখন ব্যাটারা গেল ছোটবাবুর কাছে দরবার করতে। হোঁৎকা-গোয়ার, ওর কি! হয়ত বলে বসবে, হোকগে লোকসান আমাদের, দে তোরা বাঁধ কেটে।

গোবিন্দ। পারে, ও হারামজাদা সব পারে বড়বাবু। গলা ছোট করিয়া) বলি রমাকে একটা খবর দিয়ে রেখেছ ত? সে ছুঁড়ীরও সব সময়ে মেজাজের ঠিক থাকে না। গরীব-দুঃখীর কান্না দেখলে হয়ত বা সায় দিয়েই বসবে।

বেণী। নাঃ—সে ভয় নেই খুড়ো, তাকে আমি সকালবেলাতেই টিপে দিয়ে রেখেচি, কাল রাত্তির থেকেই একটা কানা-ঘুষো শুনচি কি না। ঐ যে! আবার ক'ব্যাটা এই দিকেই আসচে।

কৃষকেরা। (সমস্বরে) দোহাই বড়বাবু, গরীবদের বাঁচান। এ আবাদ পচে গেলে আমরা ছেলে পুলে নিয়ে অনাহারে মরব।

গোবিন্দ। কেন হে সনাতন, মুরুব্বিরা ছুটে গেলেন যে ছোটবাবুর কাছে। এখন বাঁচান না তিনি।

সনাতন। যে গেছে সে গেছে গাঙ্গুলীমশাই, আমরা এই পা দুটিই জানি, এই পা ধরেই পড়ে থাকব। (বেণীর পদতলে পড়িয়া ক্রন্দন)

২য় কৃষক। (বেণীর পদতলে পড়িয়া) আমাদের রাখতে হয় রাখুন, মারতে হয় মারুন,—পা আমরা ছাড়ব না।

বেণী। (জোর করিয়া পা ছাড়াইয়া লইয়া) যা—যা—আমি দু'দুশো টাকার জলকর নষ্ট করতে পারব না। চল খুড়ো আমরা যাই, আমাদের আরও কাজ আছে।

[বেণী ও গোবিন্দ যাইতে উদ্যত হইল]

কৃষকেরা। বড়বাবু—গাঙ্গুলীমশাই, তবে কি সত্যিসত্যিই আমরা মারা যাব?

গোবিন্দ। (ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মুখ বিকৃত করিয়া) মারা যাবি কি যাবিনে তার আমরা কি জানি ?

[উভয়ের প্রস্থান]

কৃষকেরা। হা ভগবান! দুঃখীদের কি তবে সত্যিই মারবে। ওপরে বসে সব দেখচ, তবু কোন উপায় করে দেবে না।

[সকলের দ্রুতবেগে প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

[রমার বহির্ব্বাটী। কাল সন্ধ্যা। প্রাঙ্গণের একদিকে চণ্ডীমণ্ডপের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে এবং অন্যদিকে ছোট একটি তুলসীমঞ্চ। রমা সন্ধ্যাদীপ-হাতে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া মঞ্চমূলে প্রদীপ রাখিয়া গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল। এমনি সময়ে তাহার আনত মাথার কাছে নিঃশব্দ পদক্ষেপে রমেশ আসিয়া দাঁড়াইল]

রমা। (মুখ তুলিয়া অকস্মাৎ রমেশকে দেখিয়া বিস্ময়ে) এ কি, আপনি যে!

রমেশ। অত্যন্ত প্রয়োজনে আসতে হোল রমা।

রমা। (ঈষৎ হাসিয়া) বেশ আসা! কিন্তু হঠাৎ কেউ যদি দেখে ত ভাববে আমি বুঝি প্রদীপ জেলে এতক্ষণ আপনাকেই নমস্কার করছিলাম। এমনি কোরে বুঝি দাঁড়ায় ?

রমেশ। রমা, আমি শুধু তোমার কাছেই এসেছি।

রমা। (হাসিমুখে) সে আমি জানি। নইলে কি মাসির কাছে এসেচেন, আমি বলচি ?

[এই বলিয়া সে প্রদীপ হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল]

কি আদেশ বলুন ?

রমেশ। তুমি নিশ্চয়ই সব শুনেচ। জল বার করে দেবার জন্যে তোমার মত নিতে এসেচি।

রমা। আমার মত ?

রমেশ। হাঁ, তোমার মত নিতেই ছুটে এসেচি রমা। আমি নিশ্চয় জানি দুঃখীদের এত বড় বিপদে তুমি কখনোই না বলতে পারবে না।

রমা। জল বার কোরে দেওয়াই উচিত বটে, কিন্তু কি কোরে হবে রমেশদা বড়দার যে মত নেই।

[বেণী ও গোবিন্দের প্রবেশ]

বেণী। না, আমার মত নেই। কেন থাকবে? দু-তিনশো টাকার মাছ বেরিয়ে যাবে সে খবরটা রেখেচ কি? এ টাকাটা কি চাষারা দেবে?

রমেশ। চাষারা গরীব, টাকা তারা কোথায় পাবে? কথাটা একবার বুঝে দেখুন বড়দা।

বেণী। তা দেখচি। কিন্তু না-হোক এত টাকা আমরাই বা কেন লোকসান করতে যাব এ-কথাটাও ত বুঝে উঠতে পারিনে রমেশ। (গোবিন্দর প্রতি) খুড়ো, এমনি করে ভায়া আমার জমিদারী রাখবেন। ওহে রমেশ, হারামজাদারা সকাল থেকে এতক্ষণ আমার ওখানে পড়েই মড়া-কান্না কাঁদছিল,—আমি জানি সব। বলি, তোমার সদরে কি দরওয়ান নেই? তার পায়ে নাগরা জুতো নেই? যাও ঘরে গিয়ে সেই ব্যবস্থা করগে, জল আপনি নিকেশ হয়ে যাবে।

[এই বলিয়া নিজের রসিকতায় গোবিন্দর সহিত একযোগে হিঃ হিঃ হাঃ হাঃ—করিয়া হাসিতে হাগিল]

রমেশ। কিন্তু ভেবে দেখুন বড়দা, আমাদের তিন ঘরের দু'শো টাকা মাত্র লোকসান বাঁচাতে গিয়ে গরীবদের সারা বছরের অন্ন মারা যাবে। যেমন কোরে হোক তাদের পাঁচ-সাত হাজার টাকা ক্ষতি হবেই।

বেণী। হ'ল হ'লই। তাদের পাঁচ হাজারই যাক আর পঞ্চাশ হাজারই যাক, এই গোটা সদরটা খুঁড়ে ফেললেও ও পাঁচটা পয়সা বার হবে না ভায়া, যে, ও-শালাদের জন্যে দু-দু'শ টাকা উড়িয়ে দিতে হবে?

রমেশ। এরা সারা বছর খাবে কি?

বেণী। (হাসিয়া, মাথা নাড়িয়া, থুথু ফেলিয়া, অবশেষে স্থির হইয়া) খাবে কি? দেখবে ব্যাটারা যে যার জমি বন্ধক রেখে আমাদের কাছেই টাকা ধার করতে ছুটে আসবে। ভায়া, মাথাটা একটু ঠাণ্ডা কোরে চল। কর্ত্তারা এমনি কোরেই বাড়িয়ে-গুছিয়ে এই যে এক-আধ টুকরো উচ্ছিষ্ট ফেলে রেখে গেছেন, এই আমাদের নেড়ে-চেড়ে, গুছিয়ে-গাছিয়ে, খেয়ে-দেয়ে আবার ছেলেদের জন্যে রেখে যেতে হবে। ওরা খাবে কি? ধার-কর্জ্জ করে খাবে। নইলে আর ব্যাটাদের ছোটলোক বলেচে কেন?

গোবিন্দ। এ যে মুনি-ঋষিদের শাস্ত্রবাক্য বাবাজী, এ ত আর তোমার আমার কথা নয়।

রমেশ। বড়দা, আপনি যখন কিছুই করবেন না স্থির করেচেন তখন তর্ক কোরে আর লাভ নেই।

বেণী। না নেই। (রমার প্রতি) তোমার পীরপুরের আকবর আলি আর

তার ব্যাটাদের খবর পাঠিয়ে দেওয়া হয়েচে রমা। (গোবিন্দর প্রতি) চল খুড়ো, আমরা ও-দিকটা একবার দেখে-শুনে আসিগে। সন্ধ্যাও হ'ল।

গোবিন্দ। চল বাবা, চল!

[উভয়ের প্রস্থান]

রমেশ। হুকুম দাও রমা, ওঁর একার অমতেই এত বড় অন্যায় হতে পারে না। আমি এখুনি গিয়ে বাঁধ কাঠিয়ে দেব।

রমা। কিন্তু মাছ আটকে রাখার কি বন্দোবস্ত করবেন?

রমেশ। এত জলে কোন বন্দোবস্ত হওয়াই সম্ভবপর নয়। এ ক্ষতি আমাদের স্বীকার করতেই হবে। না হলে গ্রাম মারা যায়।

[রমা নীরব]

রমেশ। তা হলে অনুমতি দিলে?

রমা। না। এত টাকা আমি লোকসান করতে পারব না। তা ছাড়া বিষয় আমার ভাইয়ের। আমি অভিভাবক মাত্র!

রমেশ। না, আমি জানি অর্দ্ধেক তোমার।

রমা। শুধু নামেই, বাবা নিশ্চয় জানতেন সমস্ত বিষয় যতীনই পাবে। তাই অর্দ্ধেক আমার নামে দিয়ে গেছেন।

রমেশ। (মিনতির কণ্ঠে) রমা, এ ক'টা টাকা? এদিকে তোমাদের অবস্থা সকলের চেয়ে ভাল। তোমার কাছে এ ক্ষতিই নয়। আমি মিনতি জানাচ্চি, এর জন্যে এত লোককে অন্নহীন কোরো না। যথার্থ বলচি, তুমি যে এত নিষ্ঠুর হতে পার আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

রমা। নিজের ক্ষতি করতে পারিনে বলে যদি নিষ্ঠুর হই, না হয় তাই ভাল, আপনার যদি এতই দয়া, নিজেই না হয় ক্ষতিপূরণ করে দিন না।

রমেশ। রমা, মানুষ খাঁটি কি না চেনা যায় শুধু টাকার সম্পর্কে। এই জায়গায়টায় নাকি ফাঁকি চলে না, তাই এইখানেই মানুষের যথার্থ রূপ ধরা পড়ে। তোমারও আজ তাই পড়েচে। কিন্তু তোমাকে আমি কখন এমন করে ভাবিনি। ভেবেচি, তুমি এর চেয়ে অনেক, অনেক ওপরে। কিন্তু তুমি তা নও। তোমাকে নিষ্ঠুর বলাও ভুল। তুমি অতি নীচ, অতি ছোটো।

রমা। কি আমি? কি বললেন?

রমেশ। তুমি অত্যন্ত হীন এবং নীচ। আমি যে কত ব্যাকুল হয়ে উঠেচি, সে তুমি টের পেয়েছ বলেই আমার কাছে দুঃখীর মুখের গ্রাসের দাম আদায়ের দাবী করলে। কিন্তু বড়দাও মুখ ফুটে এ-কথা বলতে পারেননি। পুরুষ হয়েও তাঁর

মুখে যা বেধেছে, নারী হয়ে তোমার মুখে তা বাধেনি।—একটা কথা তোমাকে আজ বলে যাই রমা। আমি এর চেয়েও ঢের বেশি ক্ষতিপূরণ করতে পারি, কিন্তু সংসারে যত পাপ আছে, মানুষের দয়ার ওপর জুলুম করাটাই সবচেয়ে বড়। আজ তুমি তাই করে আমার কাছে টাকা আদায়ের ফন্দি করেচ।

[রমা বিহ্বল হতবুদ্ধির ন্যায় নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল]

রমেশ। আমার দুর্ব্বলতা কোথায় সে তোমাদের অগোচর নেই বটে, কিন্তু সেখানে পাক দিয়ে আজ একবিন্দু রস পাবে না। কিন্তু কি আমি করব তাও তোমাকে জানিয়ে দিয়ে যাই। এখুনি নিজে জোর করে বাঁধ কাটিয়ে দেব,—তোমরা পার আটকাবার চেষ্টা করোগে।

[এই বলিয়া রমেশ চলিয়া যাইতেছিল, রমা ফিরিয়া ডাকিয়া]

রমা। শুনুন। আমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে আমাকে যত অপমান করলেন, আমি তার একটারও জবাব দেব না। কিন্তু এ-কাজ আপনি কিছুতেই করবার চেষ্টা করবেন না।

রমেশ। কেন?

রমা। কারণ, এত অপমানের পরেও আমার আপনার সঙ্গে বিবাদ করতে ইচ্ছে করে না। আর—

রমেশ। আর কি?

রমা। আর, আর,—হয়ত, আকবর সর্দ্দারের দল এসে পড়েচে।

রমেশ। কারা তোমার আকবর সর্দ্দারের দল আমি জানিনে—জানতেও চাইনে। কলহ-বিবাদের অভিরুচি আমারও নেই, কিন্তু, তোমার সদ্ভাবের মূল্যও আর আমার কাছে কিছুমাত্র নেই।

[দ্রুতপদে প্রস্থান]

[মাসির প্রবেশ]

মাসি। কে অমন কোরে হাঁকা-হাঁকি করছিল রে রমা, যেন চেনা-গলা?

রমা। কেউ না।

মাসি। না বললেই শুনব? সন্ধ্যেটি দিয়ে আহ্নিক করতে বসেচি, যেন ষাঁড় চেঁচানো চেঁচাচ্ছে। আহ্নিক ফেলে রেখে উঠে আসতে হোল।

রমা। সে চলে গেছে। তুমি ফিরে গিয়ে আবার আহ্নিকে বোসগে মাসি। কুমুদা!

[দাসীর প্রবেশ]

কুমুদা। কেন দিদি?

রমা। একবার জ্যাঠাইমার ওখানে যাব, আমার সঙ্গে চল্।

মাসি। সেখানে আবার কিসের জন্যে?

রমা। দেখ মাসি, সব কথাই তোমাকে জানতে হবে তার মানে নেই। চল্‌ কুমুদা।

কুমুদা। চল দিদি।

[উভয়ের প্রস্থান]

মাসি। বাপ্‌রে! যেন মার-মুখী! তবু যদি না লোকে তারকেশ্বরের কথা শুনত! আমি তাই লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে মরি?

[প্রস্থান]

[বেণী, গোবিন্দ, আহত আকবর ও তাহার দুই পুত্র
গহর ও ওস্‌মানের প্রবেশ]

আকবর। (খুঁটি ঠেস্‌ দিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার সমস্ত মুখ রক্তে ভাসিতেছে) আল্লা!

গহর। (নিজের রক্তধারা হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া) বাপজান্‌, দরদ কি বেশি মালুম হচ্চে?

আকবর। আল্লা!

বেণী। কথা শোন্‌ আকবর। থানায় চল্‌। সাত বছর যদি না তাকে দিতে পারি ত ঘোষাল বংশের ছেলে নই আমি।

[রমার প্রবেশ]

রমা। অ্যাঁ! এমনধারা কে করলে তোমাদের আকবর? (এই বলিয়া সে অদূরে বসিয়া পড়িল)

আকবর। (আকাশের প্রতি হাত তুলিয়া) আল্লা!

বেণী। আল্লা! আল্লা! এখানে বসে আল্লা আল্লা করলে হবে কি? বলচি থানায় চল্‌। যদি না এর শোধ দশ বচ্ছর ঠেলতে পারি ত,—রমা, তুমি চুপ করে রইলে কেন? বল না একবার থানায় যেতে।

রমা। কে তোমাকে এমন কোরে জখম করলে আকবর?

আকবর। ছোটবাবু, দিদিঠাকরাণ।

রমা। এ কি কখনো হতে পারে আকবর? ছোটবাবু একলা তোমাদের তিন বাপ-ব্যাটাকে জখম কোরে দিলে? এ যে তিনশো জনে পারে না!

আকবর। তাই ত হোলো দিদিঠাকরাণ। সাবাস! মায়ের দুধ খেয়েছিল বটে! লাঠি ধরলে বটে!

গোবিন্দ। সেই কথাই ত থানায় গিয়ে বলতে বলচি রে ব্যাটা! কার লাঠিতে তুই জখম হলি? ছোটবাবুর, না সেই হারামজাদা ভোজোর?

আকবর। সেই বেঁটে হিন্দুস্থানীটার? লাঠির সে জানে কি? কি বলিস্ রে গহর, তোর পয়লা চোটেই সে বসেছিল না রে?

[গহর কথা কহিল না, মাথা নাড়িয়া সায় দিল]

আকবর। মোর হাতের চোট্ পেলে সে বাঁচত না। গহরের লাঠিতেই বাপ কোরে সে বসে পড়লে দিদিঠাকরাণ। তখন ছোটবাবু তার লাঠি তুলে নিয়ে বাঁধ এট্কে দাঁড়াল দিদি-ঠাকরাণ, তিন বাপ-ব্যাটায় মোরা হটাতে নারলাম। আঁধারে বাঘের মত তেনার চোখ জ্বলতে লাগল। কইলেন, আকবর, বুড়োমানুষ তুই সরে যা। বাঁধ কেটে না দিলে সারা গাঁয়ের লোক মারা পড়বে, তাই কেট্তেই হবে। তুইও ত রে চাষী, তোর আপন গাঁয়েও ত জমি-জমা আছে, সমঝে দেখরে, সব বরবাদ হয়ে গেলে তোর ক্যামন লাগে? মুই সেলাম কোরে কইলাম, আল্লার কিরে ছোটবাবু, তুমি একটিবার পথ ছাড়। দিদিঠাকরাণ পাঠিয়েচে মোদের, মোরা জান কবুল দিইচি। তিনি চমকে উঠে কইলেন, তোদের রমা পেঠিয়েচে আকবর, আমারে মারতে? মুই কইলাম, তবে বাঁধ এট্কোনা ছোটবাবু, ঘরকে যাও। তোমার আড়ালে দাঁড়িয়ে ঐ যে কয় সুমুন্দি মুয়ে কাপড় জড়ায়ে ঝপাঝপ্ কোদাল মারচে ওদের শিরগুলো ফাঁক কোরে দিয়ে যাই।

বেণী। বেইমান ব্যাটারা,—তাকে সেলাম বাজিয়ে এসে এখানে চালাকি মারা হচ্চে!

আকবর। (তিন বাপ-ব্যাটায় প্রতিবাদের ভঙ্গিতে হাত তুলিয়া) খবরদার বড়বাবু! বেইমান কোয়ো না। মোরা মোছলমানের ছ্যালে, সব সইতে পারি, ও পারিনি।—(হাত দিয়া কতকটা রক্ত মুছিয়া ফেলিয়া) আমারে বেইমান কয় দিদি! ঘরের মধ্যে বসে বেইমান কইচো, বড়বাবু, চোখে দেখলে জানতে পারতে ছোটবাবু কি!

বেণী। (মুখ বিকৃত করিয়া) ছোটবাবু কি! তাই থানায় গিয়ে জানিয়ে আয় না? বলবি, তুই বাঁধ পাহারা দিচ্ছিলি, ছোটবাবু চড়াও হয়ে তোরে মেরেচে।

আকবর। (জিভ কাটিয়া) তোবা, তোবা! দিনকে রাত করতে বল বড়বাবু?

বেণী। না হয় আর কিছু বলবি। আজ রাত্তিরে গিয়ে জখম দেখিয়ে আয় না,—কাল ওয়ারেণ্ট বার কোরে একেবারে হাজতে পুরবো। রমা, তুমি ভাল কোরে একবার বুঝিয়ে বল না? এমন সুবিধা যে আর কখনো পাওয়া যাবে না!

[রমা নীরবে একবার আকবরের মুখের প্রতি চাহিল]

আকবর। (মাথা নাড়িয়া) না দিদিঠাকরাণ, ও পারব না।

বেণী। (ধমক দিয়া) পারবিনে কেন শুনি ?

আকবর। (ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে) কি কও বড়বাবু, সরম নেই মোর ? পাঁচখানা গাঁয়ের লোকে মোরে সর্দ্দার কয় না ? দিদিঠাকরাণ, তুমি হুকুম দিলে আসামী হয়ে জ্যালে যেতে পারি, ফৈরিদি হব কোন্ কালামুয়ে ?

রমা। সত্যিই পারবে না আকবর ?

আকবর। না, দিদিঠাকরাণ, আর সব পারি, সদরে গিয়ে গায়ের চোট দেখাতে না পারি। ওঠ্‌রে গহর, এইবার ঘরকে যাই। মোরা লালিস্ করতি পারব না।

[এই বলিয়া তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইল ও চলিয়া যাইতে লাগিল]

গোবিন্দ। সত্যিই যে চলে যায় বড়বাবু! কিছুই যে হোলো না ?

বেণী। বারণ কর না রমা, এমন সুযোগ ফস্‌কালে যে আর কখনো মিলবে না।

[রমা আধোমুখে নির্ব্বাক হইয়া রহিল, আকবর ও তাহার দুই পুত্র লাঠিতে ভর দিয়া কোনমতে বাহির হইয়া গেল]

বেণী। ও—বোঝা গেছে সমস্ত।

গোবিন্দ। হুঁ, যা শোনা গেল তা মিথ্যে নয় দেখছি।

[উভয়ের দ্রুতপদে প্রস্থান]

রমা। রমেশদা, এ যে তুমি পারো, এত শক্তি যে তোমার ছিল এ-কথা ত আমি স্বপ্নেও ভাবিনি !

পঞ্চম দৃশ্য

[গ্রামের একাংশ। কয়েকটা ভাঙা মন্দিরের কিছু কিছু দেখা যাইতেছে। বৃক্ষলতা-গুল্মে সমস্ত স্থান সমাকীর্ণ। মনে হয় এদিকে কদাচিৎ-কখনো কেহ আসে মাত্র]

[বেণী ও গোবিন্দের প্রবেশ]

গোবিন্দ। (সচকিতে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া) কে জানে কোন্ শালা আবার কোথা দিয়ে শুনবে। যে জাল বিস্তার করে দড়িটি ধরে বসে আছি বাবা, একটুখানি টান্ দিয়েচি কি অমনি ঝুপ করে পড়েচে।

বেণী। হাঁসিল ত ?

গোবিন্দ। নইলে কি আর তোমাকে এই বনের মধ্যে না-হোক ডেকে এনেচি

বাবা? তুই শালা ভৈরব আচায্যি—তোর নেই এক কড়ার মুরোদ, তুই যাস্ আমাদের বিপক্ষে? তুই যাস্ পরকে আগলাতে? এখন বাস্তু-ভিটেটা বাঁচা! কি করে মেয়ের বিয়ে দিস্ তা একবার দেখি!

বেণী। ডিক্রী হয়েছে তা'হলে?

গোবিন্দ। (দুই হাতের দশ আঙুল তুলিয়া ধরিয়া) একটি হাজার! কিন্তু শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজবে না বাবা,—আধাআধি।

বেণী। (অত্যন্ত খুশি হইয়া) আধাআধি কেন খুড়ো, দশ আনা ছ'আনা।

গোবিন্দ। ভ্যালা মোর বাপ্‌রে! শুধু এই নয় বাবা। সুমুখে পুজো। যদু মুখুয্যের কন্যা এবার মাকে কি করে আনেন তা দেখতে হবে। আসচে ফাল্গুনে ঘটা করে ভাইয়ের পৈতেটি কি করে দেন তাও একবার নেড়ে-চেড়ে পাঁচজনকে দেখাব,—তবে আমার নাম গোবিন্দ গাঙুলী।

বেণী। তারকেশ্বরের কাণ্ডটা তা হলে সত্যি বল?

গোবিন্দ। সত্যি নয়? শালা নটবর কি কিছু বলতে চায়? বক্‌সিস কোবলে, পিঠে হাত বুলিয়ে কিছুতেই কিছু হয় না। ব্যাটা আর ভাঙে না। তখন ফস্ করে পায়ের ধুলো মাথায় দিয়ে বললাম, বাবা, রমার চাকরই হও আর যাই হও,—শুদ্দুর ছাড়া আর কিছু নও, ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর কর, বামুনের পায়ের ধুলো মাথায় করে যদি মিথ্যে বল, তে-রাত্তির পোয়াবে না, সর্পাঘাত হবে। ব্যাটা যেন কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল। সাহস দিয়ে বললাম, নটবর, চাকরি গেলে আবার ঢের হবে, কিন্তু প্রাণ গেলে আর হবে না। তখন ফড়্ ফড়্ করে আগাগোড়া ব্যাপারটা বলে ফেললে। ঠাকরুণের ছ'টার গাড়িতে আর বাড়ি আসা হ'লো না। বাবু রাত্তিরে বাসায় রইলেন, খাওয়া, হাসি-গল্প—যাক, পরচর্চ্চায় কাজ নেই,—ঘটনাটা সত্যি।

বেণী। দেখলে না খুড়ো, কিছুতেই আকবরকে থানায় যেতে দিলে না!

গোবিন্দ। দেবে কি করে? দেওয়া কি যায় বাবা? যায় না।

বেণী। হুঁ। অন্ধকার হয়ে আসচে, যাওয়া যাক চল।

গোবিন্দ। চল। (হঠাৎ বেণীর হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া) কিন্তু বাবা, ভাইপোটা যে অর্দ্ধেক বিষয় টেনে নেবে তা চলবে না বলে রাখচি। সামলাতে হবে।

বেণী। নির্ভয়ে থাকো খুড়ো, আমি বেঁচে থাকতে তা হবে না।

গোবিন্দ। হাটের অংশটা এবার ছেড়ে দিতে রমা পথ পাবে না তাও তোমাকে বলে রাখলাম বড়বাবু। কিন্তু চেপে। ব্যাপারটা হঠাৎ চাউর করে ফেলো না।

বেণী। (ঈষৎ হাসিয়া) দেখা যাক।

[উভয়ের প্রস্থান]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[রমেশের বাটীর অন্তঃপুর। তাহার শয়ন-কক্ষে বসিয়া রমেশ গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত লেখাপড়া করিতেছিল। অকস্মাৎ নেপথ্যে কাহার ক্রন্দনের শব্দ শুনা গেল, এবং পরক্ষণে ভৈরব আচার্য্য গোপাল সরকারের গলা জড়াইয়া মড়া-কান্না কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবেশ করিল। রমেশ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল]

ভৈরব। (সরোদনে) বাবু, আমি ধনে-প্রাণে মারা গেছি।

রমেশ। ব্যাপার কি সরকারমশাই ?

গোপাল সরকার। কাজ সেরে শুতে যাচ্ছিলেম বাবু, হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এসে আচার্য্যিমশাই গলা জড়িয়ে ধরেচে। গলাও ছাড়ে না, কান্নাও থামায় না।

রমেশ। কি হ'লো আচার্য্যিমশাই ?

ভৈরব। বাবু গো, আমি একেবারে গেছি। ছেলেপুলের হাত ধরে একবার গাছতলায় শুতে হবে।

রমেশ। গাছতলায় কেন ? ঘর কি হ'লো ?

ভৈরব। আর নেই,—নিলেম করে নিয়েচে।

রমেশ। এই ত সকালেও ছিল। এরই মধ্যে কে নিলেম করে নিলে ?

ভৈরব। কে এক সনৎ মুখুয্যে বাবু, গোবিন্দ গাঙুলীর খুড়শ্বশুর।

[ক্রন্দন]

গোপাল। আরে, আমার গলা ছাড়ুন না। বাবুকে সমস্ত বুঝিয়ে বলুন,—কে নিলে, কেন নিলে, খামোকা আমাকে জড়িয়ে ধরে থাকলে কি হবে ? ছাড়ুন।

ভৈরব। (গলা ছাড়িয়া) এক হাজার সাতাশ টাকা পাঁচ আনা ছ'পাই,—বাবু গো, ধনে-প্রাণে মারা গেলাম।

গোপাল। টাকা কর্জ্জ নিয়েছিলেন ?

ভৈরব। না, এক পয়সা না সরকারমশাই। দেনা মিথ্যে, খত্ মিথ্যে—কবে নালিশ হ'লো, কবে শমন হ'লো, কবে ডিক্রি হয়ে বাড়ি-ঘর-দোর নিলাম হয়ে গেল—কিছুই জানিনে বাবু। কাল কানাঘুষো খবর পেয়ে সদরে গিয়ে টের পেলাম—ছেলে-পুলে নিয়ে আমাকে গাছতলায় শুতে হবে। এক হাজার সাতাশ টাকা পাঁচ আনা ছ'পাই—

রমেশ। এমন ভয়ানক কথা ত কখনো শুনিনি সরকারমশাই ?

গোপাল। পাড়াগাঁয়ে এমন অনেক হয় বাবু। যারা গরীব, বড়লোকের কোপে পড়ে তারা সত্যিই ধনে-প্রাণে মারা যায়। এ-সমস্তই বেণীবাবু আর

গাঙ্গুলীমশায়ের কাজ—আচায্যিমশাই বরাবর আমাদের দিকে আছেন বলেই তাঁর এই বিপদ।

ভৈরব। হাঁ বাবু, তাই আমার এই বিপদ।

রমেশ। কিন্তু এর উপায় সরকারমশাই?

গোপাল। অনেক টাকার ব্যাপার। এ ঋণ মিথ্যে, দলিল মিথ্যে, সাক্ষী মিথ্যে,—কে হয়ত ওঁর নাম লিখে শমন নিয়েচে, কে হয়ত আদালতে গিয়ে কবুল জবাব দিয়েচ, সদরে গিয়ে সমস্ত তদন্ত না ক'রে ত কিছুই বলবার জো নেই।

রমেশ। তাই আপনি যান। সমস্ত খরচ নিয়ে যত টাকা লাগে এর প্রতিকার করুন। এমন করুন যেন এত বড় অত্যাচার করতে আর কেউ না সাহস করে।

ভৈরব। (অকস্মাৎ রমেশের পা জড়াইয়া ধরিয়া) বাবু গো, আপনি চিরজীবী হোন। ধনে-পুত্রে লক্ষ্মী লাভ ক'রে আপনি রাজা হোন।

রমেশ। (পা ছাড়াইয়া লইয়া) আপনি বাড়ি যান আচায্যিমশাই, যা করা উচিত আমি ক'রব।

ভৈরব। ভগবান যেন আপনাকে—

রমেশ। রাত অনেক হ'লো আচায্যিমশাই, আজ আমি বড় শ্রান্ত।

ভৈরব। ভগবান যেন আপনাকে দীর্ঘজীবী করেন, ভগবান যেন আপনাকে রাজা করেন—

[ইত্যাদি বলিতে বলিতে ভৈরবের প্রস্থান]

রমেশ। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) সরকারমশাই, এই আমাদের গর্ব্বের ধন। এই আমাদের শুদ্ধশান্ত ন্যায়নিষ্ঠ বাঙলার পল্লীসমাজ।

গোপাল। হাঁ, এই। সবাই জানবে এ কাজ বেণীবাবুর, সবাই গোপনে জল্পনা করে বেড়াবে, কিন্তু মুখ ফুটে কেউ এ অত্যাচারের প্রতিবাদ করবে না। সেবার গাঙ্গুলীমশাই বিধবা বড়ভাজকে মেরে বাড়ি থেকে বের করে দিলে, কিন্তু বেণীবাবু সহায় বলে সবাই চুপ করে রইল। সে কেঁদে সকলকে জানালে, সকলেই বললে, আমরা কি কোরব, ভগবানকে জানাও তিনিই এর বিচার করবেন।

রমেশ। তার পরে?

গোপাল। তার পরে সেই গাঙ্গুলীমশাই-ই সকলের জাত মেরে বেড়াচ্ছেন। মৃত পল্লীসমাজ কথাটি বলবার সাহস রাখে না। অথচ, আমিই ছেলেবেলায় দেখেছি বাবু, এমনধারা ছিল না। বিধবা বড়ভাজের গায়ে হাত দিয়ে কেউ সহজে নিস্তার পেত না। তখন সমাজ দণ্ড দিত, এবং সে দণ্ড অপরাধীকে মাথা পেতে নিতে হতো।

রমেশ। তবে কি পল্লীসমাজ বলে কিছুই আর নেই?

গোপাল। যা আছে সে ত এসে পর্য্যন্ত স্বচক্ষেই দেখচেন। যা আর্ত্তকে

রক্ষে করে না, দুঃখীকে শুধু দুঃখের পথেই ঠেলে দেয়, তাকেই সমাজ ব'লে কল্পনা করার মহাপাপ আমাদের নিয়ত রসাতলের দিকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

রমেশ। (আশ্চর্য্য হইয়া) সরকারমশাই, এ-সকল কথা আপনি জানলেন কার কাছে।

গোপাল। আমার স্বর্গীয় মনিবের কাছে। এই মাত্র যে ভৈরবকে উদ্ধার করতে চাইলেন, এ শক্তি আপনি পেলেন কোথায়? এ তাঁরই দয়া। এমনি কোরে বিপন্নকে উদ্ধার করতে তাঁকে যে আমি বহুবার দেখেচি ছোটবাবু।

রমেশ। (দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া) বাবা—

গোপাল। রাত প্রায় শেষ হয়ে এল বাবু, আপনি একটু শোন্।

রমেশ। হাঁ শুই। আপনি বাড়ি যান সরকার মশাই।

[গোপাল সরকার প্রস্থান করিল। রমেশ শয়নের আয়োজন করিতেছিল, সহসা দ্বারের কাছে কি একটা দেখিতে পাইয়া চমকিয়া প্রশ্ন করিল—]

রমেশ। কে? কে দাঁড়িয়ে?

[যতীন দ্বারের কাছে মুখ বাড়াইয়া]

যতীন। ছোড়দা, আমি।

রমেশ। (কাছে গিয়া) যতীন? এত রাত্রে? আমায় ডাকচ?

যতীন। হাঁ, আপনাকে।

রমেশ। আমাকে ছোড়দা বলতে তোমাকে কে বলে দিলে?

যতীন। দিদি।

রমেশ। রমা? তিনি কি তোমাকে কিছু বলতে পাঠিয়েচেন?

যতীন। না। দিদি বললেন, আমাকে সঙ্গে কোরে তোর ছোড়দার বাড়িতে নিয়ে চল্। ঐ যে ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন।

[এই বলিয়া সে দরজার বাহিরে চাহিল]

রমেশ। (ব্যস্ত হইয়া সরিয়া আসিয়া) আজ আমার একি সৌভাগ্য! কিন্তু আমাকে ডেকে না পাঠিয়ে এত রাত্রে নিজে এলে কেন? এস, ঘরে এস।

[রমা অত্যন্ত দ্বিধাভরে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দ্বারের অনতিদূরে মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। যতীন দিদির কাছে আসিয়া বসিতে যাইতেছিল; কিন্তু রমেশ তাহাকে একটি আরাম-কেদারায় আনিয়া শোয়াইয়া দিল]

রমা। রাত আর নেই, ভোর হয়ে এসেচে, (অধোমুখে) শুধু একটি জিনিস আপনার কাছে ভিক্ষে চেয়ে নেবো বলে আপনার বাড়িতে এসেচি। দেবেন বলুন?

রমেশ। আমার কাছে ভিক্ষে চাইতে? আশ্চর্য্য! কি চাই বল?

রমা। (মুখ তুলিয়া ক্ষণকাল অপলক-চক্ষে রমেশের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল) আগে কথা দিন।

রমেশ। (মাথা নাড়িয়া) তা পারিনে। তোমাকে কোন প্রশ্ন না করেই কথা দেবার শক্তি যে তুমি নিজের হাতেই ভেঙে দিয়েচ রমা।

রমা। আমি ভেঙে দিয়েচি ?

রমেশ। তুমিই। তুমি ছাড়া এ শক্তি সংসারে আর কারু ছিল না। রমা, আজ তোমাকে একটা সত্য কথা বলব।—ইচ্ছে হয় বিশ্বাস কোরো, ইচ্ছে না হয় কোরো না। কিন্তু জিনিসটা যদি না মরে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যেতো, হয়ত এ কথা তোমাকে কোনদিন শোনাতে পারতাম না ; কিন্তু আজ নাকি আর কোন পক্ষেই লেশমাত্র ক্ষতির সম্ভবনা নেই, তাই আজ জানাচ্চি সেদিন পর্য্যন্তও তোমাকে অদেয় আমার কিছুই ছিল না। কিন্তু কেন জানো ?

রমা। (মাথা নাড়িয়া জানাইল) না।

রমেশ। কিন্তু শুনে রাগ কোরো না। লজ্জাও পেয়ো না। মনে কোরো এ কোন পুরাকালের একটা গল্প শুনচ মাত্র। তোমাকে ভালবাসতাম রমা। মনে হয়, তেমন ভালবাসা বোধহয় কেউ কখনো বাসেনি। ছেলেবেলায় মা'র মুখে শুনেছিলাম, আমাদের বিয়ে হবে। তারপরে, যেদিন সমস্ত ভেঙে গেল, সেদিন—কত বছর কেটে গেল, তবুও মনে হয় সে বুঝি কালকের কথা।

[রমা তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া পলকের জন্য শিহরিয়া আবার
শুদ্ধ অধোমুখে নিশ্চল হইয়া রহিল]

রমেশ। তুমি ভাবছ তোমাকে এ-সব কাহিনী শোনানো অন্যায়। আমার মনেও এ সন্দেহ ছিল বোলেই সেদিন তারকেশ্বরে যখন একটি দিনের সমাদরে আমার সমস্ত জীবনের ধারা বদলে দিয়ে গেল, সেদিনও চুপ করেই ছিলাম। চুপ করেই ছিলাম, কিন্তু সে নীরবতার ব্যথা মাপবার মানদণ্ড হয়ত শুধু অন্তর্যামীর হাতেই আছে।

রমা। (কিছুতেই যেন আর সহিতে পারিল না) যা তাঁর হাতে আছে তা তাঁর হাতেই থাক্ না রমেশদা।

রমেশ। তাই ত আছে রমা।

রমা। তবে—তবে, আজকেই বা বাড়িতে পেয়ে আমাকে অপমান করচেন কেন ?

রমেশ। অপমান ! কিছুমাত্র না। এর মধ্যে মান-অপমানের কথা নেই। এ যাদের কাহিনী শুনচো, সে রমাও তুমি কোনদিন ছিলে না, সে রমেশও আর আমি নেই।

রমা। রমেশদা, আপনার নিজের কথাই বলুন। রমার কথা আমি আপনার চেয়ে বেশী জানি।

রমেশ। যাই হোক, শোন। কেন জানিনে, সেদিন আমার অসংশয়ে বিশ্বাস হয়েছিল, তুমি যা ইচ্ছে বল, যা খুশি কর, কিন্তু আমার অকল্যাণ তুমি কিছুতেই সইতে পারবে না। বোধ করি ভেবেছিলাম, সেই যে ছেলেবেলায় একদিন ভালবেসেছিলে, সেই যে হাতে কোরে চোখ মুছিয়ে দিয়েছিলে, হয়ত তা আজও একেবারে ভুলতে পারনি। তাই মনে করেছিলাম কোন কথা তোমাকে না জানিয়ে তোমারি ছাওয়ায় বসে সমস্ত জীবনের কাজগুলো আমার ধীরে ধীরে কোরে যাব, কিন্তু সে-রাত্রে আকবরের নিজের মুখে যখন শুনতে পেলাম তুমি নিজে—ও কি? বাইরে এত গোলমাল কিসের?

[দ্রুতবেগে গোপাল সরকারের প্রবেশ]

গোপাল। ছোটবাবু! (অকস্মাৎ রমাকে দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া থামিল)

রমেশ। কি হয়েচে সরকারমশাই?

গোপাল। পুলিশের লোক ভজুয়াকে গ্রেপ্তার করেচে।

রমেশ। ভজুয়াকে? কেন?

গোপাল। সেদিন রাধাপুরের ডাকাতিতে সে নাকি ছিল।

রমেশ। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। আপনি বাইরে যান।

[গোপাল সরকার প্রস্থান করিল]

রমেশ। যতীন ঘুমিয়ে পড়েচে, সে থাক্। কিন্তু তুমি আর একমুহূর্ত্ত থেকো না রমা, খিড়কী দিয়ে বেরিয়ে যাও। পুলিশ খানাতল্লাশি করতে ছাড়বে না।

রমা। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভীতকণ্ঠে) তোমার নিজের ত কোন ভয় নেই?

রমেশ। বলতে পারিনে রমা। কতদূর কি দাঁড়িয়েচে সে ত এখনো জানিনে।

রমা। তোমাকেও ত গ্রেপ্তার করতে পারে?

রমেশ। তা পারে।

রমা। পীড়ন করতেও পারে?

রমেশ। অসম্ভব নয়।

রমা। (সহসা কাঁদিয়া উঠিল) আমি যাব না রমেশদা।

রমেশ। (সভয়ে) যাবে না কি রকম?

রমা। তোমাকে অপমান করবে, তোমাকে পীড়ন করবে—আমি কিছুতেই যাব না রমেশদা।

রমেশ। (ব্যাকুল-কণ্ঠে) ছি ছি, এখানে থাকতে নেই। তুমি কি পাগল হয়ে গেলে রাণী?

[এই বলিয়া দুই হাত ধরিয়া জোর করিয়া তাহাকে বাহির করিয়া দিল। ওদিকে বহু লোকের পদশব্দ ও গোলমাল স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে লাগিল।]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিশ্বেশ্বরীর কক্ষ

[জ্যাঠাইমা ও রমেশ]

জ্যাঠাইমা। হাঁরে রমেশ, তুই নাকি তোর পীরপুরের নতুন ইস্কুল নিয়েই মেতে রয়েচিস, আমাদের ইস্কুলে আর পড়াতে যাস্‌নে?

রমেশ। না। যেখানে পরিশ্রম শুধু পণ্ডশ্রম, যেখানে কেউ কারো ভালো দেখতে পারে না, সেখানে খেটে মরায় কোন লাভ নেই। শুধু মাঝে থেকে নিজেরই শত্রু বেড়ে ওঠে। বরঞ্চ, যাদের মঙ্গলের চেষ্টায় দেশের সত্যিকার মঙ্গল হবে, সেই সব মুসলমান আর হিন্দুর ছোট জাতেদের মধ্যেই পরিশ্রম করব।

জ্যাঠাইমা। এ-কথা ত নতুন নয় রমেশ। পৃথিবীতে ভাল করবার ভার যে-কেউ নিজের ওপরে নিয়েচে চিরদিনই তার শত্রুসংখ্যা বেড়ে উঠেচে। সেই ভয়ে যারা পেছিয়ে দাঁড়ায়, তুইও যদি তাদেরি দলে গিয়ে মিশিস্ তা হলে ত চলবে না বাবা। এ গুরুভার ভগবান তোকেই বইতে দিয়েচেন, তোকেই বয়ে বেড়াতে হবে। কিন্তু হাঁরে, তুই নাকি ওদের হাতে জল খাস?

রমেশ। (হাসিয়া) এই দেখ, এরই মধ্যে তোমার কানে উঠেচে; কিন্তু আমি ত তোমাদের জাত-ভেদ মানিনে জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা। মানিস্‌নে কি রে? এ কি মিছে কথা, না, জাত-ভেদ নেই যে তুই মানিস্‌নে?

রমেশ। আছে তা মানি, কিন্তু ভাল বলে মানিনে। এর থেকে কত মনোমালিন্য, কত হানাহানি—মানুষকে ছোট করে অপমান করবার ফল কি তুমি দেখতে পাও না জ্যাঠাইমা? সেদিন অর্থাভাবে দ্বারিক ঠাকুরের প্রায়শ্চিত্ত হয়নি বলে তার মৃতদেহ কেউ স্পর্শ করতে চায়নি, এ-কথা কি তুমি জানো না?

জ্যাঠাইমা। জানি বাবা, সব জানি, কিন্তু এর আসল কারণ জাত-ভেদ নয়। যা সবচেয়ে বড় কারণ তা এই যে যাকে যথার্থ ধর্ম্ম বলে, একদিন যা এখানে ছিল, আজ তা পল্লীগ্রাম থেকে একেবারে লোপ পেয়েচে। আছে শুধু কতকগুলো অর্থহীন আচারের কুসংস্কার, আর তার থেকে নিরর্থক দলাদলি।

রমেশ। এর কি কোন প্রতিকার নেই জ্যাঠাইমা?

জ্যাঠাইমা। আছে বই কি বাবা। প্রতিকার আছে শুধু জ্ঞানে। যে-পথে

তুই পা দিয়েচিস্ শুধু সেই পথে। তাই ত তোকে বার বার বলি বাবা, তুই যেন তোর জন্মভূমিকে ত্যাগ করে কিছুতে যাস্‌নে। তোর মত বাইরে থেকে যারা বড় হতে পেরেচে, তারা যদি তোরই মত গ্রামে ফিরে আসত, সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন কোরে চলে না যেত, পল্লীগ্রামের এত বড় দুর্গতি হোত না। তারা কখনো গোবিন্দকে মাথায় নিয়ে তোকে দূরে সরাত না।

রমেশ। দূরে যেতে ত আর আমার দুঃখ নেই জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা। কিন্তু এই দুঃখই যে সবচেয়ে বড় দুঃখ রমেশ, কিন্তু আজ যদি কাজের মাঝখানেই সব ছেড়ে দিয়ে চলে যাস্ বাবা, তোর জন্মভূমি তোকে ক্ষমা করবে না।

রমেশ। জন্মভূমি ত শুধু একা আমার নয় জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা। তোর একার বই কি বাবা, শুধু তোরই মা। দেখতে পাস্‌নে মা মুখ ফুটে সন্তানের কাছে কোনদিন কিছুই দাবী করেন না। তাই এত লোক থাকতে কারো কানেই তাঁর কান্না গিয়ে পৌঁছয়নি, কিন্তু তুই আসামাত্রই শুনতে পেয়েচিস্।

রমেশ। (ক্ষণকাল নতমুখে নীরবে থাকিয়া) একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করব জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা। কি কথা রমেশ?

রমেশ। আমি ত তোমাদের জাত-ভেদ মানিনে, কিন্তু তুমি ত মান?

জ্যাঠাইমা। তুই মানিস্‌নে বলে আমি মানব না রে?

রমেশ। কিন্তু আমি ত সকলের ছোঁয়া খাই,—আমার হাতে ত তুমি খেতে পারবে না জ্যাঠাইমা?

জ্যাঠাইমা। পারব না কিরে? তুই আমার বাবা—তাই কি ছোটোখাটো? মস্ত বড় বাবা। মেয়ে হয়ে এতবড় আস্পর্দ্ধার কথা আমি মুখে আনতে পারি রে?

রমেশ। (তৎক্ষণাৎ হেঁট হইয়া তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া) এই আশীর্ব্বাদ আমাকে তুমি কর জ্যাঠাইমা, তোমাকে যেন আমি চিনতে পারি।

জ্যাঠাইমা। (তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিয়া) হয়েচে, হয়েচে। কিন্তু আমার যে এখনো আহ্নিক সারা হয়নি বাবা, একটুখানি বসবি?

রমেশ। না জ্যাঠাইমা, আমার ইস্কুলের বেলা হয়ে যাচ্ছে।

জ্যাঠাইমা। তা হলে যখনি সময় পাবি আসিস্ রমেশ।

[রমেশ ও জ্যাঠাইমার প্রস্থান]

[একদিক দিয়া রমা ও অপর দিক দিয়া দাসীর প্রবেশ]

রমা। জ্যাঠাইমা কোথায় রাধা?

দাসী। এইমাত্র পুজো করতে গেলেন। দেরি হবে না দিদি, একটু বোস না?

[বেণী প্রবেশ করিল, এবং তাহাকে দেখিয়াই দাসী সরিয়া গেল]

বেণী। তোমাকে আসতে দেখেই এলাম রমা। অনেক কথা আছে। মা বুঝি পুজো করতে গেলেন?

রমা। তাই ত রাধা বললে।

বেণী। অনেক চাল ভেবে কাজ করতে হয় দিদি, নইলে শত্রুকে জব্দ করা যায় না। সেদিন মনিবের হুকুমে যে ভজুয়া লাঠি-হাতে বাড়ি চড়াও হয়ে মাছ আদায় করতে এসেছিল সে কথা তুমি যদি না থানায় লিখিয়ে দিতে, আজ কি ব্যাটাকে এমন হাজতে পোরা যেত? অমনি ঐ সঙ্গে রমেশের নামটাও যদি দু'কথা বাড়িয়ে-গুছিয়ে লিখিয়ে দিতিস্ বোন্! আমার কথাটায় তখন তোরা ত কেউ কান দিলিনে।—না না না, তোমাকে সাক্ষী দিতে যেতে হবে না। আর তাই যদি হয়, তাতেই বা কি! জমিদারী রাখতে গেলে কিছুতেই হটলে চলে না; কিন্তু রমেশও কষ্ট দিতে আমাদের ছাড়বে না. দাদামশায়ের লাখো টাকা মেরেচে,—পীরপুরে খুলচে ইস্কুল। এম্‌নিই ত মুসলমান প্রজারা জমিদার বলে মানতে চায় না, তার উপর লেখাপড়া শিখলে জমিদারী রাখা না-রাখা আমাদের সমান হবে তা এখন থেকে বলে রাখচি।

রমা। আচ্ছা বড়দা, বিষয়-সম্পত্তি যদি নষ্ট হয়েই যায় তাতে রমেশদার নিজের ক্ষতিও ত কম নয়?

• বেণী। (ঈষৎ চিন্তা করিয়া) হুঁ। কি জানো রমা, এতে নিজের ক্ষতি ভাববার বিষয়ই নয়। আমরা দু'জনে জব্দ হলেই ও খুশী। দেখচ না এসে পর্য্যন্ত কি রকম টাকা ছড়াচ্চে। ছোটলোকদের মধ্যে 'ছোটবাবু' 'ছোটবাবু' একটা সাড়া পড়ে গেছে। যেন ওই একটা মানুষ, আর আমরা দু'ঘর কিছুই নয়; কিন্তু বেশিদিন এ চলবে না। ওই যে তাকে পুলিশের নজরে তুমি খাড়া করে দিয়েচ বোন, এতেই তাকে শেষ হতে হবে।

রমা। আমি লিখিয়ে দিয়েছিলাম রমেশদা জানতে পেরেচেন?

বেণী। ঠিক জানিনে; কিন্তু জানতে পারবেই। ভজুয়ার মামলায় সব কথাই উঠবে কি না।

রমা। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া) আচ্ছা বড়দা, আজকাল ওঁর নামই বুঝি সকলের মুখে মুখে?

বেণী। হুঁ। তা একরকম তাই বটে। কিন্তু আমিও অল্পে ছাড়ব না রমা। সে লেখাপড়া শিখিয়ে সমস্ত প্রজা বিগড়ে তুলবে, আর জমিদার হয়ে আমি মুখ বুজে সইব তা যেন কেউ স্বপ্নেও না ভাবে। এই ব্যাটা ভৈরব আচায্যি ভজুয়ার হয়ে সাক্ষী দিয়ে কি কোরে মেয়ের বিয়ে দেয়, তা একবার দেখতে হবে।

রমা। কি বল বড়দা?

বেণী। তা একবার নেড়ে-চেড়ে দেখতে হবে না? আমার বিপক্ষে আদালতে দাঁড়িয়ে কি কোরে ছেলে-পুলে নিয়ে গাঁয়ে বাস করে তার খবর নিতে হবে না?—আর আচায্যি তো চুনো-পুঁটি; রুই-কাতলাও আছে। দেখি গোবিন্দ-খুড়ো কি বলে! দেশে ডাকাতি ত লেগেই আছে এবার চাকরকে যদি জেলে পুরতে পারি ত মনিবকে পুরতেও বেশি বেগ পেতে হবে না।

রমা। (অতি বিস্ময়ে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া) বল কি বড়দা, রমেশদাকে দেবে তুমি জেলে?

বেণী। কেন সে কি পীর প্যাগম্বর? বাগে পেলে তাকে ছাড়তে হবে নাকি? তুই বলিস্ কি?

রমা। (মৃদুকণ্ঠে) রমেশদা যদি জেলেই যান, সে কি আমাদেরই কলঙ্ক নয়?

বেণী। কেন? কেন শুনি?

রমা। আমাদেরই আত্মীয়, আমরা না বাঁচালে লোকে ত আমাদেরই ছি ছি করবে।

বেণী। যে যেমন কাজ করবে সে তার তেমন ফল ভুগবে। আমাদের কি?

রমা। রমেশদা ত সত্যিই আর চুরি-ডাকাতি কোরে বেড়ান না। বরঞ্চ পরের ভালর জন্যেই নিজের সর্ব্বস্ব দিচ্ছেন সে কথা ত কারো কাছে চাপা নেই। তার পরে আমাদেরও ত গাঁয়ে মুখ দেখাতে হবে।

বেণী। তোর হ'লো কি বল্ ত বোন্?

রমা। গাঁয়ের লোকে ভয়ে মুখের সামনে কিছু না বলুক, আড়ালে বলবেই। তুমি বলবে আড়ালে রাজার মাকেও ডাইনি বলে। কিন্তু ভগবান ত আছেন? নিরপরাধীকে মিছে কোরে শাস্তি দেওয়ালে তিনি ত রেহাই দেবেন না?

বেণী। হা রে কপাল! সে ছোঁড়া বুঝি ঠাকুর-দেবতা কিছু মানে? শিবের মন্দিরটা ভেঙে পড়চে—মেরামত করবার জন্যে তার কাছে লোক পাঠাতে সে হাঁকিয়ে দিয়ে বলেচে, যারা তোমাদের পাঠিয়েচে তাদের বলগে বাজে খরচ করবার টাকা নেই আমার। শোন কথা! এটা হ'লো বাজে খরচ, আর কাজের খরচ হচ্চে ছোটলোকদের ইস্কুল করে দেওয়া! তা ছাড়া বামুনের ছেলে সন্ধ্যা-আহ্নিক কিছুই করে না, শুনি মোছলমানের হাতে পর্য্যন্ত জল খায়! দু'পাতা ইংরাজী পড়ে আর কি তার জন্ম-জাত আছে দিদি, কিছুই নেই। শাস্তি তার গেছে কোথা? সমস্তই তোলা আছে, তা একদিন সবাই দেখবে।

[রমা নীরব]

বেণী। এখন যাই, সময় মত আর একবার দেখা করব। বাইরে বোধ করি এতক্ষণে গোবিন্দ-খুড়ো এসে বসে আছে।

রমা। আমিও এখন যাই বড়দা। [উভয়ের প্রস্থান]

[রমেশের প্রবেশ]

রমেশ। রাধা, রাধা!

[দাসীর প্রবেশ]

রাধা। কেন ছোটবাবু?

রমেশ। জ্যাঠাইমা কি পূজোর ঘর থেকে বেরিয়েচেন? তখন একটা কথা তাঁকে বলতে ভুলেছিলাম।

রাধা। এখনো বেরোননি। ডেকে দেব?

রমেশ। না না, থাক। বিকেলে আসবো তাঁকে বোলো।

রাধা। আচ্ছা।

[দাসীর প্রস্থান]

[দ্রুতপদে গোপাল সরকারের প্রবেশ]

রমেশ। আপনি এখানে যে?

গোপাল। অপেক্ষা করবার সময় নেই ছোটবাবু, আপনাকে চতুর্দ্দিকে খুঁজে বেড়াচ্চি। শুনেচেন ভৈরব আচায্যির কাণ্ড? শুনেচেন, কি সর্ব্বনাশ আমাদের সে করেচে।

রমেশ। কই না।

গোপাল। কর্ত্তা স্বর্গীয় হলেন, শোকে দুঃখে ভাবলাম আর না, এবারে শান্ত হ'ব। কিন্তু হোতে দিলে না। আপনি কিন্তু আমাকে বাধা দিতে পারবেন না ছোটবাবু, আচায্যিকে আমি শাস্তি দেবো, দেবো, দেবো! এর প্রতিশোধ নেবো, নেবো, নেবো। আমি আজই যাচ্চি সদরে!

রমেশ। ব্যাপার কি সরকারমশাই? আপনার মত শান্ত মানুষে এতখানি উতলা হয়ে উঠেচেন, কি করলেন আচায্যিমশাই?

গোপাল। কি করলেন? নেমকহারাম, শয়তান! তখনি মনে হয়েছিল, যাক ওর ভিটে-মাটি বিক্রী হয়ে, আমরা এতে মাথা দেব না। কিন্তু তখনি ভয় হোলো কর্ত্তা হয়ত স্বর্গে থেকে দুঃখ পাবেন। জানি ত তাঁর স্বভাব। তাই আপনাকে নিষেধ করতে পারলাম না।

রমেশ। তবুও যে কিছুই বুঝলাম না সরকারমশাই?

গোপাল। সেদিন আপনার আদেশ-মত সদরে গিয়ে ওর ডিক্রীর টাকাটা জমা দিয়ে মকদ্দমার সমস্ত ব্যবস্থা স্থির কোরে এলাম, আর আজ এইমাত্র খবর পেলাম

শরত্ ভৈরব আচায্যি নিজে গিয়ে দরখাস্ত কোরে মামলা তুলে নিয়েচে, দেনা স্বীকার করেচে।

রমেশ। তার মানে?

গোপাল। তার মানে জমা দেওয়া অতগুলো টাকা আমাদের গেল। আমাদের মাথায় কাঁটাল ভেঙে তিনজনে এখন বখরা করে খাবে। গোবিন্দ গাঙুলী, বড়বাবু, আর ও নিজে। শোনেননি সকাল থেকে আচায্যি-বাড়িতে রসুন-চৌকির সানাইয়ের বাদ্যি? ঘটা কোরে হবে দৌহিত্রের অন্নপ্রাশন, ওই টাকায় দেশশুদ্ধ বামুনের দল ফলার কোরে বাঁচবে। অথচ আপনার স্থান নেই,—স্থান হয়েচে গোবিন্দ গাঙুলীর। আপনাকে করেছে তারা 'একঘরে'।

রমেশ। ভৈরব আচায্যি? পারলে করতে সে?

গোপাল। পারলে বৈ কি। পাড়াগাঁয়ের লোকে পারে না যে কি তাই শুধু আমার জানতে বাকী। আমি চললাম।

রমেশ। যান। আমি শুধু ভাবি, এ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত হবে কিসে?

গোপাল। আমার সাক্ষী আছে, আদালত খোলা আছে, আমি তাকে সহজে ছাড়ব না ছোটবাবু।

[প্রস্থান]

রমেশ। জানিনে আইনে কি বলে। জানিনে কৃতঘ্নতার দণ্ড আদালতে হয় কি-না। কিন্তু থাক্ সে! আমি নিলাম আজ নিজের হাতে এই ভার। কেবল সহ্য করে যাওয়াই জগতে পরম ধর্ম্ম নয়।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ভৈরব আচার্য্যের বহির্ব্বাটী। দৌহিত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে দ্বারে মঙ্গলঘট স্থাপিত হইয়াছে। আম্রপল্লবের মালা গাঁথিয়া সম্মুখে ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে রসুনচৌকি বাদ্যকরের দল উপবিষ্ট। সম্মুখের বারান্দায় বসিয়া গোবিন্দ গাঙ্গুলী, বেণী ঘোষাল প্রভৃতি ভদ্রলোক। কেহ হাসিতেছে, কেহ ধূমপান করিতেছে। একজন বৈষ্ণব ও তাহার বৈষ্ণবী কীর্ত্তন গাহিতেছিল, এবং তাহাই সকলে পরমানন্দে শ্রবণ করিতেছে। গান শেষ হইলে দীনু ভট্টাচার্য্য হুঁকা রাখিয়া বাহিরে যাইতেছিল, এমনি সময়ে রমেশ আসিয়া প্রবেশ করিল। দেখিলেই বুঝা যায় সে অতিশয় উত্তেজিত হইয়া আসিয়াছে। তাহার অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে উপস্থিত সকলেই চঞ্চল হইয়া উঠিল।]

গান

শ্রীমতী করিছে বেশ।
ভুলাতে নাগর
শ্যাম নটবর
নানা ছাঁদে বাঁধে কেশ।
(আহা) শ্রীমতী করিছে বেশ।
হেরিয়া মুকুরে
চাঁচর চিকুরে
বিনায়ে বিনায়ে বিনোদ গোখুরে
রাধা বাঁধিল কবরী কত
কেহ হ'ল নাক মনোমত (হায় রে)
ফণি-গঞ্জিত বেণী বিনোদিনী
দুলাইয়া দিক শেষ
(আহা) শ্রীমতী করিছে বেশ।

বেণী গেল ছুটি
লজ্জিয়া কটি
পরশি মেখলা নিতম্বে লুটি
চুম্বিয়া পাদদেশ।
উজ্জ্বল দু'টি নয়নপ্রান্তে কজ্জল নিল টানি
ফুলধনু জিনি ভ্রূযুগ মাঝে দীপ সম টিপখানি।
ভরিয়া দু'করে স্বর্ণবিন্দু
মার্জ্জিল ধনী বদন ইন্দু
নন্দিতে শ্যামসুন্দর-হৃদি—বন্দিতে কমলেশ।

রমেশ। আচায্যিমশাই কই?

দীনু। (কাছে আসিয়া) চল বাবা, চল, বাড়ি ফিরে চল। তুমি যে উপকার আচায্যির করেচো সে ওর বাবা করতো না। কিন্তু উপায় ত নেই। কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে সকলকেই ঘর করতে হয়, তোমাকে নেমন্তন্ন করতে গেলে,—বুঝলে না বাবা,—ভৈরবকে নেহাৎ দোষ দেওয়াও যায় না। তোমরা সব আজকালকার সহরের ছেলে, জাত-টাত ত তেমন মানো না—তা'তেই বুঝলে না বাবা,—দু'দিন পরে ওর ছোট মেয়েটা বছর বারোর হ'লো ত,—পার করতেও ত হবে,—আমাদের সমাজের ব্যাপার বুঝলে না বাবা—

রমেশ। আজ্ঞে হাঁ বুঝেচি। তিনি কই?

দীনু। আছে আছে বাড়িতেই আছে। কিন্তু বামুনকেই বা দোষ দিই কি কোরে। (সকলের দিকে চাহিয়া) আমাদের বুড়োমানুষের পরকালের ভয়ও ত একটা—

রমেশ। সে ত ঠিক কথা। কিন্তু ভৈরব কোথায়?

[ভৈরবের প্রবেশ]

ভৈরব। (সবিনয়ে বেণীবাবুর উদ্দেশে) দেখুন বড়বাবু, আপনার পাছে কষ্ট হয়—

[অকস্মাৎ সম্মুখে রমেশকে দেখিয়া বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া গেল]

রমেশ। (দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া তাহার একটা হাত সবলে চাপিয়া ধরিয়া) কেন এমন করলেন? আজ আমি—

ভৈরব। বড়বাবু—গোবিন্দ গাঙুলীমশাই—দেখুন না একবার—

রমেশ। (ভৈরবকে সজোরে একটা ঝাঁকুনি দিয়া) বড়বাবু, গোবিন্দ—আজ আমি সবাইকে দেখাবো! বলুন কেন এ-কাজ করলেন?

[বেণী প্রভৃতি সকলের দ্রুতবেগে প্রস্থান]

ভৈরব। (কাঁদিয়া উঠিয়া) লক্ষ্মীরে, পুলিসে খবর দে রে। মেরে ফেললে রে—

রমেশ। চুপ! বলুন, কিসের জন্যে এ-কাজ করলেন?

ভৈরব। মেরে ফেললে রে! বাবারে!

রমেশ। মেরেই ফেলবো। আজ তোমাকে খুন করে তবে বাড়ি যাবো।

[এই বলিয়া সে পুনঃ পুনঃ ঝাঁকুনি দিতে লাগিল। লক্ষ্মী আসিয়া পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে বহু লোক সমবেত হইয়া চারিদিক হইতে উঁকি-ঝুঁকি মারিতে লাগিল]

[দ্রুতবেগে রমার প্রবেশ]

রমা। (রমেশের হাত চাপিয়া ধরিয়া) হয়েচে,—এবার ছেড়ে দাও।

রমেশ। কেন শুনি?

রমা। এই লোকটার গায়ে তুমি হাত দেবে?

রমেশ। একে আমি কিছুতেই ছাড়বো না।

রমা। (জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া দিয়া) এত লোকের মাঝখানে তোমার লজ্জা করে না, কিন্তু আমি যে লজ্জায় মরে যাই রমেশদা। বাড়ি যাও।

রমেশ। (মুহূর্ত্তকাল বিহ্বল-চক্ষে তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া) আচ্ছা। বাড়িই চললাম।

[রমেশ ধীরে ধীরে প্রস্থান করিতে বেণী, গোবিন্দ প্রভৃতি সকলে ভিড় করিয়া আসিয়া পড়িল। ভৈরব বসিয়া পড়িয়া দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল]

গোবিন্দ। বাড়ি চড়াও হয়ে যে আধমরা করে গেল, এর কি করবে এখন সেই পরামর্শ করো।

বেণী। আমিও ত তাই বলি।

রমা। কিন্তু এ-পক্ষের দোষও ত কম নয় বড়দা? তা ছাড়া হয়েচেই বা কি যে, এই নিয়ে হৈ চৈ করতে হবে।

বেণী। বল কি রমা, এ কি সোজা ব্যাপার হোলো? আমরা সবাই না থাকলে ত সে খুন করে যেতো।

রমা। করলে ত আমরা আটকাতে পারতাম না বড়দা।

লক্ষ্মী। তুমি ত ওর হয়ে বলবেই রমাদিদি। তোমার বাপকে কেউ ঘরে ঢুকে মেরে ফেলে গেলে কি করতে বল ত?

রমা। আমার বাপ ও তোমার বাপে অনেক তফাৎ লক্ষ্মী, তুমি সে তুলনা কোরো না; কিন্তু আমি কারও হয়েই কথা বলিনি, ভালোর জন্যেই বলেচি।

লক্ষ্মী। বটে! ওর হয়ে কোঁদল করতে তোমার লজ্জা করে না? বড়লোকের

মেয়ে বলে কেউ ভয়ে কথা বলে না, নইলে কে না শুনেচে? তুমি বলে তাই মুখ দেখাও, আর কেউ হলে গলায় দড়ি দিতো।

বেণী। (লক্ষ্মীকে তাড়া দিয়া) তুই থাম্ না লক্ষ্মী—কাজ কি ও-সব কথায়?

লক্ষ্মী। কাজ নেই কেন! যার জন্যে বাবাকে এত দুঃখ পেতে হোলো তার হয়েই উনি কোঁদল করবেন? বাবা যদি আজ মারা যেতেন?

রমা। (লক্ষ্মীর প্রতি) লক্ষ্মী, ওঁর মত লোকের হাতে মরতে পাওয়া ভাগ্যের কথা। আজ মারা পড়লে তোমার বাবা স্বর্গে যেতে পারতো।

লক্ষ্মী। তাইতেই বুঝি তুমি মরেচো রমাদিদি?

রমা। (ক্ষণকাল নীরবে তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল) কিন্তু কথাটা কি তুমিই বল ত বড়দা।

বেণী। কি কোরে জানবো বোন। লোকে কত কথা বলে—তাতে কান দিলে ত চলে না।

রমা। লোকে কি বলে?

বেণী। বললেই বা রমা। লোকের কথাতে ত গায়ে ফোস্কা পড়ে না। বলুক না।

রমা। তোমার গায়ে হয়ত কিছুতেই ফোস্কা পড়ে না, কিন্তু সকলের গায়ে ত গণ্ডারের চামড়া নেই? কিন্তু লোককে এ-কথা বলাচ্চে কে? তুমি!

বেণী। আমি?

রমা। তুমি ছাড়া আর কেউ নয়। পৃথিবীতে কোন দুষ্কর্ম্মই ত তোমার বাকী নেই,—জাল, জোচ্চুরি, চুরি, ঘরে আগুন দেওয়া সবই হয়ে গেছে, এটাই বা বাকী থাকে কেন। মেয়েমানুষের এত বড় সর্ব্বনাশ যে আর নেই সে বোঝবার তোমার শক্তি নেই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কিসের জন্য এ শত্রুতা তুমি করে বেড়াচ্ছো? এ কলঙ্ক রটিয়ে তোমার লাভ কি?

বেণী। আমার লাভ কি হবে? লোকে যদি তোমাকে রাত্রে রমেশের বাড়ি থেকে বার হতে দেখে,—আমি করব কি?

রমা। এত লোকের সামনে আর সব কথা আমি বলতে চাইনে, কিন্তু তুমি মনে কোরো না বড়দা, তোমার মনের ভাব আমি টের পাইনি? কিন্তু তুমি নিশ্চয় জেনো, আমি রমা। যদি মরি, তোমাকেও জ্যান্ত রেখে যাবো না।

[দ্রুতবেগে প্রস্থান]

গোবিন্দ। অ্যাঁ? এ হোলো কি বড়বাবু? তোমাকেও চোখ রাঙিয়ে যায়,—মেয়েমানুষ হয়ে? আমি বেঁচে থেকে এও চোখে দেখতে হবে?

বেণী। (নিজের ললাট স্পর্শ করিয়া) কারও দোষ নয় খুড়ো, দোষ এর।

কলিকাল,—এরই নাম কাল-মাহাত্ম্য। ভালো ছাড়া কখনো কারো মন্দ করিনে, মন্দ করার কথা ভাবতে পারিনে। জগতে আমার এমন হবে না তো হবে কার? বিদ্যাসাগরের কি হয়েছিল? গল্প শুনেচো ত!

গোবিন্দ। তা আর শুনিনি!

বেণী। তবে তাই। দোষ দেবো কাকে? (ভৈরবকে দেখাইয়া) এঁকে রক্ষা করতে না যেতাম ত কোন কথাই হতো না! কিন্তু সে ত আর আমি প্রাণ থাকতে পারিনে।

তৃতীয় দৃশ্য

বনাকীর্ণ নির্জ্জন গ্রাম্য পথ

[রমেশ দ্রুতপদে প্রবেশ করিল। রমা অন্তরাল হইতে ডাকিল—রমেশদা! এবং পরক্ষণেই সম্মুখে আসিয়া হাজির হইল]

রমেশ। রমা! এতদূ'র এই নির্জ্জন পথে তুমি?

রমা। আমি জানি পীরপুরের ইস্কুলের কাজ সেরে এই পথে তুমি নিত্য যাও।

রমেশ। তা যাই। কিন্তু তুমি কেন?

রমা। শুনেছিলাম এখানে আর তোমার শরীর ভাল থাকচে না। এখন কেমন আছো?

রমেশ। ভালো নয়। মনে হয় রোজ রাত্রেই যেন জ্বর হয়।

রমা। তা হলে কিছুদিন বাইরে ঘুরে এলে ভাল হয়।

রমেশ। (হাসিয়া) ভাল ত হয় জানি, কিন্তু যাই কি কোরে?

রমা। হাসলেন যে বড়? আপনি বলবেন আপনার অনেক কাজ, কিন্তু এমন কাজ কি আছে যা নিজের শরীরের চেয়েও বড়?

রমেশ। নিজের শরীরটা যে ছোট জিনিস তা আমি বলিনে। কিন্তু এমন কাজ মানুষের আছে যা এই দেহটার চেয়েও বড়। কিন্তু সে ত তুমি বুঝবে না রমা।

রমা। আমি বুঝতেও চাইনে। কিন্তু আপনাকে আর কোথাও যেতেই হবে। সরকারমশাইকে বলে দিয়ে যান আমি তাঁর কাজ-কর্ম্ম দেখবো।

রমেশ। তুমি দেখবে আমার কাজ-কর্ম্ম?

রমা। কেন, পারবো না?

রমেশ। পারবে। হয়ত আমার নিজের চেয়েও ভাল পারবে, কিন্তু পেরে কাজ নেই। আমি তোমাকে বিশ্বাস করবো কি কোরে?

রমা। রমেশদা, ইতরে বিশ্বাস করতে পারে না। কিন্তু তুমি পারবে। তুমি না পারলে সংসারে বিশ্বাস করার কথাটা উঠে যাবে। আমাকে এই ভারটুকু তোমার দিয়ে যাও!

রমেশ (ক্ষণকাল নীরবে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া) আচ্ছা ভেবে দেখি।

রমা। কিন্তু ভাববার ত সময় নেই। আজই তোমাকে আর কোথাও যেতে হবে। না গেলে—

রমেশ। (পুনশ্চ তাহার মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া) তোমার কথার ভাবে মনে হয়, না গেলে আমার বিপদের সম্ভাবনা। ভালো, যাই-ই যদি তাতে তোমার লাভ কি? আমাকে বিপদে ফেলতে তুমি নিজেও ত কম চেষ্টা করোনি যে, আজ আর একটা বিপদে সতর্ক করতে এসেচো। সে-সব কাণ্ড এত পুরোনো হয় নি যে তোমার মনে নেই। বরঞ্চ খুলে বলো আমি চলে গেলে তোমার নিজের কি সুবিধে হয়,—হয়ত তোমার জন্যে আমি রাজি হতেও পারি।

রমা। (এই কঠিন আঘাতে রমার মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল, কিন্তু আপনাকে সে সামলাইয়া লইল) আচ্ছা, খুলেই বলচি। তুমি গেলে আমার ভাল কিছুই নেই, কিন্তু না গেলে অনেক ক্ষতি। আমাকে সাক্ষী দিতে হবে।

রমেশ। এই? মাত্র এইটুকু? কিন্তু সাক্ষী না দিলে?

রমা। না দিলে আমার মহামায়ার পুজোয় কেউ আসবে না, আমার যতীনের উপনয়নে কেউ খাবে না, আমার বার-ব্রত, ধর্ম্ম-কর্ম্ম,—না রমেশদা, তুমি যাও, তোমাকে আমি মিনতি করচি। থেকে, সব দিক দিয়ে আমাকে নষ্ট কোরো না। তুমি যাও—যাও এদেশ থেকে।

রমেশ। (একমুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া) বেশ, আমি যাবো। আমার আরব্ধ কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই যাবো—কিন্তু নিজের কাছে নিজেকে কি জবাব দেব?

রমা। জবাব নেই। আর কেউ হলে জবাবের অভাব ছিল না, কিন্তু এক অতি ক্ষুদ্র নারীর অখণ্ড স্বার্থপরতার উত্তর তুমি কোথায় খুঁজে পাবে রমেশদা! তোমাকে নিরুত্তরে যেতে হবে।

রমেশ। বেশ, তাই হবে। কিন্তু আজ আমার সাধ্য নেই।

রমা। সত্যিই সাধ্য নেই?

রমেশ। না? তোমার সঙ্গে কে আছে তাকে ডাকো।

রমা। সঙ্গে আমার কেউ নেই। আমি একাই এসেচি।

রমেশ। একাই এসেচো? সে কি কথা রাণী,—একলা এলে কোন্ সাহসে?

রমা। সাহস এই ছিল যে, আমি নিশ্চয় জানতাম এই পথে তোমার দেখা পাবো। তার পরে আমার ভয় কিসের?

রমেশ। ভালো করোনি রমা, অন্ততঃ তোমার দাসীকেও সঙ্গে আনা উচিত ছিল। এই নিস্তব্ধ জনহীন পথে আমাকেও ত তোমার ভয় করা কর্ত্তব্য।

রমা। তোমাকে? ভয় করবো আমি তোমাকে?

রমেশ। নয় কেন?

রমা। (মাথা নাড়িয়া) না, কোনমতেই না। আর যা খুশি উপদেশ দাও রমেশদা, সে আমি শুনবো। কিন্তু তোমাকে ভয় করবার ভয় আমাকে দেখিয়ো না।

রমেশ। আমাকে তোমার এতই অবহেলা?

রমা। হাঁ, এতই অবহেলা। বলছিলে, দাসীকে সঙ্গে না এনে ভালো করিনি। কিন্তু কিসের জন্যে শুনি? ভেবেচো তোমার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে দাসীর শরণাপন্ন হবো? রমার চেয়ে তোমার কাছে সে-ই হবে বড়?

[রমেশ নিঃশব্দে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল]

মনে নেই সকালের কথা? সেখানে লোকের অভাব ছিল না। তবু সেই মূর্ত্তি দেখে সবাই যখন ভয়ে পালিয়ে গেল তখন কে রক্ষে করেছিল ভৈরব আচায্যিকে? সে রমা। দাসী-চাকরের তখন প্রয়োজন হয়নি, এখনও হবে না। বরঞ্চ, আজ থেকে তুমিই রমাকে ভয় কোরো। আর এই কথাটাই বলবার জন্যে আজ এসেছিলাম।

রমেশ। তা হলে নিরর্থক এসেচো রমা। ভেবেছিলাম তোমার নিজের কল্যাণের জন্যই আমাকে চলে যেতে বলচো। কিন্তু তা যখন নয়, তখন আমাকে সতর্ক করবার প্রয়োজন দেখতে পাইনে।

রমা। সমস্ত প্রয়োজনই কি সংসারের চোখে দেখা যায় রমেশদা।

রমেশ। যায় না তা আমি স্বীকার করিনে। চললাম।

[প্রস্থান]

রমা। (অকস্মাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া) যে অন্ধ তাকে আমি দেখাবো কি দিয়ে!

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[রমার পূজার দালানের একাংশ। দুর্গা-প্রতিমা স্পষ্ট দেখা যায় না বটে, কিন্তু পূজার যাবতীয় আয়োজন বিদ্যমান। সময় অপরাহ্ণ-প্রায়। এ-বেলার মত পূজার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেছে। একধারে রমা স্থির হইয়া বসিয়াছিল, তাহার বাটীর সরকার প্রবেশ করিয়া কহিল]

সরকার। মা, বেলা যায়, কিন্তু শূদ্দুররা তো কেউ এলো না। একবার ঘুরে দেখে আসবো কি?

রমা। কেউ এলো না?

সরকার। কই না।

[হুঁকা হাতে করিয়া বেণী ঘোষালের প্রবেশ]

বেণী। ইস্। এত খাবার-দাবার নষ্ট কোরে দিতে বসেচে দেশের ছোটলোকের দল! এত বড় আস্পর্দ্ধা! কিন্তু ব্যাটাদের শেখাবো, শেখাবো, শেখাবো! চাস কেটে যদি না তুলে দিই তো আমি—

[রমা তাহার মুখের পানে চাহিয়া একটুখানি হাসিল। কিছু বলিল না]

না, না, এ হাসির কথা নয় রমা, বড় সর্ব্বনেশে কথা! একবার যখন জানবো এর মূলে কে, তখনই এই এমনি কোরে ছিঁড়ে ফেলব—আরে হারামজাদা ব্যাটারা এ বুঝিসনে যে, যার জোরে তোরা জোর করিস্ সেই রমেশবাবু যে নিজে জেলের ঘানি টেনে মরচেন! তোদের মারতে কতটুকু সময় লাগে?—ভৈরব আচায্যিকে ছুরি মারতে ঢুকেছিল, হাতে এতো বড়ো ভোজালি স্পষ্ট প্রমাণ করে দিলাম। কই, কোন শালা আটকাতে পারলে না? আরে মনে করি যদি তো রাতকে দিন, দিনকে রাত করে দিতে পারি যে! আচ্ছা—আরো খানিকটা দেখি, তার পরে—শাস্তরে বলেচে যথা ধর্ম্ম তথা জয়ঃ। শূদ্দুর হয়ে বামুনবাড়ির ধর্ম্ম-কর্ম্মের ওপর আড়ি? আচ্ছা—

[প্রস্থান]

[ধীরে ধীরে বিশ্বেশ্বরীর প্রবেশ]

বিশ্বেশ্বরী। রমা!

রমা। কেন মা?

বিশ্বেশ্বরী। চুপটি কোরে বসে আছিস্ মা, কে বল্‌বে মানুষ। ঠিক যেন কে মাটির মূর্ত্তি গড়ে রেখেচে। (ধীরে ধীরে তাহার পাশে বসিয়া) সে হাসি নেই, সে উল্লাস নেই,—যেন কোথায় কোন্ বহু দূরে চলে গেছিস্।

রমা। (ঈষৎ হাসিয়া) বাড়ির ভেতর এতক্ষণ কি করছিলে জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী। তোমার যজ্ঞি-বাড়িতে তো কাজ কম নেই মা। অন্ন-ব্যঞ্জনের যেন পাহাড় জমিয়ে তুলেচ।

রমা। এবারে কিন্তু সমস্ত নিষ্ফল। বোধ করি একজন চাষাও আমার বাড়িতে মায়ের প্রসাদ পেতে আসবে না। কিন্তু অন্যান্য বারের কথা জানো ত জ্যাঠাইমা, এই সপ্তমীর দিনে প্রজাদের ভিড় ঠেলে বাড়িতে ঢুকতে পারা যেত না।

বিশ্বেশ্বরী। এখনো বলা যায় না রমা। হয়ত সন্ধ্যের পরে সবাই আসবে।

রমা। না, আসবে না জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা। সবাই ওই কথাই বলচে। বেণী, গোবিন্দঠাকুরপো রাগে দাপাদাপি করে করে বেড়াচ্ছে, ভেতরে তোর মাসীর গালাগালির জ্বালায় কান পাতবার জো নেই, কেবল তোর মুখেই নালিশ নেই। সে রাগ নেই, অভিমান নেই,—তোর চোখের পানে চাইলে মনে হয় যেন ওর নীচে কান্নার সমুদ্র চাপা আছে। কেমন কোরে এমন বদলে গেলি মা?

রমা। রাগ করব কাদের ওপর জ্যাঠাইমা? প্রজাদের ওপরে? গরীব বলে কি তাদের সম্ভ্রমবোধ নেই? তারা আমার মত পাপিষ্ঠার অন্ন গ্রহণ করবে কেন?

বিশ্বেশ্বরী। তোমাকে পাপিষ্ঠা বলে কার সাধ্য মা?

রমা। বললেও তো অন্যায় হয় না। তারা জানে আমরা তাদের ভালোবাসিনে, আমরা তাদের আপনার জন নই। আমরা তো আদর কোরে আহ্বান করিনে মা, আমরা জোর কোরে হুকুম করি দুটো খেয়ে যাবার জন্যে। তাই তাদের না আসায় আমরা রাগে ক্ষেপে উঠি।—কিন্তু আদর যে কি সে স্বাদ তারা পেয়েচে, ভালোবাসা যে কি সে তারা রমেশদার কাছে জেনেচে। তাদের সেই বন্ধুকেই আমরা যখন মিথ্যে মামলায় মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে জেলে পুরে এলাম, এ-দুঃখ তারা ভুলবে কি করে জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী। কিন্তু তুমি ত মিথ্যে সাক্ষী দাওনি মা?

রমা। দিইনি আমি? তাদের বড় আশা ছিল, আর যেই কেন না মিথ্যে বলুক, আমি বলতে পারব না। কিন্তু বলতেও ত পারলাম। মুখে ত বাধল না! আচায্যি-মশায়ের কত বড় অপরাধ, কত বড় কৃতঘ্নতা যে রমেশদাকে আত্মবিস্মৃত করেছিল, সে ত আমি জানি। আমি ত জানি তাঁর হাতে একটা তৃণ পর্য্যন্ত ছিল

না, তবু আদালতে দাঁড়িয়ে স্মরণ করতেই পারলাম না, হাতে তাঁর ছুরি-ছোরা ছিল কি না!

বিশ্বেশ্বরী। রমা—

রমা। জ্যাঠাইমা, তুমি বলছিলে মিথ্যে তো আমি বলিনি। এখানকার আদালতে হলফ কোরে মিথ্যে হয়ত আমি বলিনি, কিন্তু যে-আদালতে হলফ করার বিধি নেই, সেখানে আমি কি জবাব দেবো? উঃ—ভগবান! সত্য-গোপনের যে এত বড় বোঝা এ আমাকে তুমি আগে জানতে দাওনি কেন?

বিশ্বেশ্বরী। কিন্তু আমি তোমাকে বলচি মা, শাস্তি তার হয়েচে সত্যি, কিন্তু অকল্যাণ তার কখনো হবে না।

রমা। হবে কি কোরে জ্যাঠাইমা, আজ সমস্ত অকল্যাণের ভার এসে পড়েছে যে আমার মাথার ওপর।

বিশ্বেশ্বরী। একলা তোমার মাথায় পড়েনি মা, আমরা সবাই মিলে তাকে ভাগ কোরে নিয়েচি! অসত্যাচারী সমাজের যে কাপুরুষের দল মিথ্যে দুর্নামের ভয় দেখিয়ে তোমাকে ছোট করেচে, এ পাপের ভারে তাদের মাথা আজ পথের ধূলায়। বেণীর মা আমি, আমার মাথা মাটিতে লুটোচ্চে রমা, কখনও আর তুলতে পারব না।

রমা। অমন কথা তুমি বোলো না জ্যাঠাইমা। কিন্তু আমি কি করেছিলাম জানো? জনশূন্য অন্ধকার-পথে একলা দেখা কোরে সেধেছিলাম, রমেশদা, তুমি যাও,—যাও এখান থেকে। বিশ্বাস করলেন না, বললেন, আমি চলে গেলে তোমার লাভ কি? আমার লাভ? হঠাৎ ব্যথার ভারে যেন পাগল হয়ে গেলাম। বললাম, লাভ কিছুই নেই,—কিন্তু না গেলে আমার অনেক ক্ষতি। আমার মহামায়ার পূজোয় কেউ আসবে না, আমার যতীনের উপনয়নে কেউ খাবে না,—তুমি দেশে থেকে আমাকে সকল দিক দিয়ে নষ্ট কোরো না। কিন্তু এত বড় মিথ্যে আমি কোথায় পেলাম জ্যাঠাইমা? রাগ কোরে বললেন, এই? এইমাত্র? না, এর জন্যে আমার কাজ ছেড়ে আমি কোনমতেই যাব না। অভিমানে ভাবলাম, তবে হোক একটা শিক্ষা। বিশ্বাস ছিল, সামান্য কিছু একটা জরিমানা হবে। কিন্তু সে শাস্তি যে এমনি কোরে আসবে,—তাঁর রোগশীর্ণ মুখের পানে চেয়েও বিচারকের দয়া হবে না,—তাঁকে জেলে দেবে এ-কথা আমার অতি বড় দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারিনি জ্যাঠাইমা।

বিশ্বেশ্বরী। সে জানি মা।

রমা। শুনলাম, আদালতে তিনি কেবল আমার পানেই চেয়ে ছিলেন। তাঁর গোপাল সরকার চাইলেন আপিল করতে, তিনি বললেন, না। সারা জীবন যদি জেলের মধ্যে বাস করতে হয় সেও ঢের ভাল, কিন্তু আপিল করে খালাস পেতে চাইনে। এ শাস্তি আমার কত বড় বল ত জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী। কিন্তু তার মিয়াদের কালও পূর্ণ হয়ে এলো। মুক্তি পেতে আর বেশি দিন নেই।

রমা। তাঁর মুক্তি হবে, কিন্তু তাঁর সেই নিবিড় ঘৃণা থেকে ইহজীবনে আমার ত মুক্তি নেই মা।

[বৃদ্ধ সনাতন হাজরাকে লইয়া বেণীর প্রবেশ]

বেণী। এই আমাদের তিনপুরুষের প্রজা। সুমুখ দিয়ে যাচ্ছিলেন, ডাকতে-তবে বাড়ি ঢুকলেন। হাঁরে সনাতন, এত অহঙ্কার কবে থেকে হোল রে? বলি তোদের ঘাড়ে কি আর একটা কোরে মাথা গজিয়েচে রে?

সনাতন। দুটো করে মাথা আর কার থাকে বড়বাবু? আপনাদেরই থাকে না ত আমাদের মত গরীবের।

বেণী। কি বললি রে হারামজাদা!

সনাতন। দুটো মাথা কারো থাকে না বড়বাবু, সেই কথাই বলেচি,—আর কিছু নয়।

[গোবিন্দ গাঙুলীর প্রবেশ]

গোবিন্দ। তোদের বুকের পাটা শুধু দেখচি আমরা! মায়ের প্রসাদ পেতেও কেউ তোরা এলিনে, বলি, কেন বল্ ত রে?

সনাতন। (হাসিয়া) আর বুকের পাটা! যা করবার সে ত আমার করেচেন। সে যাক। কিন্তু মায়ের প্রসাদই বলুন, আর যাই বলুন, কোন কৈবর্ত্তই আর বামুন-বাড়িতে পাত পাতবে না। এত পাপ যে মা বসুমাতা কেমন করে সইচেন, তাই আমরা কেবল বলাবলি করি। (নিশ্বাস ফেলিয়া রমার প্রতি চাহিয়া) একটু সাবধানে থেকো দিদিঠাকরুণ, পীরপুরের ছোঁড়ার দলটা একেবারে ক্ষেপে রয়েচে। এর মধ্যেই দু'তিনবার তারা বড়বাবুর বাড়ির চারপাশে ঘুরে গেছে—সামনে পায়নি তাই রক্ষে। (বেণীর প্রতি) একটু সামলে-সুমলে থাকবেন বড়বাবু, রাতবিরেতে আর বার হবেন না।

[বেণী কি-একটা বলিতে গেল, কিন্তু ভয়ে তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।]

রমা। (স্নেহার্দ্র-কণ্ঠে) সনাতন, ছোটবাবুর জন্যেই বুঝি তোমাদের সব রাগ এত?

সনাতন। মিথ্যে বোলে আর নরকে যাব না দিদিঠাকরুণ, তাই বটে। তবে, পীরপুরের লোকগুলোর রাগটাই সবচেয়ে বেশি। তারা ছোটবাবুকে দেবতা মনে করে।

রমা। (আনন্দোজ্জ্বল মুখে) তাই নাকি সনাতন?

বেণী। (সনাতনের হাত চাপিয়া ধরিয়া) তোকে একবার দারোগার কাছে

গিয়ে বলতে হবে সনাতন। তুই যা চাইবি তাই দেব। তোর সেই সাবেক দু'বিঘে জমি ছাড়িয়ে নিতে চাস্ ত তাই পাবি। ঠাকুরঘরে বসে দিব্বি করচি সনাতন, বামুনের কথাটা রাখ্।

সনাতন। সে দিনকাল আর নেই বড়বাবু—সে দিনকাল আর নেই। ছোটবাবু সব উল্টে দিয়ে গেছেন।

গোবিন্দ। বামুনের কথা তা হলে রাখবিনে বল্?

সনাতন। (মাথা নাড়িয়া) না। বললে তুমি রাগ করবে গাঙুলিমশাই, কিন্তু সেদিন পীরপুরের নূতন ইস্কুলঘরে ছোটবাবু বলেছিলেন, গলায় গাছকতক সুতো ঝোলানো থাকলেই বামুন হয় না। আমি ত আর আজকের নই ঠাকুর, সব জানি। যা কোরে তোমরা বেড়াও সে কি বামুনের কাজ? তোমাকেই জিজ্ঞাসা করচি দিদিঠাকরুণ, তুমিই বল দিকি!

[রমা নিরুত্তরে মাথা হেঁট করিল]

সনাতন। (মনের আক্রোশ মিটাইয়া বলিতে লাগিল) বিশেষ কোরে ছোঁড়াদের দল। এই দুটো গাঁয়ের যত ছোকরা সন্ধ্যের পরে সবাই গিয়ে জোটে মোড়লের বাড়িতে। তারা ত স্পষ্ট বলে বেড়াচ্ছে জমিদার ত ছোটবাবু। আর সব চোর-ডাকাত। তা ছাড়া খাজনা দিয়ে বাস করব, ভয় কারুকে করব না। আর বামুনের মত থাকে ত বামুন, নইলে, আমরাও যা তারাও তাই।

বেণী। (আতঙ্কে পরিপূর্ণ হইয়া) সনাতন, আমার ওপরেই কেন এত রাগ, বলতে পারিস?

সনাতন। তা আর পারিনে বড়বাবু? আপনিই যে সকল নষ্টের গোড়া তা কারও জানতে বাকী নেই।

[বেণী চুপ করিয়া রহিল; ভয়ে বুকের ভিতর তাহার ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছিল]

বিশ্বেশ্বরী। গাঙুলী-ঠাকুরপো; ছোটলোকের মুখে এত আস্পর্দ্ধার কথা শুনেও যে বড় চুপ করে আছ?

[বেণী বক্রচক্ষে মায়ের প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়াও নীরব হইয়া রহিল]

গোবিন্দ। হাঁ সনাতন, বিপিন মোড়লের বাড়িতেই তা হলে আড্ডা বল্? সেখানে কি করে তারা বলতে পারিস?

সনাতন। কি করে তা জানিনে। কিন্তু ভাল চাও ত কু-মতলব কোরো না ঠাকুর। তারা ছোট-বড় সবাই ভাই সম্পর্ক পাতিয়েচে। এক মন, এক প্রাণ। ছোটবাবুর জেল হওয়া থেকে সব রাগে বারুদ হয়ে আছে, তার মধ্যে গিয়ে চক্‌মকি ঠুকে আগুন জ্বালতে যেয়ো না গাঙুলীমশাই। এই তোমাদের সাবধান করে দিয়ে গেলাম।

[সনাতন প্রস্থান করিলে সকলেই কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া]

বেণী। ব্যাপার শুনলে রমা?

[রমা মুচকিয়া হাসিল, কথা কহিল না। হাসি দেখিয়া বেণীর গা জ্বলিয়া গেল]

বেণী। শালা ভৈরবের জন্যেই এত কাণ্ড। আর তুমি না যাবে সেখানে, না তাকে ছাড়িয়ে দেবে তো এ-সব কিছুই হয় না। খেতো শালা মার,—তোমার কি!

[রমা পুনরায় একটু হাসিল, জবাব দিল না]

বেণী। তুমি ত হাসবেই রমা। মেয়েমানুষ, বাড়ির বার হতে ত হয় না—কিন্তু আমাদের উপায় কি হবে বল ত? সত্যি-সত্যিই যদি একদিন মাথা ফাটিয়ে দেয়? মেয়েমানুষের কাজ করতে গেলেই এই দশা হয়।

[রমা বিস্মিত-মুখে শুধু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল]

বেণী। গোবিন্দ-খুড়ো, চুপ করে বসে থাকলে কি হবে? আমার দারোয়ান আর চাকর দু'জনকে একবার ডেকে পাঠাও না? গোটা দুই আলো যেন সঙ্গে কোরে আনে।

গোবিন্দ। এস না, বাইরে গিয়ে ডাকতে পাঠাই। আর ভয়টা কিসের? না হয়, আমি নিজে গিয়ে তোমাকে বাড়ি পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসব।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

পথ

[জগন্নাথ ও নরোত্তমের প্রবেশ। জগন্নাথের হাতে একগাছা মোটা লাঠি]

নরোত্তম। এই পথ, এইখান দিয়েই যাবে। জগা, এখনো বল্, সাহস হবে ত?

জগন্নাথ। সাহস হবে না কি রে! শাস্তি নিতে রাজি হয়েই ত শাস্তি দিতে দাঁড়িয়েচি। অনেক দুঃখু দিয়েচে। মা দুর্গা! শুধু এই করো, আজ যেন একটা কাজের মত কাজ করে যেতে পারি। যেন হাত না কাঁপে।

নরোত্তম। হাত কাঁপবে কি রে?

জগন্নাথ। তা পারে। বাপ-পিতামোর কাল থেকে মার খাওয়াটাই অভ্যাস হয়ে আছে কিনা! তাই শেষ পর্য্যন্ত হাত যদি না ওঠে ত জানবি হাতের দোষ, আমার নয়।

নরোত্তম। তবে লাঠিগাছটা আমার হাতে দিয়ে তুই সরে দাঁড়া। দেখি আমি কি করতে পারি।

জগন্নাথ। অমন কথা তুই বলিস্‌নে নরু। তোর ছেলে-পুলে আছে, কিন্তু আমার নেই। এই আমার সময়। ছোটবাবু ফিরে এলে আর হবে না, তিনি হাত চেপে ধরবেন। তাই তাঁর জেল থেকে বেরোবার আগেই তার শোধ নিয়ে আমি জেলে গিয়ে ঢুকবো। তুই ঘরে যা।

নরোত্তম। ঘরে যাব না, কাছেই থাকব জগা।

[নরোত্তমের প্রস্থান। অপর দিক দিয়া গোবিন্দ, বেণী ও দারোয়ানের প্রবেশ। হাতে তাহার লণ্ঠন]

বেণী। (চমকিয়া) দাঁড়িয়ে কে রে?

জগন্নাথ। আমি জগন্নাথ।

গোবিন্দ। পথে দাঁড়িয়ে লোক ভাঙান হচ্চে, কেউ না খেতে যায়। না রে হারামজাদা?

জগন্নাথ। গাল দিয়ো না বলচি গাঙুলীমশাই।

বেণী। গাল দেবে না হারামজাদা—শালা! কাল চাল কেটে ভিটেয় সরষে বুনে দেব জানিস্‌?

জগন্নাথ। অনেকের দিয়েচ জানি, কিন্তু আর না দিতে পার আমি তার ব্যবস্থা কোরে যাব।

বেণী। কি ব্যবস্থা করবি রে হারামজাদা? শুনি?

[এই বলিয়া সে অগ্রসর হইয়া গেল]

জগন্নাথ। এই যে ব্যবস্থা।

[এই বলিয়া সে বেণীর মাথায় সজোরে লাঠির আঘাত করিল]

বেণী। (বসিয়া পড়িল) বাবা রে! গেছি রে বাবা!

[গোবিন্দ ও দারোয়ান চীৎকার করিয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিল]

বেণী। তোর পায়ে পড়ি বাবা, জগন্নাথ, ব্রহ্মহত্যা করিস্‌নে। দোহাই বাবা, তোকে দশ বিঘে জমি দেব।

জগন্নাথ। জমি তোমার চাইনে—সে তোমার থাক্‌। ব্রহ্মহত্যাও করব না!

বেণী। আজ থেকে তোর সঙ্গে বাপ-ব্যাটা সম্পর্ক জগন্নাথ—যা চাইবি তুই—

জগন্নাথ। কিছুই চাইব না। কিন্তু বাপ-ব্যাটার সম্পর্ক তোমার সঙ্গে? ছিঃ! আর সাবধান করে দিচ্চি বড়বাবু, এই মারই তোমার শেষ মার নয়। বাবু বোলে, বামুন বোলে যতই সয়েচি, ততই অত্যাচার বেড়ে গেছে। আর আমরা সইব না। দেখি তোমরা সিধে হও কি না! [প্রস্থান]

বেণী। বাবা রে, মরে গেছি রে! সব শালা পালাল রে!

[গোবিন্দ ও দারোয়ানের প্রবেশ]

গোবিন্দ। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) পালাবো কেন বাবা, পালাইনি। ছুটে লোক ডাকতে গিয়েছিলাম। জগা শালা কি-রকম গুণ্ডা জান ত? শালাকে ডাকাতি চার্জ্জে পাঁচ বছর ঠেলে দেবো—তবে আমার নাম গোবিন্দ গাঙুলী!

দারোয়ান। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) হাঁথ মে একঠো হাতিয়ার রহতো!

বেণী। দূর হ শালা সুমুখ থেকে। মেরে তক্তা বানিয়ে দিলে—(মাথায় হাত দিয়া দেখিয়া) বাবা গো! কি রক্ত পড়চে গো,—আর আমি বাঁচব না।

[বেণী শুইয়া পড়িল]

গোবিন্দ। (ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া) বাঁচবে, বাঁচবে। আমি নিজে তোমাকে কলকাতার হাসপাতালে নিয়ে যাব। (দারোয়ানের প্রতি) ধর না শালা ছাতুখোর। শালা ভয়ে শিয়ালের মত ছুটে পালাল।

দারোয়ান। কেয়া রে বাবুজি, বিন্ হাতিয়ার—

[উভয়ে বেণীকে তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিল]

তৃতীয় দৃশ্য

[রমার শয়নকক্ষ। পীড়িত রমা শয্যায় শায়িত। সম্মুখে প্রাতঃসূর্য্যালোক খোলা জানালার ভিতর দিয়া মেঝের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বিশ্বেশ্বরী প্রবেশ করিলেন]

বিশ্বেশ্বরী। (অশ্রুভরা কণ্ঠে) আজ কেমন আছিস রমা?

রমা। (একটু হাসিয়া) ভাল আছি জ্যাঠাইমা।

বিশ্বেশ্বরী। রাত্রে জ্বরটা কি ছেড়েছিল?

রমা। না। কিন্তু বোধ হয় শীগ্‌গির একদিন ছেড়ে যাবে।

বিশ্বেশ্বরী। কাশিটা?

রমা। কাশিটা বোধ করি তেমনি আছে।

বিশ্বেশ্বরী। তবু বলিস্ ভাল আছিস্ মা!

[রমা নিঃশব্দে হাসিল, বিশ্বেশ্বরী তাহার শিয়রে গিয়া বসিলেন এবং মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিলেন]

বিশ্বেশ্বরী। তোর হাসি দেখলে মনে হয় মা, যেন গাছ থেকে ছেঁড়া ফুল দেবতার পায়ের কাছে হাসছে! রমা?

রমা। কেন জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী। আমি ত তোর মায়ের মত রমা—

রমা। মত কেন জ্যাঠাইমা, তুমিই ত আমার মা।

বিশ্বেশ্বরী। (হেঁট হইয়া রমার ললাটে চুম্বন করিলেন) তবে সত্যি করে বল দেখি মা, তোর কি হয়েচে?

রমা। অসুখ করেচে জ্যাঠাইমা।

বিশ্বেশ্বরী। (রমার রুক্ষ চুলগুলিতে হাত বুলাইয়া কহিলেন) সে তো এই দুটো চামড়ার চোখেই দেখতে পাই মা। যা এতে ধরা যায় না তেমনি যদি কিছু থাকে মায়ের কাছে লুকোস্‌নে রমা। লুকোলে তো অসুখ সারবে না মা।

রমা। (কিছুক্ষণ জানালার বাহিরে নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া) বড়দা কেমন আছেন জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী। মাথার ঘা সারতে দেরি হবে বটে, কিন্তু হাসপাতাল থেকে পাঁচ-ছয় দিনেই বাড়ি আসতে পারবে।—দুঃখ কোরো না মা, এই তার প্রয়োজন ছিল। এতে তার ভালোই হবে। ভাবচো, মা হয়ে সন্তানের এত বড় দুর্ঘটনায় এ-কথা বলচি কি কোরে? কিন্তু তোমাকে সত্যি বলচি রমা, এতে আমি ব্যথা বেশি পেয়েচি কি আনন্দ বেশি পেয়েচি বলতে পারিনে। অধর্ম্মকে যারা ভয় করে না, লজ্জা যাদের নেই, প্রাণের ভয়টা যদি না তাদের তেমনি বেশি থাকে মা, সংসার ছার-খার হয়ে যায়। তাই কেবলই মনে হয়, এই চাষার ছেলে বেণীর যে মঙ্গল করে দিয়ে গেল পৃথিবীতে কোন আত্মীয় বন্ধুই তার সে ভাল করতে পারতো না। কয়লাকে ধুয়ে তার রং বদলানো যায় না মা, তাকে আগুনে পোড়াতে হয়।

রমা। কিন্তু এমনধারা ত আগে ছিল না জ্যাঠাইমা। কে দেশের চাষাদের এ-রকম কোরে দিলে?

জ্যাঠাইমা। সে কি তুই নিজেই বুঝিস্‌নি মা, কে এদের বুক এমন কোরে ভরে দিয়ে গেছে। ওরা ভাবলে তাকে যেমন কোরে হোক জেলে বন্ধ করলেই আপদ চুকল। কিন্তু এ-কথা তারা ভাবলে না যে, আগুন জ্বলে উঠে শুধু শুধু নেবে না। জোর করে নেবালেও সে আশে-পাশের জিনিস তাতিয়ে দিয়ে যায়।

রমা। কিন্তু এই কি ভালো জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী। ভাল বই কি মা। এক দিকে প্রবলের অত্যাচার করবার অখণ্ড স্পর্দ্ধা, অন্য দিকে নিরুপায়ের সহ্য করবার তেমনি অবিচ্ছিন্ন ভীরুতা,—এই দুই-ই যদি সে খর্ব্ব করে থাকে মা, বেণীর কথা মনে করে আমি কোনদিন দীর্ঘশ্বাস ফেলব না। বরঞ্চ এই প্রার্থনা করব, সে আমার ফিরে এসে দীর্ঘজীবী হয়ে যেন এমনি কোরেই কাজ করতে পারে। রমা, এক সন্তান যে কি সে শুধু মায়েই জানে। বেণীকে যখন

তাঁরা রক্তমাখা অবস্থায় পাল্কিতে করে হাসপাতালে নিয়ে গেল, তখন যে আমার কি হয়েছিল তোমাকে বোঝাতে পারব না। কিন্তু তবুও কারুকে আমি অভিশাপ দিতে পারিনি। এ-কথা ত ভুলতে পারিনি মা যে, ধর্ম্মের শাসন মায়ের মুখ চেয়ে থাকে না।

রমা। তোমার সঙ্গে তর্ক করচিনে জ্যাঠাইমা, কিন্তু এই যদি সত্যি হয়, তবে রমেশদা কোন্ পাপে এ দুঃখ ভোগ করেচেন? আমরা যা কোরে তাঁকে জেলে দিয়েচি এ-কথা ত কারও অগোচর নেই।

বিশ্বেশ্বরী। নেই বলেই ত বেণী আজ হাসপাতালে। আর তোমার—কি জানিস্ মা, কোন কাজই কোনদিন শুধু শুধু শূন্যে মিলিয়ে যায় না। তার শক্তি কোথাও না-কোথাও গিয়ে কাজ করেই। কিন্তু কি কোরে করে তা সকল সময় ধরা পড়ে না বলেই আজ পর্য্যন্ত এ সমস্যার মীমাংসা হোলো না, কেন একের পাপে অন্যে প্রায়শ্চিত্ত করে। কিন্তু করতে যে হয় রমা, তাতে ত সংশয় নেই।

[রমা নীরবে দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল]

বিশ্বেশ্বরী। এর থেকে আমারও চোখ ফুটেচে মা, ভাল করব বললেই সংসারে ভাল করা যায় না। গোড়ার ছোট-বড় অনেকগুলো সিঁড়ি উত্তীর্ণ হবার ধৈর্য্য থাকা চাই। একদিন রমেশ হতাশ হয়ে যখন চলে যেতে চেয়েছিল তখন আমিই তাকে যেতে দিইনি। তাই তার জেলের খবর শুনে মনে হয়েছিল আমিই যেন তাকে জেলে পাঠালাম। তখনও ত জানিনি মা,—বাইরে থেকে ছুটে এসে ভাল করতে যাওয়ার বিড়ম্বনা এত। সে কাজ এত কঠিন।

রমা। কেন জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী। আগে যে দশের সঙ্গে এক হয়ে মিলতে হয়, সে কথা ত তখন মনেও ভাবিনি। প্রথম থেকেই সে তার মস্ত জোর, মস্ত প্রাণ নিয়ে এতই উঁচুতে এসে দাঁড়াল যে কেউ তার নাগালই পেল না। কিন্তু এখন ভাবি তাকে নাবিয়ে এনে ভগবান মঙ্গল করেচেন।

রমা। ভগবান নয় জ্যাঠাইমা—আমরা; কিন্তু আমাদের অধর্ম্ম তাঁকে কেন নাবিয়ে আনবে?

বিশ্বেশ্বরী। আনবে বই কি মা, নইলে পাপ আর এত ভয়ঙ্কর কেন? উপকারের প্রত্যুপকার কেউ যদি না-ই করে, এমন কি উল্টে অপকার করে, তাতেই বা কি আসে-যায় মা, মানুষের কৃতঘ্নতায় যদি না দাতাকে নাবিয়ে আনে। তুই বলচিস্ রমা, কিন্তু তোদের গ্রাম কি আর রমেশকে ঠিক তেমনটি ফিরে পাবে? তোরা স্পষ্ট দেখতে পাবি, সে যে হাত দিয়ে দশের কল্যাণ করে বেড়াত, তার সেই

হাতটাই ভৈরব আচায্যি—আর একা ভৈরব কেন, তাদের সবাই মিলে মুচড়ে ভেঙে দিয়েচে। কে জানে, হয়ত ভালই হয়েচে। তার বলিষ্ঠ সমগ্র হাতের অপর্য্যাপ্ত দান গ্রহণ করার শক্তি যখন লোকের ছিল না, তখন এই ভাঙা হাতটাই তাদের সত্যিকার কাজে লাগবে।

[এই বলিয়া তিনি গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার হাতখানি রমা নীরবে কিছুক্ষণ নাড়া-চাড়া করিয়া নিজের দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল]

রমা। জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী। কেন মা?

রমা। লাঞ্ছনা-গঞ্জনা আমার গায়ে লাগে না, মা। মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে যেদিন তাঁকে জেলে দিয়েচি, সেদিন থেকে জগতে সমস্ত ব্যথা কেবল পরিহাস হয়ে গেছে।

বিশ্বেশ্বরী। এমনই হয় মা।

রমা। সকলে বলতে লাগলেন শত্রুকে যেমন কোরে হোক নিপাত করতে দোষ নেই। তাঁরা তাই করেচেন। কিন্তু, আমার ত সে কৈফিয়ৎ নেই জ্যাঠাইমা!

বিশ্বেশ্বরী। তোমারই বা নেই কেন?

রমা। না মা, নেই।—একটা কথা আজ তোমার কাছে স্বীকার করব, জ্যাঠাইমা। ঘোড়লদের বাড়িতে ছেলেরা জড় হয়ে রমেশদার কথা-মত সৎ আলোচনাই করত। বদমাইসের দল ব'লে তাদের পুলিশে ধরিয়ে দেবার একটা মতলব চলছিল। আমি লোক পাঠিয়ে তাদের সাবধান করে দিই। কারণ, পুলিশ ত এই চায়। একবার তাদের হাতে পেলে ত আর রক্ষে রাখত না।

বিশ্বেশ্বরী। (শিহরিয়া) বলিস্ কিরে? নিজের গ্রামের মধ্যে পুলিশের উৎপাত বেণী মিথ্যে কোরে ডেকে আনতে চেয়েছিল?

রমা। মনে হয় বড়দার এই শাস্তি তারই ফল। আমাকে মাপ করতে পারবে জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী। তার মা হয়ে এ যদি না ক্ষমা করতে পারি, কে পারবে রমা। আমি আশীর্ব্বাদ করি এর পুরস্কার ভগবান তোমাকে যেন দেন।

রমা। (হাত দিয়া অশ্রু মুছিয়া ফেলিল) আমার এই একটা সান্ত্বনা, তিনি ফিরে এসে দেখবেন তাঁর আনন্দের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে আছে। যা তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর সেই দেশের দীন-দুঃখীরা এবার ঘুম ভেঙে উঠে বসেচে; তাঁকে চিনেচে, তাঁকে ভালোবেসেচে। এই ভালবাসার আনন্দে আমার অপরাধ কি তিনি

ভুলতে পারবেন না?—জ্যাঠাইমা, শুধু একটি জায়গায় আমরা দূরে যেতে পারিনি। তোমাকে আমরা দু'জনেই ভালোবেসেছিলাম।

[বিশ্বেশ্বরী নিঃশব্দে তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন]

রমা। সেই জোরে একটি দাবী তোমার কাছে আজ রেখে যাব। যখন আমি আর থাকব না, তখনও যদি আমাকে তিনি ক্ষমা করতে না পারেন, শুধু এই কথাটি আমার হয়ে তাঁকে বোলো, যত মন্দ বলে আমাকে তিনি জানতেন, তত মন্দ আমি ছিলুম না। আর যত দুঃখ তাঁকে দিয়েচি, তার অনেক বেশি দুঃখ যে আমি নিজেও সয়েচি,—তোমার মুখের এই কথাটি হয়ত তিনি অবিশ্বাস করবেন না।

বিশ্বেশ্বরী। তবে, চল মা আমরা কোন তীর্থস্থানে গিয়ে থাকি। যেখানে রমেশ নেই, বেণী নেই, যেখানে চোখ তুললেই ভগবানের মন্দিরের চূড়ো চোখে পড়ে, সেইখানে যাই। আমি সমস্ত বুঝতে পেরেচি রমা। যদি যাবার দিনই তোর এগিয়ে এসে থাকে মা, তবে এ বিষ বুকের মধ্যে নিয়ে আর যাব না—সমস্ত এখানেই নিঃশেষ করে ফেলে রেখে যাব। কেমন, পারবি ত মা?

রমা। (বিশ্বেশ্বরীর জানুর উপর মুখ লুকাইয়া আকুল হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল, কহিল—) আমি আর পারিনে জ্যাঠাইমা, আমাকে এখান থেকে তুমি নিয়ে চল।

চতুর্থ দৃশ্য

কারা-প্রাচীরের সম্মুখের পথ

[এক দিক দিয়া রমেশ প্রবেশ করিল ও অপর দিক দিয়া বেণী—তাহার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা—স্কুলের হেড মাস্টার বনমালী ও কয়েকজন ছাত্র। পশ্চাতে বেণীর অনুগত আরও দুই-চারিজন লোক]

বেণী। (রমেশকে আলিঙ্গন করিয়া) রমেশ, ভাই রে, নাড়ীর টান যে এমন টান এবার তা টের পেয়েচি। রমা যে আচায্যি হারামজাদাকে হাত কোরে এত শত্রুতা করবে, লজ্জা-সরমের মাথা খেয়ে নিজে এসে মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে এত দুঃখ দেবে, সে-কথা জেনেও যে জানিনি, ভগবান তার শাস্তি আমাকে দিয়েচেন। জেলের মধ্যে তুই বরং ছিলি ভাল ভাই, বাইরে থেকে এই ক'টা মাস আমি যে তুষের আগুনে জ্বলে-পুড়ে গেছি।

[রমেশ হতবুদ্ধির মত কি যে করিবে ভাবিয়া পাইল না। বনমালী ও ছেলেরা অগ্রসর হইয়া পায়ের ধূলা লইল]

বেণী। (কাঁদিয়া ফেলিয়া) দাদার ওপর অভিমান রাখিস্‌নে ভাই, বাড়ি চল্‌। মা কেঁদে কেঁদে চু'চক্ষু অন্ধ করবার যোগাড় করেচেন। আমরা শুধু প্রাণে বেঁচে আছি রমেশ।

রমেশ। (বেণীর মাথার ব্যাণ্ডেজটা হাত দিয়া দেখাইয়া) এ কি বড়দা, মাথা ভাঙলো কি করে?

বেণী। শুনে আর কি হবে ভাই, আমি কাউকে দোষ দিইনে। এ আমার নিজেরই কর্ম্মফল,—আমারই পাপের শাস্তি।—জানিস্‌ ত রমেশ, এই আমার জন্মগত দোষ যে, মনে এক, মুখে আর কিছুতে করতে পারিনে। মনের ভাব আর পাঁচজনের মত ঢেকে রাখতে পারিনে বলে কত শাস্তিই যে ভোগ করতে হয়,—কিন্তু তবু ত আমার চৈতন্য হয় না। দোষের মধ্যে সেদিন কাঁদতে কাঁদতে বলে ফেলেছিলাম, রমা, আমরা তোর কাছে কি অপরাধ করেচি যে ভাইকে আমার জেলে দিলি! জেল হয়েচে শুনলে মা যে একেবারে প্রাণ বিসর্জ্জন করবেন। আমরা ভায়ে ভায়ে সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়া করি, যা করি, তবু ত সে আমার ভাই। তুই একটি আঘাতে আমার ভাইকে মারলি—আমার মাকে মারলি!—রমেশ, সেদিন রমার সে উগ্র-মূর্ত্তি মনে হলে আজও হৃদকম্প হয়। বললে, রমেশের বাপ আমার বাপকে জেলে দিতে যায়নি। পারলে ছেড়ে দিত বুঝি?

রমেশ। হাঁ, রমার মাসীর মুখেও একথা শুনছিলাম।

বেণী। এই হোলো তার জাতক্রোধ। কিন্তু মেয়েমানুষের এত দর্প আমারও সহ্য হল না। আমি রেগে বলে ফেললাম, আচ্ছা, ফিরে আসুক সে, তার পরে এর বিচার হবে। কিন্তু খুন করা যে তার অভ্যেস ভাই। তোমাকে খুন করতে আকবর লেঠেলকে পাঠিয়েছিল মনে নেই? কিন্তু তোমার কাছে ত চালাকি খাটেনি,—তুমিই উল্টে শিখিয়ে দিয়েছিলে! কিন্তু আমাকে খুন করা আর শক্ত কি?

রমেশ। তার পরে?

বেণী। তার পরে কি আর মনে আছে ভাই? কে কিসে ক'রে যে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল, সেখানে কি হ'ল, কে দেখলে কিছুই জানিনে। এ যাত্রা যে রক্ষে পেয়েচি সে কেবল মায়ের পুণ্যে। এমন মা কি আর আছে রমেশ!

[রমেশের মুখে ও মনের মধ্যে কত কি যে হইতে লাগিল তাহার নির্দ্দেশ নাই,—কিন্তু সে একটা কথাও কহিল না]

বেণী। গাড়ি তৈরী ভাই। আর দেরি নয়,—বাড়ি চল্‌। মায়ের কাছে তোরে একবার পৌঁছে দিয়ে আমি বাঁচি।

রমেশ। চলুন। জেলের মধ্যেই শুনেছিলাম রমা না-কি বড় পীড়িত?

বেণী। ভগবানের দণ্ড রমেশ,—এ যে তাঁরই রাজ্য, এ কি সবাই মনে রাখে?

জগদীশ্বর। চল ভাই, ঘরে চল।

[সকলের প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

রমার কক্ষ

[রমেশ প্রবেশ করিয়া রমাকে দেখিয়া চমকাইয়া গেল]

রমেশ। তোমার এত অসুখ করেচে তা ত আমি ভাবিনি!

[রমা শয্যা হইতে উঠিয়া রমেশের পায়ের কাছে প্রণাম করিল]

রমেশ। এখন কেমন আছ রাণী?

রমা। আমাকে আপনি রমা বলেই ডাকবেন।

রমেশ। বেশ তাই। শুনেছিলাম তুমি অসুস্থ ছিলে। এখন কেমন আছ এই খবরটাই জানতে চাচ্ছিলাম। নইলে, নাম তোমার যাই হোক, সে ধরে ডাকবার আমার ইচ্ছেও নেই, আবশ্যকও নেই।

রমা। এখন আমি ভাল আছি। আমি ডেকে পাঠিয়েচি বলে আপনি হয়ত খুব আশ্চর্য্য হয়েচেন, কিন্তু—

রমেশ। না হইনি। তোমার কোন কাজে আশ্চর্য্য হবার দিন আমার কেটে গেছে। কিন্তু ডেকে পাঠিয়েচ কেন শুনি?

রমা। (ক্ষণকাল অধোমুখে নিরুত্তর হইয়া থাকিয়া) রমেশদা, আজ দুটি কাজের জন্যে তোমাকে কষ্ট দিয়ে ডেকে এনেচি। কত যে অপরাধ করেচি সে ত জানি, তবুও আমি নিশ্চয় জানতাম তুমি আসবেই। আর আমার এই শেষ অনুরোধ দুটিও অস্বীকার করবে না।

[বলিতে বলিতে অশ্রুভারে গলা তাহার ভাঙিয়া আসিল]

রমেশ। কি তোমার অনুরোধ?

রমা। (চকিতের ন্যায় মুখ তুলিয়াই পুনরায় আনত করিল) পীরপুরের যে বিষয়টা বড়দা তোমার সাহায্যে দখল করতে চাচ্ছেন সেটা আমার নিজের। বাবা বিশেষ করে আমাকেই সেটা দিয়ে গেছেন। তার পোনর আনা আমার, এক আনা তোমাদের। সেইটেই তোমাকে আমি দিয়ে যেতে চাই।

রমেশ। তোমার ভয় নেই, বড়দা যাই কেন না আমাকে বলুন, আমি চুরি করতে পূর্ব্বেও কখনো কাউকে সাহায্য করিনি, এখনো করব না। আর যদি দান করতেই চাও, তার জন্যে অন্য লোক আছে। আমি দান গ্রহণ করিনে।

রমা। আমি জানি রমেশদা, তুমি চুরি করতে সাহায্য করবে না। আর নিলেও সে তুমি নিজের জন্যে নেবে না সেও আমি জানি। কিন্তু তা ত নয়। দোষ করলে শাস্তি হয়। আমি যত অপরাধ করেচি, এটা তারই দণ্ড বলে কেন গ্রহণ কর না?

রমেশ। তোমার দ্বিতীয় অনুরোধ?

রমা। আমার যতীনকে আমি তোমার হাতে দিয়ে গেলাম—

রমেশ। দিয়ে গেলাম মানে?

রমা। (রমেশের মুখের প্রতি চাহিয়া) একদিন কোন মানেই তোমার কাছে গোপন থাকবে না রমেশদা,—তাই, আমার যতীনকে আমি তোমাকেই দিয়ে যাব। তাকে তোমার মত করেই মানুষ কোরো। বড় হয়ে সে যেন তোমারি মত স্বার্থত্যাগ করতে পারে। (আঁচলে মুখ মুছিয়া) এ আমার চোখে দেখে যাবার সময় হবে না, কিন্তু আমার নিশ্চয় বিশ্বাস, যতীনের দেহে তার পূর্ব্বপুরুষদের রক্ত আছে। ত্যাগের যে শক্তি তাঁদের অস্থিমজ্জায় মিশে ছিল—শেখালে হয়ত সেও একদিন তোমারি মত মাথা উঁচু কোরে দাঁড়াবে।

[রমেশ চুপ করিয়া রহিল]

রমা। চুপ কোরে থাকলে ত আজ তোমাকে ছাড়ব না রমেশদা।

রমেশ। দেখ, এ-সকলের মধ্যে আর আমাকে টেনো না। আমি অনেক দুঃখের পর একটুখানি আলোর শিখা জ্বালাতে পেরেচি, তাই কেবলই ভয় হয়, পাছে একটুতেই তা নিবে যায়।

রমা। তোমার ভয় নেই রমেশদা, এ আলো আর নিববে না। জ্যাঠাইমা বলছিলেন, তুমি দূর থেকে এসে বড় উঁচুতে বসে কাজ করতে চেয়েছিলে বলেই এত বাধা পেয়েচ। তখন পরের মত তুমি গ্রাম্য-সমাজের অতীত ছিলে, এখন হয়েচ তাদেরই একজন। তখন তোমার দেওয়া ছিল বিদেশীর দান, আজ হয়েচে তা আত্মীয়ের স্নেহের উপহার। দুঃখ পেয়ে দুঃখ সয়ে সে তুমি আর নেই। তাই এ আলো আর ম্লান হবে না,—এখন প্রতিদিনই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

রমেশ। ঠিক জান রমা, আমার এই দীপের শিখাটুকু আর নিববে না?

রমা। ঠিক জানি। যিনি সব জানেন, এ সেই জ্যাঠাইমার কথা। এ-কাজ তোমারি। আমার যতীনকে তুমি হাতে তুলে নিয়ে, আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কোরে আজ আশীর্ব্বাদ কর যেন নিশ্চিন্ত হয়ে আমি যেতে পারি।

রমেশ। কিন্তু যাবার কথাই বা তুমি ভাবছ কেন রমা,—আমি বলচি তুমি আবার ভাল হয়ে যাবে।

রমা। ভাল হবার কথা ত ভাবচিনে রমেশদা, শুধু ভাবচি আমার যাবার কথা। কিন্তু আরও একটি অনুরোধ তোমাকে রাখতে হবে। আমার কথা নিয়ে বড়দার সঙ্গে তুমি কোনদিন বিবাদ করো না।

রমেশ। এ কথার মানে ?

রমা। মানে যদি কখনো শুনতে পাও, সেদিন কেবল এই কথাটি মনে করো, আমি কেমন কোরে নিঃশব্দে সহ্য করে চলে গেছি—একটি কথারও প্রতিবাদ করিনি। একদিন যখন অসহ্য মনে হয়েছিল, সেদিন জ্যাঠাইমা এসে বলেছিলেন,—মা, মিথ্যেকে ঘাঁটাঘাঁটি করে জাগিয়ে তুললেই তার পরমায়ু বেড়ে ওঠে। নিজের অসহিষ্ণুতায় তার আয়ু বাড়িয়ে তোলার মত পাপ অল্পই থাকে। তাঁর এই উপদেশটি স্মরণ রেখে সকল দুঃখ-দুর্ভাগ্যই আমি কাটিয়ে উঠেচি। এটি তুমিও কখনো ভুলো না রমেশদা।

[রমেশ নীরবে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল]

রমা। আজ আমাকে তুমি ক্ষমা করতে পারচ না ভেবে দুঃখ পেয়ো না রমেশদা। আমি ঠিক জানি আজ যা কঠিন হচ্ছে, একদিন তাই সোজা হয়ে যাবে। সেদিন আমার সকল অপরাধ তুমি সহজেই ক্ষমা করবে জেনে মনের মধ্যে আর আমার ক্লেশ নাই—কাল সকালেই আমি যাচ্চি।

রমেশ। কাল সকালেই ? কোথায় যাবে কাল ?

রমা। জ্যাঠাইমা যেখানে নিয়ে যাবেন আমি সেইখানেই যাব।

রমেশ। কিন্তু তিনি ত আর আসবেন না শুনচি।

রমা। আমিও না। আমিও তোমার পায়ে আজ জন্মের মতই বিদায় নিলাম।

[এই বলিয়া রমা মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল]

রমেশ। আচ্ছা যাও। কিন্তু অকস্মাৎ কেন বিদায় নিলে তাও কি জানতে পারব না ?

[রমা মৌন হইয়া রহিল]

রমেশ। কেন যে তোমার সমস্ত কথাই লুকিয়ে রেখে চলে গেলে সে তুমিই জান। কিন্তু আমিও কায়মনে প্রার্থনা করি, একদিন যেন তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করতে পারি। তোমাকে ক্ষমা করতে না পারায় যে আমার কি ব্যথা, সে শুধু আমার অন্তর্যামীই জানেন।

[এই সময়ে বিশ্বেশ্বরী প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন—রমা!]

রমেশ। জ্যাঠাইমা! কি অপরাধে আমাদের এত শীঘ্র ত্যাগ করে চললে?

বিশ্বেশ্বরী। অপরাধ? অপরাধের কথা বলতে গেলে ত শেষ হবে না বাবা। তাতে কাজ নেই। কিন্তু আমার নিজের কথাটা তুই জেনে রাখ, এখানে যদি মরি রমেশ, বেণী আমার মুখে আগুন দেবে। সে হলে ত কোনমতেই মুক্তি পাব না রমেশ। ইহকালটা ত জলে-জলেই গেল, পাছে পরকালটাও এমনি জলে-পুড়ে মরি, আমি সেই ভয়েই পালাচ্ছি রমেশ।

রমেশ। জ্যাঠাইমা, ছেলের অপরাধ যে তোমার বুকে এমন কোরে বেজেছিল সে ত কোনদিন জানতে দাওনি? কিন্তু সমস্ত ছেড়ে রমা কেন বিদায় নিতে চায়? তাকে তুমি কোথায় নিয়ে যাবে?

রমা। আমি আসচি জ্যাঠাইমা।

[প্রস্থান]

বিশ্বেশ্বরী। জিজ্ঞেসা করছিলি রমা কেন বিদায় নিতে চায়? কোথায় তাকে আমি নিয়ে যেতে চাই? সংসারে আর তার স্থান হোল না রমেশ, তাই তাকে এবার ভগবানের পায়ের নীচে নিয়ে যাব। সেখানে গিয়েও সে বাঁচে কি না জানিনে, কিন্তু যদি বাঁচে, বাকি জীবনটা এই অতি-কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা করতে বলব, কেন ভগবান তাকে এত রূপ, এত গুণ, এত বড় একটা মহাপ্রাণ দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন, আর কেনই বা বিনা দোষে দুঃখের বোঝা মাথায় দিয়ে আবার সংসারের বাইরে ফেলে দিলেন। এ কি তাঁরই অভিপ্রায়, না, এ শুধু আমাদের সমাজের খেয়ালের খেলা। ওরে রমেশ, তার মত দুঃখিনী বুঝি আর পৃথিবীতে নেই।

[বলিতে বলিতে তাঁহার গলা ভাঙিয়া পড়িল। রমেশ নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল]

বিশ্বেশ্বরী। কিন্তু তোর ওপর আমার এই আদেশ রমেশ, তাকে যেন তুই ভুল বুঝিস্‌নে। যাবার সময় আমি কারও বিরুদ্ধে কোন নালিশ করে যেতে চাইনে, শুধু এই কথাটা আমার তুই ভুলেও কখনো অবিশ্বাস করিস্‌নে যে, তার বড় মঙ্গলাকাঙ্খিণী তোর আর নেই।

রমেশ। কিন্তু জ্যাঠাইমা—

বিশ্বেশ্বরী। এর মধ্যে কোন 'কিন্তু' নেই রমেশ। তুই যা শুনেচিস্‌ সব মিথ্যে, যা জেনেচিস্‌ সব ভুল, কিন্তু এ অভিযোগের এইখানেই যেন সমাপ্তি হয়। তোর কল্যাণের কাজ যেন বন্যার মত সমস্ত দ্বেষ-হিংসা ভাসিয়ে নিয়ে বয়ে যেতে পারে, তোর ওপর এই তার শেষ প্রার্থনা। এই জন্যেই সে মুখ বুজে সমস্ত সহ্য করেচে। প্রাণ দিতে বসেচে রমেশ, তবু কথা কয়নি।

রমেশ। তাকে বোলো জ্যাঠাইমা—

বিশ্বেশ্বরী। পারিস্ ত নিজেই তাকে বলিস্ রমেশ, আমার আর সময় নেই।

[প্রস্থান]

[যতীনকে সঙ্গে লইয়া রমা প্রবেশ করিল। তার পরিধানে দূরে বাহিরে যাইবার পরিচ্ছদ]

রমেশ। (সবিস্ময়ে) এ কি! এত রাত্রে এ বেশ কেন?

রমা। যাত্রা করে বেরিয়ে এলাম রমেশদা, রাত আর নেই। যাবার আগে দুটি কাজ বাকি ছিল। এক তোমার পায়ের ধূলো নেওয়া, আর যতীনকে তোমার হাতে তুলে দেওয়া।

রমেশ। এ ভার আমাকেই দিয়ে যাবে রমা?

রমা। রমা ত নয়, রাণী। তার সবচেয়ে আদরের ধন এই ছোট ভাইটি। তাকে তুমি ছাড়া আর কে নিতে পারে রমেশদা?

রমেশ। কিন্তু এর কত বড় দায়িত্ব—এ অনুরোধ রমা—

রমা। এখনো রমা—? কিন্তু এ ত অনুরোধ নয়, এ তার দাবি। এই দাবি নিয়েই সে সংসারে একদিন এসেছিল, এই দাবি নিয়েই সে সংসার থেকে যাবে। এ দাবির ত অন্ত নেই রমেশদা,—একে তুমি ফাঁকি দেবে কি কোরে? এই নাও।

[এই বলিয়া সে যতীনকে তাহার হাতে দিয়া পায়ের নীচে গড় হইয়া প্রণাম করিল]

যবনিকা পতন

রামের সুমতি

রামের সুমতি

১

রামলালের বয়স কম ছিল, কিন্তু দুষ্টুবুদ্ধি কম ছিল না। গ্রামের লোকে তাহাকে ভয় করিত। অত্যাচার যে তাহার কখন্ কোন দিক দিয়া কি ভাবে দেখা দিবে, সেকথা কাহারও অনুমান করিবার জো ছিল না। তাহার বৈমাত্র বড়ভাই শ্যামলালকেও ঠিক শান্ত-প্রকৃতির লোক বলা চলে না, কিন্তু সে লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড করিত না। গ্রামের জমিদারী কাছারিতে সে কাজ করিত এবং নিজের জমি-জমা তদারক করিত। তাদের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল। পুকুর, বাগান, ধানজমি, দু-দশ ঘর বাগ্দী প্রজা এবং কিছু নগদ টাকাও ছিল। শ্যামলালের পত্নী নারায়ণী যেবার প্রথম ঘর করতে আসেন—সে আজ তের বছরের কথা—সে বছরে রামের বিধবা জননীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি আড়াই বছরের শিশু রাম এবং এই সমস্ত সংসারটা তাঁহার তের বছরের বালিকা পুত্রবধূ নারায়ণীর হাতে তুলিয়া দিয়া যান।

এ বৎসর চারিদিকে অত্যন্ত জ্বর হইতেছিল। নারায়ণীও জ্বরে পড়িলেন। তিন-চারিটা গ্রামের মধ্যে একমাত্র খানিকটা-পাশকরা ডাক্তার নীলমণি সরকারের এক টাকা ভিজিট দু'টাকায় চড়িয়া গেল এবং তাঁহার কুইনিনের পুরিয়া, অ্যারারুট-ময়দা সহযোগে সুখাদ্য হইয়া উঠিল। সাতদিন কাটিয়া গেল, নারায়ণীর জ্বর ছাড়ে না। শ্যামলাল চিন্তিত হইয়া উঠিলেন।

বাড়ির দাসী নৃত্যকালী ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আজ তাঁকে ভিন্ গাঁয়ে যেতে হবে—সেখানে চার টাকা ভিজিট—আসতে পারবেন না।

শ্যামলাল ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, আমিও না হয় চার টাকাই দেব, টাকা আগে না প্রাণ আগে? যা তুই, চামারটাকে ডেকে আন্ গে।

নারায়ণী ঘরের ভিতর হইতে সে কথা শুনিতে পাইয়া ক্ষীণস্বরে ডাকিয়া বলিলেন, ওগো, কেন তুমি এত ব্যস্ত হচ্চ? ডাক্তার না হয় কালই আসবে, একদিনে আর কি ক্ষেতি হবে?

রামলাল উঠানের একধারে পিয়ারা তলায় বসিয়া পাখীর খাঁচা তৈরী করিতেছিল, উঠিয়া আসিয়া বলিল, তুই থাক নেত্য, আমি যাচ্চি।

দেবরটির সাড়া পাইয়া উদ্বেগে নারায়ণী উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, ওগো, রামকে মানা কর। ও রাম, মাথা খাস্ আমার, যাসনে—লক্ষ্মী ভাইটি আমার, ছি দাদা, ঝগড়া করতে নেই।

রাম কর্ণপাতও করিল না—বাহির হইয়া গেল। পাঁচ বছরের ভ্রাতুষ্পুত্র তখনও কাঠিগুলা ধরিয়া বসিয়াছিল, কহিল, খাঁচা বুনবে না কাকা?

বুনবো অখন, বলিয়া রাম চলিয়া গেল।

নারায়ণী কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, কেন তুমি ওকে যেতে দিলে? দেখ কি কাণ্ড বা করে আসে।

শ্যামলাল ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়াই ছিলেন, রাগিয়া বলিলেন, আমি কি করব? তোমার মানা শুনলে না, আমার মানা শুনবে?

হাত ধরলে না কেন? ও হতভাগার জন্যে আমার একদণ্ডও যদি বাঁচতে ইচ্ছে করে। নেত্য, লক্ষ্মী মা আমার, দাঁড়িয়ে থাকিস্নে—ভোলাকে পাঠিয়ে দে গে, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফিরিয়ে আনুক—সে হয়ত এখনো গরু নিয়ে মাঠে যায়নি।

নেত্যকালী ভোলার সন্ধানে গেল।

রাম নীলমণি ডাক্তারের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাক্তার তখন ডিস্পেন্সারিতে, অর্থাৎ একটা ভাঙা আলমারির সামনে একটা ভাঙা টেবিলে বসিয়া নিক্তিহাতে ঔষধ ওজন করিতেছিলেন। চার-পাঁচজন রোগী হাঁ করিয়া তাহাই দেখিতেছিল। ডাক্তার আড়-চোখে চাহিয়া নিজের কাজে মন দিলেন।

রাম মিনিট-খানেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, বৌদির জ্বর সারে না কেন?

ডাক্তার নিক্তিতে চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, আমি কি করব—ওষুধ দিচ্ছি—

ছাই দিচ্ছ! পচা ময়দার গুঁড়োতে অসুখ ভালো হয়!

কথা শুনিয়া নীলমণি ওজন নিক্তি সব ভুলিয়া চোখ রাঙা করিয়া বাক্যশূন্য হইয়া চাহিয়া রহিলেন। এত বড় শক্ত কথা মুখে আনিবার স্পর্দ্ধা যে সংসারে কোন মানুষের থাকিতে পারে, তিনি তাহা জানিতেন না।

ক্ষণেক পরে গর্জ্জিয়া উঠিলেন, পচা ময়দার গুঁড়ো তবে নিতে আসিস্ কেন রে? তোর দাদা পায়ে ধরে ডাকতে পাঠায় কেন রে?

রাম বলিল, এদিকে ডাক্তার নেই, তাই ডাকতে পাঠায়। থাকলে পাঠাত না।

লোকগুলো স্তম্ভিত হইয়া শুনিতেছিল, তাহাদিগের পানে চাহিয়া দেখিয়া সে পুনর্ব্বার বলিল, তুমি ইতর, বামুনের মান-মর্য্যাদা জান না, তাই বলে ফেললে পায়ে ধরে ডাকতে পাঠায়। দাদা কারো পায়ে ধরে না। আসবার সময় বৌদিদি মাথার দিব্যি দিয়ে ফেলেচে, নইলে দাঁতগুলো তোমার সব্বাই ভেঙে দিয়ে ঘরে যেতুম। তা শোন, ভাল ওষুধ নিয়ে এখুনি এস, দেরী ক'রো না। আজ যদি জ্বর না ছাড়ে

ঐ যে সামনে কলমের আমবাগান করেচ, বেশি বড় হয়নি ত—ও কুড়ুলের এক এক ঘায়েই কাত হবে—ওর একটিও আজ রাত্তিরে থাকবে না। কাল এসে শিশিবোতল-গুলো গুঁড়ো করে দিয়ে যাব। বলিয়াই সে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

ডাক্তার নিক্তি ধরিয়া আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন।

একজন বৃদ্ধ তখন সাহস করিয়া বলিল, ডাক্তারবাবু, আর বিলম্ব ক'রো না। ভাল ওষুধ লুকোনো-টুকোনো যা আছে, তাই নিয়ে যাও। ও রামঠাকুর—যা বলে গেছে তা ফলাবে, তবে ছাড়বে।

ডাক্তার নিক্তি রাখিয়া বলিলেন, আমি থানার দারোগার কাছে যাব; তোমরা সব সাক্ষী।

যে বৃদ্ধ পরামর্শ দিতেছিল, সে বলিল, সাক্ষী? সাক্ষী কে দেবে বাবু? আমার ত কুইনাইন খেয়ে কান ভোঁ ভোঁ করতেছে—রাম ঠাকুর কি যে বলে গেল, তা শুনতেও পেলুম না। আর দারোগা করবে কি বাবু? ও দেবতাটি দেখতে ছোট, কিন্তু ওনার বাগ্দী ছোকরার দলটি ছোট নয়। ঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারলে থানার লোক দেখতে আসবে না, দারোগাবাবু এক আঁটি খড় দিয়ে উপকার করবে না। ও সব আমরা পারব না—ওনাকে সবাই ডরায়! তার চেয়ে যা বলে গেছে, তাই কর গে। একবার দেখ দেখি আপনি—আজ দুখানা রুটি-টুটি খাব না কি?

ডাক্তার অন্তরে পুড়িতেছিলেন, বুড়ার হাত দেখিবার প্রস্তাবে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন—সাক্ষী দিবিনে তোরা, তবে দূর হ' এখান থেকে। আমি কারুর হাত দেখতে পারব না—মরে গেলেও কাউকে ওষুধ দেব না—দেখি, তোদের কি গতি হয়?

বৃদ্ধ লাঠিটা হাতে লইয়া উঠিয়া পড়িল—দোষ কারো নয় ডাক্তারবাবু, উনি বড় শয়তান। ঠাকুরকে খবরটা একবার দিয়েও যেতে হবে, না হলে হয়ত বা মনে করবে, থানায় যাবার মতলব আমরা দিয়েচি। বিঘেটাক বেগুন-চারা লাগিয়েচি—বেশ ডাগর হয়েও উঠেচে—হয়ত আজ রাত্তিরেই সমস্ত উপড়ে রেখে যাবে। বাগ্দী ছোঁড়াগুলো ত রাত্রে ঘুমোয় না। বাবু, থানায় না হয় আর একদিন যেয়ো—আজ এক শিশি ওষুধ নিয়ে ওনারে ঠাণ্ডা করে এসো।

বৃদ্ধ চলিয়া গেল, আর যাহারা ছিল তাহারাও সরিয়া পড়িতে লাগিল। নীলমণি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মানবজীবনের শেষ অভিজ্ঞতা—সংসারের সর্ব্বোত্তম জ্ঞানের বাক্যটি আবৃত্তি করিয়া উঠিয়া বাড়ির ভিতরে গেলেন—দুনিয়ার কারও ভাল করতে নেই।

নারায়ণী বাহিরের দিকের জানালায় চোখ রাখিয়া ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন। রাম বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া ডাকিল, গোবিন্দ, খাঁচা ধরবি আয়।

নারায়ণী ডাকিলেন, ও রাম, এ-দিকে আয়।

রাম কঞ্চির মধ্যে সাবধানে কাঠি পরাইতে পরাইতে বলিল, এখন না, কাজ কচ্চি।

নারায়ণী ধমক দিয়া বলিলেন, আয় বলচি শীগ্‌গির।

রাম কাঠিগুলা নামাইয়া রাখিয়া বৌদির ঘরে গিয়া তক্তপোষের একধারে পায়ের কাছে গিয়া বসিল।

নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিলেন, ডাক্তারের সঙ্গে তোর দেখা হ'ল?

হ্যাঁ।

কি বললি তাঁকে?

আসতে বললুম।

নারায়ণী বিশ্বাস করিলেন না—শুধু আসতে বললি—আর কিছু বলিস্‌নি?

রাম চুপ করিয়া রহিল।

নারায়ণী বলিলেন, বল্ না কি বলেচিস তাঁকে?

বলব না।

নৃত্যকালী ঘরে ঢুকিয়া সংবাদ দিল—ডাক্তারবাবু আসচেন।

নারায়ণী মোটা চাদরটা টানিয়া লইয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। রাম ছুটিয়া পলাইয়া গেল। অনতিকাল পরেই ডাক্তার লইয়া শ্যামলাল ঘরে ঢুকিলেন। ডাক্তার কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া পরিশেষে নারায়ণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৌমা, জ্বর সারা না-সারা কি ডাক্তারের হাতে? তোমার দেওরটি ত আমাকে দু'টি দিনের সময় দিয়েছে। এর মধ্যে সারে ভাল, না সারে ত আমার ঘর-দোরে আগুন ধরিয়ে দেবে।

নারায়ণী লজ্জায় মরিয়া গিয়া বলিলেন, ওর ঐ-রকম কথা, আপনি কোন ভয় করবেন না।

ডাক্তার বলিলেন, লোকে বলে ওর একটা দল আছে। তাদের যে কথা, সেই কাজ। তাতেই বড় শঙ্কা হয় মা! আমরা ওষুধ দিতে পারি, প্রাণ দিতে পারিনে।

নারায়ণী চুপ করিয়া বলিলেন, ও ছোঁড়া একদিন জেলে যাবে, তা জানি, কিন্তু ঐ-সঙ্গে আমাকেও না যেতে হয়, তাই ভাবি।

আজ নীলমণি শোবার ঘরের সিন্দুক খুলিয়া আসল কুইনিন এবং টাটকা ঔষধ আনিয়াছিলেন, তাহাই ব্যবস্থা করিয়া ফিরিবার সময় শ্যামলাল চার টাকা ভিজিট দিতে গেলে তিনি জিভ কাটিয়া বলিলেন, সর্ব্বনাশ! আমার ভিজিট ত এক টাকা। তার বেশি আমি কোনমতেই নিতে পারব না—ও অভ্যাস আমার নেই। শ্যামবাবু, টাকা দু'দিনের, কিন্তু ধর্ম্মটা যে চিরদিনের।

দুই দিন পূর্ব্বে এইখানেই এক টাকার অধিক আদায় করিয়া লইয়াছিলেন,

আজ সে-কথাও তিনি বিস্মৃত হইলেন। কিন্তু শ্যামলাল সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়া লইলেন। যাহা হউক, নারায়ণী আরোগ্য হইয়া উঠিলেন। এবং সংসার আবার পূর্ব্বের মতই চলিতে লাগিল।

২

মাস-দুই পরে একদিন নারায়ণী নদী হইতে স্নান করিয়া পূর্ণ কলস নামাইয়া রাখিয়াই বলিলেন, নেত্য, সে বাঁদরটা কোথায় ?

বাঁদরটা যে কে, তাহা বাটীর সকলেই জানিত।

নেত্য বলিল, ছোটবাবু এই ত ছিল— ঐ যে ওখানে ঘুড়ি তৈরী কচ্চে।

নারায়ণী দেখিতে পাইয়া ডাকিলেন, ইদিকে আয় হতভাগা, ইদিকে আয়। তোর জ্বালায় কি আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব ?

রামলাল আধখানা বেলের ভিতর হইতে কাঠি দিয়া খুঁচাইয়া আঠা বাহির করিতে করিতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

নারায়ণী বলিলেন, সাঁতরাদের এক-মাচা শশা-গাছ কেটে দিয়ে এসেচিস্ কেন ?

তারা আমাকে কাটতে দেখেচে ?

তারা দেখেনি, আমি দেখেচি! কেন কেটেচিস্ বল্ ?

আমাকে তারা অপমান করলে কেন ?

নারায়ণী জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, অপমানের কথা পরে হবে—তুই চুরি কচ্ছিলি কেন, তাই আগে বল্ ?

রামলাল রীতিমত বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, চুরি কচ্ছিলুম ? কখ্খন না। এইটুকু শশা নিলে চুরি করা হয় ?

নারায়ণী আরো জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, হাঁ বাঁদর! একশবার হয়। বুড়ো ধাড়ি, কাকে চুরি করা বলে, ঐ কচি ছেলেটাও জানে। দাঁড়িয়ে থাক্ এক-পায়ে, পাজি, দাঁড়া বলচি!

এ-বাড়িতে কচি খোকা গোবিন্দ ছিল রামের বাহন। চব্বিশ ঘণ্টাই সে কাছে থাকিত এবং সব কাজে সাহায্য করিত। রামের হুকুম মত এতক্ষণ সে ঘুড়ি ধরিয়া ছিল, গোলমাল শুনিয়া সেটা ছাড়িয়া দিয়া মায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

রাম ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া চট্‌ করিয়া বলিল, কাকা, দাঁড়াও এক-পায়ে—এমনি করে। বলিয়া সে একটা পা তুলিয়া দাঁড়াইবার প্রণালীটা দেখাইতেছিল—

রাম ঠাস্‌ করিয়া তাহার গালে একটা চড় বসাইয়া দিয়া পিছন ফিরিয়া একপায়ে দাঁড়াইল।

নারায়ণী হাসি চাপিয়া ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইয়া রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিলেন। মিনিট-দুই পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, সে তেমনি এক পায়ে দাঁড়াইয়া কোঁচার খুঁট দিয়া ঘন ঘন চোখ মুছিতেছে।

নারায়ণী বলিলেন, আচ্ছা যা, হয়েছে। আর এমন করিসনে।

রাম সে কথা শুনিল না। রাগ করিয়া তেমনিভাবে এক পায়ে দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতে লাগিল।

নারায়ণী কাছে আসিয়া তাহার বাহু ধরিয়া টানিতে লাগিলেন, সে শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া প্রবলবেগে ঝাড়া দিয়া তাঁহার হাত সরাইয়া দিল, তিনি হাসিয়া আর একবার টানিবার চেষ্টা করিতেই সে পূর্ব্বের মত সবেগে ঝাড়া দিয়া নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া এক দৌড়ে পলাইয়া গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে নৃত্যকালী ডাকিতে আসিয়া দেখিল, চণ্ডীমণ্ডপের ও-ধারের বারান্দায় পা ঝুলাইয়া খুঁটি ঠেস্‌ দিয়া রাম চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

নৃত্যকালী বলিল, ইস্কুলের সময় হয়নি ছোটবাবু? মা ডাকচেন।

রাম জবাব দিল না। যেন শুনিতে পায় নাই, এইভাবেই বসিয়া রহিল।

নৃত্য সামনে আসিয়া বলিল, মা, চান করে খেয়ে নিতে বলচেন।

রাম চোখ রাঙাইয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, তুই দূর হ!

কিন্তু মা কি বলেচেন শুনতে পেয়েচ?

না পাইনি। আমি নাব না, খাব না—কিছু করব না—তুই যা।

আমি গিয়ে বলচি তাঁকে, বলিয়া নৃত্যকালী ফিরিতে উদ্যত হইল।

রাম তৎক্ষণাৎ উঠিয়া খিড়কির এঁদো-পুকুরে ডুব দিয়া আসিয়া ভিজা মাথায় ভিজা কাপড়ে বসিয়া রহিল। নারায়ণী খবর পাইয়া ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিলেন—ওরে ও ভূত! ও কি করলি? ও ডোবায় ভয়ে কেউ পা ধোয় না, তুই স্বচ্ছন্দে ডুব দিয়ে এলি?

তিনি আঁচল দিয়া বেশ করিয়া তাহার মাথা মুছাইয়া দিয়া, কাপড় ছাড়াইয়া ঘরে আসিয়া ভাত বাড়িয়া দিলেন। রাম বাড়া-ভাতের সুমুখে গোঁজ হইয়া বসিয়া রহিল।

নারায়ণী তাহার ভাবটা বুঝিয়া কাছে আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, লক্ষ্মী ভাইটি, এ-বেলা তুই আপনি খা, রাত্তিরে তখন আমি খাইয়ে দেব। চেয়ে দেখ এখনো আমার রান্না হয়নি—লক্ষ্মীটি খাও।

রাম তখন ভাত খাইয়া জামা পরিয়া ইস্কুলে চলিয়া গেল।

নৃত্যকালী কহিল, তোমার জন্যই ওর সব-রকম বদ অভ্যাস হচ্ছে মা। অত বড় ছেলেকে কোলে বসিয়ে খাইয়ে দেওয়া কি। একটু রাগ করলেই খাইয়ে দিতে হবে—ও আবার কি-কথা।

নারায়ণী একটু হাসিয়া বলিলেন, না হলে খায় না যে। রাত্তিরের লোভ না দেখালে ও ঐখানে একবেলা ঘাড় গুঁজে বসে থাকতো—খেতো না।

নৃত্যকালী বলিল, না, খেত না। ক্ষিদে পেলে আপনি খেত। অত বড় ছেলে—

নারায়ণী মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, তোরা ওর বয়সই দেখিস্। বড় হলে বুদ্ধি হলে পর আপনিই লজ্জা হবে। তখন আর কোলে বসতে চাইবে, না, খাইয়ে দিতে বলবে?

নৃত্যকালী ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, ভালর জন্যই বলি মা, নইলে আমার দরকার কি? বার-তের বছর বয়সে যদি ওর জ্ঞান-বুদ্ধি না হয়, তবে কবে হবে?

নারায়ণী এবার রাগ করিলেন। বলিলেন, জ্ঞান-বুদ্ধি সকল মানুষের এক সময়ে হয় না নেত্য। কারো বা দু'বছর আগে, কারো বা দু'বছর পরে হয়। আর হোক ভাল, না হোক ভাল, তোদেরই বা এত দুর্ভাবনা কেন?

নেত্য বলিল, ঐ তোমার দোষ মা। ও যে কি রকম দুষ্টু হয়ে উঠেচে তা ত নিজেই দেখতে পাচ্ছ। পাড়ার লোকে বলে, তোমার আদরেই ও—

নারায়ণী রুক্ষস্বরে বলিলেন, পাড়ার লোক আদরটাই দেখে, শাসনটা দেখে না; কিন্তু তুই ত পাড়ার লোক ন'স্, সমস্ত সকালবেলাটা যে এক পায়ে দাঁড়িয়ে কাঁদলে, পচা পুকুরে ডুব দিয়ে এল, ভগবান জানেন, জ্বর হবে না কি হবে, তার পরে কি বলিস উপোস করিয়ে ইস্কুল পাঠিয়ে দিতে? ঘরে-বাইরে আমার অত গঞ্জনা সহ্য হয় না, নেত্য। বলিতে বলিতে তাঁহার স্বর রুদ্ধ হইয়া চোখ জলে ভরিয়া আসিল, আঁচল দিয়া তিনি চোখ মুছিলেন।

এই কথা লইয়া কাল রাত্রে স্বামীর সঙ্গেও যে সামান্য কলহ হইয়া গিয়াছিল, সে-কথা নেত্য জানিত না। অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া সে বলিল, ও কি মা, কাঁদ কেন? মন্দ কথা ত আমি কিছু বলিনি! লোকে বলে, তাই একটু সাবধান করে দেওয়া।

নারায়ণী চোখ মুছিয়া বলিলেন, সকল মানুষকে ভগবান একরকম গড়েন না। ও একটু দুষ্ট বলেই আমি যার তার কথা চুপ করে সহ্য করি, কিন্তু আদর দেবার খোঁটা লোকে দেয় কি করে? তারা কি চায়, ওকে আমি কেটে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসি? তা হলেই বোধ করি তাদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। বলিয়া কোনরূপ উত্তরের প্রতীক্ষামাত্র না করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

নেত্যকালী এতটুকু হইয়া গিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, জানি না বাপু। সব বিষয়ে যে মানুষের এত বুদ্ধি, এত ধৈর্য্য, সে কেন এতটুকু কথা বুঝতে পারে না? আর শাসন ত ভারী! ছেলে এক মিনিট এক-পায়ে দাঁড়িয়ে কেঁদেচে ত পৃথিবী রসাতলে গেছে!

দাদার সঙ্গে বসিয়া আহার করিতে রাম একেবারে পছন্দ করিত না। আজ রাত্রে ইচ্ছা করিয়া নারায়ণী দুই ভাইয়ের খাবার পাশাপাশি দিয়া অদূরে বসিয়াছিলেন। রাম ঘরে ঢুকিয়াই লাফাইয়া উঠিল। যাও, আমি খাব না—কিছুতেই খাব না।

নারায়ণী বলিলেন, তবে শুগে যা।

তাঁহার গম্ভীর কণ্ঠস্বরে রামের লাফানি বন্ধ হইল, কিন্তু সে খাইতে বসিল না—চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রান্নাঘরের আর একটা দরজা দিয়া শ্যামলাল ঘরে ঢুকিতেই রাম ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল। শ্যামলাল ধীরে-সুস্থে খাইতে বসিয়া বলিলেন, রেমো খেলে না যে?

নারায়ণী সংক্ষেপে বলিলেন, ও আমার সঙ্গে খাবে।

আহার শেষ করিয়া শ্যামলাল চলিয়া যাইবামাত্র রাম এক-মুঠা ছাই লইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, আমি কাউকে খেতে দেব না—সকলের পাতে ছাই দেব—দিই?

নারায়ণী মুখ তুলিয়া বলিলেন, দিয়ে একবার মজা দেখ্ না।

রাম ছাই-মুঠা হাতে করিয়া সুর বদলাইয়া বলিল, ভারি মজা, সকালবেলা আমাকে ঠকিয়ে ভাত খাইয়ে দিয়ে এখন মজা দেখ না।

তুই খেলি কেন?

তুমি যে বললে রাত্তিরে—

বুড়ো খোকা, পরের হাতে খেতে তোর লজ্জা করে না?

রাম আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, পরের হাতে কোথায়! তুমি যে বললে!

নারায়ণী আর তর্ক না করিয়া বলিলেন, আচ্ছা, যা—ছাই ফেলে দিয়ে হাত ধুয়ে আয়। কিন্তু আর কোনদিন খেতে চাস্!

খাওয়ানো তখনো শেষ হয় নাই, নৃত্যকালী বিনা প্রয়োজনে একবার দরজার সম্মুখ দিয়া ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ও-দিকের বারান্দায় চলিয়া গেল।

নারায়ণী দেখিয়া বলিলেন, রাম, কখনও কি একটু শান্ত হবিনে ভাই। ভগবান কোনদিন কি তোর একটু সুমতি দেবেন না? লোকের কথা যে আমি আর সহ্য করতে পারিনে।

রাম মুখের ভাত গিলিয়া বলিল, কে লোক, তার নাম বল।

না রায়ণী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, ব্যাস! কে লোক, ওকে তার নাম বলে দাও।

কিন্তু মাস-কয়েক পরেই সত্যিই নারায়ণীর অসহ্য হইয়া উঠিল। তাহার বিধবা মা দিগম্বরী দশ বছরের কন্যা সুরধুনীকে লইয়া এতদিন কোনমতে তাঁহার ভাইয়ের বাড়িতে দিন কাটাইতেছিলেন। হঠাৎ সেই ভাইয়ের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার আর দাঁড়াইবার স্থান রহিল না। নারায়ণী স্বামীকে সম্মত করাইয়া তাঁহাদিগকে আনাইতে লোক পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা আসিলেন এবং আসিয়াই দিগম্বরী মেয়েকে ত ডিঙাইয়া গেলেনই, সেই সুবাদে রামকেও ডিঙাইবার জন্য পা বাড়াইতে লাগিলেন। প্রথম হইতেই তিনি রামকে বিদ্বেষের চোখে দেখিতে লাগিলেন।

আজ সকালবেলা রাম দুই-তিন হাত লম্বা একটা অশথ চারা আনিয়া উঠানের মাঝখানে পুঁতিতে আরম্ভ করিয়া দিল। রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া দিগম্বরী মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে সমস্ত লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্নস্বরে বলিলেন, ওটা কি হচ্ছে রাম?

রাম তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল, অশ্বথ গাছটা বড় হলে বেশ ছায়া হবে গো! মাস্টারমশাই বলেচেন অশ্বথের ছায়া খুব ভাল। গোবিন্দ, যা, ঘটি করে জল নিয়ে আয়। ভোলা, মোটা দেখে বাঁশ কেটে আন—বেড়া দিতে হবে। নইলে গরু-বাছুরে খেয়ে ফেলবে।

দিগম্বরী হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গিয়া বলিলেন, উঠানের মাঝখানে অশ্বথ গাছ! এমন ছিষ্টিছাড়া কাজ কখনও বাপের বয়সে দেখিনি বাবা!

রাম সে কথায় কর্ণপাতও করিল না।

গোবিন্দ তাহার সামর্থ্যানুযায়ী একটি ছোট ঘটি করিয়া জল আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিল। রাম তাহার হাত হইতে ঘটিটি লইয়া সস্নেহে হাসিয়া বলিল, এটুকু জলে কি হবে রে পাগলা! তুই বরং দাঁড়া এইখানে, আমি জল আনিগে।

তাহার পর ঘড়া ঘড়া জল ঢালিয়া সমস্ত উঠানটা কাদা করিয়া, রাম যখন গাছ-পোঁতা শেষ করিয়াছে, তখন নারায়ণী নদী হইতে স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। দিগম্বরী এতক্ষণ তুষের আগুনে দগ্ধ হইতেছিলেন, কারণ তাঁহার চোখের সুমুখেই এই হিতকর বিরাট অনুষ্ঠানটি আরম্ভ হইয়া প্রায় সমাধা হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি মেয়েকে দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, দেখ্, নারাণি, চেয়ে দেখ্। তোর দেওরের কাণ্ডটা একবার দেখ্। উঠানের মাঝখানে অশ্বথ গাছ পুঁতে বলে কি-না ছায়া হবে। আবার ওদিকে দেখ হারমজাদা ভোলার কাণ্ড। একটা আস্ত বাঁশঝাড় কেটে নিয়ে ঢুকচে—বেড়া দেওয়া হবে।

নারায়ণী চাহিয়া দেখিলেন, সত্যই এক-রাশ বাঁশ ও কঞ্চি টানিয়া ভোলা উঠানে

ঢুকিতেছে। ভোলা রামের প্রায় সমবয়সী। নারায়ণী হাসিতে লাগিলেন। ওদিকে মায়ের ক্রুদ্ধ ব্যস্ত ভাব, একদিকে রামের এই পাগলামী, সমস্ত জিনিসটাই তাঁহার কাছে পরম হাস্যকর ব্যাপার বলিয়া ঠেকিল। হাসিয়া বলিলেন, উঠানের মাঝখানে অশ্বত্থ গাছ কি হবে রে?

রাম আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, কি হবে কি বৌদি! কেমন চমৎকার ঠাণ্ডা ছায়া হবে বল ত, আর এই যে ছোট ডালটি দেখচ, উটি বড় হলে—এই গোবিন্দ, আঙ্গুল দেখাস্‌নে—বড় হলে গোবিন্দের জন্যে একটা দোলা টাঙিয়ে দেব। ভোলা, একটু উঁচু করে বেড়া দিতে হবে, নইলে কালী গলা বাড়িয়ে খেয়ে নেবে; দে, কাটারীখানা, আমার হাতে দে, তুই পারবিনে। খট্‌-খট্‌ ঠক্‌-ঠক্‌ করিয়া বাঁশ কাটা সুরু হইয়া গেল।

নারায়ণী হাসিতে হাসিতে কক্ষস্থিত পূর্ণকলস রান্নাঘরে রাখিয়া দিতে চলিয়া গেলেন।

রাগে দিগম্বরীর চোখ জ্বলিতে লাগিল। মেয়ের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, তুই যে কিছু বললিনে? ঐখানে তবে অশ্বত্থ গাছ হোক্‌।

নারায়ণী হাসিয়া বলিলেন, মা, ব্যস্ত হ'চ্চ কেন, অত বড় গাছ কখন হয়? ওর কি শেকড়-বাকড় আছে যে ঘড়া ঘড়া জল ঢাললেই বাঁচবে? ও ত কালই শুকিয়ে যাবে।

দিগম্বরী কিছুমাত্র শান্ত না হইয়া বলিল, শুকুবে না ছাই হবে, ভাল চাস্‌ ত উপড়ে ফেলে'দে গে।

নারায়ণী শঙ্কিত হইয়া বলিলেন, বাপরে! তা হ'লে আর কারো রক্ষে থাকবে না।

দিগম্বরী বলিলেন, কেন, বাড়ি কি ওর একলার যে মনে করলেই উঠোনের মাঝখানে এক অশ্বত্থ গাছ পুঁতে দেবে? তোরা কি কেউ ন'স? আমার গোবিন্দ কি কেউ নয়? মা গো, অশ্বত্থ গাছের উপরে এসে রাজ্যের কাক, চিল, শকুনি বাসা করবে, হাড়-গোড় ফেলে নোঙরা করবে—আমি ত নারাণি, তা হলে থাকতে পারব না। ওকে তোদের এত ভয়টা কি জন্যে শুনি? আমার যদি বাড়ি হ'ত নারাণি, তা হলে দেখতুম, ও কতবড় বজ্জাত। একদিনে সোজা করে দিতুম।

নারায়ণী মায়ের বুকের ভিতরটা যেন দর্পণের মত স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জোর করিয়া হাসিয়া বলিলেন, ছেলেমানুষ, ওর এখন কি বুদ্ধি মা! বুদ্ধি থাকলে কি কেউ নিজের বাড়ির উঠোনে অশ্বত্থ গাছ পোঁতে। দু'দিন থাক্‌, তার পরে ও আপনিই ফেলে দেবে।

দিগম্বরী বলিলেন, ফেলে দেবে। ও কেন দেবে, আমি নিজেই দেব।

নারায়ণী কহিলেন, না মা, ও কাজ করো না, তোমাকে বলচি, ওকে চেন

না। আমি ছাড়া ওর ভাইও ছুঁতে সাহস করবে না মা। আজকের দিনটা যাক্।

দিগম্বরী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, আচ্ছা, আচ্ছা, তুই কাপড় ছাড়গে যা।

দুপুরবেলা নারায়ণী নিজের ঘরে বসিয়া বালিশের অড় সেলাই করিতেছিলেন, নেত্য ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল, মা সর্ব্বনাশ হয়েচে! দিদিমা ছোটবাবুর গাছ ফেলে দিয়েচে! সে ইস্কুল থেকে এসে আর কাউকে বাঁচতে দেবে না। নারায়ণী সেলাই ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন, সত্যই গাছ নাই।

বলিলেন, মা, রামের গাছ কি হ'ল?

দিগম্বরী মুখখানা হাঁড়িপনা করিয়া আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিলেন, ওই।

নারায়ণী কাছে আসিয়া দেখিলেন, সেটা শুধু তুলিয়া ফেলা হয় নাই, মুচড়াইয়া ভাঙিয়া রাখা হইয়াছে। তখনই নিঃশব্দে তুলিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়া নারায়ণী ঘরে চলিয়া গেলেন।

ইস্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাম সর্ব্বাগ্রে তাহার গাছটি দেখিতে গিয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিল। বই-খাতা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, বৌদি, আমার গাছ?

নারায়ণী রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, বলচি, এদিকে আয়।

না, যাব না। কই আমার গাছ?

এদিকে আয় না বলচি।

রাম কাছে আসিতেই তিনি হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গিয়া কোলের উপর বসাইয়া, মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া বলিলেন, মঙ্গলবারে কি অশ্বত্থগাছ পুঁততে আছে রে?

রাম শান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন, কি হয়?

নারায়ণী হাসিয়া বলিলেন, তা হলে বাড়ির বড়বৌ মরে যায় যে!

রাম একমুহূর্ত্তে ম্লান হইয়া গিয়া বলিল, যাঃ, মিছে কথা।

নারায়ণী হাসিমুখে বলিলেন, না রে, মিছে কথা নয়, পাঁজিতে লেখা আছে।

কই, পাঁজি দেখি?

নারায়ণী মনে মনে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া অকস্মাৎ গভীর বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, তুই কি ছেলে রে! মঙ্গলবার পাঁজির নাম করতে নেই—তুই দেখবি কি রে? এ-কথা যে ভোলাও জানে, আচ্ছা, ডাক্ তাকে।

এত বড় অজ্ঞতা পাছে ভোলার কাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই ভয়ে সে তৎক্ষণাৎ অপ্রতিভ হইয়া তাহার দুই বাহু দিয়া মাতৃসমা বড়বধূর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া বলিল, এ আমি জানি। কিন্তু ফেলে দিলে আর দোষ নেই, না বৌদি ?

নারায়ণী তাহার মাথাটা বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, না, আর দোষ নেই। তাঁহার চোখ দুটি জলে ভিজিয়া উঠিল। মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, হাঁ রে রাম, আমি মরে গেলে তুই কি করবি ?

রাম সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, যাঃ, বলতে নেই।

নারায়ণী অলক্ষ্যে চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, বুড়ো হলুম, মরব না রে !

এবারে রাম পরিহাস বুঝিতে পারিয়া মুখ তুলিয়া সহাস্যে বলিল, তুমি বুড়ো বুঝি ? একটি দাঁতও পড়েনি, একটি চুলও পাকেনি।

নারায়ণী বলিলেন, চুল না পাকতেই আমি নদীর জলে একদিন ডুবে মরব। নাইতে যাব আর ফিরে আসব না।

কেন বৌদি ?

তোর জ্বালায়। আমার মাকে তুই দেখতে পারিস্‌নে, দিনরাত ঝগড়া করিস্, সেইদিন তোরা টের পাবি, যেদিন আর ফিরব না।

কথাটা রাম বিশ্বাস করিল না বটে, তথাপি মনে মনে শঙ্কিত হইয়া বলিল, আচ্ছা, আমি আর কিছু বলব না। কিন্তু ও কেন আমাকে অমন ক'রে বলে ?

বললেই বা। উনি আমার মা, তোরও গুরুজন। আমাকে যেমন তুই ভালবাসিস, ওঁকেও তেমনি ভালবাসবি।

রাম আবার বৌদিদির বুকের মধ্যে মুখ লুকাইল। এইখানে মুখ রাখিয়া সে এই দীর্ঘ তের বৎসর বাড়িয়া উঠিয়াছে, কেমন করিয়া সে এত বড় মিথ্যা কথা মুখে আনিবে ! এ যে তাহার পক্ষে একেবারেই অসাধ্য !

নারায়ণী আর্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, মুখ লুকালে কি হবে বল্ ?

ঠিক এই সময়ে দিগম্বরী দেখা দিলেন। কণ্ঠস্বরে মধু ঢালিয়া দিয়া বলিলেন, কাজকর্ম নেই নারাণি ! দেওরকে নিয়ে সোহাগ হচ্ছে, নিজের ছেলেটা যে ওদিকে সারা হয়ে গেল।

রাম তৎক্ষণাৎ মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার চোখ দুইটা হিংস্র শ্বাপদের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল।

নারায়ণী জোর করিয়া তাহার মুখ বুকের উপর টানিয়া লইয়া মাকে বলিলেন, ছেলেটা সারা হয়ে গেল কিসে ?

কিসে ? বেশ ! বলিয়াই দিগম্বরী প্রস্থান করিলেন।

যা লাইয়া বলিবার মত একটা মিথ্যাকথাও তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না। রাম জোর করিয়া মাথা তুলিয়া বলিল, ও ডাইনীর আমি গলা টিপে দেব।

নারায়ণী তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিলেন, চুপ কর্‌ পাজি, মা হয় যে।

দিন-চারেক পরে একদিন ভাত খাইতে বসিয়া 'উঃ আঃ' করিয়া বার-দুই জল খাইয়া রাম ভাতের থালাটা টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া নাচিতে লাগিল—ঐ ডাইনী-বুড়ীর রান্না আর আমি খাব না, কখ্‌খন খাব না, ঝালে মুখ জ্বলে গেল, বৌদি—ও—বৌদি—

চিৎকার শুনিয়া নারায়ণী আহ্নিক ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া পড়িলেন।

রাম রাগে কাঁদিয়া ফেলিল—আমি কখ্‌খন খাব না, কখ্‌খন খাব না—ওকে দূর করে দাও। বলিতে বলিতে ঝড়ের বেগে সে বাহির হইয়া গেল।

নারায়ণী স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিলেন, মা, বার বার বলি, তরকারীতে এত ঝাল দিও না, এত ঝাল খাওয়া এ-বাড়ির কারো অভ্যাস নাই।

দিগম্বরী অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া বলিলেন, ঝাল আবার কোথায়? দুটি লঙ্কা শুধু গুলে দিয়েচি, এতেই এত কাণ্ড!

নারায়ণী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, নাই দিলে মা দুটো লঙ্কা। কেউ যখন খায় না, তখন—

চুপ কর্‌ নারাণি, চুপ কর্‌। রান্না শেখাতে আসিস্‌নে আমাকে, চুল পাকালুম এই করে, এখন পেটের মেয়ের কাছে রান্না শিখতে হবে! ধিক্‌ আমাকে!

নারায়ণী আর কোন কথা না বলিয়া রান্নাঘরে গিয়া নূতন করিয়া রাঁধিবার যোগাড় করিতে লাগিলেন।

দিগম্বরী দুয়ারে পা ছড়াইয়া বসিয়া কপালে করাঘাত করিয়া উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন, ভাই রে! কোথায় আছিস্‌, একবার ডেকে নে! আর সহ্য হয় না! যা মুখে আসে, আমাকে তাই বলে গাল দেয় রে! আমি বুড়ী! আমি ডাইনী! আমাকে দূর করে দিতে বলে। আমি এমন মেয়ে-জামায়ের ভাত খেতে এসেচি—আমার গলায় দড়ি জোটে না! এর চেয়ে পথে ভিক্ষে করা শতগুণে ভাল। সুরো, আয় মা, আমরা যাই, এ-বাড়িতে আর জলস্পর্শ করব না।

সুরধনী কাঁদ কাঁদ হইয়া মায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, দিগম্বরী তাহার হাত ধরিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

নারায়ণী বঁটি কাত করিয়া রাখিয়া উঠিয়া আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন।

দিগম্বরী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, না না, আটকাস্‌নে আমাদের নারায়ণী, যেতে দে। আমরা অনাহারে গাছতলায় মরব সেও ভাল, কিন্তু তোদের ভাত খাব না, তোদের ঘরে শোব না।

নারায়ণী হাত-জোড় করিয়া কহিলেন, কার ওপর রাগ করে যাচ্ছ মা? আমরা কি কোন অপরাধ করেচি?

দিগম্বরীর ক্রন্দন অধিকতর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, নাকিসুরে কহিলেন, আমি কচি খুকি নই, নারাণি, সব বুঝি। তোর ইসারা না থাক্‌লে কি ওর কখনও অত সাহস হয়? আমি ডাইনী! অ্যাঁ, আমাকে দূর করে দাও। আচ্ছা, তাই যাচ্ছি। আমরা তোদের আপদ-বালাই—গলগ্রহ! পথ ছাড়্‌ বলচি!

নারায়ণী মায়ের দুই পায়ে হাত দিয়া বলিলেন, মা, আজকের মত মাপ কর! আচ্ছা, উনি আসুন, তারপর যা ইচ্ছে হয় ক'রো। তার পর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া দুই পায়ে জল ঢালিয়া আঁচল দিয়া মুছাইয়া একটা পিঁড়ির উপর বসাইয়া পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন।

ক্রোধটা তাঁহার তখনকার মত শান্ত হইল বটে, কিন্তু দুপুরবেলা শ্যামলাল আহারে বসিতেই তিনি কপাটের অন্তরালে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। প্রথমটা শ্যামলাল হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিলেন, পরে একটু একটু করিয়া সমস্ত ব্যাপারটা অবগত হইয়া অর্দ্ধভুক্ত অন্ন ফেলিয়া রাখিয়া উঠিয়া গেলেন।

নারায়ণী বুঝিলেন এ রাগ কাহার উপরে। নৃত্যকালী সহ্য করিতে পারিল না। বাড়ির মধ্যে সে ছিল স্পষ্টবাদিনী, চট্‌ করিয়া বলিয়া বসিল, দিদিমা, জেনে-শুনে ইচ্ছে করে বাবাকে খেতে দিলে না। চোখের জল ত তোমার শুকিয়ে যাচ্ছিল না দিদিমা, না হয় দু'মিনিট পরেই বার করতে!

দিগম্বরী মুখ কালি করিয়া নিরুত্তরে রহিলেন।

দুপুরবেলা রাম কোথা হইতে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া, এ-ঘর ও-ঘর খুঁজিয়া তাহার বৌদিদির ঘরে আসিয়া দেখিল, তিনি গোবিন্দকে লইয়া শুইয়া আছেন। ব্যাপারটা তাহার বড় ভাল বোধ হইল না। তথাপি আস্তে আস্তে বলিল, ক্ষিদে পায় যে!

বৌদিদি কথা কহিলেন না।

সে আর একটু জোর দিয়া বলিল, কি খাব?

নারায়ণী শুইয়া থাকিয়াই বলিলেন, আমি জানিনে, যা এখান থেকে।

না যাব না—আমার ক্ষিদে পায় না বুঝি!

নারায়ণী মুখ ফিরাইয়া রুষ্টভাবে বলিলেন, আমাকে জ্বালাতন করিস্‌নে রাম, নেত্য আছে, তাকে বল্‌গে।

রাম আর কিছু না বলিয়া বাইরে আসিয়া নেত্যকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া বলিল, খেতে দে নেত্য।

নেত্য বোধ করি প্রস্তুত হইয়াই ছিল, এক বাটি দুধ, কিছু মুড়ি ও চার-পাঁচটা নারিকেল-নাড়ু আনিয়া দিল।

রাম রাগিয়া উঠিয়া বলিল, এই বুঝি?

নেত্য বলিল, ছোটবাবু ভাল চাও ত আজ আর হাঙ্গামা ক'রো না। বাবু ভাত খেয়ে কাছারি চলে গেছে, মা উপোস করে গোবিন্দকে নিয়ে শুয়ে আছে। গোলমাল শুনে যদি উঠে আসে—তোমার অদেষ্টে দুঃখ আছে তা বলে দিচ্চি।

রাম তাহা দেখিয়াই আসিয়াছিল, আর দ্বিরুক্তি না করিয়া খানিকটা দুধ খাইয়া মুড়ি ও নাড়ু কোঁচড়ে ঢালিয়া পুকুরধারে গাছতলায় গিয়া বসিল। তাহার আহারে প্রবৃত্তি চলিয়া গিয়াছিল। বৌদি উপোস করিয়া আছে। সে অন্যমনস্ক হইয়া মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে ভাবিতে লাগিল, তাহার মুনি-ঋষিদের মত কোন একটা মন্ত্র জানা থাকিলে এইখানে বসিয়াই সে বৌদির পেট ভরাইয়া দিত। কিন্তু মন্ত্র না জানিয়া কি উপায়ে যে কি করা যায়, ইহা কোনমতে স্থির করিতে পারিল না। ফিরিয়া গিয়া তাহাকে খাইবার জন্য অনুরোধ করিতে তাহার লজ্জা করিতেও লাগিল। তা ছাড়া দাদা খায়নি। অনুরোধ করিলেই বা কি হইবে? সে কোঁচড হইতে মুড়ি প্রভৃতি জলের উপর ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কেবলই মনে হইতে লাগিল, বৌদি উপোস করিয়া আছে। কথাটা সে মনে মনে যত রকম করিয়া আবৃত্তি করিল, ততবারই তাহার মনের মধ্যে ছুঁচ ফুটিল।

রাত্রে শ্যামলাল ভার্য্যাকে বলিলেন, আমার আর সহ্য হয় না। ওকে নিয়ে আর বাস করা চলে না।

নারায়ণী অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কার কথা বলচ?

রামের কথা। তোমার মা আমাকে চার-পাঁচ দিন ধরে ক্রমাগত বলচেন, রাম ওঁকে না-হক অপমান করচে। আমি পাঁচজন ভদ্রলোক ডেকে বিষয়-আশয় সমস্ত ভাগ করে ওকে আলাদা করে দেব। আমি আর পারিনে।

নারায়ণী স্তম্ভিত হইয়া ক্ষণকাল বসিয়া থাকিয়া বলিলেন, রামকে আলাদা করে দেবে? ওকথা মুখে এনো না। ও দুধের ছেলে, বিষয়-আশয় নিয়ে কি করবে শুনি?

শ্যামলাল বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, দুধের ছেলেই বটে! আর বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে ও কি করবে, সে ওই জানে।

নারায়ণী বলিলেন, ও জানে না, আমি জানি। কিন্তু মা বুঝি তোমাকে চার-পাঁচ দিন ধরে ক্রমাগত ওই কথা বলে বেড়াচ্ছেন ?

শ্যামলাল একটু অপ্রতিভ হইয়া ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, না, উনি কিছুই বলেননি, লোকেরও ত চোখ আছে গো! আমি নিজে কি কিছুই দেখতে পাইনে, তাই তুমি মনে কর ?

নারায়ণী বলিলেন, না, আমি তা মনে করিনে। কিন্তু ওর কে আছে? কাকে নিয়ে ও পৃথক হবে? মা আছে, না বোন আছে, না একটা মাসি-পিসি আছে? ওকে রেঁধে খাওয়াবে কে ?

শ্যামলাল বিরক্ত হইয়া বলিলেন, আমি ও-সব জানিনে। মুখে বলিলেন বটে, জানি না, কিন্তু অন্তরে জানিতেছিলেন। এত বড় সত্যটা না জানিয়া পথ কোথায়? নারায়ণী কি কথা বলিতে গেলেন, কিন্তু তাঁহার ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল। তাই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, নিজেকে সামলাইয়া লইয়া ভারি গলায় বলিলেন, দেখ, তের বছর বয়সে মেয়েরা যখন পুতুল খেলে বেড়ায় তখন মা আমার মাথায় এই সমস্ত সংসারটা ফেলে রেখে স্বচ্ছন্দে স্বর্গে চলে গেলেন। তিনি দেখচেন, এ ভার আমি বইতে পেরেচি কিনা। রেঁধেচি-বেড়েচি, ছেলে মানুষ করেচি, লোক লৌকিকতা, কুটুম্ব, সংসার সমস্ত এই একটা মাথায় বয়ে বয়ে আজ ছাব্বিশ বছরের আধ-বুড়ো মাগী হয়েচি। এখন আমার ঘর-কন্নার মধ্যে যদি হাত দিতে এস, সত্যি বলচি তোমাকে আমি নদীতে ডুব দিয়ে মরব। তখন আর একটা বিয়ে করে রামকে আলাদা করে দিয়ে যেমন ইচ্ছে তেমন করে সংসার ক'রো, আমি দেখতেও যাব না, বলতেও যাব না। কিন্তু এখন নয়।

শ্যামলাল মনে মনে স্ত্রীকে ভয় করিতেন, আর কথা কহিলেন না। কথাটা এইখানেই সে রাত্রে বন্ধ হইয়া রহিল। পরদিন নারায়ণী রামকে কাছে বসাইয়া গভীর স্নেহে গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, রাম, তোর এখানে আর থেকে কাজ নেই ভাই। তুই কোথাও আলাদা থাক্‌গে যা—পারবিনে থাকতে ?

রাম তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া একগাল হাসিয়া বলিল, পারব বৌদি! তুমি, আমি, গোবিন্দ আর ভোলা, কবে যাওয়া হবে বৌদি ?

নারায়ণী নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। ইহার পর কি বলিবেন! কিন্তু রাম কথাটা থামিতে দিল না। সে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল, বলিল, কবে যাব বৌদি ?

তিনি সে কথার উত্তরে তাহার মুখটা বুকের উপর টানিয়া লইয়া বলিলেন, তোর বৌদিকে ছেড়ে একলা থাকতে পারবিনে ?

রাম মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

আর বৌদি যদি মরে যায় ?

বাঃ—

বা নয়। এখন বৌদির কথা শুনিস্‌নে—তখন দেখতে পাবি।

রাম প্রতিবাদ করিয়া বলিল, কখন তোমার কথা শুনিনে?

নারায়ণী বলিলেন, কখন্‌ শুনিস্‌ তাই বল্‌। কতদিন বলেচি, আমার মাকে তুই অপমান করিস্‌নে, তবু তাঁকে অপমান করতে ছাড়বিনে। কালও করেচিস্‌। এইবার আমি যেখানে দু'চোখ যায় চলে যাব।

আমিও সঙ্গে যাব।

তুই কি টের পাবি কখন্‌ যাব! আমি লুকিয়ে চলে যাব।

আর গোবিন্দ?

সে তোর কাছে থাকবে, তুই মানুষ করবি।

না, আমি পারব না বৌদি।

নারায়ণী হাসিয়া বলিলেন, তোকে পারতেই হবে।

তখন রাম সমস্ত কথাটা অবিশ্বাস করিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, সব মিছে কথা। কোথাও যাবে না।

মিছে নয়—সত্যি। দেখিস্‌, আমি চলে যাব।

রাম অনুতপ্ত হইয়া বলিল, আর যদি তোমার সব কথা শুনি তা হলে?

নারায়ণী হাসিমুখে বলিলেন, তা হলে যাব না। তোকেও আর গোবিন্দকে মানুষ করতে হবে না।

রাম খুশী হইয়া বলিল, আচ্ছা, আজ থেকে তুমি দেখো।

৩

আট দিন বেশ নিরুপদ্রবে কাটিল। দিগম্বরী যে কটাক্ষ করিতেন না, তাহা নহে, কিন্তু রাম রাগ করিত না। বৌদিদির সেদিনকার কথা ঠিক বিশ্বাস না করিলেও তাহার ভয় হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ভগবান বিরূপ, আবার দুর্ঘটনা ঘটিল। আজ দিগম্বরী তাঁহার পিতৃদেবের উদ্দেশে দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ-ভোজনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। পিতার প্রেতাত্মা এতদিন ছেলের বাড়িতে চুপ করিয়া ছিল, এখন নাত-জামাইয়ের বাড়িতে যাতায়াত করিতে লাগিল, অবশ্য স্বপ্নে—তবু তাহাকে সন্তুষ্ট করা চাই ত!

সকালবেলা রাম আঁক কষিতেছিল। ভোলা আসিয়া চুপি চুপি খবর দিয়া গেল,

দাদাঠাকুর, ভগা বাগ্‌দী তোমার কেত্তিক-গণেশকে চাপবার জন্যে জাল এনেচে, দেখবে এসো।

একটু বুঝাইয়া বলি। বহুদিনের পুরাতন গোটা-দুই খুব বড় গোছের কইমাছ ঘাটের কাছে সর্ব্বদাই ঘুরিয়া বেড়াইত। মানুষজনকে সে-দুটো আদৌ ভয় করিত না। রাম বলিত, এরা তার পোষা মাছ এবং নাম দিয়েছিল, কার্ত্তিক, গণেশ। এ-পাড়ায় এমন কেহ ছিল না যে-ব্যক্তি কার্ত্তিক-গণেশের অসাধারণ রূপ-গুণের বিবরণ রামের কাছে শোনে নাই, এবং তাহার অনুরোধে একবার দেখিতে আসে নাই। কি যে তাহাদের বিশেষত্ব তাহা কেবল সেই জানিত, এবং কে কার্ত্তিক, কে গণেশ, শুধু সেই চিনিত। ভোলাও সব সময় ঠাহর করিতে পারিত না বলিয়া রামের কাছে কানমলা খাইত।

নারায়ণী হাসিয়া বলিলেন, রামের কার্ত্তিক গণেশ কাজে লাগবে আমার শ্রাদ্ধের সময়।

ভোলার খবরটা রামকে কিছুমাত্র বিচলিত করিল না। সে শ্লেটের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, একবার চেপে মজা দেখুক না—জাল ছিঁড়ে তারা বেরিয়ে যাবে।

ভোলা কহিল, না দাঠাকুর, আমাদের জাল নয়। ভগা জেলেদের মোটা জাল চেয়ে এনেচে—সে ছিঁড়বে না।

রাম শ্লেট রাখিয়া বলিল, চল্ ত দেখি।

পুকুর ধারে আসিয়া দেখিল তাহার কার্ত্তিক-গণেশের বিরুদ্ধে সত্যই ষড়যন্ত্র চলিতেছে।

ভগা ঘাটের কাছে জলে কতকগুলা মুড়ি ভাসাইয়া দিয়া জাল উদ্যত করিয়া প্রস্তুত হইয়া আছে।

রাম আসিয়া তাহাকে একটা ধাক্কা মারিয়া বলিল, হতভাগা, মুড়ি দিয়ে আমার মাছ ডাকচ!

ভগা কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, বড়বাবু হুকুম দিয়ে গিয়েছেন। অন্য মাছ আর পাওয়া গেল না দাঠাকুর।

রাম তাহার হাত হইতে জাল ছিনাইয়া লইয়া টান মারিয়া ফেলিয়া বলিল, যা, দূর হ!

ভগা জাল তুলিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

রাম ফিরিয়া আসিয়া পুনর্ব্বার শ্লেট-পেন্সিল লইয়া বসিল। সে কাহারও উপর রাগ করিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল।

দিগম্বরী আজ সকাল সকাল আহ্নিক সারিয়া লইতেছিলেন। নেত্য আসিয়া খবর দিল, মাছ পাওয়া গেল না দিদিমা। ছোটবাবু ভগা বাগ্‌দেকে মেরে-ধরে

হাঁকিয়ে দিয়েছেন। এই মাছ দুইটার উপর দিগম্বরীর লুব্ধ দৃষ্টি ছিল। বড় রুইমাছের মুড়ার সম্বন্ধে বিধবার মনের ভাব অনুমান করিতে নাই। সুতরাং লোভ তাঁহার নিজের জন্য নয় বটে, কিন্তু নিজের কোন একটা কাজে, স্বহস্তে রাঁধিয়া সদ্‌ব্রাহ্মণের পাতে দিয়া পুণ্য ও খ্যাতি অর্জ্জন করিবার বাসনা অনেক দিন হইতে তিনি মনে মনে পোষণ করিতেছিলেন। কাল জামাইয়ের মত লইয়া, অর্থাৎ কার্ত্তিক-গণেশ সম্বন্ধে আভাস মাত্র না দিয়া, জেলেদের মোটা জাল চাহিয়া আনাইয়া, প্রজা ভগা বাগদীকে চার আনা বক্‌সিস্ কবুল করিয়া সমস্ত আয়োজন একরূপ সম্পূর্ণ করিয়াই রাখিয়াছিলেন। আজ সকালেও সে দুইটা প্রাণীকে ঘাটের কাছে ঘুরিতে-ফিরিতে দেখিয়া আসিয়া নিশ্চিন্ত হৃষ্ট-চিত্তে জপে বসিয়াছেন। এমন সময় এরূপ দুঃসংবাদ তাঁহাকে হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য করিয়া তুলিল। তাঁহার দাঁত কিড় মিড় করা অভ্যাস ছিল। তিনি অকস্মাৎ দাঁতে দাঁত ঘসিয়া, গলার মালাটা উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, ওরে, কি শত্তুর আমার! কবে ছোঁড়া মরবে রে, আমার হাড়ে বাতাস লাগবে। বাসি মুখে এখনো জল দিইনি ঠাকুর! যদি সত্যির হও, যেন তে-রাত্তির না পোহায়।

কাছে বসিয়া নারায়ণী তরকারী কুটিতেছিলেন। তিনি বিদ্যুদ্‌বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, 'মা!' শুনিয়াছি সন্তানের মুখে মাতৃ সম্বোধনের তুলনা নাই। নারায়ণীর মুখে মাতৃ-সম্বোধনের আজ বোধ করি তুলনা ছিল না। ঐ এক অক্ষরের ডাকে দিগম্বরীর বুকের রক্ত হিম হইয়া গেল। কিন্তু নারায়ণীও আর কিছু বলিতে পারিলেন না। দেখিতে দেখিতে তাঁহার দুই গণ্ড বাহিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ক্ষণেকপরে চোখ মুছিয়া যেখানে রাম পড়া তৈরি করিতেছিল সেইখানেই আসিয়া দাঁড়াইলেন।

কঠোর-স্বরে প্রশ্ন করিলেন, তুই ভগা বাগ্‌দীকে মেরে হাঁকিয়ে দিয়েচিস্?

রাম চমকাইয়া শ্লেট হইতে মুখ তুলিয়া এক মুহূর্ত্ত তাঁহার মুখের 'পানে চাহিয়া দেখিল, এবং জবাব দিবার লেশমাত্র চেষ্টা-না করিয়া ওদিকের দরজা দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

নারায়ণী ভিতরের কথা জানিতে পারিলেন না, ফিরিয়া আসিয়া ভগা বাগ্‌দীকে ডাকিয়া আনিলেন এবং মাছ ধরিয়া আনিতে হুকুম দিলেন।

হুকুম পাইয়া ভগা জাল লইয়া গেল এবং অবিলম্বে এক প্রকাণ্ড রুই ঘাড়ে করিয়া আনিয়া ধড়াস্ করিয়া উঠানের মাঝখানে ফেলিয়া দিল।

নারায়ণী রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া মাছ দেখিয়া এখন শিহরিয়া উঠিলেন। শঙ্কিত হইয়া কহিলেন, ওরে, একে ঘাটে ধরিস্‌নি ত? এ রামের কার্ত্তিক-গণেশ নয় ত?

ভগা এত শীঘ্র এত বড় মাছ আনিতে পারিয়া বাহাদুরী করিয়া বলিল, আজ্ঞে হাঁ মা-ঠাকরুণ, এ ঘেটো রুই—বড় জবর রুই।

দিগম্বরীকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, মা-ঠাকরুণ এনারেই ধত্তে বলে দেছল।

নারায়ণী স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। নৃত্যকালী যদিও রামের উপর খুব সদয় নহে, তবুও মাছ দেখিয়া সে রাগিয়া উঠিল। দিগম্বরীকে বলিল, আচ্ছা দিদিমা, পাড়ার লোকে জানে ছোটবাবুর কার্ত্তিক গণেশের কথা। তুমি কি বলে এ মাছ ধরতে বলে দিলে? দু' তিনটে পুকুরে কি আর মাছ ছিল না? দশটা লোক খাবে, তা একটা আধমণি মাছই বা কি হবে? লুকিয়ে ফেল একে, কোথায় গেছে তিনি, এখনি এসে পড়বে।

দিগম্বরী মুখ ভারী করিয়া বলিলেন, জানি মা বাপু অত শত। একটা মাছ ধরেচে ত সাত-গুষ্টি মিলে করচে কি দেখ না। একে লুকিয়ে ফেলবি, বামুন খাবে না?

নেত্য বলিল, তোমার বামুন খাবে দুটো-আড়াইটার সময়, ঢের সময় আছে। ছোটবাবু আগে ইস্কুলে যাক্, না হলে আজ আর কেউ বাঁচবে না। ও মা! ভোলা এই দাঁড়িয়েছিল, সে গেল কোথায়? সে বুঝি তবে খবর দিতে ছুটেছে। যা হয় কর মা, দাঁড়িয়ে থেকো না।

ভগা চার আনা পয়সার লোভে জাল চাহিয়া আনিয়াছিল, ব্যাপার দেখিয়া নগদ আদায়ের আশা ছাড়িয়া জাল লইয়া প্রস্থান করিল।

প্রয়োজন হইলে, কখন কোন্ স্থানে রামকে পাওয়া যাইবে, ভোলা তাহা জানিত। সে ছুটিয়া গিয়া বাগানের উত্তর-ধারের পিয়ারাতলায় আসিয়া উপস্থিত হইল। রাম একটা ডালের উপর বসিয়া পা ঝুলাইয়া পিয়ারা চিবাইতেছিল, ভোলা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, দেখবে এস দাঠাকুর, ভগা তোমার কার্ত্তিককে মেরেচে।

রাম চিবানো বন্ধ করিয়া বলিল, যাঃ—

সত্যি দাঠাকুর। মা হুকুম দিয়ে ধরিয়েচে, এখনো উঠানে পড়ে আছে; দেখবে চল।

রাম ঝুপ্ করিয়া লাফাইয়া পড়িয়া দৌড়িল, এবং ঝড়ের বেগে ছুটিয়া আসিয়া উঠানের মাঝখানে একবার থমকিয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, ওগো, এই ত আমার গণেশ! বৌদি, তুমি হুকুম দিয়ে আমার গণেশকে ধরালে! বলিয়া মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাটা ছাগলের মত সে পা ছুঁড়িতে লাগিল। শোকটা যে তাহার কিরূপ সত্য, কিরূপ দুর্দ্দম, সে বিষয়ে দিগম্বরীরও বোধ করি সংশয় রহিল না।

তাহাকে খাওয়াইবার জন্যে রাত্রে নারায়ণী টানাটানি করিতে লাগিলেন, রাম তাঁহার হাত ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল, এবং সমস্ত দিন উপবাসের পর গোটা পাঁচ-ছয় ভাত মুখে দিয়া উঠিয়া গেল।

দিগম্বরী আড়ালে দাঁড়াইয়া জামাইকে বলিলেন, তুমি একবার বল, না হলে নারায়ণী খাবে না, সে সারাদিন উপোস করে আছে।

শ্যামলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, উপোস কেন?

দিগম্বরী কান্নার অভাবে কণ্ঠস্বর করুণ করিয়া বলিলেন, আমার একশ' ঘাট হয়েচে বাবা! কিন্তু কেমন করে জানব বল, পুকুর থেকে বামুন-ভোজনের জন্যে একটা মাছ ধরালে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়!

শ্যামলাল বুঝিতে না পারিয়া ডাকিলেন, নেত্য, কি হয়েচে রে?

নেত্য আড়াল হইতে বলিল, সেটা ছোটবাবুর গণেশ।

শ্যামলাল চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, রেমোর কার্ত্তিক-গণেশের একটা না কি?

নেত্য বলিল, হ্যাঁ।

আর বলিতে হইল না। তিনি আগাগোড়া ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া বলিলেন, রাম খায়নি বুঝি?

নেত্য বলিল, না।

শ্যামলাল বলিলেন, তবে আর খেতে বলে কি হবে? সে খায়নি, ও খাবে কি?

দিগম্বরী বলিতে লাগিলেন, এমন কাণ্ড হবে জানলে বামুন খাওয়াবার কথাও তুলতুম না বাবা! ও নিজে কেনই বা হুকুম দিয়ে মাছ ধরালে, কেনই বা এমন করচে, তা সে ও-ই জানে। আমি ত চুপ করেই ছিলাম। তবু সব দোষ যেন আমারই। আমাদের না হয় আর কোথাও পাঠিয়ে দাও বাবা, এখানে এক দণ্ডও থাকতে আর ভরসা হয় না।

একটুখানি চুপ করিয়া রীতিমত কান্নার সুরে পুনরায় শুরু করিলেন, কপাল আমার এমন করে যদি না-ই পুড়বে, অমন ভাই বা মরবে কেন, আমাকেই বা লাথি-ঝাঁটা খেয়ে এখানে থাকতে হবে কেন? বাবা, আমরা নিতান্ত নিরুপায়, তাই হাত জোড় করে বলচি, আমাদের একটা-কিছু উপায় তোমাকে করে দিতে হবেই।

শ্যামলাল ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু হাঁ না কিছুই বলিতে পারিলেন না।

নারায়ণী আড়ালে দাঁড়াইয়া নিজের মায়ের এই নির্লজ্জ ঠকামোয়, লজ্জায় সরমে মরিয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া রামের রুদ্ধ দরজায় ঘা দিয়া ডাকিলেন, লক্ষ্মী মানিক আমার! দোরটা একবার খুলে দে!

রাম জাগিয়া ছিল, কিন্তু সাড়া দিল না।

নারায়ণী আবার ডাকিলেন, ওঠ্, দোর খোল্।

এবারে চেঁচাইয়া বলিল, না খুলব না, তুমি যাও। তোমরা সবাই আমার শত্তুর।

আচ্ছা ভাই, তুই দোর খোল্।

না, না, না,—আমি খুলব না। সত্যই সে রাত্রে কপাট খুলিল না। শ্যামলাল ঘরের ভিতর হইতে সমস্ত শুনিতে পাইয়াছিলেন, নারায়ণী ঘরে আসিতে বলিলেন, হয় একটা উপায় কর, না হয় যেখানে ইচ্ছা আমি চলে যাব। এত হাঙ্গামা আমার বরদাস্ত হয় না।

নারায়ণী নিরুত্তর হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

তাহার পর দুই-তিন দিন কাটিয়া গেলেও যখন রামের রাগ পড়িতে চাহিল না, তখন নারায়ণী ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। আজ সন্ধ্যা হয়, তবুও সে ইস্কুল হইতে ফিরিল না দেখিয়া নারায়ণী উৎকণ্ঠিত ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিতেছিলেন; এমন সময় দিগম্বরী নদী হইতে গা ধুইয়া, সংসারের সংবাদ লইয়া, রামের অমঙ্গল কামনা করিয়া, বড় মেয়ের সৃষ্টিছাড়া মতি-বুদ্ধির অবশ্যম্ভাবী ফলাফল প্রতিবাসিনীদের কাছে ঘোষণা করিয়া, শোকে-তাপে অসময়ে অল্পবয়সে নিজের মাথার চুল পাকাইবার কারণ দর্শাইয়া, নিজেকে বড় মেয়ে নারায়ণীর প্রায় সমবয়সী বলিয়া প্রচার করিয়া, ভাইয়ের সংসারে কিরূপ সর্ব্বময়ী ছিলেন, তাহার বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস বলিয়া, ধীরে-সুস্থে বাড়ি ফিরিতেছিলেন, এমন সময় পথিমধ্যে এক কাণ্ড শুনিয়া তিনি যেন বাতাসে উড়িতে উড়িতে বাড়ি আসিয়া পৌঁছিলেন। উঠানে পা দিয়াই উচ্চ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, তোর গুণধর দেওরের কাণ্ড শুনেচিস্ নারাণি?

নারায়ণী ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গিয়া বলিলেন, কি কাণ্ড?

দিগম্বরী বলিলেন, থানায় গেছে। যাবেই ত। যে বজ্জাত ছেলে বাবা, এমনটি সাত জন্মে দেখিনি!

তাঁহার মুখে-চোখে আহ্লাদ যেন উছলিয়া পড়িতে লাগিল। নারায়ণী সে কথার জবাব না দিয়া ডাকিলেন, নেত্য, রাম এখনো এলো না কেন, একবার ভোলাকে পাঠিয়ে দে,—খুঁজে আনুক।

দিগম্বরী বলিলেন, আমি যে শুনে এলুম!

নেত্য শুনিবার আগ্রহে হাঁ করিয়া দাঁড়াইল; নারায়ণী তাড়া দিয়া উঠিলেন, দাঁড়িয়ে থাকলি যে? কথা কানে গেল না বুঝি?

নেত্য ব্যস্ত হইয়া চলিয়া গেল, দিগম্বরী কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ টানিয়া আনিয়া বলিলেন, কি হয়েচে জানিস নারাণি—

তুমি ভিজে কাপড় ছাড় গে মা, তার পরেই না হয় ব'লো; বলিয়া তিনি অন্যত্র গিয়া গেলে। দিগম্বরী অবাক্ হইয়া মনে মনে বলিলেন, বাপ্ রে! মেয়ের রাগ

দেখ! এমন একটা কাণ্ড আনুপূর্ব্বিক বলিতে না পাইয়া তাঁহার পেট ফুলিতে লাগিল।

সে কাণ্ডটা সংক্ষেপে এই—গ্রামের স্কুলে জমিদারের এক ছেলে পড়ত। আজ টিফিনের সময় তাহার সহিত রামের তর্ক বাঁধিল। বিষয়টা জটিল, তাই মীমাংসা না হইয়া মারামারি হইয়া গেল। জমিদারের ছেলে বলিয়াছিল, শাস্ত্রে লেখা আছে, শ্মশানকালী রক্ষাকালীর চেয়ে অধিক জাগ্রত। কেন না, শ্মশানকালীর জিভ বড়!

রাম প্রতিবাদ করিয়া বলিল, না শ্মশানকালীর জিভ একটু চওড়া বটে, কিন্তু অত বড়ও নয়, অমন রাঙাও নয়! কিছুদিন পূর্ব্বে পাড়ায় চাঁদা করিয়া রক্ষাকালীর পূজা হইয়া গিয়াছিল, সে স্মৃতি রামের মনে উজ্জ্বল ছিল। জমিদারের ছেলে রামের কথা অস্বীকার করিয়া নিজের করতল তুলিয়া ধরিয়া বলিল, রক্ষাকালীর জিভ ত এতটুকু!

রাম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, কি, এতটুকু কখখনো না। এই এত বড়। এতটুকু জিভ হলে কি কখনও পৃথিবী রক্ষা করতে পারে? পৃথিবী রক্ষা করে বলেই ত রক্ষাকালী নাম।

তারপর আর দুই-একটা কথা, এবং তার পরই ঘুষাঘুষি। জমিদারের ছেলের গায়ে জোর ছিল কম, সুতরাং মার সেই বেশি খাইল। নাক দিয়া ফোঁটা দুই রক্ত বাহির হইল। এই ক্ষুদ্র স্কুলের জীবনে এত বড় কাণ্ড ইতিপূর্ব্বে ঘটে নাই। যে জমিদারের স্কুল, তাহারই পুত্রের নাকে রক্ত! অতএব হেডমাস্টার নিজে স্কুল বন্ধ করিয়া ছেলেটিকে লইয়া দরবার করিতে ছুটিলেন। বলা বাহুল্য, রামলাল বহু পূর্ব্বেই অন্তর্দ্ধান হইয়াছিল।

ভোলা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, দাঠাকুরকে পাওয়া গেল না। অনতিকাল পরে শ্যামলাল মুখ কালি করিয়া বাড়ি আসিলেন। উঠানে দাঁড়াইয়া বলিলেন, ওগো শুনচ? এ-গ্রাম থেকে বাস উঠাতে হ'ল দেখচি। চাকরি করে দু'পয়সা ঘরে আনছিলুম, তাও বোধ করি এবার ঘুচল। নারায়ণী ভাঁড়ার হইতে বাহির হইয়া একটা চৌকাঠে ভর দিয়া শুষ্ক-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁরা থানায় গেছেন না?

শ্যামলাল ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, বাবু শিবতুল্য লোক, তাই মাপ করেচেন, কিন্তু আরো পাঁচজন আছে ত। দিন দিন এক একটা নূতন ফ্যাসাদ তৈরি হলে কি করে গ্রামে বাস করি, বল! রাম কই?

নারায়ণী বলিলেন, সে এখনো আসেনি। বোধ করি ভয়ে পালিয়েছে। শ্যামলাল গম্ভীর হইয়া বলিলেন, পালালেও তার সঙ্গে আর সম্পর্ক নেই, না পালালেও নেই। সে সৎমার ছেলে, লোকে নিন্দা করবে, তাই ত এতদিন কোনমতে সহ্য করে-ছিলুম, কিন্তু আর নয়। এখন নিজের প্রাণ বাঁচাতে হবে।

দিগম্বরী রান্নাঘরের বারান্দা হইতে বলিলেন, নিজের ছেলেটার পানেও ত চাইতে হবে।

শ্যামলাল উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, হবে না, মা, নিশ্চয় হবে। তবে কাল পাড়ায় পাঁচজন ভদ্রলোক ডেকে বিষয়-সম্পত্তি আলাদা করে ফেলব। আর তোমাকেও বলে রাখলুম, এ নিয়ে ওকে বকা-ঝকা করবার দরকার নেই। ও যা ভাল বোঝে তাই করে। ভাল বুঝেচে, মনিবের ছেলের গায়ে হাত তুলেচে।

দিগম্বরী মনে মনে পরমানন্দিত হইয়া বলিলেন, নারাণী কেন যে ওকে শাসন করতে যায়—আমার ত দেখে ভয়ে বুক কাঁপে। যে গোঁয়ার ছেলে, ও আমাকেই যখন অপমান করে, তখন ওকে অপমান করে ফেলবে, এ কি বেশি কথা। আমি বলি, শোন! নিজের মান নিজের ঠাঁই—রামের কথায় থেকো না।

শ্যামলাল শ্বশ্রূর এ কথাটায় আর সায় দিতে পারিলেন না, বোধ করি চক্ষুলজ্জা হইল। বলিলেন, যাই হোক, ওকে শাসন করবার দরকার নেই।

নারায়ণী পাথরের মূর্ত্তির মত নির্ব্বাক নিশ্চল হইয়া সমস্ত শুনিলেন, একটা কথারও জবাব দিলেন না। তার পর ধীরে ধীরে নিজের কাজে চলিয়া গেলেন।

ঘণ্টাখানেক পর নেত্য আসিয়া চুপি চুপি বলিল, মা, ছোটবাবু ঘরে এসেচে।

নারায়ণী নিঃশব্দে উঠিয়া গিয়া রামের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া কপাট বন্ধ করিলেন। রাম খাটের উপর চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছিল, দরজা বন্ধ করার শব্দে চমকিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, বৌদিদি দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং ঘরের কোণে তাহারই একগাছা পাতলা বেতের ছড়ি ছিল, তাহাই তুলিয়া লইতেছেন। সে তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া খাটের ওধারে গিয়া দাঁড়াইল। নারায়ণী ডাকিলেন, এদিকে আয়।

রাম হাত জোড় করিয়া বলিল, আর করব না বৌদি! এইবারটি ছেড়ে দাও!

নারায়ণী কঠিন হইয়া বলিলেন, এলে কম মারব, কিন্তু না এলে এই বেত তোমার পিঠে ভাঙব।

রাম তথাপি নড়িল না, সেইখানে দাঁড়াইয়া মিনতি করিতে লাগিল, তিন সত্যি করচি বৌদি, আর কোন দিন করব না, কান মলচি বৌদি—

নারায়ণী খাটের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সপাৎ করিয়া এক ঘা বেত তাহার ঘাড়ের উপর বসাইয়া দিলেন; তাহার পর বেতের উপর বেত পড়িতে লাগিল। প্রথমটা সে ওদিকের দোর খুলিয়া পলাইবার চেষ্টা করিল, তারপর ঘরময় ছুটাছুটি করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিল, শেষে পায়ের তলায় পড়িয়া চেঁচাইতে লাগিল। নেত্য পেছনে আসিয়া জানালার ফাঁক দিয়া দেখিতেছিল, কাঁদিয়া বলিল, মা, ছেড়ে দাও মা। আমি ঘাট মানচি—

দিগম্বরী খিঁচাইয়া উঠিয়া বলিলেন, তুই সব কাজে কথা কইতে আসিস্ কেন বল ত—

শ্যামলাল ঘরের ভিতর হইতে ডাকিয়া কহিলেন, কি হচ্চে ও—সারারাত ঠেঙাবে না কি ?

নারায়ণী বেত ফেলিয়া বলিলেন, মনে থাকে যেন !

৪

রাম ভাত খাইতে বসিয়াছিল। দিগম্বরী আড়ালে বসিয়া সুর তুলিয়া বলিলেন, অত বড় ছেলেকে অমন করে মারা কেন ? ওর বড় ভাই কোনদিন গায়ে হাত তোলে না।

নেত্য কাজ করিতে করিতে বলিল, তুমি কম নও দিদিমা ! তুমিই ত ও-সব কথা মাকে এসে লাগাও।

সে রাত্রে অত মার তাহার মোটেই ভাল লাগে নাই, রাম শুনিয়া চোখ পাকাইয়া বলিল, ডাইনী বুড়ী আমাদের সব খেতে এসেচে।

দিগম্বরী চেঁচাইয়া উঠিলেন, নারাণি, শুনে যা তোর দেওরের কথা।

নারায়ণী স্নান করিতে যাইতেছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া ক্লান্তভাবে বলিলেন, পারিনে মা, আর কথা শুনতে ; সত্যি বলচি নেত্য, মরণ হলে আমার হাড় জুড়োয়—আর সহ্য হচ্ছে না। ওরে ও বাঁদর, এখনো তোর পিঠের দাগ মিলোয়নি, এর মধ্যেই সব ভুলে গেলি !

রাম জবাব দিল না, ভাত খাইতে লাগিল। নারায়ণী আর কোন কথা না বলিয়া স্নান করিতে চলিয়া গেলেন। উঠানের উপরেই একটা পিয়ারাগাছ ছিল, ভাত খাইয়া রাম তাহার উপর উঠিল এবং নির্ব্বিচারে কাঁচা-পাকা পিয়ারা চর্ব্বণ করিতে লাগিল। কোনটার কতকটা খাইল, কোনটার একটু কমড়াইয়াই ফেলিয়া দিল। নিতান্ত কাঁচাগুলো নিরর্থক ছিঁড়িয়া এদিকে ওদিকে ছুঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল। দেখিয়া দিগম্বরীর গা জ্বালা করিতে লাগিল। নারায়ণী বাড়িতে নাই, তিনি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন, তোমার জন্য ত বাছা, পাকা পিয়ারা দাঁতে কাটবার জো নাই, কাঁচাগুলো নষ্ট করে কি হচ্ছে ?

রাম কোনদিনই তাঁহার কথা সহিতে পারিত না। বিশেষ, এইমাত্র নেত্যর কাছে মার খাইবার কারণ জানিতে পারিয়া রাগে ফুলিতেছিল, গাছের উপর হইতে চেঁচাইয়া বলিল, বেশ করচি—বুড়ী !

এই বিশেষণটা দিগম্বরী সবচেয়ে অপছন্দ করিতেন, মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, বুড়ী! বেশ কচ্চ? আচ্ছা আসুক সে। যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর হওয়া চাই ত! কি বেহায়া ছেলে বাবা!—মার খেয়ে পিঠের চামড়া উঠে গেছে, তবু লজ্জা হ'ল না!

রাম উপর হইতে বলিল, ডাইনী বুড়ী!

ডাইনী বুড়ী! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! পাজি হারামজাদা, নাব বলচি?

রাম বলিল, নাবব কেন? তোর বাবার গাছ?

দিগম্বরী ক্ষেপিয়া উঠিলেন, চীৎকার করিয়া বলিলেন, অ্যাঁ—বাপ তুললি? শুনলি নেত্য, শুনলি?

ঠিক সেই সময় নারায়ণী ঘাট হইতে আসিয়া পড়িলেন। গাছের উপর দৃষ্টি পড়িতেই বলিলেন, ভাত খেয়ে ইস্কুলে গেলিনে? গাছে চড়েচিস্ যে!

রাম ভাবিয়া রাখিয়াছিল, গাছের উপর হইতে দূরে বৌদিকে আসিতে দেখিয়াই সে নামিয়া পলাইবে। কিন্তু ঝগড়ায় ব্যস্ত থাকায় পথের দিকে নজর করে নাই। বৌদিদি একবারে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সে সভয়ে বলিল, পিয়ারা খাচ্চি।

তা ত খাচ্চিস্—ইস্কুলে গেলিনে?

আমার পেট কামড়াচ্চে যে!

নারায়ণী জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, তাই ভাত খেয়ে উঠে কাঁচা পিয়ারা চিবোচ্চ?

দিগম্বরী মেয়ের গলা শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, হারামজাদা ছোঁড়া আমার বাপ তোলে! বলে, নাবব কেন—তোর বাপের গাছ?

নারায়ণী চোখ তুলিয়া বলিলেন, বলেচিস্?

রাম চোখ-মুখ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, না বৌদি, বলিনি।

দিগম্বরী চেঁচাইয়া উঠিলেন, বলিস্‌নি হারামজাদা? নেত্য সাক্ষী আছে। তার পর মুখ বিকৃত করিয়া, সানুনাসিক স্বর করিয়া বলিতে লাগিলেন, সেদিন যখন বেতের উপর বেত পড়েছিল,—তখন—আঁর কঁরব না বৌদি—পায়ে পড়ি বৌদি, মঁরে গেলুম বৌদি,—চেপে ধরলে চিঁ চিঁ কর, আর ছেড়ে দিলে লাফ মার, হারামজাদা।

রাম আর সহ্য করিতে পারিল না। তাহার হাতে একটা বড় কাঁচা পিয়ারা ছিল—ধাঁ করিয়া ছুঁড়িয়া মারিয়া দিল। সেটা দিগম্বরীকে স্পর্শ করিল না, নারায়ণীর ডান জ্রর উপরে গিয়া সজোরে আঘাত করিল। এক মুহূর্তের জন্য চোখে অন্ধকার দেখিয়া তিনি সেইখানে বসিয়া পড়িলেন। দিগম্বরী ভয়ঙ্কর চেঁচামেচি করিয়া

উঠিলেন, নেত্য কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল, রাম গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় মারিল।

দুপুরবেলা শ্যামলাল স্নানাহার করিতে আসিয়া দেখিলেন বিষম কাণ্ড। নারায়ণী নির্জ্জীবের মত বিছানায় পড়িয়া আছেন, তাঁহার ডান চোখ ফুলিয়া ঢাকিয়া গিয়াছে। তাহার উপর ভিজা ন্যাকড়ার পটি বাঁধিয়া নেত্য পাখা লইয়া বাতাস করিতেছে। দিগম্বরী আজ আর আড়ালে গেলেন না, সামনেই চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, রাম মেরে ফেলচে নারায়ণীকে।

শ্যামলাল চমকাইয়া উঠিলেন। কাছে আসিয়া আঘাত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া কঠিনভাবে স্ত্রীকে বলিলেন, আজ তোমাকে আমি দিব্যি দিচ্ছি—যদি ওকে খেতে দাও, যদি কোনদিন কথা কও—যদি কোন কথায় থাক, সেই দিনে যেন তুমি আমার মাথা খাও।

নারায়ণী শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, চুপ কর, চুপ কর—ও কথা মুখে এনো না।

শ্যামলাল বলিলেন, আমার এত বড় দিব্যি যদি না মানো, সেই দিন যেন তোমাকে আমার মরা মুখ দেখতে হয়। বলিয়া ডাক্তার ডাকিয়া আনিতে নিজেই চলিয়া গেলেন।

সমস্ত দিন নদীর ধারে ধারে বেড়াইয়া, বসিয়া, দাঁড়াইয়া, অসম্ভব কল্পনা করিয়া রাম সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকাইয়া বাড়ি ঢুকিল। দেখিল উঠানের মাঝামাঝি ছ্যাচা বাঁশের বেড়া দিয়া বাড়িটিকে দুই ভাগ করা হয়েছে। নাড়া দিয়ে দেখল, বেশ শক্ত, ভাঙা যায় না। রান্না-ঘরে আলো জ্বলিতেছিল, চুপি-চুপি মুখ বাড়াইয়া দেখিল, সেখানেও ওই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঘরে কেহ নাই, শুধু একরাশ পিতল-কাঁসার বাসন মেজের উপর পড়িয়া আছে। ব্যাপারটা যে কি, তাহা ঠিক না বুঝিতে পারিলেও, সকালবেলার কাণ্ডটার সহিত কেমন করিয়া যেন যোগ রহিয়াছে, তাহা অনুমান করিয়া তাহার বুক শুকাইয়া উঠিল। তখন ফিরিয়া গিয়া সে চুপ করিয়া তাহার নিজের ঘরের মধ্যে বসিয়া বাটীর অপর খণ্ডের গতিবিধি শব্দ-সাড়া শুনিতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে তাহার যে অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইয়াছিল, এখন সে কথাও ভুলিয়া গেল। রাত্রি তখন বোধ হয় নয়টা, সে ঘুরিয়া গিয়া খিড়কীর দরজায় ঘা দিতেই নেত্য কপাট খুলিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। রাম জিজ্ঞাসা করিল, বৌদি কোথায় নেত্য?

ঘরে শুয়ে আছেন।

রাম ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, বৌদি খাটের উপর শুইয়া আছেন, এবং নীচে মাদুর পাতিয়া দিগম্বরী ছোট মেয়েকে লইয়া বসিয়া আছেন। গোবিন্দ খেলা করিতেছিল, ছুটিয়া আসিয়া কাকার হাত ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে বলিয়া দিল, কাকা, তোমার

বাড়ি ওদিকে, এদিকে আমাদের বাড়ি। বাবা বলেচে, তুমি এ-ঘরে ঢুকলে পা ভেঙে দেবে।

রাম খাটের উপর নারায়ণীর পায়ের কাছে গিয়া বসিতেই তিনি পা সরাইয়া লইলেন। রাম চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। দিগম্বরী তাঁহার ছোট মেয়েকে ঠেস্ দিয়া বলিলেন, সুরো, বল্ না তোর দাদাবাবু কি বলেচে ওকে।

সুরধুনী মুখস্থের মত গড়-গড় করিয়া বলিয়া গেল—দাদাবাবু বলেচে, তুমি এখানে এসো না। কাল সকালে সব—কি মা?

দিগম্বরী বলিলেন, বিষয়-সম্পত্তি।

সুরধুনী বলিল, বিষয়-সম্পত্তি কাল ভাগ-বাটরা করে দেবে।

দিগম্বরী বলিলেন, দিব্যি দেবার কথাটা বল্ না—ন্যাকা মেয়ে!

সুরধুনী বলিল, দাদাবাবু দিব্যি দিয়েচেন দিদিকে,—খেতেও দেবে না, কথাও বলবে না—বললে দাদাবাবু—

নারায়ণী বিছানার উপর হইতে ধমক দিয়া উঠিলেন, আচ্ছা হয়েচে হয়েচে, তুই চুপ কর।

তখন দিগম্বরী বলিলেন, তা সত্যি বাছা! তুমি মানুষ-জনকে আধ-খুন করে ফেলবে—সে দিব্যি না দিয়ে আর করে কি! আমি ত বাপু, কিছুতে তার দোষ দিতে পারব না—তা যে যাই বলুক! এ-বাড়িতে তোমার আসা-যাওয়া খাওয়া-দাওয়া আর চলবে না। ওকে সোয়ামীর মাথার দিব্যি ত মানতে হবে?

সুরধুনী বলিল, মা, ভাত দেবে চল না।

দিগম্বরী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, সবুর কর বাছা।

রাম তখনও বসিয়া আছে; এমন অবস্থায় ঘরে-দোরে আগুন ধরিয়া গেলেও ত তিনি উঠিতে পারেন না। রামের বুকের ভিতর চাপা কান্না মাথা খুঁড়িতে লাগিল, কিন্তু দিগম্বরীর সেই সকালবেলার খোনা কথার ভ্যাংচানি তাহার বুকের উপর পাথর চাপাইয়া পথ আটকাইয়া রাখিল। একবার সে কাঁদিতে পারিল না, একবার বলিতে পারিল না, 'আর করব না বৌদি!' এই একটা কথা অনেক আপদে-বিপদেই তাহাকে রক্ষা করিয়াছে—আজ তাহাই বলিতে না পাইয়া তাহার দম আটকাইয়া আসিতে লাগিল।

এমন সময়ে নারায়ণী ক্লান্তভাবে বলিলেন, সুরো, যেতে বল ওকে।

এবার সে কান্না চাপিয়া বলিয়া উঠিল, যেতে বল্ ওকে! আমার খিদে পায় না বুঝি! সেই ত কখন খেয়েচি!

নারায়ণী একটু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, একেবারে খুন করে ফেলতে পারেনি? তা হলে দশ হাতে খেতো! আমি জানিনে—যাক ও নেত্যর কাছে।

যাক না নেত্যর কাছে। আমি কারো কাছে যাব না—আমি না খেয়ে উপোস করে শুয়ে থাকব। বলিতে বলিতে রাম দুম্ দুম্ করিয়া পা ফেলিয়া বাড়ী-ঘর কাঁপাইয়া নিজের ঘরে গিয়া শুইল। নেত্য কিছু খাবার আনিয়া বলিল, ছোটবাবু ওঠ, খাও।

রাম লাফাইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল, দূর হ, পোড়ামুখী—দূর হ।

নেত্য খাবার রাখিয়া চলিয়া গেল, রাম থালা-গেলাস ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠানের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

সকালবেলা শ্যামলাল কাজে চলিয়া যাবার পরে রাম নিজের উঠানে পায়চারি করিতে করিতে গর্জ্জাইতে লাগিল—আমি দিব্যি মানিনে! ওঃ ভারি দিব্যি? ও কে যে দিব্যি দেয়? ও কি আমার আপনার দাদা? ও কেউ নয়, ওর কথা আমি মানিনে। আমি কি ওকে মেরেচি? বুড়ী ডাইনীকে মেরেচি। ও ত শুধু বৌদিকে লেগেচে, তবে ওরা কেন দিব্যি দিতে আসে!

এ-সকল কথার কেহই জবাব দিল না, খানিক পরে সে সুর বদলাইয়া বলিতে লাগিল—বেশ ত! ভালই ত! নাই কথা কইলে, নাই খেতে দিলে। আমি মজা করে রাঁধব—ভাত, ডাল, ভাল ভাল তরকারি, মাছ—একলা বেশ পেট ভরে খাব। আমার কি হবে?

এ-কথারও কেহ জবাব দিল না। তখন সে রান্নাঘরে ঢুকিয়া খন্-খন্ ঝন্ ঝন্ শব্দে থালা, ঘটি, বাটি নাড়িয়া-চাড়িয়া কাজ করিতে লাগিল। হাঁক-ডাক করিয়া ভোলাকে চাল ডাল ধুইয়া আনিতে, তরকারি কুটিতে আদেশ দিল। সমস্ত নেত্য রান্নাঘরে রাখিয়া গিয়াছিল। ভোলাকে হুকুম করিল, তুই আমার চাকর, ও-বাড়ি যাস্‌নে। ও-বাড়ির, কেউ যদি এদিকে আসে, তার পা ভেঙে দিবি—বুঝলি ভোলা, নেত্য আসুক একবার এদিকে।

নারায়ণী রান্নাঘরের বারান্দায় চুপ করিয়া বসিয়া শুনিতে লাগিলেন। দিগম্বরী কৌতূহলী হইয়া মাঝে মাঝে বেড়ার ফাঁক দিয়া দেখিতেছিলেন। খানিক পরে বড় মেয়ের কাছে উঠিয়া আসিয়া হাসি চাপিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিতে লাগিলেন, আহা বাছার কি বুদ্ধি! উনি আবার ভাল তরকারি রেঁধে খাবেন। একটা পেতলের হাঁড়িতে প্রায় এক কাঠা চাল গলায় গলায় তুলে দিয়ে রান্না চড়িয়েচে—তাতে জল দিয়েচে এক ফোঁটা। একজন খাবে ত, রাঁধচে দশজনের, তাই বা সেদ্ধ হবে কি করে? পুড়ে আঙরা উঠবে যে! ঐ হাঁড়িতে কি অত চাল ধরে, না, ঐটুকু জলের কর্ম্ম! আবার রাঁধিয়ে বলে দেমাক আছে! রাঁধি বটে আমরা, কিন্তু দেমাক কত্তে জানিনে। ভাত রাঁধব, তা এমন জল দেব, আর দেখতে হবে না—চোখ বুজে সেদ্ধ হবে। কই রাঁধুক দিকি আমার সঙ্গে। লোক খেয়ে কারটা ভাল বলে দেখি।

নারায়ণী মুখ ফিরাইয়া রহিলেন।

নেত্য কাছে ছিল, সে বলিল, দিদিমার এক কথা। ও কি কোনদিন এক ঘটি জল গড়িয়ে খেয়েচে যে, আজ রেঁধে খাবে?

সে অনেকদিনের দাসী, এসব ব্যাপার তাহার ভাল লাগিতেছিল না।

মায়ের দেখাদেখি সুরধুনীও মাঝে মাঝে গিয়া বেড়ার ফাঁক দিয়া দেখিতেছিল। ঘণ্টা-খানেক পরে ছুটিয়া আসিয়া দিদির হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল—ও দিদি, দেখবে এস, রামদাদা—মা গো! একেবারে কাঁচা ভাতগুলো খাচ্চে। কিছু নেই দিদি—একেবারে শুধু ভাতে, আচ্ছা দিদি, কাঁচা ভাত পেট কামড়াবে না?

নারায়ণী তাহার হাত ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া গিয়া বিছানার উপর শুইয়া পড়িলেন। সে যে কত বড় দুঃখ, কত বড় ক্ষুধার তাড়নে এইগুলা খাইতে বসিয়াছে, সে কথা তাঁহার অগোচর রহিল না।

দুপুরবেলা শ্যামলালের খাওয়া হইয়া গেল, দিগম্বরী ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন, যা পারিস্, দুটি খেয়ে নে নারাণি! ওর তাড়সে জ্বরের মত হয়েচে—ওতে খাওয়া চলে। আমি বলচি, ক্ষেতি হবে না।

নারায়ণী মোটা চাদরটা আগাগোড়া মুড়ি দিয়া ভাল করিয়া শুইয়া বলিলেন, আমাকে বিরক্ত ক'রে না মা, তোমরা খাও গে।

দিগম্বরী বলিলেন, ভাত না খাস, দু'খানা রুটি করে দি—না হয়—

নারায়ণী কহিলেন, না, কিছু না।

দিগম্বরী আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, ও আবার কি কথা, কাল থেকে উপোস করে আছিস্, আজ দুটি না খেলে হবে কেন?

নারায়ণী জবাব দিলেন না। নেত্য আসিয়া বলিল, তুমি মিথ্যে বকে মরচ দিদিমা! ঐখানে দাঁড়িয়ে একবেলা চেঁচালেও ওঁকে খাওয়াতে পারবে না। জ্বর হয়েচে, একটু ঘুমোতে দাও।

দিগম্বরী চলিয়া গেলেন, বলিতে বলিতে গেলেন, জানিনে বাপু, নাগ্‌লে-টাগ্‌লে একটু জ্বরভাব হয়, তাই বলে কি মানুষ উপোস করে পড়ে থাকে? আমরা ত পারিনে।

বৈকালে নারায়ণী আবার রান্নাঘরের বারান্দায় আসিয়া বসিলেন, এবং যতবার নেত্যর চোখে চোখে হইল ততবারই কি বলিতে গিয়া চাপিয়া গেলেন।

রাম স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া হাত-মুখ ধুইয়া দোকান হইতে মুড়ি-মুড়কি কিনিয়া আনিল। খাইতে খাইতে গলা বড় করিয়া বলিল, কি আর ক্ষেতি হ'ল আমার? ভাত খেয়ে ইস্কুলে গেলুম, অবার ফিরে এসে কেমন খাচ্চি।

বেড়ার ওদিকে সকলেই রহিয়াছে তাহা সে বুঝিল, কিন্তু সকালের মত এখনও

কেহ জবাব দেয় না দেখিয়া সে আরও অস্থির হইয়া উঠিল। চেঁচাইয়া বলিল, এই দিকটা আমার সীমানা। কোনদিন নেত্য কি, কেউ যদি আমার সীমানায় আসে, তখন পা ভেঙ্গে দেব।

এই পা ভাঙ্গার ভয় সে ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছিল, সেবারেও যেমন ফল হয় নাই, এবারেও হইল না। কেহ ভয় পাইয়াছে কিনা বোঝা গেল না। সন্ধ্যার পর আলো জ্বালিয়া সে রান্নাঘরে ঢুকিয়া আবার চেঁচামেচি করিতে লাগিল, আমার কাঠ কই, আমি রাঁধব কি দিয়ে? আমার শিল-নোড়া কই, আমি বাটনা বাটব কিসে? ও-ঘর হইতে নেত্য বলিল, মা বলচেন, কাল শিল-নোড়া কিনে দেবেন।

না, আমি কেনা শিল-নোড়া চাইনে। বলিয়া সে কাঁদিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

খানিকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কেন আমার গণেশকে ধরলে? কেন আমাকে খোনা খোনা করে বুড়ী ভেঙালে, বেশ করেচি গাল দিয়েচি—ও মরে আর জন্মে পেত্নী হবে।

দিগম্বরী চোখ কটমট করিয়া বলিলেন, শুনলি নারাণি, শুনলি? এ-সমস্ত পায়ে পা তুলে দিয়ে ঝগড়া করা নয়?

নারায়ণী চুপ করিয়া অন্য দিকে চাহিয়াছিলেন, সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

৫

পরদিন সকাল হইতেই রামের কথাবার্ত্তা বদলাইয়া গেল। সম্পূর্ণ দুইটা দিন কাটিয়া গিয়াছে, বৌদিদি তাকে ডাকে নাই, বকে নাই, খাইতে দেয় নাই, এ-রকম তাহার জ্ঞানে দেখে নাই। আজ সে বাস্তবিক ভয় পাইয়াছিল। প্রথমটা রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া সে নানারূপ উল্টা-পাল্টা জবাবদিহি করিল। একবার বলিল, বেড়াল মারিতে পেয়ারা ছুঁড়িয়াছিল; একবার বলিল, হাত ফসকাইয়া পড়িয়া গিয়া বৌদিদির কপালে লাগিয়াছিল; একবার বলিল, কাঁচা পেয়ারা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতেছিল। তার পর একবার বলিল, কাহাকেও সে গাল দেয় নাই; একবার বলিল, গোবিন্দকে দিয়াছিল; একবার বলিল, ভোলাকে দিয়াছিল। কিন্তু কোন কৈফিয়তেই কাজ হইল না। ও-ঘরে কেহ জবাব দিল না, 'হাঁ না' একটা কথাও বলিল না। একবার বহু কষ্টে লজ্জা-সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া 'আর কোনদিন করব না'

ধরিয়া ফেলিয়াও যখন হইল না, তখন সে চুপ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কি উপায়ে কি দিয়া কেমন করিয়া সে বৌদিদিকে প্রসন্ন করিবে? বৌদিদি তাহাকে আলাদা করিয়া দিয়াছে, তবে কোথায় সে যাইবে? কাহার কাছে কেমন করিয়া সে থাকিবে? কোন দিকেই আজ সে কূল-কিনারা দেখিতে পাইল না। আজ সে রাঁধিবার চেষ্টাও করিল না, পড়িতেও গেল না, ঘরে গিয়া শুইয়া রহিল।

গোপনে কাঁদিয়া কাঁদিয়াই বোধ করি, গত রাত্রে নারায়ণীর জ্বর আসিয়াছিল। দুপুরবেলা দিগম্বরী এক বাটি দুধ আনিয়া বলিলেন, খেতেই হবে। না খেয়ে কি মরবি? নারায়ণী প্রতিবাদ না করিয়া দুধের বাটী হাতে লইয়া কতকটা খাইয়া বাটী নামাইয়া রাখিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। তাঁহার 'না না' করিয়া কথা-কাটাকাটি করিতে ঘৃণা বোধ হইল।

রাত্রি যখন নয়টা বাজিয়া গিয়াছে, তখন নেত্য আসিয়া চুপি চুপি বলিল, মা, ছোটবাবুর ত কোন সাড়া-শব্দ পাইনে—রাত ত ঢের হ'ল!

নারায়ণী উদ্বেগে উঠিয়া বসিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, লক্ষ্মী মা আমার, দেখে আয় সে ঘরে আছে কি না।

নেত্যর চোখ ভিজিয়া উঠিল। হাত দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, আমার যেতে সাহস হয় না মা। বলিয়া বাহিরে গিয়া ভোলাকে ডাকিয়া আনিল। ভোলা সংবাদ দিল—দাঠাকুর ঘরে আছে, ঘুমুচ্চে।

নারায়ণী নিঃশব্দে দুই হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া চাদর মুড়ি দিয়া আবার শুইয়া পড়িলেন। পরদিন প্রভাত না হইতেই তিনি স্নান করিয়া আসিয়া রান্না চড়াইয়া দিলেন।

রান্না যখন প্রায় অর্দ্ধেক অগ্রসর হইয়াছে, তখন দিগম্বরী গাত্রোত্থান করিয়া ব্যাপার দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। কর্কশ-স্বরে প্রশ্ন করিলেন, তোর না জ্বর নারাণি? তুই না তিন দিন খাস্‌নি? ভোর-বেলা উঠে চান করে এসে এ-সব কি হচ্ছে, জিজ্ঞেস করি।

নারায়ণী স্বাভাবিক মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, রাঁধচি, দেখতে ত পাচ্চ।

তা ত পাচ্চি, কিন্তু কেন? শুনি? তুই কি আমার হাতে খাবিনি?

নারায়ণী জবাব দিলেন না, কাজ করিতে লাগিলেন।

কাল সমস্ত দিন ধরিয়া রাম এই কথা ভাবিতেছিল—বৌদিদির না-জানি কত লাগিয়াছে! একটা কাঁচা পেয়ারা লইয়া বার বার কপালের উপর ঠুকিয়া সে আঘাতের গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়া, শেষে ভাবিতে বসিয়াছিল, কি করিলে এই কুকর্ম্মটা মুছিয়া ফেলিতে পারা যায়। ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনে পড়িয়া গেল, কিছুদিন পূর্ব্বে বৌদিদি তাহাকে এইস্থানে থাকিতে নিষেধ করিয়া-

ছিলেন। শেষে স্থির করিল, সে আর কোথাও গেলে বৌদিদি খুশী হইবে। তাহার মামার বাড়ি তারকেশ্বরের ওদিকে, অথচ কোথায় সে ঠিক জানে না। সেইখানে গিয়া খুঁজিয়া লইবে, সঙ্কল্প করিয়া সে একটি ছোট পুঁটুলি বাঁধিয়া লইয়া প্রভাতের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল।

নারায়ণী রান্না শেষ করিয়া একখানি থালায় সমস্ত দ্রব্য পরিপাটি করিয়া সাজাইতেছিলেন। দ্বারের কাছে ভোলা আসিয়া ডাকিল, মা!

নারায়ণী ফিরিয়া ভোলাকে দেখিয়া বলিলেন, কি রে ভোলা?

এ কয়টা দিন সে বাহিরে গরুর সেবা করিত বটে, কিন্তু রামের ভয়ে ভিতরে আসিত না। ভোলা আস্তে আস্তে বলিল, চুপি চুপি একটা কথা আছে মা।

নারায়ণী কাছে আসিতেই ভোলা ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, তুমি যা বলেছিলে মা, তাই হয়, যদি দুটি টাকা দাও।

নারায়ণী বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, কি হয় রে? কাকে টাকা দিতে হবে?

ভোলা একটুখানি আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, তুমি দাঠাকুরকে চলে যেতে বলেছিলে না? তিনি যেতে রাজি আছেন—আচ্ছা, দুটো না দাও, একটি টাকা দাও।

নারায়ণী ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, কোথায় যেতে রাজি আছে রে? কোথায় সে?

ভোলা বলিল, বাইরে গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছেন। বাবার থানের ওদিকে কোথায় তেনার মামার বাড়ি আছে যে!

যা ভোলা, শীগ্‌গির ডেকে আন্—বল্, আমি ডাকচি।

ভোলা ছুটিয়া গেল, নারায়ণী কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অনতিকাল পরেই রাম একটি ছোট পুঁটুলি হাতে লইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই নারায়ণী নিঃশব্দে তাহার হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গেলেন।

দূর হইতে দিগম্বরী রামকে রান্নাঘরে ঢুকিতে দেখিয়া আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, সাজানো থালার সুমুখে নারায়ণীর কোলের উপর বসিয়া রাম তাহার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া আছে, এবং তাহার মাথার উপর, পিঠের উপর, আর এক জনের অশ্রু বৃষ্টি-ধারার মত ঝরিয়া পড়িতেছে। অবাক্ হইয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন, ওঃ—তাই এত রান্না? খাওয়ান হবে বুঝি? আমার জামাই যে-এত বড় দিব্যিটা দিলেন, সেটা ভেসে গেল বুঝি?

নারায়ণী মুখ তুলিয়া বলিলেন, ভেসে যাবে কেন মা, তাঁর কথা আমি অমান্য করিনি, তিন দিন খাইনি, খেতেও দিইনি।

দিগম্বরী তীক্ষ্ণভাবে বলিলেন, এই বুঝি অমান্য করিস্‌নি, তবে এ কি হচ্চে? যে দিব্যি দিয়েছে তার বুঝি হুকুমটাও একবার নিতে হবে না?

নারায়ণী কি একটা কঠিন আঘাত সহ্য করিয়া লইয়া সংক্ষেপে বলিলেন, আমার হুকুম নেওয়া হয়েচে।

দিগম্বরী বিশ্বাস করিলেন না। অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, আমি কচি খুকী নই নারাণি। হুকুম নিলি, আর আমি জানতেও পারলুম না।

এবার নারায়ণীর আর সহ্য হইল না। তিনিও কঠিন হইয়া বলিলেন, তুমি কি জানবে মা, কার কাছে কখন আমি হুকুম পেয়েচি? মা, যার মুখ আছে, সেই দিব্যি দিতে পারে, কিন্তু—বলিয়া তিনি গভীর স্নেহে রামের লজ্জিত মুখ জোর করিয়া বুকের ভিতর হইতে তুলিয়া ধরিয়া তাহার ললাটে চুম্বন করিয়া বলিলেন, কিন্তু যাকে বুকে করে এতটুকুকে বড় করে তুলতে হয়, সে-ই জানে, হুকুম কোথা দিয়ে কেমন করে আসে। তোমাকে ভাবতে হবে না মা; এখন একটু সামনে থেকে যাও, দু'টো খাইয়ে দিই। ও আমার তিন দিন অনাহারে আছে। বলিতে বলিতে তাঁহার চোখের জল আবার ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

দিগম্বরী একমুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া বলিলেন, এখানে তবে আর আমার কি করে থাকা হবে? এ-বাড়িতে আর থাকতে পারব না, তা তোকে আজ স্পষ্ট বললুম।

নারায়ণী বলিলেন, আমিও এই কথাটাই তোমাকে মুখ ফুটে বলতে পারছিলুম না মা, সত্যি তোমার এখানে থাকা হবে না। তোমার চোখে চোখে আমার এত বড় ছেলে যেন আধখানা হয়ে গেছে। ও দুষ্ট হোক যা হোক, আমার বাড়িতে আমার চোখের সামনে ওকে শাস্তি দিতে আমি কাউকে দেব না। আজ তুমি থাক, কাল কিন্তু বাড়ি যেয়ো। তোমার খরচ-পত্র আমি সমস্ত পাঠিয়ে দেব, কিন্তু এখানে তোমার আর থাকা হবে না।

দিগম্বরী কাঠ হইয়া গিয়া কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। রাম বুকের ভিতর হইতে আস্তে আস্তে বলিল, না বৌদি, উনি থাকুন, আমি ভাল হয়েচি, আমার সুমতি হয়েচে—আর একটিবার তুমি দেখ।

নারায়ণী আর একবার তাহার মুখ ধরিয়া ললাটে ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিয়া চোখের-জলের ভিতর দিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তুই এখন ভাত খা।

আলো ও ছায়া

আলো ও ছায়া

১

প্রথমেই যদি তোমরা ধরিয়া ব'স, এমন কখ্‌খনো হয় না, তবে ত আমি নাচার। আর যদি বল হইতেও পারে—জগতে কি যে ঘটে, সবই কি জানি? তা হলে এ কাহিনী পড়িয়া ফেল, আমার বিশ্বাস, তাহাতে কোন মারাত্মক ক্ষতি হইবে না। আর গল্প লিখিতে এমন কিছু প্রতিজ্ঞা করিয়া বসা হয় না যে, সবটুকু খাঁটি সত্য বলিতে হইবে। হ'লই বা দু-এক ছত্র ভুল, হ'লই বা একটু-আধটু মতভেদ—এমনই বা তাহাতে কি আসে-যায়? তা নায়কের নাম হইল যজ্ঞদত্ত মুখুয্যে—কিন্তু সুরমা বলে আলোমশাই। নায়িকার নাম ত শুনিলে, কিন্তু যজ্ঞদত্ত তাকে বলে ছায়াদেবী। দিন-কতক তাহাদের ভারি কলহ বাধিয়া গেল, কে যে আলো—কে যে ছায়া, কিছুতেই মীমাংসা হয় না, শেষে সুরমা বুঝাইয়া দিল, এটা তোমার সূক্ষ্মবুদ্ধিতে আসে না যে, তুমি না থাকিলে আমি কোথাও নাই—কিন্তু আমি না থাকিলে তুমি চিরকাল চিরজীবী, তাই তুমি আলো, আমি ছায়া।

যজ্ঞদত্ত হাসিল, এক তরফা ডিগ্রী পেতে চাও কর, কিন্তু বিচারটা কোন কাজের হ'ল না।

সুরমা। খুব হয়েচে, বেশ হয়েচে, চমৎকার হয়েচে আলোমশাই, আর ঝগড়া করতে হবে না। তুমি আলোমশাই, আমি শ্রীমতী ছায়াদেবী। বলিতে বলিতে ছায়াদেবী নানারূপের আলোমশাইকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল।

* * * *

গল্পের এতটুকু ত হ'ল। কিন্তু এইবার তোমাদের সঙ্গেই দ্বন্দ্বযুদ্ধ না বাধিয়া গেলে বাঁচি। তুমি কহিবে, ইহারা স্ত্রী-পুরুষ, আমি কহিব, স্ত্রী-পুরুষ বটে, কিন্তু স্বামী-স্ত্রী নয়। নিশ্চয় তুমি চোখ রাঙাইবে, তবে কি অবৈধ প্রণয়? আমি বলিব, খুব শুদ্ধ ভালবাসা। কিছুতেই তোমরা তাহা বিশ্বাস করিবে না, মুখ ভার করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, কত বয়স? আমি কহিব, আলোর বয়স তেইশ, আর ছায়ার বয়স আঠার। এর পরেও যদি শুনিতে চাও, আরম্ভ করিতেছি।

যজ্ঞদত্তের ছোট করিয়া দাড়ি ছাটা, চোখে চশমা, মাথায় ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ,

পরণে কুঞ্চিত ঢাকাই কাপড়, সার্টে এসেন্স মাখান, পায়ে মখমলের কাজ-করা স্লিপার —ছায়া স্বহস্তে ফুল তুলিয়া দিয়াছে। লাইব্রেরীতে এক-ঘর পুস্তক, বাটীতে বিস্তর দাস-দাসী। টেবিলের ধারে বসিয়া যজ্ঞদত্ত পত্র লিখিতেছিল। সম্মুখে মস্ত মুকুর। পর্দ্দা সরাইয়া ছায়াদেবী সাবধানে প্রবেশ করিল। ইচ্ছা, চুপি চুপি চোখ টিপিয়া ধরে; পিঠের কাছে আসিয়া হাত বাড়াইতে গিয়া সম্মুখে দর্পণে নজর পড়িল। দেখিল, যজ্ঞদত্ত তাহার মুখপানে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছে। সুরমাও হাসিয়া ফেলিল; বলিল, কেন দেখে ফেললে?

যজ্ঞ। সেটা কি আমার দোষ?

সুরমা। তবে কার?

যজ্ঞ। অর্দ্ধেকটা তোমার, আর অর্দ্ধেকটা ঐ আরসিখানার।

সুরমা। এখনই আমি ওটা ঢেকে দেব।

যজ্ঞ। তা দিও, কিন্তু বাকিটার কি হবে?

সুরমা বার-দুই নড়িয়া-চড়িয়া কহিল, আলোমশাই!

যজ্ঞ। কেন ছায়াদেবী?

সুরমা। তুমি রোগা হয়ে যাচ্চ কেন?

যজ্ঞ। তা ত আমার বিশ্বাস হয় না।

সুরমা। তুমি খাও না কেন?

যজ্ঞদত্ত হাসিয়া উঠিল—সুরো, কোন্দল করতে এসেচ!

সুরমা। হুঁ।

যজ্ঞ। আমি তাতে রাজি নই।

সুরমা। তুমি বিয়ে করবে না কেন।

যজ্ঞ। সে জবাব ত রোজই একবার করে দিয়ে এসেচি।

সুরমা। না, করতেই হবে।

যজ্ঞ। সুরো, তুমি একটি বিয়ে কর না কেন?

সুরমা যজ্ঞদত্তের হাত হইতে পত্রখানি কাড়িয়া লইয়া কহিল, ছিঃ, বিধবার কি বিয়ে হয়?

যজ্ঞদত্ত খানিকক্ষণ চুপ করিয়া কহিল, কে জানে! কেউ বলে হয়, কেউ বলে হয় না।

সুরমা। তবে আমাকে এ নিমিত্তের ভাগী করবার চেষ্টা কেন?

যজ্ঞদত্ত দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, তবে কি চিরকাল শুধু আমারই সেবা করে কাটাবে?

হুঁ, বলিয়া সে ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

যজ্ঞদত্ত অশ্রু মুছাইয়া দিয়া কহিল, সুরো, কি তোমার মনের সাধ, আমাকে খুলে বলবে না?

সুরমা। আমাকে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দাও।

যজ্ঞ। আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে?

সুরমার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না—দক্ষিণে ও বামে বার-দুই মাথা নাড়িতে গিয়া চোখের জল উৎসের মত ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

২

সুরমা। যজ্ঞদাদা, সেই গল্পটা আবার বল না?

যজ্ঞ। কোন্‌টা সুরো?

সুরমা। সেই যে আমাকে যবে বৃন্দাবনে কিনেছিলে। কত টাকায় কিনেছিলে গো?

যজ্ঞ। পঞ্চাশ টাকায়। আমার তখন আঠার বছর বয়স। বি. এ. এক্‌জামিন দিয়ে পশ্চিমে বেড়াতে যাই। মা তখন বেঁচে, তিনিও সঙ্গে ছিলেন। একদিন দুপুরবেলায় মালতী-কুঞ্জের ধারে একদল বৈষ্ণবী গান গাইতে আসে, তারই মধ্যে প্রথম তোমাকে দেখতে পাই, যৌবনের প্রথম ধাপটিতে পা দিয়ে জগৎটাকে এমন সুশ্রী দেখতে হয় যে, শুধু নিজের দুটি চোখে সে মাধুর্য্য সবটুকু উপভোগ করতে পারা যায় না। সাধ হয়, মনের মতন আর দুটি চোখ এমনি করে এক সাথে এমনি শোভা সম্ভোগ করতে পারে যদি তাকে বুঝিয়ে বলতে পারি—ও কি সুরমা, কাঁদচ যে?

সুরমা। না—তুমি বল।

যজ্ঞ। তুমি তখন তের বছরের নবীন বৈষ্ণবী; হাতে মন্দিরা, গান গাইছিলে।

সুরমা। যাও—আমি বুঝি গান গাইতে পারি?

যজ্ঞ। তখন ত পারতে, তার পর অনেক পরিশ্রমে তোমাকে পাই, তুমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, বালবিধবা। মা তোমার তীর্থে এসে আর ফিরে যেতে পারেননি—স্বর্গে গিয়েচেন। আমার মার কাছে তোমায় এনে দিই, তিনি বুকে তুলে নিলেন—তার পর মৃত্যুকালে আবার আমাকেই ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন।

সুরমা। যজ্ঞদাদা, আমার বাড়ি কোথায়?

যজ্ঞ। শুনেচি, কৃষ্ণনগরের কাছে।

সুরমা। আমার আর কেউ নেই?

যজ্ঞ। আমি আছি, তাই যে তোমার সব সুরমা।

সুরমার চক্ষু আবার জলে ভিজিয়া আসিল, কহিল, তুমি আমাকে আবার বেচতে পার?

যজ্ঞ। না, তা পারি না। নিজেকে না বেচে ফেললে উটি কিছুতেই হতে পারে না।

সুরমা কথা কহিল না, তেমনিভাবে সজল-নয়নে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। বহুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে কহিল, তুমি দাদা, আমি ছোট বোন—আমাদের দু'জনার মাঝখানে একটি বৌ আন না দাদা!

যজ্ঞ। কেন বল দেখি?

সুরমা। সমস্ত দিন ধরে সাজিয়ে-গুজিয়ে তাকে আমি তোমার কাছে বসিয়ে রাখব।

যজ্ঞ। তা কি প্রাণ ধরে পারবে?

সুরমা। মুখ তুলিয়া চোখের-উপর চোখ পাতিয়া কহিল, আমি কি তেমনি অধম যে হিংসা করব?

যজ্ঞ। হিংসা নাই করলে, কিন্তু নিজের স্থানটি বিলিয়ে দেবে?

সুরমা। বিলিয়ে কেন দিতে যাব। আমি রাজা রাজাই থাকব, শুধু একটি মন্ত্রী বহাল করব, দু'জনে মিলে তোমার রাজ্যটা চালাতে আমোদ হবে।

যজ্ঞ। দেখ ছায়া, বিবাহে প্রবৃত্তি নেই, কিন্তু তোমার যদি একজন সাথীর বড় প্রয়োজন হয়ে থাকে ত বিবাহ করব।

সুরমা। হাঁ, নিশ্চয় কর, খুব আমোদ হবে; দু'জনে খুব মনের সুখে দিন কাটাব। মনে মনে কহিল, তিন কুলে আমার কেউ নাই, আমার মান-অপমান তাও নাই, কিন্তু তুমি কেন আমাকে নিয়ে বিশ্বের কলঙ্ক কুড়াবে? দেবতা আমার! তুমি বিবাহ কর, তোমার মুখ চেয়ে আমার সব সইবে।

৩

কলিকাতায় প্রতিবেশীর খবর অনেকে রাখে না। অনেকে আবার খুব রাখে। যাহারা রাখে তাহারা বলে, যজ্ঞদত্ত এম. এ. পাশ করুক, কিন্তু বকাটে ছেলে। ইসারায় তাহারা সুরমার কথাটা উল্লেখ করে। সুরমা ও যজ্ঞদত্ত মাঝে মাঝে তাহা শুনিতে পায়। শুনিয়া দুইজনে হাসিতে থাকে।

কিন্তু তুমি ভাল হও আর মন্দ হও, বড়মানুষ হইলে তোমার বাড়িতে লোক আসিবেই, বিশেষ মেয়েমানুষ। কেহ বা বলে সুরমা, তোমার দাদার বিয়ে দাও না?

সুরমা। দাও না দিদি, একটি ভাল মেয়ে খুঁজে-পেতে।

যে সুরমার সখী সে হাসিয়া ফেলে—তাইত, ভাল মেয়ে মেলা শক্ত, তোমার রূপে যার চোখ ভরে আছে—তার—

দূর, পোড়ারমুখি! বলিতে বলিতে কিন্তু সুরমার সমস্ত মুখমণ্ডল স্নেহ ও গর্ব্বে রঞ্জিত হয়ে উঠে।

সেদিন দুপুরবেলা ঝুপ্‌ঝাপ্‌ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, সুরমা ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, একটি মেয়ে পছন্দ করে এলাম।

যজ্ঞদত্ত। আঃ, একটা দুর্ভাবনা গেল। কোথায় বল দেখি?

সুরমা। ও পাড়ার মিত্তিরদের বাড়ি।

যজ্ঞদত্ত। বামুন হয়ে কায়েতের ঘরে?

সুরমা। কায়েতের ঘরে কি বামুন থাকতে নেই? তার মা ও-বাড়িতে রেঁধে খেতো, মেয়েটি শুনেচি ভাল; দেখে এসে যদি মনে ধরে ত ঘরে আন।

যজ্ঞদত্ত। আমি কি এমনি হতভাগা সে, রাজ্যের ভিখিরী ছাড়া আমার অন্ন জুটবে না।

সুরমা। ভিখিরী কুড়িয়ে আনা কি তোমার নূতন কাজ?

যজ্ঞদত্ত। আবার!

সুরমা। না, যাও, দেখে এস। মনে ধরে ত না ব'ল না।

যজ্ঞদত্ত। মনে কিছুতেই ধরবে না।

সুরমা। ধরবে গো ধরবে—একবার দেখেই এস না।

ছায়াদেবী তখন আলোমশাইকে এমন সাজাইয়া দিল, এত গন্ধ মাখাইয়া মাজিয়া ঘসিয়া চুল আঁচড়াইয়া দিয়া এমনিভাবে আরসির সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিল যে, যজ্ঞদত্তের লজ্জা করিতে লাগিল। ছিঃ, এ যে বড় বাড়াবাড়ি হয়ে গেল।

সুরমা। তা হোক, দেখে এস।

গাড়ি করিয়া যজ্ঞদত্ত মেয়ে দেখিতে গেল। পথে একজন বন্ধুকেও তুলিয়া লইল। চল, মিত্তির-বাড়িতে জলযোগ করে আসি।

বন্ধু। তার মানে?

যজ্ঞদত্ত। সে-বাড়িতে একটা ভিখিরীর মেয়ে আছে। তাকে বিয়ে করতে হবে।

বন্ধু। বল কি, এমন প্রবৃত্তি কে দিলে?

যজ্ঞদত্ত। তোমরা যার হিংসেয় মরে যাও তিনিই, সেই ছায়াদেবী।

যজ্ঞদত্ত বন্ধুকে লইয়া মেয়ে দেখিতে ঘরে ঢুকিলেন। মেয়ে কার্পেটের আসনের উপর বসিয়া, পরণে দেশী কাপড়, কিন্তু অনেক ধোপ-পড়া, সুতাগুলা মাঝে মাঝে জালের মত হইয়া গিয়াছে। হাতে বেলোয়ারি চুড়ি এবং এক জোড়া পাক-দেওয়া তামার মত রংয়ের সোনার বালা—মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় ভিতরের গালাটা দেখা যাইতেছে। মাথায় এত তেল যে কপালটা পর্য্যন্ত চক্‌চক্‌ করিতেছে, ব্রহ্মতালুর শক্ত খোঁপাটা কাঠের মত উঁচু হইয়া আছে। দুই বন্ধুতে মুখ টিপিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। হাসি চাপিয়া মেয়েটির দিকে চাহিয়া যজ্ঞদত্ত কহিল, কি নাম তোমার?

মেয়েটি বড় বড় কালো চোখ দুটো শান্তভাবে তাহার মুখের প্রতি রাখিয়া কহিল, প্রতুল।

যজ্ঞদত্ত বন্ধুর গা টিপিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, ওহে, গদাধর নয় ত?

বন্ধু ঈষৎ ঠেলিয়া দিয়া কহিল, জ্যাঠামি করো না, তাড়াতাড়ি পছন্দ করে নাও।

হাঁ, এই নিই—

বেশ—বেশ, কি পড়?

কিছু না।

আরো ভালো।

কাজ-কর্ম্ম করতে জান।

প্রতুল মাথা নাড়িল—নিকটে একজন ঝি দাঁড়াইয়াছিল, সে ব্যাখ্যা করিয়া দিল—ভারি কর্ম্মী মেয়ে বাবু, রাঁধা-বাড়া সংসারের কাজ-কর্ম্মে মায়ের হাত পেয়েচে। আর, মুখে কথাটি নেই—ভারি শান্ত।

তা বুঝেচি।

তোমার বাপ বেঁচে নেই?

না।

মাও মরে গেছেন?

হাঁ।

যজ্ঞদত্ত দেখিল এই হাবা মেয়েটার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছে।—তোমার কি কেউ নেই?

না।

আমার বাড়ি যাবে?

সে ঘাড় নাড়িল, হুঁ। এই সময় জানালার দিকে নজর পড়ায় সে দেখিল খড়খড়ির ফাঁক দিয়া দুটো কালো চোখ যেন অগ্নিবর্ষণ করিতেছে, ভয় পাইয়া সে বলিল, না।

বাহিরে আসিয়া মিত্তির-মহাশয়ের সাক্ষাৎলাভ।

কেমন দেখলেন ?

বেশ।

বিবাহের তবে দিন স্থির হোক

হোক।

৪

বার-তের বৎসরের বালকের হাত হইতে কোন নির্দ্দয় রসহীন অভিভাবক তাহার অর্দ্ধপঠিত কৌতুকপূর্ণ নভেলটা টানিয়া লুকাইয়া রাখিয়া দিলে তাহার যেমন অবস্থা হয়, ভিতরের প্রাণটা ব্যাকুলভাবে সেই শুষ্কমুখ শঙ্কিত বালককে এঘর-ওঘর ছুটাইয়া লইয়া বেড়ায়, ভয়ে ভয়ে তীব্র চক্ষু দুটি যেমন সেই প্রিয় পদার্থটিকে আবিষ্কার করিবার জন্য ব্যস্ত এবং বিরক্ত হইয়া থাকে, আর সর্ব্বদাই যেন কাহার উপর রাগ করিতে ইচ্ছা করে, তেমনিভাবে সুরমা যজ্ঞদত্তের জন্য ছটফট করিতে লাগিল। কি যেন কি একটা খুঁজিয়া বাহির করিবে। চেয়ার, বেঞ্চ, শোফা, শয্যা, ঘর, বারান্দা—সবগুলার উপরেই সে বিরক্ত হইয়া উঠিল। রাস্তার দিকের একটা জানালাও তাহার পছন্দ হইল না, একবার এটাতে একবার ওটাতে বসিতে লাগিল। যজ্ঞদত্ত ঘরে ঢুকিলেন।

কি হ'ল আলোমশায় ? আলোমহাশয়ের মুখ গম্ভীর।

সুরমা। পছন্দ হল ?

যজ্ঞ। হ'ল।

সুরমা। কবে বিয়ে ?

যজ্ঞ। বোধ হয় এই মাসেই।

নিরানন্দ উৎসাহে সুরমা কাছে আসিল, কিন্তু কোনরূপ উপদ্রব করিল না।—আমার মাথা খাও, সত্যি বল।

কি বিপদ, সত্যিই ত বলচি।

আমার মরা মুখ দেখ—বল, পছন্দ হয়েচে ?

হাঁ।

হঠাৎ যেন সুরমা আর কোন কথা খুঁজিয়া পাইল না। বালক বালিকারা ধমক খাইয়া কাঁদিবার পূর্ব্বে যেমন এদিক-ওদিক ঘাড় নাড়িয়া একটা অর্থহীন কথা বলিয়া

ফেলে, সুরমা তেমনি ছেলেমানুষটির মত মাথা হেলাইয়া গাঢ়স্বরে কহিল, তবে বলেছিলাম ত—

যজ্ঞদত্ত নিজের ভাবনায় ব্যস্ত ছিল, তাই বুঝিতে পারিল না যে, এ কথার একেবারে কোন অর্থ-ই নাই; কেন না, প্রথমতঃ 'পছন্দই হবে' এমন কথা সুরমা কোনকালে উচ্চারণ করে নাই। দ্বিতীয়তঃ, সে নিজেও মেয়ে দেখে নাই বরং এমনটি সে মোটেই আশা করে না যে, এত অল্পে পছন্দ হইবে, এবং এত শীঘ্র সম্বন্ধ পাকা হইবে। তাই সে সমস্ত দিনটা নিজের ঘরে বসিয়া এই কথা তোলাপাড়া করিতে লাগিল। দু'দিন পরে কিন্তু যজ্ঞদত্ত অনেক কথা বুঝিতে পারিল, কহিল, সুরো, এ বিয়ে দিও না দিদি।

সুরমা। বাঃ তা কি হয়? সব যে স্থির হয়ে গেছে।

যজ্ঞ। স্থির কিছুই নয়?

সুরমা। না, তা হতে পারে না, দুঃখীর মেয়েকে সুখী করবে এটাও ভেবে দেখ, বিশেষ কথা দিয়ে ফেরাবে?

যজ্ঞদত্তের প্রতুলকুমারীর মুখ মনে পড়িল, সহিষ্ণুতা ও শান্তভাবের নিগূঢ় ছায়া যেন সেদিন তাহার কালো চোখ দুটিতে সে দেখিতে পাইয়াছিল—তাই সে চুপ করিয়া রহিল, তবু যজ্ঞদত্ত অনেক কথা ভাবিতে লাগিল। সুরমার কথাই বেশি ভাবিল। বর্ষার দিনে বাদল-পোকাগুলো হঠাৎ যেমন ঘর ভরিয়া দেয় তেমন তাহার মনটা যেন অস্বস্তিতে ভরিয়া উঠিল, কিন্তু তাহাদিগের নিভৃত বাসগহ্বরটা যেমন কিছুতেই খুঁজিয়া বাহির করা যায় না, তেমনি সুরমার মুখের কথাগুলো মনের কোন্ গুপ্ত আকাঙ্খার ভিতর দিয়া দলে দলে বাহির হইতে লাগিল, সেইটাই খুঁজিয়া পাইল না। চোখে তার এমনি ঝাপ্‌সা জাল লাগিয়া রহিল যে, কোনক্রমেই সুরমার মুখখানি সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল না।

৫

বিবাহ করিয়া যজ্ঞদত্ত বধূ ঘরে আনিল। বিকারগ্রস্ত রোগী ঘরে লোক না থাকিলে যেমন সমস্ত শক্তি এক করিয়া জলের ঘড়াটার পানে ছুটিয়া গিয়া আঁকড়াইয়া ধরে, সুরমা তেমনি করিয়া নূতন বধূকে আলিঙ্গন করিল। নিজের যতগুলি গহনা ছিল পরাইয়া দিল, যতগুলি বস্ত্র ছিল সমস্ত তাহার বাক্সে ভরিয়া দিল। শুষ্কমুখে সমস্ত দিন ধরিয়া বধূ সাজাইবার ধূম দেখিয়া যজ্ঞদত্ত মুখ চুন করিয়া

রহিল। গাঢ় স্বপ্নটা সহ্য হয়—কেন না, অসহ্য হইলেই ঘুম ভাঙিয়া যায়, কিন্তু জাগিয়া স্বপ্ন দেখাটায় যেন দম আটকাইতে থাকে, কিছুতেই সেটা শেষও হয় না—ঘুমও ভাঙ্গে না। মনে হয় একটা স্বপ্ন, মনে হয় একটা সত্য, 'আলো ও ছায়া'র দু'জনেরই এই ভাবটা আসিতে লাগিল। একদিন ঘরে ডাকিয়া যজ্ঞদত্ত ক হল, ছায়াদেবী!

কি যজ্ঞদাদা?

আলোমশাই বললে না?

মুখ নত করিয়া সুরমা কহিল, আলোমশাই!

যজ্ঞদত্ত দুই হাত বাড়াইয়া কহিল অনেকদিন কাছে এস নাই—এস।

সুরমা একবার মুখপানে চাহিয়া দেখিল; পরক্ষণেই বলিয়া উঠিল, বাঃ, আমি ত খুব! বৌকে একলা ফেলে এসেচি। বলিতে বলিতে সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

রাগের মাথায় যদি কোন অপরিচিত ভদ্রলোকের গালে চড় মারা যায়, আর সে যদি শান্তভাবে ক্ষমা করিয়া চলিয়া যায়; তাহা হইলে মনটা যেমন খারাপ হইয়া থাকে, তেমনি ক্ষমাপ্রাপ্ত অপরাধীর মত তাহারও মনটা ক্রমাগত দমিয়া পড়িতে লাগিল। কেবলি মনে হয়, সে অপরাধ করিয়াছে আর সুরমা প্রাণপণে ক্ষমা করিতেছে।

সুরমা সর্ব্বাভরণা নববধূকে জোর করিয়া তাহার পার্শ্বে বসাইয়া দেয়। সন্ধ্যা হইলেই বাহির হইতে কট্ করিয়া তালা বন্ধ করিয়া দেয়। গালে হাত দিয়া যজ্ঞদত্ত ভাবিতে থাকে। বৌও কতক বুঝিতে পারে, সে সেয়ানা মেয়ে নয়, তবুও ত সে নারী; সাধারণ স্ত্রীবুদ্ধিটুকু হইতে ভগবান কাহাকেও বঞ্চিত করেন না। সেও সারা রাত্রি জাগিয়া থাকে। আজ আট দিনও বিবাহ হয় নাই, এরি মধ্যে যজ্ঞদত্ত একদিন প্রত্যূষে সুরমাকে ডাকিয়া কহিল, সুরো, বর্দ্ধমানে পিসিমাকে বৌ দেখিয়ে আনি।

দামোদর-পারে পিসিমার বাড়ি। সেখানে পৌঁছাইয়া যজ্ঞদত্ত কহিল, পিসিমা, বৌ এনেচি, দেখ।

পিসিমা। ওমা, বিয়ে করেছিস্ বুঝি, আহা বেঁচে থাক। দিব্বি চাঁদপনা বৌ, এইবার মানুষের মত ঘর-সংসার কর্।

যজ্ঞ। সেই জন্যেই ত সুরো জোর করে বিয়ে দিলে।

পিসিমা। সুরো বুঝি বিয়ে দিয়েচে?

যজ্ঞ। সেই ত দিলে, কিন্তু কপাল মন্দ—বৌ নিয়ে ঘর করা চলে না।

পিসিমা। কেন রে?

যজ্ঞ। জানো ত পিসিমা, আমার নর গণ, বৌয়ের হ'ল রাক্ষস গণ। একসঙ্গে থাকলে গণৎকার বলে বাঁচি না-বাঁচি।

পিসিমা। ষাট ষাট, সে কথা—

যজ্ঞ। তখন তাড়াতাড়ি এসব দেখা হয়নি, এখন ত তোমার কাছে থাকবে, মাসে পঞ্চাশ টাকা পাঠাব, তাতে চলবে না পিসিমা ?

পিসিমা। হ্যাঁ তা চলে যাবে। পাড়াগাঁয়ে, বিশেষ কষ্ট হবে না। আহা, চাঁদের মত মেয়ে, ডাগর হয়েচে ; হাঁরে যজ্ঞ, একটা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করলে হয় না ?

যজ্ঞ। হতে পারে। আমি ভট্টাচার্য্যের মত নিয়ে যা ভাল হয় তোমাকে জানাব।

পিসিমা। তা জানাস বাছা।

সন্ধ্যার সময় বৌকে কাছে ডাকিয়া যজ্ঞদত্ত কহিল, তবে তুমি এখানেই থাক।

সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা।

—যা তোমার দরকার হবে আমাকে জানিয়ো।

—আচ্ছা।

—তুমি চিঠি লিখিতে জান।

—না।

—তবে কি করে জানাবে ?

নববধূ গৃহপালিতা হরিণীর মত চক্ষু দুইটি স্বামীর মুখের উপর রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল। যজ্ঞদত্তও মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল।

পিসিমার বাটীতে বৌ ভোরে উঠিয়া কাজ করিতে লাগিল। বসিয়া থাকিতে সে শিখে নাই, নূতন লোক হইলেও সে পরিচিতের মত ঘরকন্নার কাজ করিতে শুরু করিল। দুই-চার দিনেই পিসিমা বুঝিলেন, এমন মেয়ে সবাই গর্ভে ধরে না।

বৌয়ের অনেক গহনা, পাড়া-শুদ্ধ ঝেঁটিয়ে লোক তা দেখতে আসে।

—কে দিয়েচে গা ? তোমার বাপ ?

—না, বাপ-মা আমার নাই, ঠাকুরঝি দিয়েচেন।

দু-একজন সমবয়সীর সহিত ভাব হইলে তাহারা খুঁটিয়া খুঁটিয়া কথা বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তোমার ঠাকুরঝি বুঝি খুব বড়লোক ?

—হ্যাঁ।

—সব গহনা তারি।

—সব। তাঁর দরকার নেই, তিনি বিধবা, এসব পরেন না।

—কত বয়স বৌ ?

—আমাদের চেয়ে কিছু বড়। তিনি জোর করে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েচেন।

—তোমার বর বুঝি তাঁর খুব অনুগত?

—হ্যাঁ, তিনি সতীলক্ষ্মী, সবাই তাঁকে ভালবাসে

৬

উপরের জানালা হইতে সুরমা দেখিল, যজ্ঞদত্ত বাড়ি ফিরিয়া আসিল, কিন্তু সঙ্গে বৌ নাই। ঘরে প্রবেশ করিলে কহিল, যজ্ঞদাদা, বৌকে কোথায় রেখে এলে?

পিসির বাড়ি।

সঙ্গে আনলে না কেন?

থাক কিছুদিন, পরে আনলেই হবে।

কথাটা সুরমার বুকে বিঁধিল। দুইজনেই চুপ করিয়া রহিল। প্রিয়জনের সহিত তর্ক করিতে গিয়া হঠাৎ বচসা হইয়া গেলে যেমন দুইজনেই কিছুক্ষণ ক্ষুন্নমনে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, এ দুইজনও কিছুদিন তেমনি চুপ-চাপ দিন কাটাইতে লাগিল। সুরমা কহে, নেয়ে-খেয়ে নাও, অনেক বেলা হল। যজ্ঞদত্ত বলে, হাঁ এই যাই। এমনি করিয়াও কিছুদিন কাটিল। একসঙ্গে ঘর করিতে গিয়া চিরদিন এভাবে চলে না, তাই আবার মিল হইতে লাগিল। যজ্ঞদত্ত আবার আদর করিয়া ডাকিতে লাগিলেন—ও ছায়া দেবী। ছায়া কিন্তু আর আলোমশায় বলে না, যজ্ঞদাদা বলে, কখনও বা শুধু দাদা বলিয়াই ডাকে।

সুরমা একদিন কহিল, দাদা, প্রায় তিনমাস হতে চলল, এইবার বৌকে আনো। যজ্ঞদত্ত কাটাইয়া দেয়, হাঁ তা হবে এখন।

মনের ভাব বুঝিয়া সুরমা চুপ করিয়া থাকে।

পিসির পত্র মাঝে মাঝে আসে। পিসি লেখেন, বৌয়ের ম্যালেরিয়া জ্বর হইতেছে, চিকিৎসা হওয়া প্রয়োজন। মনের ভাব বুঝিয়া যজ্ঞদত্ত কতকগুলো টাকা বেশি করিয়া পাঠাইয়া দেয়। আর মাস-খানেক কোন কথা উঠে না।

এমন সময় একদিন হঠাৎ চিঠি আসিল যে, পিসি মরিয়া গিয়াছে। যজ্ঞদত্ত বর্দ্ধমানে চলিয়া গেল। যাইবার সময় সুরমা মাথার দিব্যি দিয়া বলিয়া দিল, বৌকে নিয়ে এস।

বর্দ্ধমানে পিসির শ্রাদ্ধশান্তি হইয়া গেলে একদিন দুপুরবেলা যজ্ঞদত্ত বারান্দায় দাঁড়াইয়া বাড়ি যাইবার কথা ভাবিতেছিল। উঠানে একটা ধানের মরাইয়ের পাশে

নতুনবৌ দাঁড়াইয়া, চোখে পড়িল। চোখাচোখি হইবামাত্র সে হাত দিয়া ইসারা করিয়া ডাকিল।

যজ্ঞদত্তও স্ত্রীর নিকট পৌঁছিল।

কি?

আপনাকে কিছু বলব।

বেশ ত বল।

নূতন বৌ ঢোক গিলিয়া কহিল, একদিন আপনি বলেছিলেন যদি আমার কোন দরকার হয়—

যজ্ঞদত্ত। বেশ ত কি দরকার বল?

বৌ। বাড়িতে সবাই বলাবলি কচ্ছিলেন, আমি বড় অলক্ষণা, তাই এখানে আর থাকতে ইচ্ছে করে না।

যজ্ঞদত্ত। কোথায় থাকতে চাও?

বৌ। কলকাতায় যদি কোন ভদ্র পরিবারে স্থান পাই—আমি ত সব কাজ কত্তে পারি।

যজ্ঞদত্ত। তোমার নিজের বাড়িতে যাবে?

বৌ। আমার নিজের বাড়ি? সে আবার কোথায়? তাঁরা কি আর থাকতে দেবেন?

যজ্ঞদত্ত হাত দিয়া স্ত্রীর মুখ তুলিয়া ধরিয়া কহিল, আমার বাড়িতে যাবে?

বৌ। যাব।

যজ্ঞদত্ত। সুরমা তোমার জন্য বড় ব্যস্ত হয়েচে।

সুরমার কথায় তাহার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল—ঠাকুরঝি আমায় মনে করেন?

যজ্ঞদত্ত। করেন বই কি।

বৌ। তবে নিয়ে চলুন।

জগতে একরকমের লোক আছে, তাহারা পরের সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার বুদ্ধি কিছুতেই খুঁজিয়া পায় না, কিন্তু এমন একটা সহজ বুদ্ধি রাখে যে তাহার উপর নির্ভর করিয়া নিজের সম্বন্ধে অপরের পরামর্শ মোটেই প্রয়োজন বোধ করে না। নূতন বৌটি এই শ্রেণীর। সে নিজের কথা নিজেই ভাবে—পরকে জিজ্ঞাসা করে না।

ভাবিয়া কহিল, আপনাদের অকল্যাণ করবার বড় ভয় আমার, কিন্তু থাকি বা কোথায়? না হয়, আমি নীচেই থাকব, সব কাজ-কর্ম্ম করতে নীচে থাকাই সুবিধের।

যজ্ঞ। উপরে কি তোমার থাকবার ঘর নেই?

আছে, কিন্তু নীচের ঘরেই বেশ থাকবো।

যজ্ঞদত্ত আর কোন কথা কহিল না। ভাবিতে লাগিল যে, খুব বোকার মত ত এ কথাগুলো নয় এবং কয়েকবার মনে করিল, বলিয়া ফেলে যে সে অলক্ষণা নহে, রাক্ষসগণ প্রভৃতি মিথ্যা কথা। কিন্তু মিথ্যা কথার কারণটি কি, তা কি করিয়া বলা যায়! বিশেষ বাড়ি গিয়া সে তাহার অতীত এবং ভবিষ্যৎ ব্যবহারে যে বেশ মিল করিয়া তুলিতে পারিবে, সে ভরসাও মনে করিতে পারিল না।

৭

সুরমা দেখিল বৌ আসিয়াছে। উগ্র নেশার প্রথম ঝোঁকটা কাটাইয়া দিয়া সে স্থির হইয়াছে। তাই বৌ দেখিতে বাড়াবাড়ি করিল না। শান্ত ধীরভাবে প্রিয়-সম্ভাষণ করিল, মৌখিক নহে, অন্তরগত মঙ্গলেচ্ছা তাহার শুষ্ক মুখের উপর জ্যোতি ফিরাইয়া আনিল।—বৌ, কই ভাল ছিলে না ত?

বৌ মাথা নাড়িয়া কহিল, মাঝে মাঝে জ্বর হ'ত।

সুরমা তাহার কপালের ঘাম মুছাইয়া বলিল, এখানে চিকিৎসা হলেই সব ভাল হয়ে যাবে।

দুপুরবেলা সুরমা সংবাদ পাইল যে, বৌয়ের জন্য নীচের ঘর পরিষ্কার হইতেছে। অপমানে তাঁহার চোখে জল আসিল। সংবরণ করিয়া যজ্ঞদত্তের কাছে গিয়া বলিল, দাদা, বৌ কি নীচে শোবে? তুমি কিছু বলবে না?

—আর কি বলব? যার যা খুশি তা করুক।

সুরমা লজ্জা ও ধিক্কারে আপনাকে শাসন করিতে পারিল না, সম্মুখেই কাঁদিয়া পলাইয়া গেল। উপরের গোলযোগটা কিন্তু নীচে পৌঁছিল না।

নূতন বৌ নূতন করিয়া সংসারের কাজ-কর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে সে সুরমার সব কাজগুলি নিজের হাতে তুলিয়া লইল। শুধু উপরে যায় না —স্বামীর সহিত দেখা করে না। ক্রমে সুরমাও উপর ছাড়িয়া দিল। বৌ প্রফুল্ল গম্ভীর মুখে কাজ করিত, সুরমা পাশে বসিয়া থাকিত। একজন দেখাইত কর্ম্ম করিয়া সুখ, অপর বুঝিত কর্ম্মস্রোতে অনেক দুঃখ ভাসাইয়া দিতে পারা যায়। দু'জনের কেহই বেশী কথা কহে না, তাদের সহানুভূতি ক্রমে গাঢ়তর হইয়া আসিতে লাগিল।

মাঝে মাঝে নূতন বধূর প্রায় জ্বর হয়, দুই-চারিদিন উপবাসে থাকিয়া আপনি সারিয়া উঠে। ঔষধে প্রবৃত্তি নাই, ঔষধ খায় না। সে-সময়ের কাজ কর্ম্মগুলা দাস-দাসীতেই করে; সুরমা পারিয়া উঠে না, ইচ্ছা থাকিলেও সামর্থ্যে কুলায় না। সোনার প্রতিমা সুরমা দেবীর এখন সে রং নাই, সে কান্তি নাই, অত লাবণ্য দুই

মাসের মধ্যে কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। বৌ মাঝে মাঝে বলে, ঠাকুরঝি, তুমি দিন দিন এমন হয়ে যাচ্ছ কেন?

আমি? আচ্ছা বৌ, শরীরটা ভাল করবার জন্যে আমি যদি বিদেশে যাই, তোমার কষ্ট হবে না ত?

হবে বৈকি।

তবে যাব না?

না ঠাকুরঝি, যেয়ো না, তুমি ঔষধ খেয়ে এখানেই ভাল হও।

সুরমা স্নেহভরে তাহার ললাট চুম্বন করিল।

একদিন সুরমা যজ্ঞদত্তের খাবার সাজাইতেছিল। যজ্ঞদত্ত তাহার মলিন কৃশ মুখখানি সতৃষ্ণ-চক্ষে দেখিতেছিল। সুরমা মুখ তুলিলে, সে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, মনে হয় মলেই বাঁচি!

কেন? বলিতেই সুরমার চক্ষে জল আসিল। ভয় হয় আর কতদিন এ প্রাণটাকে বয়ে বেড়াতে হবে। বন্দুকের গুলি খাইয়া বনের পশু যেমন মাটি ছাড়িয়া আকাশে পালাইবার জন্য প্রাণপণে লাফাইয়া উঠে, কিন্তু আকাশ তাহার কেহ নয়, তাই সেই আশ্রয়শূন্য মরণাহত জীব শেষে চিরদিনের আশ্রয় পৃথিবীকেই জড়াইয়া ধরিয়া প্রাণত্যাগ করে, তেমনি ছটফট করিয়া সুরমা প্রথমে আকাশ পানে চাহিয়া দেখিল, তার পর তেমনি করিয়া ভূলুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল, যজ্ঞদাদা, আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমার শত্রু, আমাকে আর কোথাও পাঠিয়ে দিয়ে তুমি সুখী হও।

তখনি হয়ত দাসী আসিয়া পড়িবে, যজ্ঞদত্ত হাত ধরিয়া তাহাকে তুলিয়া ধরিল। সস্নেহে অশ্রু মুছাইয়া কহিল, ছিঃ, ছেলেমানুষী ক'র না।

অশ্রু মুছিতে মুছিতে সুরমা তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

৮

তার পর একদিন সুরমা বৌকে টানিয়া কাছে লইয়া কহিল, বৌ, দাদা কি তোমাকে কখন কিছু বলেচেন?

বৌ সহজভাবে উত্তর দিল, কি আবার বলবেন?

তবে তুমি কখন তাঁর কাছে যাও না কেন? তোমার কি যেতে ইচ্ছা করে না?

বৌয়ের প্রথমটা লজ্জা করিতে লাগিল, পরে মুখ নত করিয়া কহিল, করে দিদি, কিন্তু যাবার ত জো নেই।

কেন.বৌ?

তোমার কি মনে নেই?

কই না।

ওঃ, তুমি বুঝি ভুলে গেছ ঠাকুরঝি, আমার যে রাক্ষস গণ, ওঁর নর গণ।

কে বলেচে?

উনিই পিসিমাকে বলেছিলেন, তাইতে—

সুরমা শিহরিয়া উঠিল—এ যে মিছে কথা বৌ!

মিছে কথা?

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সে সুরমার মুখপানে চাহিয়া রহিল। সুরমা বার বার শিহরিয়া উঠিল—মিছে কথা বৌ, ভয়ানক মিছে কথা।

আমার বিশ্বাস হয় না, উনি মিছে কথা বলবেন।

সুরমা আর সহিতে পারিল না—দুই বাহুর মধ্যে দৃঢ় করিয়া আলিঙ্গন করিয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল, বৌ, আমি মহাপাতকী।

বধূ আপনাকে ছাড়াইয়া লইয়া ধীরে ধীরে কহিল, কেন ঠাকুরঝি?

উঃ, তা আর শুনতে চেয়ো না। আমি বলতে পারব না।

ঝড়ের মত সুরমা যজ্ঞদত্তের সম্মুখে আসিয়া পড়িল—বৌকে এমন করে ঠকিয়ে রেখেচ, উঃ, কি ভয়ানক মিথ্যাবাদী তুমি।

যজ্ঞদত্ত অবাক হইয়া গেল।—ও কি সুরো!

কৃতবিদ্য তুমি, ছি ছি, তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। যজ্ঞদত্ত অর্থ বুঝিল না, শুধু কটু-কথা শুনিতে লাগিল।—কি ভেবে বিয়ে করেছিলে? কি ভেবে ত্যাগ করে আছ? আমার জন্য? আমার মুখ চেয়ে এই প্রতারণা করে আসচ?

সুরমা, পাগল হয়ে গেলে?

পাগল আমি? তোমার চেয়ে আমার জ্ঞান আছে, দাও আমাকে কোথাও পাঠিয়ে। সুরমার চক্ষু রক্তবর্ণ, হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, এক দণ্ডও আমি থাকতে চাই না, ছিঃ ছিঃ!

যজ্ঞদত্ত চীৎকার করিয়া কহিল, কি বলচ?

বলচি তুমি মিথ্যাবাদী—প্রতারক।

নিমেষে যজ্ঞদত্তের মাথার ভিতর আগুন জ্বলিয়া উঠিল। অকারণে মনে হইল, তাহার ভিতরের অন্তরটা বাহির হইয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে ডাকিতেছে। জ্ঞানশূন্য হইয়া সে টেবিলের উপরিস্থিত ভারী 'রুলার' তুলিয়া লইয়া চীৎকার করিয়া কহিল, আমি অধম, আমি প্রতারক, আমি মিথ্যাবাদী, এই তার প্রায়শ্চিত্ত করচি।

বিপুল বলের সহিত যজ্ঞদত্ত তাহার মস্তকে ভীষণ আঘাত করিল। মাথা ফাটিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া রক্তস্রোত বহিল। সুরমা অস্ফুটে ডাকিল, মাগো? তার পর অচৈতন্য হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেল। যজ্ঞদত্ত তাহা দেখিল, দেখিল তার সমস্ত মুখ রক্তে ভাসিতেছে, চোখের ভিতর রক্ত ঢুকিয়া সমস্ত ঝাপসা বোধ হইতেছে। সে উন্মত্তের মত বলিয়া উঠিল, আর কেন? এই সময় পিছন হইতে কে ধরিয়া ফেলিল। ফিরিয়া দেখিল স্ত্রী; কাঁদিয়া বলিল, তুমি? স্কন্ধের উপর মাথা রাখিয়া সেও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

সুরমা যেমন করিয়া নীচে হইতে উপরে ছুটিয়া আসিল, নূতনবধূ তাহাতে আশ্চর্য্য ও শঙ্কিত হইয়া নিঃশব্দে পিছনে আসিয়া দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া সব কথা শুনিল, সব কাণ্ড দেখিল। অনেকখানি সত্য তাহার মাথার ভিতরে সূর্য্যের আলোকের ন্যায় প্রতিভাত হইল, তাহারও বক্ষ-স্পন্দন দ্রুত হইয়া আসিয়াছিল, চক্ষের বাহিরে কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি হইতেছিল, কিন্তু সে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বিপদের সময় স্বামীকে ক্রোড়ে করিয়া বসিল।

৯

ছয় দিন পরে ভাল করিয়া জ্ঞান হইলে, সুরমা জিজ্ঞাসা করিল, দাদা কেমন আছেন?

দাসী কহিল, ভাল আছেন।

—আমি দেখে আসব! কিন্তু উঠিতে গিয়া আবার শুইয়া পড়িল।

দাসী কহিল, তুমি বড় দুর্ব্বল, তাতে জ্বর হয়েছে, উঠো না, ডাক্তার বারণ করেচে।

সুরমা আশা করিল যজ্ঞদাদা দেখিতে আসিবে, বৌ দেখিতে আসিবে।

একদিন দুইদিন করিয়া ক্রমে এক সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল, তবু কেহ আসিল না, কেহ খোঁজও লইল না।

আলো ও ছায়া

জ্বর সারিয়াছে, কিন্তু বড় দুর্ব্বল। উঠিতে চেষ্টা করিলে হয়ত উঠিতে পারিত, কিন্তু বিষম অভিমানে তাহার শয্যাত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি হইল না। নিজের মনে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিত, চোখ মুছিয়া ভাবিত—তাহাদের আলো ও ছায়ার কাহিনী।

দীপ্ত আলো ও গাঢ় ছায়া লইয়া তাহারা খেলা আরম্ভ করিয়াছিল, এখন আলো নিভিয়া আসিতেছে। মধ্যাহ্নের সূর্য্য পশ্চিমে ঝুঁকিয়াছে, গাঢ় ছায়া তাই অস্পষ্ট ও বিকৃত হইয়া প্রেতের মত কঙ্কালসার হইয়াছে। অজানা অন্ধকারের পানে সে ছায়া যেন মিশিয়া যাইবার জন্য ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছে। কাঁদিয়া কাঁদিয়া সুরমা ঘুমাইয়া পড়িল।

গায়ের উপর তপ্ত হস্ত রাখিয়া কে যেন ডাকিল, দিদি!

সুরমা উঠিয়া বলিল, একি বৌ? চক্ষু তাহার রক্তবর্ণ, মুখ শুষ্ক, ওষ্ঠদ্বয় যেন কালিমাখা।—কেন বৌ, কি হয়েচে তোমার?

কি হয়েচে আমার! তুমি আমাকে এ-বাড়িতে এনেছিলে, তাই বলতে এসেচি দিদি, ছুটি দাও আমাকে। আমি যাব—

কেন দিদি, কোথা যাবে?

নূতন বধূ সুরমার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া লুটাইয়া পড়িল!

সুরমা দেখিল তাহার দেহ অগ্নির মত উত্তপ্ত।—একি! এ যে বড় জ্বর হয়েচে। এমন সময় একজন দাসী চীৎকার করিয়া ছুটিয়া আসিল, দিদি, বৌ কোথা গেল? ওমা জ্বরের ঝোঁকে পালিয়ে এসেচেন! আজ আট দিন বেহুঁস হয়ে পড়েছিলেন। মা-গো! কি করে এলেন?

আট দিন জ্বর! ডাক্তার দেখচে?

কেউ না দিদি, কেউ না, পরশুদিন সকালবেলাও বৌমা এক ঘণ্টা কলতলায় মাথা পেতে বসেছিলেন, এত মানা করলুম, কিছুতেই শুনলেন না।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে সুরমা যজ্ঞদত্তের ঘরে গিয়া কাঁদিয়া পড়িল, দাদা, বৌ আর বাঁচে না।

বাঁচে না! কি হয়েচে?

আমার ঘরে এসে দেখ দাদা, বৌ বুঝি বাঁচে না।

দুই-তিনজন ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া বলিল, প্রবল বিকার। সমস্ত রাত্রি বিফল পরিশ্রম করিয়া তাহারা ভোরবেলায় চলিয়া গেল।

সমস্ত রাত্রি যজ্ঞদত্ত মাথার শিয়রে বসিয়া রহিল, কতবার মুখের কাছে মুখ লইয়া গেল, বধূ কিন্তু স্বামীকে চিনিতে পরিল না।

ডাক্তার চলিয়া গেলে যজ্ঞদত্ত কাঁদিয়া উঠিল, বৌ, একবার চেয়ে দেখ, একবার বল ক্ষমা করলে!

সুরমা পায়ের উপর মুখ লুকাইয়া অস্ফুটে বলিল, বৌদিদি, কেন এ শাস্তি দিয়ে গেলে?

কে কথা কহিবে? সমস্ত মান, অভিমান, তাচ্ছিল্য, অবহেলা সরাইয়া দিয়া সে ধীরে ধীরে অনন্তে মিলাইয়া গেল।

সুরমা কহিল, দাদা কোথায়?

দাসী উত্তর কহিল, কাল তিনি পশ্চিমে চলে গেছেন।

কবে আসবেন?

জানিনে, বোধহয় শীগগির আসবেন না।

আমি কোথায় থাকব?

সরকারমশায়কে বলে গেছেন, যত ইচ্ছে টাকা নিয়ে তোমার যেখানে খুশি থেকো।

সুরমা আকাশপানে চাহিয়া দেখিল, জগতের আলো নিভিয়া গিয়াছে—সূর্য্য নাই, চন্দ্র নাই, একটি তারাও দেখা যায় না। পাশে চাহিয়া দেখিল, সে অস্ফুট ছায়াটিও কোথায় সরিয়া গিয়াছে—চতুর্দ্দিক ঘনান্ধকার, বক্ষ-স্পন্দন তাহার যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে, চক্ষের জ্যোতি ম্লান ও স্থির হইয়া আসিতেছে।

দাসী ডাকিল, দিদি!

ঊর্দ্ধনেত্রে সুরমা ডাকিল, যজ্ঞদাদা!

তার পর ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িল।

মন্দির

মন্দির

১

এক গ্রামে নদীর তীরে দু'ঘর কুমোর বাস করিত। তাহারা নদীর মাটি তুলিয়া ছাঁচে ফেলিয়া পুতুল তৈরি করিত, আর হাটে বিক্রয় করিয়া আসিত। চিরকাল তাহারা এই কাজ করে, চিরকাল এই মাটির পুতুল তাহাদিগের পরণের বস্ত্র ও উদরের অন্ন যোগাইয়া থাকে। মেয়েরা কাজ করে, জল তুলে, রাঁধিয়া স্বামী-পুত্রকে খাওয়ায় এবং নিবান ভস্মস্তূপের ভিতর হইতে পোড়া পুতুল বাহির করিয়া আঁচল দিয়া ঝাড়িয়া চিত্রিত হইবার জন্য পুরুষদের হাতের কাছে আগাইয়া দেয়।

শক্তিনাথ এই কুম্ভকার পরিবারের মধ্যে আসিয়া স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। রোগক্লিষ্ট ক্ষীণদেহ এই ব্রাহ্মণকুমার, তাহার বন্ধুবান্ধব, খেলা-ধূলা, লেখা-পড়া, সব ছাড়িয়া দিয়া এই মাটির পুতুলের পানে অকস্মাৎ একদিন ঝুঁকিয়া পড়িল। সে বাঁশের ছুরি ধুইয়া দিত, ছাঁচের ভিতর হইতে পরিষ্কার করিয়া মাটি চাঁচিয়া ফেলিত এবং উৎকণ্ঠিত ও অসন্তুষ্ট চিত্তে পুতুলের চিত্রাঙ্কন-কার্য্য কেমন অসাবধানতার সহিত সমাধা হইতেছে তাহাই দেখিত। কালি দিয়া পুতুলের ভ্রূ, চক্ষু, ওষ্ঠ প্রভৃতি লিখিত হইত। কোনটার ভ্রূ মোটা, কোনটার আধখানা, কাহারো বা ওষ্ঠের নীচে কালির আঁচড় লাগিয়া থাকিত। শক্তিনাথ অধীর ঔৎসুক্যে আবেদন করিত, সরকারদাদা, অমন তাচ্ছিল্য করে আঁকচ কেন? সরকারদাদা অর্থাৎ কারিগর সস্নেহে হাসিয়া জবাব দিত, বামুনঠাকুর, ভাল আঁকতে গেলে বেশি দাম লাগে, অত কে দেবে বল? এক পয়সার পুতুল ত আর চার পয়সায় বিকোবে না।

২

এই সহজ কথাটার অনেক আলোচনা করিয়াও শক্তিনাথ আধখানা মাত্র বুঝিয়াছিল। এক পয়সার পুতুল ঠিক পয়সায় বিকাইবে, তাহার ভ্রূ থাকুক, আধখানা ভ্রূ নাই থাকুক। দুই চক্ষু সমান অসমান যাই হউক, সেই এক পয়সা। মিছামিছি কে এত পরিশ্রম করিবে? পুতুল কিনিবে বালক, দু'দণ্ড তাহাকে আদর করিবে, শোয়াইবে, বসাইবে, কোলে করিবে—তার পর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিবে—এই ত?

শক্তিনাথ বাটী হইতে সকালবেলা যে মুড়িমুড়কি কাপড়ে বাঁধিয়া আনিয়াছিল, তাহার ভুক্তাবশিষ্ট এখনো বাঁধা আছে, তাহাই খুলিয়া অতিশয় অন্যমনস্কভাবে চিবাইতে চিবাইতে ছড়াইতে ছড়াইতে সে তাহাদের জীর্ণ বাটীর প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল। বাটীতে কেহ নাই। ভগ্নস্বাস্থ্য বৃদ্ধ পিতা জমিদারবাটীতে মদনমোহন ঠাকুরের পূজা করিতে গিয়াছেন। ভিজা আলো-চাল, কলা, মূলা প্রভৃতি উৎসর্গীকৃত নৈবেদ্য বাঁধিয়া আনিবেন, তাহার পর পাক করিয়া পুত্রকে খাওয়াইবেন, নিজেও খাইবেন। বাড়ির উঠান কুঁদফুল, করবীফুল ও শেফালীফুলগাছে পূর্ণ। গৃহলক্ষ্মী-হীন বাটীটার সর্ব্বত্রই জঙ্গল; কিছুতে শৃঙ্খলা নাই, কাহারো পারিপাট্য নাই। বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মধুসূদন কোনরূপে দিনপাত করেন। শক্তিনাথ ফুল পাড়িয়া, ডাল নাড়িয়া, পাতা ছিঁড়িয়া উঠানময় অন্যমনস্কভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

প্রতিদিন সকালবেলা শক্তিনাথ কুমোরবাড়ি যায়। আজকাল সে পুতুলে রং দিবার অধিকার পাইয়াছে। তাহার সরকারদাদা সযত্নে সবচেয়ে ভাল পুতুলটা তাহাকে বাছিয়া দিয়া বলে, নাও দাদাঠাকুর, তুমি চিত্তির কর। দাদাঠাকুর এক বেলা ধরিয়া একটি পুতুল চিত্রিত করে। হয়ত খুব ভালই হয়, তবু এক পয়সার বেশী দাম উঠে না। সরকারদাদা কিন্তু বাটী আসিয়া বলে, বামুনঠাকুরের চিত্রিকরা পুতুলটি দু'পয়সায় বিকিয়েচে। শুনিয়া শক্তিনাথের আর আনন্দ ধরে না।

৩

এ-গ্রামের জমিদার কায়স্থ। দেব-দ্বিজে তাঁহার বাড়াবাড়ি ভক্তি। গৃহদেবতা নিকষ-নির্ম্মিত মদনমোহন-বিগ্রহ; পার্শ্বে সুবর্ণরঞ্জিত শ্রীরাধা—অত্যুচ্চ মন্দিরে

রৌপ্য-সিংহাসনে তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। বৃন্দাবনলীলার কত অপরূপ চিত্র মন্দির-গাত্রে সংলগ্ন। উপরে কিংখাপের চন্দ্রাতপ, তাহ'তে শতশাখার ঝাড় ঝুলিতেছে। এক পার্শ্বে মর্ম্মর বেদীর উপর উপকরণ সজ্জিত; এবং নিত্যনিবেদিত পুষ্প-চন্দনের ঘনসৌরভে মন্দিরাভ্যন্তর সমাচ্ছন্ন। বুঝি, স্বর্গসুখ ও সৌন্দর্য্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে এই পুষ্প ও গন্ধ পূজার প্রথম উপাচার হইয়া আছে, এবং তাহারই সুকোমল সুরভি বায়ুর স্তরে স্তরে সঞ্চিত হইয়া মন্দির বায়ুকে নিবিড় করিয়া রাখিয়াছে।

৪

অনেকদিনের কথা বলিতেছি। জমিদার রাজনারায়ণবাবু যখন প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পা দিয়া প্রথম বুঝিলেন যে, এ-জীবনের ছায়া ক্রমশঃ দীর্ঘ ও অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে, যেদিন সর্ব্বপ্রথম বুঝিলেন যে, এ জমিদারী ও ধন-ঐশ্বর্য্য ভোগের মিয়াদ প্রতিদিন কমিয়া আসিতেছে; প্রথম যেদিন মন্দিরের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চোখ দিয়া অনুতাপাশ্রু বিগলিত হইয়াছিল, আমি সেইদিনের কথা বলিতেছি। তখন তাঁহার একমাত্র কন্যা অপর্ণা—পাঁচ বৎসরের বালিকা। পিতার পায়ের কাছে দাঁড়াইয়া একমনে সে দেখিত, মধুসূদন ভট্টাচার্য্য চন্দন দিয়া কালো পুতুলটি চর্চ্চিত করিতেছেন, ফুল দিয়া সিংহাসন বেষ্টন করিতেছেন এবং তাহারই স্নিগ্ধ গন্ধ আশীর্ব্বাদের মত যেন তাহাকে স্পর্শ করিয়া ফি'রতেছে। সেইদিন হইতে প্রতিদিনই এই বালিকা সন্ধ্যার পর পিতার সহিত ঠাকুরের আরতি দেখিতে আসিত এবং এই মঙ্গল-উৎসবের মধ্যে অকারণে বিভোর হইয়া চাহিয়া থাকিত।

ক্রমে অপর্ণা বড় হইতে লাগিল। হিন্দুর মেয়ে—ঈশ্বরের ধারণা যেমন করিয়া হৃদয়ঙ্গম করে, সেও তাহাই করিতে লাগিল, এবং পিতার নিতান্ত আদরের সামগ্রী এই মন্দিরটি যে তাহারও বক্ষ-শোণিতের মত, একথা সে তাহার সমস্ত কর্ম্ম ও খেলা-ধূলার মধ্যেও প্রমাণ করিতে বসিল। সমস্ত দিন এই মন্দিরের কাছাকাছি থাকিত এবং একটি শুষ্ক তৃণ বা একটি শুষ্ক ফলও সে মন্দিরের ভিতরে প'ড়িয়া থাকা সহ্য করিতে পারিত না। এক ফোঁটা জল পড়িলে সে সযতনে আঁচল দিয়া তাহা মুছিয়া লইত। রাজনারায়ণবাবুর দেবনিষ্ঠা—লোকে বাড়াবাড়ি মনে করিত, কিন্তু অপর্ণার দেবসেবাপরায়ণতা সে সীমাও অতিক্রম করিতে উদ্যত হইল। সাবেক পুষ্পপাত্রে আর ফুল আঁটে না—একটা বড় আসিয়াছে। চন্দনের পুরাতন

বাটিটা বদলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভোজ্য ও নৈবেদ্যর বরাদ্দ ঢের বাড়িয়া গিয়াছে। এমন কি, নিত্য নূতন ও নানাবিধ পূজার আয়োজন ও তাহার নিখুঁত বন্দোবস্তের মাঝে পড়িয়া বৃদ্ধ পুরোহিত পর্য্যন্ত শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। জমিদার রাজনারায়ণবাবু এ-সব দেখিয়া শুনিয়া ভক্তি-স্নেহে গাঢ়স্বরে কহিতেন, ঠাকুর আমার ঘরে তাঁহার নিজের সেবার জন্য লক্ষ্মীকে পাঠাইয়া দিয়াছেন—তোমরা কেহ কিছু বলিয়ো না।

৫

যথাসময়ে অপর্ণার বিবাহ হইয়া গেল। মন্দির ছাড়িয়া এইবার যে তাহাকে অন্যত্র যাইতে হইবে, এই আশঙ্কায় তাহার মুখের হাসি অসময়ে শুকাইয়া গেল। দিন দেখান হইতেছে, তাহাকে শ্বশুরবাড়ি যাইতে হইবে। পরিপূর্ণ বিদ্যুৎ বুকে চাপিয়া বর্ষার ঘনকৃষ্ণ মেঘখণ্ড যেমন অবরুদ্ধ গুরুভারে স্থির হইয়া কিছুক্ষণ আকাশের গায়ে বর্ষণোন্মুখভাবে দাঁড়াইয়া থাকে তেমনি স্থির হইয়া একদিন অপর্ণা শুনিল যে, সেই দেখান-দিন আজ আসিয়াছে। সে পিতার নিকট গিয়া কহিল, বাবা, আমি ঠাকুর-সেবার যে বন্দোবস্ত করিয়া গেলাম তাহার যেন অন্যথা না হয়। বৃদ্ধ পিতা কাঁদিয়া ফেলিলেন—তাই ত মা। না, অন্যথা কিছুই হবে না।

অপর্ণা নিঃশব্দে চলিয়া আসিল। তাহার মা নাই। সে কাঁদিতে পারিল না। বৃদ্ধ পিতার দুচোখ-ভরা জল—সে রাগ করিবে কি করিয়া? তাহার পর, যোদ্ধা যেমন করিয়া তাহার ব্যথিত ক্রন্দনোন্মুখ বীর-হৃদয় পৌরুষ-শুষ্ক হাসিতে চাপা দিয়া তাড়াতাড়ি অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক চলিয়া যায়, তেমনি করিয়া অপর্ণা শিবিকারোহণে গ্রাম ত্যাগ করিয়া অজানা কর্ত্তব্যের শাসন মাথা পাতিয়া লইয়া চলিয়া গেল। নিজের উচ্ছ্বসিত অশ্রু মুছিতে গিয়া তাহার মনে পড়িল—পিতার অশ্রু মুছাইয়া আসা হয় নাই। তাহার নিজের হৃদয় কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্রমাগত তাহার কাছে যেন কত নালিশ করিতে লাগিল। একে তাহার হৃদয় শত ব্যথায় বিদ্ধ, তাহার পর কোথায় কোন্ গ্রামান্তরে মন্দির হইতে যখন সন্ধ্যার শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, তখন সেই আজন্ম-পরিচিত আরতির আহ্বান-শব্দ তাহার কানের ভিতর দিয়া মর্ম্মে নৈরাশ্যের হাহাকার বহন করিয়া আনিল। ছটফট্ করিয়া অপর্ণা শিবিকার দ্বার উন্মোচন করিয়া ফেলিল, এবং সন্ধ্যার অন্ধকারের ভিতর দিয়া দেখিতে লাগিল, এবং ছায়া-নিবিড় একটা উচ্চ দেবদারু-শিখায় একটা পরিচিত মন্দিরের সমুন্নত চূড়া কল্পনা

করিয়া সে উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিয়া উঠিল। তাহার শ্বশুর-বাটীর একজন দাসী পিছনেই চলিয়া আসিতেছিল, সে তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া কহিল, ছি বৌমা, অমন করে কি কাঁদতে আছে মা, শ্বশুর ঘর কে না করে? অপর্ণা দুই হাতে মুখ চাপিয়া রোদন নিবারণ করিয়া পাল্কি'র কবাট বন্ধ করিয়া দিল।

ঠিক সেই সময়টিতেই মন্দিরের ভিতর দাঁড়াইয়া পিতা রাজনারায়ণ মদনমোহন ঠাকুরের পার্শ্বে ধূপ-ধূনার ধূমে ও চক্ষুজলে অস্পষ্ট একখানি দেবীমূর্ত্তির অনিন্দ্যসুন্দর মুখে প্রিয়তমা দুহিতার মুখচ্ছবি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

৬

অপর্ণা স্বামীগৃহে। সেথায় তাহার ইচ্ছাধীন স্বামী-সম্ভাষণের ভিতর এতটুকু আবেগ, এতটুকু চাঞ্চল্যও প্রকাশ পাইল না। প্রথম প্রণয়ের স্নিগ্ধ সঙ্কোচ, মিলনের সলজ্জ উত্তেজনা, কিছুই তাহার ম্লান চক্ষু দুটির পূর্ব্ব দীপ্তি ফিরাইয়া আনিল না। প্রথম হইতেই স্বামী ও স্ত্রী দুইজনেই যেন পরস্পরের কাছে কোন দুর্ব্বোধ্য অপরাধে অপরাধী হইয়া রহিল, এবং তাহারই ক্ষুব্ধ বেদনা কূলপ্লাবিনী উচ্ছ্বসিত তটিনীর ন্যায় একটা দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান নির্ম্মাণ করিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল।

একদিন অনেক রাত্রে অমরনাথ ধীরে ধীরে ডাকিল কহিল, অপর্ণা, তোমার এখানে থাকতে কি ভাল লাগে না?

অপর্ণা জাগিয়াছিল, বলিল, না।

বাপের বাড়ি যাবে?

যাব।

কাল যেতে চাও?

চাই।

ক্ষুব্ধ অমরনাথ জবাব শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আর যদি যাওয়া না হয়?

অপর্ণা কহিল, তা হলে যেমন আছি তেমনি থাকব।

আবার কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ করিয়া থাকিল, অমরনাথ ডাকিল, অপর্ণা!

অপর্ণা অন্যমনস্কভাবে বলিল, কি!

আমাকে কি তোমার কোন প্রয়োজন নাই?

অপর্ণা গায়ের কাপড়-চোপড় সর্ব্বাঙ্গে বেশ করিয়া টানিয়া দিয়া স্বচ্ছন্দে শুইয়া বলিল, ও-সব কথায় বড় ঝগড়া হয়, ও সব ব'লো না।

ঝগড়া হয়—কি করে জানলে?

জানি, আমাদের বাপের বাড়িতে মেজদা ও মেজবৌ এই নিয়ে নিত্য কলহ করে। আমার ঝগড়া-কলহ ভাল লাগে না।

শুনিয়া অমরনাথ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। অন্ধকারে হাতবাড়াইয়া সে যেন এই কথাটাই এতদিন খুঁজিতেছিল, হঠাৎ আজ যেন তাহা হাতে ঠেকিল, বলিয়া উঠিল, এস অপর্ণা আমরাও ঝগড়া করি! এমন করে থাকার চেয়ে ঝগড়া-কলহ ঢের ভাল।

অপর্ণা স্থিরভাবে কহিল, ছি, ঝগড়া কেন করতে যাবে? তুমি ঘুমোও।

তাহার পর অপর্ণা ঘুমাইল কি জাগিয়া রহিল, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিয়াও অমরনাথ বুঝিতে পারিল না।

প্রত্যূষে উঠিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত দিন অপর্ণার কাজ-কর্ম্মে ও জপে-তপে কাটিয়া যায়। এতটুকু রঙ্গরস বা কৌতুকের মধ্যে সে প্রবেশ করে না, দেখিয়া তাহার সমবয়সীরা বিদ্রূপ করিয়া কত কি বলে, ননদেরা 'গোঁসাই ঠাকুর' বলিয়া পরিহাস করে, তথাপি সে দলে মিশিতে পারিল না, কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল, দিনগুলা মিছা কাটিয়া যাইতেছে। আর এই যে অলক্ষ্য আকর্ষণে তাহার প্রতি শোণিত-বিন্দু সেই পিতৃপ্রতিষ্ঠিত মন্দির-অভিমুখে ছুটিয়া যাইবার জন্য পূর্ণিমার উদ্বেলিত সিন্ধুবারির মত হৃদয়ের কূলে উপকূলে অহরহঃ আছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহার সংযম কিসে হইবে? ঘর-কন্নার কাজে, না ছোট-খাট হাস্য পরিহাসে? ক্ষুব্ধ অস্থির চিত্ত তাহার এই যে বিপুল ভ্রান্তি মাথায় করিয়া আপনা-আপনি পাক খাইয়া মরিতেছে, তাহার নিকট স্বামীর আদর ও স্নেহ, পরিজনবর্গের প্রীতি-সম্ভাষণ ঘেঁসিবে কি করিয়া? কি করিয়া সে বুঝিবে, কুমারীর দেবসেবা দ্বারা নারীত্বের কর্ত্তব্যের সবটুকু পরিসর পরিপূর্ণ করা যায় না।

৭

অমরনাথের বুঝিবার ভুল—সে উপহার লইয়া স্ত্রীর কাছে আসিয়াছে। বেলা তখন নটা-দশটা। স্নানান্তে অপর্ণা পূজা করিতে যাইতেছিল। গলার স্বর যতটা সম্ভব মধুর করিয়া অমরনাথ কহিল, অপর্ণা, তোমার জন্যে কিছু উপহার এনেচি দয়া করে নেবে কি?

অপর্ণা হাসিয়া বলিল, নেব বৈ কি।

অমরনাথ আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। আনন্দে সৌখীন রুমালে বাঁধা একটা বাক্সের ডালা খুলিতে বসিল। ডালার উপরে অপর্ণার নাম সোনার জলে লেখা। এখন একবার সে অপর্ণার মুখখানি দেখিবার জন্য তাহার মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু দেখিল, মানুষ কাচের নকল চোখ পরিয়া যেমন করিয়া চাহে তেমনি করিয়া অপর্ণা তাহার পানে চাহিয়া আছে। দেখিয়া তাহার সমস্ত উৎসাহ এক নিমিষে নিবিয়া গিয়া যেন অর্থহীন একফোঁটা শুষ্ক হাসির মাঝে আপনাকে লুকাইয়া ফেলিতে চাহিল। লজ্জায় মরিয়া গিয়াও সে বাক্সের ডালা খুলিয়া গোটা-কতক কুন্তলীনের শিশি, আরো কি-কি বাহির করিতে উদ্যত হইল, অপর্ণা বাধা দিয়া কহিল, এনেচ কি আমার জন্য?

অমরনাথের হইয়া আর কে যেন জবাব দিল, হাঁ, তোমারই জন্যই এনেচি দেলখোসগুলো –

অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল, বাক্সটাও কি আমাকে দিলে?

নিশ্চয়ই।

তবে আর কেন মিছে ও-সব বের করবে, বাক্সতেই থাক্‌।

তা থাক। তুমি ব্যবহার করবে ত?

অকস্মাৎ অপর্ণা ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। সমস্ত দুনিয়ার সহিত লড়াই করিয়া তাহার ক্ষত-বিক্ষত হৃদয় পরাস্ত হইয়া বৈরাগ্য গ্রহণপূর্ব্বক নিভৃতে চুপ করিয়া বসিয়াছিল, সহসা তাহার গায়ে এই স্নেহের অনুরোধ কুৎসিত বিদ্রূপের আঘাত করিল; চঞ্চল হইয়া সে তৎক্ষণাৎ প্রতিঘাত করিল; বলিল, নষ্ট হবে না, রেখে দাও। আমি ছাড়াও আরও অনেকে ব্যবহার করতে জানে। এবং উত্তরের জন্য অপেক্ষামাত্র না করিয়া অপর্ণা পূজার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। আর অমরনাথ,—বিহ্বলের মত সেই প্রত্যাখ্যাত উপহারের উপর হস্ত রাখিয়া সেই ভাবেই বসিয়া রহিল। প্রথমে সে সহস্রবার মনে মনে আপনাকে নির্ব্বোধ বলিয়া তিরস্কার করিল। বহুক্ষণ পরে সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, অপর্ণা পাষাণী। তাহার চোখ জলে ভাসিয়া আসিল - সেইখানে বসিয়া একভাবে ক্রমাগত চক্ষু মুছিতে লাগিল। অপর্ণা তাহাকে যদি সুস্পষ্ট ভাষায় প্রত্যাখ্যান করিত, তাহা হইলে কথাটা অন্যরূপ দাঁড়াইতে পারিত। সে যে প্রত্যাখ্যান না করিয়াও প্রত্যাখ্যানের সবটুকু জ্বালা তাহার গায়ে মাখাইয়া দিয়া গিয়াছে, ইহার প্রতিকার সে কি করিয়া করিবে? অপর্ণাকে তাহার পূজার আসন হইতে টানিয়া আনিয়া, তাহারই সম্মুখে তাহার উপেক্ষিত উপহারটা নিজেই লাথি মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিবে এবং সর্ব্বসমক্ষে ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিবে যে, সে তাহার মুখ আর দেখিবে না! সে কি করিবে, কত কি বলিবে, কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া চলিয়া যাইবে, হয়ত ছাই মাখিয়া সন্ন্যাসী হইবে, হয়ত অপর্ণার

কোন দারুণ দুর্দিনের দিনে অকস্মাৎ কোথাও হইতে আসিয়া তাহাকে রক্ষা করিবে। এমনি সম্ভব ও অসম্ভব কতরকম উত্তর প্রত্যুত্তর, বাদ-প্রতিবাদ তাহার অপমান-পীড়িত মস্তিষ্কের ভিতর অধিকতর আলোড়ন সৃষ্টি করিতে লাগিল। ফলে কিন্তু সে তেমনি বসিয়া রহিল, এবং তেমনি কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই তাহার এই আগাগোড়া বিশৃঙ্খল সঙ্কল্পের তালিকা সম্পূর্ণ হইয়া উঠিল না।

৮

তাহার পর দুই দিন দুই রাত্রি গত হইয়াছে, অমরনাথ ঘরে শুইতে আসে নাই। মা জানিতে পারিয়া বধূকে ঢাকিয়া ঈষৎ ভর্ৎসনা করিলেন, পুত্রকে ডাকিয়া বুঝাইয়া বলিলেন; দিদিশাশুড়ি এইসূত্রে একটু রঙ্গ করিয়া লইলেন। এমনি সাতে-পাঁচে ব্যাপারটা লঘু হইয়া গেল।

রাত্রে অপর্ণা স্বামীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাহিল, বলিল, যদি মনে কষ্ট দিয়ে থাকি ত আমাকে ক্ষমা কর।

অমরনাথ কথা কহিতে পারিল না। শয্যার এক প্রান্তে বসিয়া বিছানার চাদর বার বার টানিয়া পরিষ্কার করিতে লাগিল। সম্মুখেই অপর্ণা দাঁড়াইয়া, মুখে তাহার ম্লান হাসি; সে আবার কহিল, ক্ষমা করবে না?

অমরনাথ মুখ নীচু করিয়াই বলিল, ক্ষমা কিসের জন্য? ক্ষমা করবার অধিকারই বা আমার কি?

অপর্ণা স্বামীর দুই হাত আপনার হাতের ভিতর লইয়া বলিল, ও-কথা ব'লো না। তুমি স্বামী, তুমি রাগ করে থাকলে কি আমার চলে? তুমি ক্ষমা না করলে আমি দাঁড়াব কোথায়? কেন রাগ করেচ, বল।

অমরনাথ আর্দ্র হইয়া কহিল, রাগ ত করি নাই।

কর নাই ত?

না। অপর্ণা কলহ ভালবাসিত না; বিশ্বাস না করিয়াও বিশ্বাস করিল। কহিল, তাই ভাল। তাহার পর নিতান্ত নির্ভাবনায় বিছানার একপ্রান্তে শুইয়া পড়িল।

অমরনাথ কিন্তু ভারি আশ্চর্য্য হইয়া গেল। অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কেবলই সে মনে মনে তর্ক-বিতর্ক করিতে লাগিল যে, এ-কথা তাহার স্ত্রী বিশ্বাস করিল কি করিয়া! সে যে দু'দিন আসে নাই, দেখা করে নাই, তথাপি সে রাগ করে নাই—এটা কি বিশ্বাস করিবার কথা? এত কাণ্ড এত শীঘ্র মিটিয়া সব বৃথা হইয়া

গেল? তাহার পর যখন সে বুঝিতে পারিল অপর্ণা সত্যই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তখন সে একেবারে উঠিয়া বসিল; এ ং দ্বিধাশূন্য হইয়া জোর করিয়া ডাকিয়া ফেলিল, অপর্ণা, তুমি বুঝি ঘুমুচ্ছো? ও অপর্ণা!

অপর্ণা জাগিয়া উঠিল, বলিল, ডাকচ?

হ্যাঁ—কাল আমি কলকাতায় যাব।

কৈ, সে কথা ত আগে শুনি নাই! এত শীঘ্র তোমার কলেজের ছুটি ফুরোল? আর দু'দিন থাকতে পার না?

না; আর থাকা হয় না।

অপর্ণা একটু ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি আমার উপর রাগ করে যাচ্চ?

ইহা যে সত্য কথা অমরনাথ তাহা জানিত, কিন্তু সে-কথা সে স্বীকার করিতে পারিল না। সঙ্কোচ আসিয়া তাহার যেন কোঁচার খুঁট ধরিয়া টানিয়া ফিরাইল। আশঙ্কা হইল পাছে সে আপনার অপদার্থতা প্রতিপন্ন করিয়া অপর্ণার সম্ভ্রম হানি করিয়া বসে; এমনি করিয়া কৌতূহল-বিমুখ নারীর নিশ্চেষ্টতা তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। স্বামীত্বের যেটুকু তেজ সে তাহার স্বাভাবিক অধিকার হইতে গ্রহণ করিয়াছিল, সেটুকু এই চার-পাঁচ মাস ধরিয়া দিনে দিনে অপর্ণা আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে, এখন সে ক্রোধ প্রকাশ করিবে কোন সাহসে?

অপর্ণা আবার বলিল, রাগ করে কোথাও যেয়ো না। তা হ'লে আমার মনে বড় ব্যথা লাগবে।

অমরনাথ মিথ্যা ও সত্যে যাহা বানাইয়া বলিতে পারিল—তাহার অর্থ এই যে, সে রাগ করে নাই এবং তাহারই প্রমাণ-স্বরূপ সে আরো দুই দিন থাকিয়া যাইবে। থাকিলও তাই। কিন্তু কাঁদিয়া জয়ী হইবার একটা লজ্জাজনক অস্বস্তি লইয়া বাড়িতে থাকিল।

৯

ঝাড়া বৃষ্টির একটা সুবিধে আছে—তাহাতে আকাশ নির্ম্মল হয়। কিন্তু টিপি টিপি বৃষ্টিতে মেঘ কাটে না, শুধু পায়ের নীচে কাদা ও চতুর্দ্দিকে নিরানন্দময় ভাব বাড়িয়া উঠে। বাড়ি হইতে যে কাদা মাখিয়া অমরনাথ কলিকাতায় আসিল, তাহা ধুইয়া ফেলিবার একটুখানি জলও সেই বৃহৎ নগরীর ভিতর খুঁজিয়া পাইল না। এখানে তাহার পূর্ব্বপরিচিত যে সব সুখ ছিল, তাহাদের কাছে এই পঙ্কিল

পা দু-খানি বাহির করিতেও তাহার লজ্জা করিতে লাগিল। না লাগে লেখাপড়ায় মন, না পায় আমোদ-আহ্লাদে তৃপ্তি। এখানে থাকিতে ইচ্ছা করে না, বাড়ি যাইতেও প্রবৃত্ত নাই। সমস্ত বুকের উপর তাহার যেন দুর্ব্বহ যন্ত্রণাভার চাপানো রহিয়াছে, এবং তাহা ঠেলিয়া ফেলিবার জন্য ব্যাকুল বক্ষপঞ্জর পরস্পর ঠোকাঠুকি করিতেছে, কিন্তু বিফল চেষ্টা।

এমনি অন্তর্বেদনা লইয়া সে একদিন অসুখে পড়িল। সংবাদ পাইয়া পিতামাতা ছুটিয়া আসিলেন, কিন্তু অপর্ণাকে সঙ্গে আনিলেন না। অমরনাথও যে ঠিক এমনিটি আশা করিয়াছিল তাহা নয়, তবু দমিয়া গেল। অসুখ উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। এ-সময়ে স্বভাবতঃই তাহার অপর্ণাকে দেখিতে ইচ্ছা করিত, কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে কথা বলিতে পারিল না, পিতামাতাও তাহা বুঝিলেন না। কেবল ঔষধ-পথ্য আর ডাক্তার বৈদ্য! অবশেষে সে তাহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিল—অমরনাথ একদিন প্রাণত্যাগ করিল।

বিধবা হইয়া অপর্ণা স্তম্ভিত হইয়া গেল। সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়া একটা ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা তাহার মনে হইল, এ বুঝি তাহারই কামনার ফল! ইহাই বুঝি সে মনে মনে এতদিন চাহিতেছিল—অন্তর্যামী এতদিনে কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। বাহিরে শুনিতে পাইল যে, তাহার পিতা চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছেন। এ কি সব স্বপ্ন? তিনি আসিলেন কখন? অপর্ণা জানালা খুলিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল, সত্যসত্যই রাজনারায়ণবাবু বালকদের মত ধূলায় লুটিয়া কাঁদিতেছেন। পিতার দেখাদেখি সেও এবার ঘরের ভিতর লুটিয়া পড়িল; অশ্রু-প্রবাহ মাটি ভিজাইয়া ফেলিল।

সন্ধ্যা হইতে আর বিলম্ব নাই; পিতা আসিয়া অপর্ণাকে বুকে তুলিয়া বলিলেন, মা! অপর্ণা!

অপর্ণা কাঁদিয়া বলিল, বাবা!

তোর মদনমোহন যে তোকে মন্দিরে ডেকেচে মা!

চল বাবা, যাই।

তোর যে সেখানে সব পড়ে আছে মা!

চল বাবা, বাড়ি যাই।

চল মা, চল। পিতা স্নেহে মস্তক চুম্বন করিলেন, বুক দিয়া সর্ব্ব দুঃখ মুছিয়া লইলেন এবং তাহার পর কন্যার হাত ধরিয়া পরদিন বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া কহিলেন, ওই মা তোমার মন্দির। ওই তোমার মদনমোহন! নিরাভরণা অপর্ণার বৈধব্য-বেশে তাহাকে আর একরকম দেখিতে হইল। যেন এই সাদা বস্ত্র ও রুক্ষ কেশে তাহাকে অধিক মানাইল। সে তাহার পিতার কথা ভাবি

বিশ্বাস করিল, ভাবিল, দেবতার আহ্বানেই সে ফিরিয়া আসিয়াছে। ঠাকুরের মুখে যেন তাই হাসি, মন্দিরে যেন তাই শতগুণ সৌরভ। নিজে যেন সে এ পৃথিবীর অনেক উচ্চে এইরূপ মনে হইল।

যে স্বামী নিজের মরণ দিয়া তাহাকে পৃথিবীর এত উচ্চে রাখিয়া গিয়াছেন, সেই মৃত স্বামীর উদ্দেশ্যে শতবার প্রণাম করিয়া অপর্ণা তাহার অক্ষয় স্বর্গ কামনা করিল।

১০

শক্তিনাথ একমনে ঠাকুর গড়িতেছিল। পূজা করার চেয়ে ঠাকুর তৈরি করিতে সে অধিক ভালবাসিত। কেমন রূপ, কেমন নাক, কান, চোখ হইবে, কোন রং বেশি মানাইবে, এই তার আলোচ্য বিষয়। কি দিয়া তাঁহার পূজা করিতে হয়, কি মন্ত্রে জপ করিতে হয়, এসব ছোট বিষয়ে তাহার লক্ষ্য ছিল না। দেবতার সম্পর্কে সে আপনাকে আপনি প্রমোশন দিয়া সেবকের স্থান হইতে পিতার স্থানে উঠিয়া আসিয়াছিল, তবু তাহার পিতা তাহাকে আদেশ করিলেন, শক্তিনাথ, আজ আমার জ্বর বেড়েচে, জমিদার-বাটীতে গিয়ে তুমি পূজা করে এস।

শক্তিনাথ বলিল, এখন ঠাকুর গড়চি!

বৃদ্ধ অসমর্থ পিতা রাগ করিয়া বলিলেন, ছেলে-খেলা এখন থাক্ বাবা, কাজ সেরে এস।

পূজার মন্ত্র আবৃত্তি করিতে তাহার মোটে ইচ্ছা হইল না—তবু উঠিতে হইল। পিতার আদেশে স্নান করিয়া, চাদর গামছা কাঁধে ফেলিয়া দেবমন্দিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ইহার পূর্ব্বেও সে কয়েকবার এ-মন্দিরে পূজা করিতে আসিয়াছে, কিন্তু এমন কাণ্ড কখন দেখে নাই। এত পুষ্প-গন্ধ, এত ধূপ-ধূনার আড়ম্বর, ভোজ্য ও নৈবেদ্যের এত বাহুল্য। তার ভারি ভাবনা হইল, এত লইয়া সে কি করিবে? কিরূপে তাহার পূজা করিবে? সকলের চেয়ে সে অপর্ণাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এ কে, কোথা হইতে আসিয়াছে, এতদিন কোথায় ছিল?

অপর্ণা কহিল তুমি কি ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের ছেলে?

শক্তিনাথ বলিল, হ্যাঁ।

—তবে পা ধুয়ে পূজা করতে ব'স।

পূজা করিতে বসিয়া শক্তিনাথ আগাগোড়া ভুলিয়া গেল। একটা মন্ত্রও তাহার মনে পড়ে না। সেদিকে তাহার মনও নাই, বিশ্বাসও নাই—শুধু ভাবিতে লাগিল,

এ কে, কেন এত রূপ, কি জন্য বসিয়া আছে ইত্যাদি। পূজার পদ্ধতি ওলট-পালট হইতেই লাগিল। কখনো ঘণ্টা বাজাইয়া, কখনো ফুল ফেলিয়া, কখনো নৈবেদ্যের উপর জল ছিটাইয়া এই অজ্ঞ নূতন পুরোহিতটি যে পূজার কেবল ভান করিতেছে মাত্র, বিজ্ঞ পরীক্ষকের মত পিছনে বসিয়া অপর্ণা সব বুঝিল। চিরদিন দেখিয়া দেখিয়া এসব ভাল করিয়াই জানে, শক্তিনাথ তাহাকে ফাঁকি দিবে কি করিয়া? পূজাবসানে কঠিনস্বরে অপর্ণা কহিল, তুমি বামুনের ছেলে, অথচ পূজা করতে জান না!

শক্তিনাথ বলিল, জানি।

—ছাই জান।

শক্তিনাথ বিহ্বলের মত একবার তাহার মুখপানে চাহিল, তাহার পর চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। অপর্ণা ডাকিয়া ফিরাইয়া বলিল, ঠাকুর, এ সব বেঁধে নিয়ে যাও কিন্তু কাল আর এসো না। তোমার বাবা আরোগ্য হলে তিনি আসবেন। অপর্ণা নিজেই তাহার চাদর ও গামছায় সমস্ত বাঁধিয়া তাহাকে বিদায় করিল। মন্দিরের বাহিরে আসিয়া শক্তিনাথ বার বার শিহরিয়া উঠিল।

এদিকে অপর্ণা নূতন করিয়া পূজার আয়োজন করিয়া অন্য ব্রাহ্মণ ডাকিয়া পূজা শেষ করিল।

১১

একমাস গত হইয়াছে। আচার্য্য যদুনাথ জমিদার রাজনারাণবাবুকে বুঝাইয়া বলিতেছেন, আপনি ত সমস্তই জানেন, বড় মন্দিরে বৃহৎ পূজা ভট্টাচার্য্যের ছেলের দ্বারা কিছুতেই সম্পন্ন হইতে পারে না!

রাজনারায়ণবাবু সায় দিয়া বলিলেন, অনেকদিন হ'ল অপর্ণাও ঠিক এই কথাই বলেছিল!

আচার্য্য মুখমণ্ডল আরো গম্ভীর করিয়া বলিলেন, তা ত হবেই। তিনি হলেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা। তার কি কিছু অগোচর আছে। জমিদারবাবুরও ঠিক এই বিশ্বাস। আচার্য্য কহিতে লাগিলেন, পূজা আমিই করি আর যেই করুন ভাল লোক চাই। মধু ভট্টাচার্য্য যতদিন বেঁচেছিলেন তিনিই পূজা করেচেন, এখন তাঁর পুত্রেরই পৌরহিত্য করা উচিত, কিন্তু সেটা ত মানুষ নয়। কেবল পট আঁকতে পারে, পুতুল গড়তে জানে, পূজা অর্চ্চনার কিছুই জানে না।

রাজনারায়ণবাবু অনুমতি দিলেন, পূজা করবেন আপনি, তবে অপর্ণাকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখব।

পিতার নিকট এ-কথা শুনিয়া অপর্ণা মাথা নাড়িয়া বলিল, তাও কি হয়? বামুনের ছেলে, নিরাশ্রয়, কোথায় তাকে বিদায় করব? যেমন জানে তেমনই পূজা করবে। ঠাকুর তাতেই সন্তুষ্ট হবেন।

কন্যার কথায় পিতার চৈতন্য হইল—এতটা আমি ভেবে দেখি নাই। মা, তোমার মন্দির, তোমার পূজা, তোমার যা ইচ্ছা তাই ক'রো, যাকে ইচ্ছা ভার দিয়ো। এই কথা বলিয়া পিতা প্রস্থান করিলেন।

অপর্ণা শক্তিনাথকে ডাকিয়া আনিয়া পূজার ভার দিল। বকুনি খাইয়া অবধি সে আর এদিকে আসে নাই, মধ্যে তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, সে নিজেও রুগ্ন। শুষ্কমুখে তাহার শোক-দুঃখের চিহ্ন দেখিয়া অপর্ণার মায়া হইল, কহিল, তুমি পুজো ক'রো; যা জান তাই ক'রো, তাতেই ঠাকুর তৃপ্ত হবেন। এমন স্নেহের স্বর শুনিয়া তাহার সাহস হইল, সাবধান হইয়া মন দিয়া পূজা করিতে বসিল। পূজা শেষ হইলে অপর্ণা নিজের হাতে সে যাহা খাইতে পারে বাঁধিয়া দিয়া বলিল, বেশ পূজা করেচ। বামুনঠাকুর, তুমি কি হাতে রেঁধে খাও?

কোনদিন রাঁধি, কোনদিন—যেদিন জ্বর হয়, সেদিন আর রাঁধতে পারি না।

তোমার কি কেউ নাই?

না।

শক্তিনাথ চলিয়া গেলে অপর্ণা তাহার উদ্দেশ্যে বলিল, আহা! দেবতার কাছে যুক্ত করে তাহার হইয়া প্রার্থনা করিল, ঠাকুর, ইহার পূজায় তুমি সন্তুষ্ট হইয়ো, ছেলেমানুষের দোষ-অপরাধ লইও না। সেইদিন হইতে প্রতিদিন অপর্ণা দাসী দ্বারা সংবাদ লইত, সে কি খায়, কি করে, কি তাহার প্রয়োজন। নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণ-কুমারটিকে সে তাহার অজ্ঞাতসারে আশ্রয় দিয়া তাহার সমস্ত ভার স্বেচ্ছায় মাথায় তুলিয়া লইল। এবং সেইদিন হইতে এই কিশোর ও কিশোরী, তাহাদের ভক্তি-স্নেহ ভুল-ভ্রান্তি সব এক করিয়া এই মন্দিরটিকে আশ্রয়পূর্ব্বক জীবনের বাকী কাজগুলিকে পর করিয়া দিল। শক্তিনাথ পূজা করে, অপর্ণা দেখাইয়া দেয়। শক্তিনাথ স্তব পাঠ করে, অপর্ণা মনে মনে তাহার অর্থ দেবতাকে বুঝাইয়া দেয়। শক্তিনাথ গন্ধ-পুষ্প হাত দিয়া তুলিয়া লয়, অপর্ণা অঙ্গুলী দিয়া দেখাইয়া বলে, বামুনঠাকুর, আজ এমনি করে সিংহাসন সাজাও দেখি, বেশ দেখাবে। এমনি করিয়া এই বৃহৎ মন্দিরের বৃহৎ কাজ চলিতে লাগিল।

দেখিয়া শুনিয়া আচার্য্য কহিলেন, ছেলে-খেলা হচ্ছে।

বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বলিলেন, যা করে হোক মেয়েটা নিজের অবস্থা ভুলে থাকলেই বাঁচি।

১২

থিয়েটারের স্টেজে যেমন পাহাড়-পর্ব্বত, ঝড়-জল এক নিমেষে উড়িয়া গিয়া একটা মস্ত রাজপ্রাসাদ কোথা হইতে আসিয়া জোটে, আর লোকজনের সুখ-সম্পদের মাঝে দুঃখ-দৈন্যের সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত হয়, শক্তিনাথের জীবনেও যেন সেইরূপ হইয়াছে। সে জাগিয়াছে, এখন ঘুমাইয়া সুখস্বপ্ন দেখিতেছে, কিংবা নিদ্রায় দুঃখ-স্বপ্ন দেখিতেছিল, এখন হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়াছে, প্রথমে তাহার ভাল ঠাহর হইত না। তথাপি এই দায়িত্বহীন দেব-সেবার সুবর্ণ-শৃঙ্খল যে তাহার সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া ধরিয়াছে এবং থাকিয়া থাকিয়া ঝন্ ঝন্ শব্দে বাজিয়া উঠিতেছে, ঐ বিক্ষিপ্ত পুতুলগুলো মাঝে মাঝে সে কথা তাহাকে স্মরণ করাইত, সে মৃত পিতার কথা মনে করিত, নিজের পূর্ব্ব স্বাধীনতার কথা ভাবিত; মনে হইত সে যেন বিকাইয়া গিয়াছে, অপর্ণা তাহাকে কিনিয়াছে; অমনি অপর্ণার স্নেহ ক্রমে মোহের মত তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

অকস্মাৎ একদিন শক্তিনাথের মামাত ভাই আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার ভগিনীর বিবাহ। মামা কলিকাতায় থাকেন, সময় ভাল, কাজেই সুখের দিনে ভাগিনেয়কে মনে পড়িয়াছে। যাইতেই হইবে। কলিকাতা যাইবে—কথাটা শক্তিনাথের খুব ভাল লাগিল। সমস্ত রাত্রি সে দাদার নিকট বসিয়া কলিকাতার সুখের গল্প, শোভার কাহিনী, সমৃদ্ধির বিবরণ শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। পরদিন মন্দিরে যাইতে তাহার ইচ্ছা হইল না। বেলা বাড়িতেছে দেখিয়া অপর্ণা ডাকিয়া পাঠাইল; শক্তিনাথ গিয়া বলিল, আজ আমি কলকাতায় যাব—মামা ডেকে পাঠিয়েচেন—বলিয়াই সে একটু সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইল।

অপর্ণা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, পরে কহিল, কবে ফিরে আসবে?

শক্তিনাথ ভয়ে ভয়ে বলিল, মামা আসতে বললেই চলে আসব।

অপর্ণা আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। আবার সেই যদু আচার্য্য আসিয়া পূজা করিতে বসিলেন। আবার তেমনি করিয়া অপর্ণা পূজা দেখিতে লাগিল, কিন্তু কোন কথা বলিবার আর তাহার প্রয়োজন হইল না, ইচ্ছাও ছিল না।

কলিকাতায় আসিয়া বিবিধ বৈচিত্র্যে শক্তিনাথের বেশ দিন কাটিলেও কয়েক-দিন পরেই বাড়ির জন্য তাহার মন কেমন করিতে লাগিল। সুদীর্ঘ অলস দিনগুলো আর যেন কাটিতে চাহে না। রাত্রে সে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল, অপর্ণা যেন তাহাকে ক্রমাগত ডাকিতেছে, আর উত্তর না পাইয়া রাগ করিতেছে। একদিন সে মামাকে কহিল, আমি বাড়ি যাব।

মামা নিষেধ করিলেন—সে জঙ্গলে গিয়ে আর কি হবে? এইখান থেকে লেখাপড়া কর, আমি তোমার চাকরি করে দেবো।

শক্তিনাথ মাথা নাড়িয়া চুপ করিয়া রহিল।

মামা কহিলেন, তবে যাও।

বড়বৌ শক্তিনাথকে ডাকিয়া বলিলেন, ঠাকুরপো, কাল বুঝি বাড়ি যাবে?

শক্তিনাথ বলিল, হাঁ যাব।

—অপর্ণার জন্য মন কেমন করচে না কি?

শক্তিনাথ বলিল, হাঁ।

—সে তোমাকে খুব যত্ন করে, নয়?

শক্তিনাথ মাথা নাড়িয়া কহিল, খুব যত্ন করে।

বড়বৌ মুখ টিপিয়া হাসিলেন; তিনি অপর্ণার কথা পূর্ব্বেই শক্তিনাথের নিকট শুনিয়া লইয়াছিলেন, বলিলেন, তবে ঠাকুরপো, এই দুটি জিনিস নিয়ে যাও; তাকে দিয়ো, সে আরো ভালোবাসবে। বলিয়া তিনি একটা শিশির ছিপি খুলিয়া খানিকটা দেলখোস শক্তিনাথের গায়ে ছড়াইয়া দিলেন। গন্ধে শক্তিনাথ পুলকিত হইয়া শিশি দুইটি চাদরে বাঁধিয়া লইয়া পর দিন বাটী ফিরিয়া আসিল।

১৯

শক্তিনাথ মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে, পূজা শেষ হইয়াছে। চাদরে সেই শিশি দুইটি বাঁধা আছে - কিন্তু দিতে সাহস হইতেছে না; এই কয়দিনে অপর্ণা তাহার নিকট হইতে এতই দূরে সরিয়া গিয়াছে। মুখ ফুটিয়া কিছুতে বলিতে পারিল না—তোমার জন্য সাধ করিয়া কলিকাতা হইতে ইহা আনিয়াছি। সুগন্ধে তোমার দেবতা তৃপ্ত হন, তাই তুমিও হইবে। এই ভাবে সাত-আট দিন কাটিল; নিত্য সে চাদরে বাঁধিয়া শিশি দুইটি লইয়া আসে, নিত্য ফিরাইয়া লইয়া যায়, আবার যত্ন করিয়া পরদিনের জন্য তুলিয়া রাখে। পূর্ব্বের মত একদিনও যদি অপর্ণা তাহাকে ডাকিয়া একটা কথাও জিজ্ঞাসা করিত, তাহা হইলেও হয়ত সে তাহাকে তাহা দিয়া ফেলিত, কিন্তু এ সুযোগ আর কিছুতেই হইল না। আজ দুইদিন হইতে তাহার জ্বর হইতেছে, তবু ভয়ে ভয়ে সে মন্দিরে পূজা করিতে আসে। কি একটা অজানা সুযোগ আশঙ্কায় সে পীড়ার কথাও বলিতে পারে না। অপর্ণা কিন্তু সংবাদ লইয়া জানিত যে, দুই দিন হইতে শক্তিনাথ কিছুই খায় নাই, অথচ পূজা করিতে আসিতেছে।

অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর, তুমি দু'দিন হতে কিছু খাও নাই কেন?

শক্তিনাথ শুষ্কমুখে কহিল, আমার রাত্রে রোজ জ্বর হয়।

জ্বর হয়? তবে স্নান করে পূজা করতে এস কেন? এ-কথা বল নাই কেন?

শক্তিনাথের চোখে জল আসিল। মুহূর্তে সব কথা ভুলিয়া গিয়া সে চাদর খুলিয়া শিশি দুইটি বাহির করিয়া বলিল, তোমার জন্য এনেচি।

আমার জন্য?

হাঁ, তুমি গন্ধ ভালবাস না?

উষ্ণ দুধ যেমন একটুখানি আগুনের তাপ পাইবামাত্র টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিয়া উঠে, অপর্ণার সর্ব্বাঙ্গের রক্ত তেমনি করিয়া ফুটিয়া উঠিল—শিশি দুইটি দেখিয়াই সে চিনিয়াছিল; গম্ভীর স্বরে বলিল, দাও। হাতে লইয়া অপর্ণা মন্দিরের বাহিরে যেখানে পূজা করা ফুল শুকাইয়া পড়িয়াছিল, সেইখানে শিশি দুইটি নিক্ষেপ করিল। আতঙ্কে শক্তিনাথের বুকের রক্ত জমাট বাঁধিয়া গেল। কঠিন স্বরে অপর্ণা কহিল, বামুনঠাকুর, তোমার মনে এত! আর তুমি আমার সামনে এসো না, মন্দিরের ছায়াও মাড়িয়ো না! অপর্ণা চম্পকাঙ্গুলি দিয়া বহির্দ্দেশ দেখাইয়া বলিল, যাও—

আজ তিন দিন হইল শক্তিনাথ গিয়াছে। আবার যদু আচার্য্য পূজা করিতে বসিয়াছেন, আবার ম্লানমুখে অপর্ণা চাহিয়া দেখিতেছে, এ যেন কাহার পূজা কে আসিয়া শেষ করিতেছে। পূজা সাঙ্গ করিয়া নৈবেদ্যের রাশি গামছায় বাঁধিতে বাঁধিতে আচার্য্যমশায় নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, ছেলেটা বিনা চিকিৎসায় মারা গেল।

আচার্য্যের মুখপানে চাহিয়া অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল, কে মারা গেল?

তুমি বুঝি শোন নাই? কয়েকদিনের জ্বরে শক্তিনাথ, ঐ মধু ভট্টাচার্য্যের ছেলে, আজ সকালে মারা পড়েচে।

অপর্ণা তবুও তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। আচার্য্য দ্বারের বাহিরে আসিয়া বলিলেন, পাপের ফলে আজকাল মৃত্যু হচ্ছে—দেবতার সঙ্গে কি তামাসা চলে মা।

আচার্য্য চলিয়া গেলেন। অপর্ণা দ্বার রুদ্ধ করিয়া মাটিতে মাথা ঠুকিয়া কাঁদিতে লাগিল; সহস্রবার কাঁদিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল; ঠাকুর, এ কার পাপে?

বহুক্ষণ পরে সে উঠিয়া বসিল; চোখ মুছিয়া সে সেই শুষ্ক ফুলের ভিতর হইতে স্নেহের দান মাথায় করিয়া তুলিয়া লইল। মন্দিরের ভিতর আবার প্রবেশ করিয়া দেবতার পায়ের কাছে তাহা নামাইয়া দিয়া কাঁদিয়া কহিল, ঠাকুর, আমি যা নিতে পারি নাই—তা তুমি নাও। নিজের হাতে কখনও তোমার পূজা করি নাই, করচি—তুমি গ্রহণ কর, তৃপ্ত হও, আমার অন্য কামনা নাই।

অপ্রকাশিত রচনাবলী

মুসলিম সাহিত্য-সমাজ

মুসলিম সাহিত্য-সমাজের দশম বার্ষিক অধিবেশনে আমাকে আপনারা সভাপতি নির্ব্বাচন করেছেন। যদিও এর নাম দিয়েছেন মুসলিম সাহিত্য-সমাজ, তথাপি এই নির্ব্বাচনের মধ্যে একটি পরম ঔদার্য্য আছে। আমি হিন্দু অথবা মুসলমান সমাজের অন্তর্গত, আমি বহুদেবতাবাদী অথবা একেশ্বরবাদী এ প্রশ্ন আপনারা করেননি। শুধু ভেবেছেন—আমি বাঙ্গালী, বঙ্গ-সাহিত্যের সেবায় প্রাচীন হয়েছি। অতএব, সাহিত্যিক দরবারে আমারও একটি স্থান আছে। সেই স্থানটি অকুণ্ঠচিত্তে আমাকে দিয়েছেন। আমিও আনন্দে সকৃতজ্ঞ মনে সেই দান গ্রহণ করেছি। ভাবি সকল বিষয়েই আজ যদি এমনি হতে পারত! যে গুণী, যে মহৎ, যে বড়—সে হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, ক্রীশ্চান হোক, স্পৃশ্য অস্পৃশ্য যা-ই হোক, স্বচ্ছন্দে সবিনয়ে তাঁর যোগ্য আসন তাঁকে দিতে পারতাম। সংশয় দ্বিধা কোথাও কণ্টক রোপণ করতে পারতো না। কিন্তু যাক সে কথা। আমি পূর্ব্বে একটি পত্রে বলেছিলাম, সাহিত্যের তত্ত্ববিচার অনেক হয়ে গেছে। অনেক মনীষী, অনেক রসিক, অনেক অধিকারী বহুবার এর সীমানা এবং স্বরূপ নির্দ্দেশ করে দিয়েছেন, সে আলোচনা আর প্রবর্ত্তন করার আমার রুচি নেই। আমি বলি, সাহিত্য-সম্মিলন প্রবন্ধপাঠের জন্য নয়, সুতীক্ষ্ণ সমালোচনায় কাউকে ধরাশায়ী করার জন্য নয়, কে কত অক্ষম উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করার জন্য নয়, যে যা লিখেছে তার চেয়ে ভাল কেন লেখেনি, এ কৈফিয়ৎ আদায়ের জন্য নয়, এ শুধু সাহিত্যিক সাহিত্যিকে মিলনক্ষেত্র। এর আয়োজন একের সঙ্গে অপরের ভাববিনিময় ও সম্যক পরিচয়ের জন্য। আমার মনে পড়ে, বয়স যখন অল্প ছিল, এ ব্রতে যখন নূতন ব্রতী, তখন আমন্ত্রণ পেয়েও কত সাহিত্য-সভায় দ্বিধায় সঙ্কোচে উপস্থিত হতে পারিনি, নিশ্চিত জানতাম সভাপতির সুদীর্ঘ অভিভাষণের একটা অংশ আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট আছেই। কখনও নাম দিয়ে, কখনও না দিয়ে। বক্তব্য অতি সরল। আমার লেখায় দেশ দুর্নীতিতে পরিপূর্ণ হয়ে এলো এবং সনাতন হিন্দুসমাজ জাহান্নামে গেল বলে। যাবার আশঙ্কা ছিল, অসহিষ্ণু হয়ে যদি নজির দিয়ে আমি তার জবাব দিতাম। কিন্তু সে অপকর্ম্ম কোনদিন করিনি—ভাবতাম, আমার সাহিত্য-রচনা যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, একদিন না একদিন লোকে বুঝবেই। যাই হোক যে দুঃখ নিজে ভোগ করেছি, সে আর পরকে দিতে চাইনে

তবে অকপটে বলতে পারি, আমার অভিভাষণ শুনে সাহিত্যিক বিজ্ঞতা আপনাদের এক তিলও বাড়বে না এবং বাড়বেই না যখন জানি, তখন কতকগুলো বাহুল্য কথার অবতারণা করি কেন? এইখানেই শেষ করলেই ত হ'ত। হ'তনা তা নয়, তবে নিজেই না কি কথাটা একদিন তুলেছিলাম, তাই তারই সূত্র ধরে এই সম্মিলনে আরও গোটাকয়েক কথা বলবার লোভ হয়।

একদিন আমার কলকাতার বাড়িতে কাজী মোতাহার সাহেব এসে উপস্থিত। সাহিত্য-আলোচনা করতে তিনি যাননি, গিয়েছিলেন দাবা খেলতে,—এ দোষ আমাদের উভয়েরই আছে—অসুস্থ ছিলাম, খেলা হ'ল না, হ'ল বর্ত্তমান সাহিত্য-প্রসঙ্গে, দুটো আলোচনা। তারই মোটামুটি ভাবটা আমি কল্যাণীয়া জাহান্ আরার বার্ষিক পত্র 'বর্ষবাণী'তে চিঠির আকারে লিখে পাঠাই। এবং সেইটি 'অবাঞ্ছিত ব্যবধান' শিরোনামায় 'বুলবুল' মাসিকপত্রের সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ মুহম্মদ হবিবুল্লাহ সাহেব উদ্ধৃত করেছেন তাঁর আষাঢ়ের কাগজে। দেখলাম, তাঁর একটা জবাব দিয়েছেন শ্রীযুক্ত লীলাময় রায়, আর একটা দিয়েছেন ওয়াজেদ আলী সাহেব।

লীলাময়ের লেখার মধ্যে ক্ষোভ আছে, ক্রোধ আছে, নৈরাশ্য আছে। আমি বলেছিলাম, সাহিত্য-সাধনা যদি সত্য হয়, সেই সত্যের মধ্য দিয়েই ঐক্য একদিন আসবেই। কারণ, সাহিত্য-সেবকেরা পরস্পরের পরমাত্মীয়। হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, ক্রীশ্চান হোক, তবু পর নয়—আপনার জন। লীলাময় বলেছেন, "প্রতিকার যদি থাকে, তবে তা সাহিত্যে নয় ত—স্বাজাত্যে"। স্বাজাত্য শব্দটায় তিনি কি বলতে চেয়েছেন বুঝলাম না। বলেছেন "ঐক্য জিনিসটা organic; হাড়ের সঙ্গে মাংস জুড়লে যেমন মানুষ হয় না, তেমনি হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান জুড়লে বাঙালী হয় না, ভারতীয় হয় না।" পরে বলেছেন, "হিন্দু-মুসলমানে আপোষ ছাড়া আর কিছু করবার নেই? সুতরাং ব্যবধান থেকে যাবে, জাতীয়তাও হবে না, আত্মীয়তাও না।" এ-সব উক্তি ক্ষোভের প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু বলি, এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, পণ্ডিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও আজ যদি এই কথা বলতে থাকেন ত নৈরাশ্যে যে সমস্ত দিক কালো হয়ে উঠবে। এ কি এঁরা ভাবেন না? মনের তিক্ততা দিয়ে কোন মীমাংসাও হয় না, মিলনও ঘটে না। আবার এমনি হতাশা প্রকাশ পেয়েছে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন, "আজ যারা নূতন করে আমাদের দুই প্রতিবেশী সমাজের সম্বন্ধে বিচার করবেন, এ নিয়ে যে আশ্চর্য্য সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার বন্ধন কেটে কল্যাণের অভিসারী হবেন, দীর্ঘ তাঁদের পথ, কঠিন তাঁদের সাধনা।" আমি এই কথাটাই মানতে চাইনে। জোর করে প্রশ্ন করতে

চাই, কেন তাঁদের পথ দীর্ঘ হবে? কিসের জন্য সাধনা তাঁদের সুকঠিন হয়ে উঠবে? কেন একটি সহজ সুন্দর পথে এই সমস্যার সমাধান আমরা খুঁজে পাব না? ওয়াজেদ আলী সাহেব পরে বলেছেন, "যাদের মনে রইলো প্রবল বিরুদ্ধতা, অন্তরে রইলো গভীর অপ্রেম, চিত্তে রইলো দীর্ঘ ব্যবধান, তাদেরকে টেনে পাশাপাশি দাঁড় করানো হ'ল। তাতে শিষ্টাচারের তাগিদে হাতের সাথে হাত মিললো, তাদের দৃষ্টি-বিনিময় হল না; একজনের অন্তর রইলো আর একজনের অন্তর থেকে শত যোজন দূরে।" এর হেতু দেখাতে গিয়ে বলেছেন, "অচেনা মুসলিম এলো বিজয়ীর বেশে, অধিকার করলো রাজার আসন। আনুগত্য, রাজসম্মান সে পায়নি এমন নয়; কিন্তু ভারতবর্ষকে স্বদেশ স্বীকার করেও দেশ-মনের মিতালি তার ভাগ্যে হয়নি, এদের অপরিচয়ের যে ব্যবধান সেটি অবাঞ্ছিত হলেও কোনদিন ঘোচেনি।" কিন্তু এই কি সমস্ত সত্য? সত্য হলে এই অবাঞ্ছিত ব্যবধান ঘুচিয়ে মিতালী করতে ক'টা দিন লাগে? মনে হয় লীলাময় অনেক ব্যথার মধ্যে দিয়েই লিখেছেন, "যাঁরা বিদেশ থেকে এসেছেন ও আজও তা মনে রেখেছেন, যাঁরা জলের উপর তেলের মত থাকবেন বলে স্থির করেছেন আবহমান কাল, দেশের অতীত সম্বন্ধে যাঁদের অনুসন্ধিৎসা ও বর্ত্তমান সম্বন্ধে যাঁদের বেদনা-বোধ নেই, রাষ্ট্রের ভিতরে আর একটা রাষ্ট্র-রচনাই যাঁদের স্বপ্ন; আমরা তাঁদের কে, যে গায়ে পড়ে তাঁদের অপ্রিয় সত্য শোনাতে যাবো''?

এ-কথার এ অর্থ নয় যে, ব্যবধান আমরা ভালবাসি, মিতালী চাইনে, পরস্পরের আলোচনা-সমালোচনা পরিহার করাই আমাদের বিধেয়। এ উক্তির তাৎপর্য্য যে কি, সমস্ত সাহিত্য-রসিক বিদগ্ধ মুসলিম সমাজকেই আমি দিতে বলি। কলহ-বিবাদ, তর্ক-বিতর্ক, বাদ-বিতণ্ডা করে নয়। কোথায় ভ্রম, কোথায় অন্যায়, কোনখানে অবিচার লুকিয়ে আছে, সেই অকল্যাণকে সুস্থ সবল চিত্ত দিয়ে আবিষ্কার করে দিতে বলি, এবং বলি উভয় পক্ষকেই সবিনয়ে সশ্রদ্ধায় তাকে স্বীকার করে নিতে। তখন পরস্পরের স্নেহ, প্রেম, ক্ষমা আমরা পাবোই পাবো।

ওয়াজেদ আলী সাহেব একটি চমৎকার ভরসার কথা বলেছেন, সেটি হিন্দু-মুসলমান সকলেরই মনে রাখা উচিত। বলেছেন, "মুসলিম সাহিত্য-সেবক আরবী-ফারসী শব্দ বাংলা ভাষার অঙ্গে জুড়তে চাইছেন, এতে আপত্তি অতি তুচ্ছ কথা, কেন-না শুধু কলম চালিয়ে ওটি হতে পারে না; তার জন্যে চাই প্রচুর সাহিত্যিক শক্তি, চাই সৃষ্টিশীল প্রতিভা। এ দুটি যেখানে নেই সেখানে ভাষা-ভূষণ পরতে গিয়ে অতি সহজেই সং সাজতে পারে।"

পারেই ত। কিন্তু এ জ্ঞান আছে কার? যিনি যথার্থ সাহিত্য-রসিক, তাঁর। ভাষাকে যিনি ভালবাসেন, অকপটে সাহিত্যের সেবা করেন, তাঁর। তাঁকে ত আমার ভয় নেই। আমার ভয় শুধু তাঁদের যাঁদের সাহিত্য-সেবা না করেও সাহিত্যের মুরব্বি হয়ে বসেছেন। প্রিয় না হলেও একটা দৃষ্টান্ত দিই। 'মহেশ' নামে আমার লেখা একটা ছোট গল্প আছে, সেটি সাহিত্যপ্রিয় বহু লোকেরই প্রশংসা পেয়েছিল। একদিন শুনতে পেলাম গল্পটি Matric-এর পাঠ্য-পুস্তকে স্থান পেয়েছে; আবার একদিন কানে এলো সেটি না কি স্থানভ্রষ্ট হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে নিজের কোন যোগ নেই, ভাবলাম এমনিই হয়ত নিয়ম। কিছুদিন থাকে, আবার যায়। কিন্তু বহুদিন পরে এক সাহিত্যিক বন্ধুর মুখে কথায় কথায় তার আসল কারণ শুনতে পেলাম। আমার গল্পটিতে না-কি গো-হত্যা আছে। অহো! হিন্দু বালকের বুকে যে শূল বিদ্ধ হবে! বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বহু টাকা মাইনের কর্ত্তা-মশায় এ অনাচার সইবেন কি করে? তাই 'মহেশে'র স্থানে শুভাগমন করেছেন তাঁর স্বরচিত গল্প 'প্রেমের ঠাকুর'। আমার 'মহেশ' গল্পটা হয়ত কেউ কেউ পড়ে থাকবেন, আবার অনেকেই হয়ত পড়েননি। তাই শুধু বিষয়-বস্তুটা সংক্ষেপে বলি। একটি হিন্দুপ্রধান জমিদার-শাসিত ক্ষুদ্র গ্রামে গরীব চাষা গফুরের বাড়ি। বেচারীর থাকার মধ্যে, বহুজীর্ণ, বহুছিদ্রযুক্ত একখানি খড়ের ঘর, বছর-দশেকের মেয়ে আমিনা, আর একটি ষাড়। গফুর ভাল-বেসে তার নাম দিয়েছিল মহেশ। বাকী খাজনার দায়ে ছোট গাঁয়ের ততোধিক-ছোট জমিদার যখন তার ক্ষেতের ধান-খড় আটক করলে, তখন সে কেঁদে বললে হুজুর! আমার ধান তুমি নাও, বাপ-বেটিতে ভিক্ষে করে খাবো, কিন্তু খড় ক'টি দাও,—নইলে এ-দুর্দ্দিনে মহেশকে আমার বাঁচাবো কি করে? কিন্তু রোদন তার অরণ্যে রোদন হ'ল—কেউ দয়া করলে না। তার পরে শুরু হ'ল তার কত রকমের দুঃখ, কত রকমের উৎপীড়ন। মেয়ে জলের জন্যে বাইরে গেলে সেই জীর্ণ কুটীরের খড় ছিঁড়ে নিয়ে লুকিয়ে মহেশকে খাওয়াতো, মিছে করে বলতো, মা আমিনা, আজ আমার জ্বর হয়েছে, আমার ভাত ক'টি তুই মহেশকে দে। সারাদিন নিজে অভুক্ত থাকতো। ক্ষুধার জ্বালায় মহেশ অত্যাচার করলে এই দশ বছরের মেয়েটার কাছেও তার ভয় ও কুণ্ঠার অবধি থাকতো না। লোকে বলতো গরুটাকে তুই খাওয়াতে পারিসনে গফুর, ওকে বেচে দে। গফুর চোখের জল ফেলে আস্তে আস্তে তার পিঠে হাত বুলিয়ে বলতো, মহেশ তুই আমার ব্যাটা,—আমাকে তুই সাত সন প্রতিপালন করেছিস। খেতে না পেয়ে তুই কত রোগা হয়ে গেছিস,—তোকে কি আজ আমি পরের হাতে দিতে পারি বাবা! এমনি করে দিন যখন আর কাটতে চায় না তখন একদিন অকস্মাৎ এক বিষম কাণ্ড ঘটলো। সে গ্রামে জলও

সুলভ নয়। শুকনো পুকুরের নীচে গর্ত কেটে সামান্য একটুখানি পানীয় জল বহু দুঃখে মেলে। আমিনা দরিদ্র মুসলমানের মেয়ে, ছোঁয়া-ছুঁইর ভয়ে পুকুরের পাড়ে দূরে দাঁড়িয়ে প্রতিবেশী মেয়েদের কাছে চেয়ে-চিন্তে অনেক দুঃখে বিলম্বে তার কলসীটি পূর্ণ করে বাড়ি ফিরে এলো। এখন ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত মহেশ তাকে ফেলে দিয়ে কলসী ভেঙ্গে ফেলে এক নিশ্বাসে মাটি থেকে জল শুষে খেতে লাগলো। মেয়ে কেঁদে উঠলো। জ্বরগ্রস্ত, পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ গফুর ঘর থেকে বেরিয়ে এলো—এ দৃশ্য তার সইলো না। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যা সুমুখে পেলে—একখণ্ড কাঠ দিয়ে সবলে মহেশের মাথায় মেরে বসলো। অনশনে মৃতকল্প গরুটা বার-দুই হাত-পা ছুঁড়ে প্রাণত্যাগ করলে।

প্রতিবাসীরা এসে বললে, হিন্দুর গাঁয়ে গোহত্যা! জমিদার পাঠিয়েছেন তর্করত্নের কাছে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নিতে। এবার তোর ঘরদোর না বেচতে হয়। গফুর দুই হাঁটুর ওপর মুখ রেখে নিঃশব্দে বসে রইলো। মহেশের শোকে, অনুশোচনায় তার বুকের ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছিলো। অনেক রাতে গফুর মেয়েকে তুলে বললে, চল্ আমরা যাই।

মেয়ে দাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়েছিল, চোখ মুছে বলল, কোথায় বাবা? গফুর বললে পুলবেড়ের চটকলে কাজ করতে?

আমিনা আশ্চর্য্য হয়ে চেয়ে রইলে। ইতিপূর্ব্বে অনেক দুঃখেও তার বাবা চটকলে কাজ করতে রাজি হয়নি। বাবা বলতো, ওখানে ধর্ম্ম থাকে না, মেয়েদের আব্রু-ইজ্জত থাকে না—ওখানে কখন নয়। কিন্তু হঠাৎ এ কি কথা!

গফুর বললে, দেরি করিস্‌নে মা, চল্। অনেক পথ হাঁটতে হবে। আমিনা জল খাবার পাত্র এবং বাবার ভাত খাবার পিতলের বাসনটি সঙ্গে নিতেছিল, কিন্তু বাবা বারণ করে বললে, ওসব থাক্ মা, ওতে আমার মহেশের প্রাচিত্তির হবে।

তার পরে গল্পের উপসংহারে বইয়ে এইরূপ আছে—"অন্ধকার গভীর নিশীথে সে মেয়ের হাত ধরিয়া বাহির হইল। এ-গ্রামে আত্মীয় কেহ তাহার ছিল না; কাহাকেও বলিবার কিছু নাই। আঙ্গিনা পার হইয়া পথের ধারে সেই বাবলা-তলায় আসিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নক্ষত্রখচিত কালো আকাশে মুখ তুলিয়া বলিল, আল্লাহ্! আমাকে যত খুশি সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেছে। তার চরে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখেনি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয়নি, তার কসুর তুমি কখনো যেন মাফ্ করো না।"

এই হ'ল গোহত্যা! এই পড়ে হিন্দুর ছেলের বুকে শেল বিঁধবে। তার চেয়ে পড়ুক 'প্রেমের ঠাকুর'! তাতে ইহলোকে না হোক তাদের পরলোকে সদ্‌গতি হবে!

এই কান্তিমান সুপরিপুষ্ট প্রেমের ঠাকুরটিকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, মুসলমান সম্পাদিত কাগজে এই গল্পটির যে কড়া আলোচনা বেরিয়েছিল তার কি কোন হেতু নেই? একেবারে মিথ্যা অমূলক?

তাই আমার চেয়েও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিটিকে সসম্মানে নিবেদন করে রাখি যে, খুব বড় হলেও মনের মধ্যে একটুখানি বিনয় থাকা ভাল। ভাবা উচিত, তাঁর রচিত গল্পের সঙ্গে বাংলার ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচয় না ঘটলেও বিশেষ কোন লোকসান ছিল না। Text Book থেকে পয়সা পাইনে—ও ব্যবসা আমায় নয়—সুতরাং ক্ষতি-বৃদ্ধিও নেই—তবু ক্লেশ বোধ হয়। নিজের জন্য নয়,—অকারণে। শুধু সান্ত্বনা এই যে, অযোগ্যের হাতে ভার পড়লে এমনি দুর্দ্দশাই ঘটে। যে ব্যক্তি কোনদিন সাহিত্য-সাধনা করেনি সে কি করে বুঝবে কার মানে কি! শুনেছি না-কি আমার 'রামের সুমতি', গল্পের খানিকটা দিয়েছেন। অত্যন্ত দয়া,—বোধ করি আশা এর থেকে রামেদের সুমতি হবে। কিন্তু মুস্কিল এই যে, দেশে রহিমরাও আছে।

আর শুধু বিদ্যালয়ই নয়, মহেশের ভাগ্যে অন্য দুর্ঘটনাও ঘটেছে। তার বিস্তারিত বিবরণ দিতে চাইনে, কিন্তু নিঃসংশয়ে জানি, এক হিন্দু জমিদার রক্তচক্ষু হয়ে শাসিয়ে বলেছিলেন, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সাহায্যে ছাপা মাসিক বা সাপ্তাহিকে এ-ধরণের গল্প যেন আর ছাপা না হয়। এতে জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজা ক্ষেপিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ দেশের সর্ব্বনাশ হয়।

যাক নিজের কথা।

উপরি-উক্ত হিন্দু মুরুব্বির মত আবার মুসলমান মুরুব্বিও আছে। শুনেছি, তাঁরা না কি আদেশ করেন ইতিহাস ফরমায়েশ মত লিখতে। ইসলাম-ধর্ম্মী কোন ব্যক্তি কোথাও অন্যায় অবিচার করেছেন এর লেশমাত্রও যেন কোন পড়ার বইয়ে না থাকে। এখানেও সান্ত্বনা এই যে, এদের কেউ কখনো কোনকালে সাহিত্য-সেবা করেননি। করলে এমন কথা মুখে আনতে পারতেন না। সত্যিকার সাহিত্যিকদের হাতে যদি এই ভার পড়ে, আমার বিশ্বাস, না-হিন্দু না মুসলিম কোন পক্ষ থেকেই বিন্দুমাত্র অভিযোগ শোনা যাবে না। ভাষার প্রতি, সাহিত্যের প্রতি সত্যিকার দরদ তাঁদের সত্য পথেই পরিচালিত করবে।

ওয়াজেদ আলী সাহেব এক স্থানে বলেছেন, "মুসলিমের এই নবস্ফূর্ত্ত আত্মপ্রকাশ, ইসলামী কৃষ্টির এই বলিষ্ঠ জাগরণ সাহিত্যক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের মত শক্তিমান প্রতিভার মনোযোগ আকর্ষণ করলো, হয়ত দেশের অনাগত কল্যাণের এ এক শুভ ইঙ্গিত। কিন্তু তবু কেন মন সন্দেহ-অবিশ্বাসে দ্বিধা-জিজ্ঞাসায় দুলে ওঠে? 'বুলবুলে' প্রকাশিত তাঁর পত্রখানিতে যেন চোখে পড়ে, মুসলিমের প্রতি তাঁর সহানুভূতির অভাব, ভাল বাসার অভাব এবং মোটামুটি একটা অন্তর্দৃষ্টির অভাব।"

মুসলিম সাহিত্য-সমাজ

আমার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে, মুসলিমের এই 'নবস্ফূর্ত্তি আত্মপ্রকাশ', ইসলামী কৃষ্টির এই 'বলিষ্ঠ জাগরণ,' যাঁরা নবীন, উদার বাংলা ভাষাকে যাঁরা অকুণ্ঠিত মনে মাতৃভাষা বলে স্বীকার করেন তাঁদের—না, যাঁরা পুরাতনপন্থী তাঁদের? আমার অভিমত এই যে, যাঁরা প্রাচীনপন্থী, যাঁরা পিছনে ছাড়া সুমুখে চাইতে জানেন না, তাঁদের জাগরণ কি মুসলিম কি হিন্দু সকল সমাজেরই বিঘ্নস্বরূপ। হিন্দুদের সম্বন্ধে এ-কথা আমি বহুবার বহুস্থানে লিখেছি, মুসলিম-সমাজের সম্বন্ধেও অসংশয়ে বলতে পারি, এ জাগরণ হয় যদি নবীনের—আসুক সে শ্রাবণের পূর্ণিমা জোয়ারের মত সমস্ত ভাসিয়ে দিয়ে, তবু তাকে আমি দু-হাত তুলে সম্বর্দ্ধনা করে নেবো। জানবো, এদের হাতে সমস্তই হবে শুভ এবং সুন্দর,—এদের হাতে হিন্দু-মুসলিম কারও ভয় নেই—এদের হাতে আমরা দু'জনেই হবো নিরাপদ। আমার আশঙ্কা শুধু প্রাচীন-পন্থীদের সম্বন্ধে।

তিনি পরে বলেছেন, "শরৎচন্দ্রের মত সাহিত্যিকদের সম্প্রদায়, জাতি এক ছাড়া দুই নয়। এ-কথা সহজেই আমাদের স্বীকৃতি দাবী করতে পারে। কিন্তু আরও একটি সহজ কথার দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। সেটি এই যে, সাহিত্য মানুষের মনের সৃষ্টি, এবং মানুষের মনকে তৈরী করে তার ধর্ম্ম, তার সমাজ, তার পরিবেশ, তার কৃষ্টি। এদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা কি সামান্য ব্যাপার? এবং সাধারণতঃ সেটি কি সম্পূর্ণরূপে সম্ভব?"

এই কথাগুলি শুধু আংশিক সত্য—সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ, এইটুকু মোটামুটি জেনে রাখা দরকার যে, মানুষ যখন সাহিত্যরচনায় নিবিষ্টচিত্ত সে ঠিক হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়। তখন সে তার সর্ব্বজনপরিচিত,'আমি'টাকে বহু দূরে অতিক্রম করে যায়, নইলে তার সাহিত্য-সাধনা ব্যর্থ হয়। এই জন্যেই যেখানে কিছুই এক নয়, বাহ্যতঃ কিছুই মেলে না, সেখানেও ম্যাক্সিম গর্কির মত সাহিত্য-সেবকেরা আমাদের বুকের মধ্যে অনেকখানি আত্মীয়ের আসন জুড়ে বসে থাকেন। এই কথাটি আমি সকল সাহিত্যিককেই মনে রাখতে বলি। কে কোথায় তার অসতর্ক মুহূর্ত্তে কি কথা বলেছে, সেইটিই তার জীবনের পরম সত্য নয়। কেবল তাই দিয়েই বিচার করা চলে না। এবং এই জন্যই ওয়াজেদ আলী সাহেব তাঁর প্রবন্ধে আমার সম্বন্ধে যে-সব কঠিন উক্তি করেছেন আমি তার জবাব দিতে বসবো না। রাগ যখন পড়বে, তখন আপনিই মনে হবে আমি সত্যি কথাই বলেছিলাম। ওয়াজেদ আলী সাহেব সবচেয়ে মর্ম্মান্তিক কথা বলেছেন এইখানে, "বস্তুতঃ, দুইটি বিষম অনাত্মীয় কৃষ্টির সংঘর্ষের ফলে এই বিক্ষোভ। এর জন্য আক্ষেপ বৃথা। হিন্দু মুসলিমকে বোঝে না, এজন্যে দুঃখের বিলাপ আজ চারিদিকে ধ্বনিত হচ্ছে। কিন্তু এমন হতে পারে যে, তার ভারতীয় ধর্ম্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি আর মনকে করেছে অপরিসর, দৃষ্টিকে করেছে

আচ্ছন্ন। আপনার পরিধিকে অতিক্রম করে গতি তার নিশ্চল। আপনার আভিজাত্যের গর্ব্বে যে চিরবিলীন, পরাজয়ের প্রাচীন অভিমান যার আজও দুর্জ্জয়' বিনা-যুদ্ধে সূচ্যগ্র-পরিমিত স্থান দান করতেও যার আপত্তি অন্তহীন, তার বুদ্ধিকে মুক্ত বলা কঠিন। অথচ, মুক্তি যার নেই সেই চলে না, চলতে পারে না, সে জড়। এই আত্মকেন্দ্রীপর বিমুখ জড়বুদ্ধির পরিবেশ এ দেশের মুসলিমকে 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' করে রেখেছে, ভারতের মাটির রসে রসায়িত হয়েও তার মন যেন ভিজছে না।"

এই যে বলেছেন দুইটি বিষম অনাত্মীয় কৃষ্টির ফলে এই বিক্ষোভ, এর জন্য আক্ষেপ বৃথা। আমরা উভয়ে উভয়ের প্রতিবেশী, আমাদের আকাশ বাতাস মাটি জল এক! মাতৃভাষা এক বলেই স্বীকার করি। তবু সংঘর্ষ এত বড় কঠোর যে, তার জন্যে আক্ষেপ পর্য্যন্ত করা বৃথা—এই মনোভাবই যদি সমস্ত হিন্দু-মুসলমানের সত্য হয় ত এই কথাই বলবো যে, এর চেয়ে বড় দুর্গতি মানুষের আর ঘটতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধিও কি জড়বুদ্ধি? মন তার মুক্ত হয়নি? এ যদি সত্য তবে ওয়াজেদ আলী সাহেবের এ ভাষা এল কোথা থেকে? সহজ, সুন্দর ও অবলীলায় আপন মনোভাব প্রকাশ করার শক্তি তাকে কে দিলে? এ-যুগে এমন লেখক, এমন সাহিত্য-সেবক কে আছে যে, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণী নয়? সাহিত্য ধর্ম্ম-পুস্তকও নয়, নীতিশিক্ষার বইও নয়, অথচ, আপন বিশাল পরিধির মধ্যে আপন মাধুর্য্যে সে সব-কিছুকেই আপন করে রেখেছে। তাই সাহিত্য কি, রসবস্তু কি, আজও কেউ তার সত্য নির্দ্দেশ পেলে না। কত তর্ক, কত মতভেদ। এই অবাঞ্ছিত ব্যবধান সম্বন্ধে মীজানুর রহমান সাহেব জ্যৈষ্ঠের "বুলবুল" মাসিকপত্রে তাঁর প্রবন্ধের এক স্থানে অকরুণ হয়ে বলেছেন, "শরৎবাবু তাঁর রাশীকৃত উপন্যাসের ভিতরে স্থানে স্থানে মুসলমান-সমাজের যে সব ছবি এঁকেছেন তা মুসলমান-সমাজের খুব উঁচু-দরের লোকের নয়!" কিন্তু জিজ্ঞাসা করি; উঁচু-নীচু স্তরের পাত্র-পাত্রীর উপরেই কি উপন্যাসের উচ্চতা-নীচতা, ভাল-মন্দ নির্ভর করে? এ যদি তাঁর অভিমত হয়, তবে আমার সঙ্গে তাঁর মতের ঐক্য হবে না। না হোক, কিন্তু উপসংহারে যে বলেছেন, "হিন্দু-সমাজের বিবিধ গলদ ও সমস্যা নিয়ে শরৎচন্দ্র যে-সকল গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন এবং প্রতিকারের উদ্দেশ্যে তাঁহার সমাজকে যে চাবুক কশেছেন, সদিচ্ছাপ্রণোদিত এমনধারা নির্ম্মম কশাঘাতও মুসলিম-সমাজ অম্লান বদনে গ্রহণ করবে তা জোর করে বলতে পারি। বাঙ্গলার কথাসাহিত্য-সম্রাটকে একবার পরীক্ষা করে দেখতে অনুরোধ করি।"

সেদিন জগন্নাথ-হলে আমার অভিনন্দনের প্রতিভাষণে এ-কথার উত্তর দিয়েছি। অন্তরের শুভ-কামনাকে এঁরা কেমন করে গ্রহণ করেন, এ-দুনিয়া থেকে বিদায়

নেবার পূর্ব্বে আমি দেখে যাবো। সে যাই হোক, মানুষে শুধু ইচ্ছা প্রকাশ করতেই পারে, কিন্তু তার পরিপূর্ণতার ভার থাকে আর একজনের 'পরে, যিনি বাক্য ও মনের অগোচর। সেদিন খেতে বসে His Exc llency আমাকে এই প্রশ্ন করেছিলেন। আমি উত্তর দিয়াছিলাম আমার সঙ্কল্প কাজে পরিণত করতে—চাই উভয় সমাজের আশীর্ব্বাদ.। ঠিক সমাজ নয়,—চাই উভয় সমাজের সাহিত্য-সেবকদের আশীর্ব্বাদ। যে ভাষার যে সাহিত্যের এতকাল সেবা করেছি, তার 'পরে অকারণ অনাচার আমার সয় না। আমার একান্ত মনের বিশ্বাস, আমার মত সাহিত্যের যথার্থ সাধনা যাঁরা করেছেন, তাঁরা হিন্দু-মুসলিম যাই হোন, কারোও এ অনাচার সইবে না। সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের জন্য পরিবর্ত্তন যদি কিছু কিছু প্রয়োজন হয়—এমন ত কতবার হয়েছে—সে কাজ ধীরে ধীরে এঁরাই করবেন। আর কেউ নয়। সে হিন্দুয়ানির কল্যাণেও নয়, মুসলমানির কল্যাণেও নয়,—শুধু মাতৃভাষা ও সাহিত্যের কল্যাণে। এই আমার মোট আবেদন।

কোথায় কোন লেখায় মুসলিম-সমাজের প্রতি অবিচার করেছি,—করিনি বলেই আমার ধারণা—তার চুল-চেরা বাদ-প্রতিবাদ প্রতিকারের পথ নয়, সে কলহ-বিবাদের নতুন রাস্তা তৈরী করা।

'বুলবুল' কাগজখানির নানাস্থান থেকে আমি উদ্ধৃতি করেছি প্রয়োজনবোধে। এই পত্রিকার অবিচ্ছিন্ন উন্নতি কামনা করি, কারণ যতটুকু পড়েছি তাতে সাহিত্যের উন্নতি এঁদের কাম্য, আমারও তাই। হয়ত কোথাও একটু কটূক্তি করে থাকবেন কিন্তু সে মনে করে রাখবার বস্তু নয়, ভুলে যাবার জিনিস।

কিন্তু আর নয়। বলবার বিষয় এখনও অনেক ছিল, কিন্তু আপনাদের ধৈর্য্যের প্রতি সত্যিই অত্যাচার করেছি। সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। এ অভিভাষণে পাণ্ডিত্য নেই, কারুকার্য্য নেই, বলার কথাগুলো কেবল সোজা করে বলে গেছি, যেন তাৎপর্য্য বুঝতে কারও ক্লেশ বোধ না হয়। শোনার পরে কেউ না বলেন—যেমন অতুলনীয় শব্দসম্পদ, তেমনি কারুকার্য্য—কিন্তু ঠিক কি যে বলা হ'ল ভাল বোঝা গেল না।

বাঙ্গলা সাহিত্যের সেবা করে মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা আমার অপরিসীম, তবু তাঁদের নামোল্লেখ করতে আমি বিরত রইলাম।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা-নিবেদনের একটা রীতি আছে। যেমন আছে আরম্ভ করার সময় বিনয় প্রকাশের প্রথা। প্রথমটা করিনি। কারণ, সাহিত্যসভায় সভাপতির কাজ এত বেশি করতে হয়েছে যে, এই ষাট বছর বয়সে নিজেকে অনুপযুক্ত, বেকুব ইত্যাদি যত প্রকারের বিনয়সূচক বিশ্লেষণ আছে নিজের নামের সঙ্গে সংযোগ

করে দিলে ঠিক শোভন হবে মনে হ'ল না। কিন্তু কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের বেলায় তা নয়। সমস্ত বিদগ্ধ মুসলিম-সমাজের কাছে আজ আমি অকপটে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। আপনারা আমার সালাম গ্রহণ করুন। বলার দোষে যদি কাউকে বেদনা দিয়ে থাকি সে আমার ভাষার ত্রুটি, আমার অন্তরের অপরাধ নয়।

—ঢাকা, ১৫ ই শ্রাবণ, ১৩৪৩।

—'বিচিত্রা,' ভাদ্র, ১৩৪৩।

মুসলমান সাহিত্য

লাটসাহেব বললেন, মুসলমানদের নিয়ে গল্প লিখবে। এ-কাজ যদি করতে পার তা হলে অত্যন্ত ভাল হয়। সাহিত্য নিয়ে আমি কোনদিন ছেলেখেলা করিনি। —অন্য ব্যাপারে হয়ত কথা রাখতে পারি। ১৯১৬ সালে চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে আসি; স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বাঁড়ুয্যের সঙ্গে দেখা, বললেন, তুই নাকি লিখিস্? আমায় দিস্ ত দু-একখানা বই। আমি বললাম, ও কিছুই নয়। তিনি বললেন, ছাখ্, তোকে যদি কেউ আক্রমণ করে তা হলে আমায় বলে দিবি। ছাখ্, কাগজ চালাতে গিয়ে যাদের গালাগালি দেওয়া উচিত নয়, তাদেরও গালাগালি দিতে হয়েছে। তুই ত আমার কাছে পড়েছিস্—যা নিজের জীবনে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে সত্যি হয়ে উঠবে—অবশ্যি কল্পনা থাকবে, তাই হবে সাহিত্যবস্তু। নিজের আয়কে অতিক্রম করে ব্যয় করতে যেয়ো না।

আমি বললাম, আশীর্ব্বাদ করুন।

তিনি বলিলেন, আশীর্ব্বাদ নয়, এই আমার আদেশ।

লোকে বলতে পারে পাঁচকড়ি বাঁড়ুয্যে লোক ভাল ছিলেন। কিন্তু তিনি এমন সমালোচনা করেছিলেন যা হয়ত তাঁর ইচ্ছে ছিল না।

ঐ দুটো কথা—কখনো আয়কে অতিক্রম করে চ'লো না, আর নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখবে। সাহিত্য সত্যও নয়, পুলিশ রিপোর্টও নয়। প্রথম যখন লোকে বলেছে, ঐ সব অস্বাভাবিক, হয় না,—৩৫।৩৬ বছর বয়সে প্রথম 'চরিত্রহীন'-সমালোচনা দেখে বুঝলাম প্রত্যেক পাঠক আমার চেয়ে বুদ্ধিমান। আর আমি ওটা কতবার দেখেছি, আর তোমরা একবার পড়েই সমালোচনা করলে।

আমায় যে লোকে ভালবাসল তার প্রধান কারণই হচ্ছে এই, লোকের অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমার কথাগুলো মেলে। মানুষ সত্যি ছোট নয়। এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার দরুন অনেক কথা জানতে পেরেছিলাম, যেটা বাইরে থেকে জানা যায় না।

এক সময়ে মুসলমান-সমাজ পিছিয়ে পড়েছিল, গভর্ণমেণ্টই একরকম দাবিয়ে দিয়েছিল। Communal Award নিয়ে আলোচনা করবার জন্য ডাকা হয়েছিল। এক ভদ্রলোক বলেছিলেন, Why are you afraid of this Muhamadan people? Without Hindu's help they can't go on, they have to take it. এখন ওরা গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে নিজেদের কথাটা বুঝেছে।

আমার বিশ্বাস, সাহিত্যের মধ্য দিয়ে রাশিয়ার গর্কি প্রভৃতিকে ভাল লাগে—তাদের সঙ্গে আমাদের কোন মিল নাই, তবু তাঁদের appreciate করি। মুসলিম সাহিত্য-সমাজ আমি নিজে একটা গড়ব। এ-ছাড়া আমাদের সত্যি পথ নেই—আমি মুসলমানদের ঐ কথাটা অনেকবার বলেছি।

মুসলমান ছেলেরা আমার কাছে একখানা বই রাখলে, উপরে লেখা—"শ্যালক বঙ্কিমের গ্রন্থাবলী।"

বললাম, অপমান করবার জন্যেই কি এসেছ? একজন মৃত ব্যক্তিকে অপমান করা ঠিক নয়। বঙ্কিমবাবু অনেক জায়গায় অকারণ মুসলমানদের আক্রমণ করেছেন। তখন ওরা ছিল অত্যন্ত নির্জ্জীব। কিন্তু সমস্ত action-এরই reaction আছে।

'বঙ্কিম-দুহিতা' বলে একখানা বই—অনেক নোংরা কথা তাতে আছে, এগুলো হতে বাধ্য। জাহানারা একদিন বললে, একটা লেখা দিতে হবে। আমার 'বর্ষবাণী' বেরুচ্ছে। তার আগে এখানের কাজী মোতাহার হোসেন বললেন, আপনার কি আমাদের একঘরে করে রেখে দেবেন? রবীন্দ্রনাথ বললেন, আমার উপরে এদের অনেকগুলি চিঠি এসেছে। আমায় চিঠি দিয়েছে ঔরঙ্গজেব সম্বন্ধে কি কতকগুলি তুলে দিতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ভয়ানক ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, ও-সবের ভেতর আর আমি যেতে চাই না। ভোলানাথ যখন মারা গেল তার অপরাধটা কি? আক্রাম খাঁর ছেলেই কাগজ চালায়। তাদের spirit-এর একটা দৃষ্টান্ত দিই। নরেন দেবের কাছে লেখা চলে গেছে, বলে, "বাংলা থোড়া বহুৎ সমঝ্‌তে হেঁ, বোলনে নেই সাকৃতে।"

আমাদের আশঙ্কা ওরা প্রথমে বাংলাটাকে নষ্ট করবে। ওরা যখন বাংলাকে মাতৃভাষা বলে স্বীকার করে না।*—বাতায়ন, ১৯ ভাদ্র, ১৩৪৩।

*১৯৩৬ সনের ৩১শে জুলাই তারিখে ঢাকা রূপলাল হাউসে 'শান্তি' পত্রিকার পক্ষ হইতে অনুষ্ঠিত সম্মিলনে প্রদত্ত বক্তৃতা।

কানকাটা

গত ফাল্গুনের (১৩১৯) 'সাহিত্যে' শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রবাবুর 'কানকাটা' ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণীত হইয়াছে। তথ্যটি সত্য কিংবা অসত্য আলোচিত হইবার পূর্ব্বে একটা সন্দেহ স্বতঃই মনে উঠে, ঠাকুরমশাই প্রবন্ধটি হাসাইবার অভিপ্রায়ে লেখেন নাই ত? কেন না, ইহা সত্যসত্যই সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা এবং যথার্থই সত্য, তাহা মনে করিলেও দুঃখ হয়। তবে যদি হাসাইবার অভিপ্রায়ে লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রবন্ধটি নিশ্চয়ই সার্থক হইয়াছে। কিন্তু, আর কোন উদ্দেশ্য থাকিলে বোধ করি ব্যর্থ হইয়াছে এবং হওয়াই মঙ্গল। যাহা হউক, উক্ত প্রবন্ধে ঠাকুরমশাই বলিয়াছেন, "কানকাটা, কন্দকাটা, বা উড়িষ্যার খোন্দ জাতিরা বাইবেল-কথিত কানানাইট জাতি ভিন্ন আর কিছুই নয়।" এই 'কিছুই নয়'টি প্রমাণ করিবার জন্য তিনি এই উভয় জাতির মধ্যে অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন এবং জাতিতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। আমার এক আত্মীয় সেদিন বলিতেছিল, আজকাল বাঙ্গলাদেশে ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বর লেখক সবাই। কেবল ঝগড়া করিতে চায়— রামের আঁতুড়-ঘর পশ্চিমমুখো, কিংবা পূর্ব্বমুখো ছিল। কথাটা তাঁহার নিতান্ত মিথ্যা নয় দেখিতেছি।

কিন্তু জাতিতত্ত্ব জিনিসটি শুধু যদি খেলনার জিনিস হইত, কিংবা সখ করিয়া খান-দুই এ-ও-তা বই নাড়াচাড়া করিলেই ইহাতে ব্যুৎপত্তি জন্মিত, তাহা হইলে আমার এ প্রতিবাদের আবশ্যকতা ছিল না। কিন্তু তাহা নহে। সত্য-উদ্ঘাটন —চুটকি গল্প লেখা নহে। অতএব, জাতিতত্ত্ববিৎ বলিয়া প্রবন্ধ লিখিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিবার পূর্ব্বে কিছু 'সলিড' পরিশ্রমের আবশ্যক। সুতরাং, যে দুর্ভাগারা অনেকদিন ধরিয়া গায়ের অনেক রক্ত জল করিয়া নীরস বইগুলি ঘাটিয়া মরিয়াছে, এ ভার তাহাদের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত-মনে সরস কবিতা এবং রসাল সাহিত্যিক প্রবন্ধে বা গল্পে মনোনিবেশ করাই বুদ্ধির কাজ। খান দুই বই ভাসা ভাসা রকম দেখিয়া-লইয়া এবং গোটা দুই সাদৃশ্য উপরে উপরে মিলাইয়া দিয়া একটা অভিনব সত্য প্রচার করিতে পারা সাহসের পরিচয় সন্দেহ নাই; কিন্তু এ-সাহসে কাজ হয় না, শুধু অকাজ বাড়ে। যেমন, তাঁহার দেখা-দেখি আমার অকাজ বাড়িয়া গিয়াছে এবং যে হতভাগ্যেরা এগুলো পড়িবে, তাহাদের ত কথাই নাই। অবশ্য, পুরুষমানুষের সাহস

থাকা ভাল, কিন্তু একটু কম থাকাও আবার ভাল। যা হউক, কথাটা এই।—ঠাকুরমশাই উড়িষ্যার (কলিঙ্গ) খোন্দ এবং বাইবেলের কানানাইটের মধ্যে গুটি পাঁচ-ছয় মিল দেখিয়াই উভয়কেই সহোদর ভাই বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কিন্তু গরমিলের ধার দিয়াও যান নাই। অবশ্য গরমিল দেখিতে যাইবার অসুবিধা আছে বটে, এবং এই অসুবিধা ভোগ না করিয়াও যা হউক একটা কিছু লেখা যায় সত্য, কিন্তু তাহাকে সত্য আবিষ্কার বলে না। যাহা বলে যাহা পিকউইক পেপারের আরম্ভটা। তা ছাড়া, শুধু সাদৃশ্য দেখিয়াই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে কত বিপজ্জনক তাহার একটা সামান্য দৃষ্টান্ত দিতেছি। এই সেদিন চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে বাড়ির ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা থালায় জল লইয়া হাঁ করিয়া বসিয়াছিল। গ্রহণ লাগিলে তাহারা দেখিবে। হঠাৎ শাশুড়ী ঠাকরুণ বলিলেন, "হাঁ বৌমা, কালীচরণ যে পাঁজি দেখে বলে গেল, সাতটার পূর্ব্বেই গেরণ লাগবে, সাতটা ত বেজে গেল, কৈ একবার ভাল করে পাঁজিটা দেখ দেখি গা।" দেখিলাম, পাঁজিতে লেখা আছে, দর্শনাভাব'। বলিলাম, "গেরণ হয়ত লাগবে, কিন্তু দেখা যাবে না।" ঠাকরুণ বিশ্বাস করিলেন না, বলিলেন, "সে কি কথা বৌমা? কালী যে বেশ করে দেখে বলে গেল, দশানা ভাব দেখা যাবে, আর তুমি বলছ একেবারেই দেখা যাবে না? এ কি হয়? দশানা না হউক আটানা, আটানা না হউক চার আনাও ত দেখতে পাওয়া চাই।" কালীচরণকে ডাকানো হইলে আমি আড়ালে থাকিয়া বলিলাম, "সরকার-মশায়, পাঁজিতে দর্শনাভাব লেখা আছে—গেরণ ত দেখতে পাওয়া যাবে না।" কালীচরণ হাসিয়া বলিল, "বৌমা, কর্ত্তা স্বর্গে গেছেন—তিনি বলতেন, গাঁয়ের মধ্যে পাঁজি দেখতে যদি কেউ থাকে ত সে কালী। ঐ যার নাম দর্শনাভাব, তারই নাম দশানাভাব! শুদ্ধ করে লিখতে গেলে ঐ রকম লিখতে হয়! এ বড় শক্ত বিদ্যে বৌমা, পাঁজি দেখে দেওয়া যে সে লোকের কাজ নয়।" আমি অবাক হইয়া গিয়া 'রেফের' উল্লেখ করিয়া বলিলাম, "শ'য়ের মাথায় ঐ খোঁচাটার মত তবে কি রয়েচে? 'আ'কারটা এদিকে না থেকে ওদিকে কেন?" কিন্তু আমার কোন কথাই খাটিল না। কালীচরণ সাদৃশ্য দেখিতে পাইয়াছে—সে হটিল না। বরং আরো হাসিয়া বলিল, "বৌমা, ওগুলো শুধু দেখবার বাহার। ছাপাড়েরা মনে করেছে, ঐগুলো দিলে বেশ দেখতে হবে! শোননি, লোকে কথায় বলে—যেন ছাপাড়ের বিদ্যে। ওগুলো কিছুই নয়।" এই বলিয়া সে 'দর্শনাভাব'কে দশানা ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া জয়োল্লাসে হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল। তবু, সে বাড়ির গোমস্তা—ব্যাকরণ পড়ে নাই। সে-রাত্রে যদি সে ঠাকুরমশায়ের মত 'র-ল-ড-লয়োরভেদঃ' শুনাইয়া দিতে পারিত, তাহা হইলে আমার আর মুখ দেখাইবার পথ থাকিত না। যাই হউক, এ-সব ঘরের কথা,—না বলিলেও চলিত এবং কালীচরণ শুনিলে হয়ত দুঃখ

করিবে, কিন্তু সামান্য 'রেফ'টাকে তুচ্ছ করিয়া, 'দর্শনাভাব'টাও যে দশানাভাবে দাঁড়ায়, এমন কি, সাদৃশ্যের জোরে এবং 'র-ল-ড'য়ের সাহায্যে এশিয়া মাইনরের কানানাইটও কলিঙ্গের কানকাটায় ষোল আনা রূপান্তরিত হয়, এই তুচ্ছ কথাটাই আজ ঠাকুরমশায়কে সবিনয়ে নিবেদন করিবার বাসনা করিয়াছি। এখন কোন পাঠক যদি ধরিয়া বসে দশানাটা বুঝি, ষোল আনাটা কি? তাহা এই। উক্ত প্রবন্ধে ঠাকুরমশায় শুরুতেই বলিতেছেন—"পাঠক শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, এই কানানাইটদিগের সহিত [উড়িষ্যার] কানকাটার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে" (দশানা-ভাব)। পরেই বলিতেছেন—"কানানাইটরা ইস্রেল-প্রবাসী কানকাটা ছাড়া আর কিছুই নয়" (ষোল আনা ভাব)। পাঠকেরা যে রীতিমত বিস্মিত হইবে, তাহা তিনি ঠিক ধরিয়াছেন। এমন কি, চন্দ্রগ্রহণের রাত্রের অপেক্ষাও। যাহা হোক, এই ষোল আনার স্বপক্ষে ঠাকুরমশায় বলিতেছেন—"ইহাদিগের উভয়ের দেবতা, উভয়ের আচার-প্রথার মধ্যে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য। উভয় জাতির আচার-প্রথা, উহাদিগের দেব-দেবী ইত্যাদি সকল বিষয় আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কানানাইট ও কানকাটা উহারা উভয়ে একজাতীয় জীব।...প্রথমে উহাদের দেবতা ও নরবলি-দান-প্রথা বিষয়ে যে কিরূপ ঐক্য, তাহাই দেখাইতেছি। ভারতের কানকাটা বা কন্ধকাটারা যদিও নানা দেবদেবীর উপাসনা করে বটে, কিন্তু তাহাদের সর্ব্বপ্রধান দেবতা—ভূমির উর্ব্বরা শক্তির দেবতা বা ভূ-দেবী 'তারী' বা 'তাড়ী'। ভূমির উর্ব্বরাশক্তি এই দেবীর উপরেই নির্ভর করে বলিয়াই তাহাদের বিশ্বাস। এই দেবীর সন্তোষের জন্যই বিশেষ কর্ম্মে তাহারা নরবলি বা শিশুবলি দিতে প্রবৃত্ত হয়।" এই উভয় জাতির দেবতা যে একই দেবতা, তাহা দেখাইবার জন্য ঋতেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, "কানানাইটদিগেরও প্রধান দেবতা উর্ব্বরা শক্তির দেবী। Their chief deity Astarte, the goddess of fertility." "কন্ধদিগের ভূ-দেবী তারী বা তাড়ী (Tari) ও কানানাইটদিগের দেবী Ishtar (ষ্টার) বা Astarte (আসটার্ট) উহারা একই শব্দের বিভিন্নরূপ মাত্র, কেবল দেশভেদ উচ্চারণভেদ ঘটিয়া সামান্য বৈলক্ষণ্য উৎপাদন করিয়াছে। যেমন সংস্কৃত 'তার' বা 'তারকা' শব্দে পূর্ব্বের 's' যুক্ত হইয়া star হইতে দেখা যায়, সেইরূপ এই 'তারী' শব্দের পূর্ব্বে 's' বা 'as' যুক্ত হইয়া Ishtar বা Astarte-রূপে পরিণত হইয়াছে। উচ্চারণকালে 'ট'য়ে 'ড'য়ে বিশেষ প্রভেদ নাই।' ইত্যাদি, ইত্যাদি যেহেতু 'র-ল-ড লয়োরভেদঃ।' প্রথমে এই দেবীটির আলোচনা প্রয়োজন। ঐক্য যাহা থাকিবার তাহা ত উনিই একরকম দেখাইয়াছেন, অনৈক্য কোথায়, তাহাই বলা আবশ্যক।

ঋতেন্দ্রবাবু যেই দেখিতে পাইলেন 'উর্ব্বরা শক্তি' অমনি দুইটাকে এক করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু উর্ব্বরা শক্তি মানে কি জমির উর্ব্বরা শক্তি? নারীর সন্তান

প্রসব করিবার শক্তিকে কি বলে? উঁহার কথাটা ঐ পর্য্যন্ত সত্য যে, উভয় জাতিই উর্ব্বরা শক্তির পূজা করিত, কিন্তু কানানাইটরা যে উর্ব্বরা শক্তির পূজা করিত তাহা জমির নয়, নারীর। কারণ, যে চিহ্ন (symbol) দ্বারা আসটার্ট দেবীটিকে প্রকাশ করা হইত, এবং যে কারণে দেবীর মন্দিরে 'temple prostitution' প্রচলিত ছিল, এবং যেহেতু "the licentious worship of the devotees of Astarte in her temple in Tyre and Sidon rendered the names of these cities synonymous with all that was wicked" তাহা ভূমির উর্ব্বরা শক্তি হইতেই পারে না। পুরাতন ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ইতিহাসের যে কোন একটা খুলিয়া দেখিলেই পাওয়া যায়, Astarte কে Venus দেবীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। যথা—Astarte the Syrian Venus ভীনস্ ভূ-দেবী নয়। আরো একটা কথা, এই খোন্দদিগের তাড়ী দেবীর মত কানানাইটদের আসটার্ট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা ছিলেন না। ইনি 'বাল' দেবতার পত্নীরূপেই পূজা পাইতেন। দেশে যতগুলি 'বালিম' ছিলেন, ততগুলিই বিভিন্ন আসটার্ট ছিলেন। এমন কি, এই দেবীটিকে কোন কোন স্থানে 'শেম্বাল' পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে। 'শেম্বাল' অর্থে বালদেবতার ছায়া। ইনি পরে অনেকগুলি নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। (2, Kings 23, 13)। বাইবেলে আশ্টারথ বলা হইয়াছে। আলেন সাহেব একস্থানে বলিয়াছেন "Thc Astarte given to Hellas under the alias of Aphrodite came back again as Aphrodite to Astarte's old Sanctuaries" কিন্তু ইহার সাবেক নাম ছিল 'আশেরা' সুতরাং 'তাড়ী'র সহিত যদি কাহারো সম্বন্ধ থাকা উচিত ত এই আশেরার, আসটার্টের নয়। আমার ব্যাকরণে তেমন বোধশোধ নাই, থাকিলেও যে এই 'আশেরা' শব্দটাকে 'র-ল-ড'য়ের জোরে 'তাড়ী' করিয়া তুলিতে পারিতাম, সে ভরসা ত জোর করিয়া পাঠককে দিতে পারিলাম না। তারপরে নরবলির কথা। পৃথিবীর যে সমস্ত প্রাচীন জাতি ভূ-দেবীর পূজা করিত এবং প্রসন্ন করিতে নরবলি দিত, তাহাদের মধ্যে না পাই কোথাও আসটার্ট দেবীকে, না পাই তাঁহার ভক্ত কানানাইটদিগকে। পাইলেও ত মনে হয় না, তাহা এমন কিছু প্রমাণ করিত যে, খোন্দ এবং কানানাইট একই ধর্ম্মের আইন-কানুন মানিয়া চলিয়াছিল। দক্ষিণ-আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা (Indians of Guayaquil) জমিতে বীজ বপন করিবার দিনে নরবলি দিত। প্রাচীন মেক্সিকোর অধিবাসীরা Conceiving the maize as a personal being who went through the whole course of life between seed time and harvest, sacrificed new-born babies when the maize was sown, older

children when it had sprouted and so on till it was fully ripe when they sacrificed old men." পাউনিরা ভূমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করিতে প্রতি বৎসর নরবলি দিত। দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রাচীন কঙ্গোর রাণী "used to sacrifice a man and woman in March; they were killed with spades and hoes." গিনি প্রদেশের অনেক স্থানেই "It was the custom annually to impale a young girl alive soon after the spring equinox in order to secure good crops. A similar sacrifice is still annually offered at Benin." বেচুয়ানা জাতিরাও ভাল ফসল পাইবার জন্য নরবলি দিত। আমাদের ভারতবর্ষের গোঁড়েরাও এক সময়ে ভূমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করিতে ব্রাহ্মণশিশু চুরি করিয়া আনিয়া ভূ-দেবীর সম্মুখে বিষাক্ত তীর দিয়া বিদ্ধ করিয়া হত্যা করিত। অস্ট্রেলিয়ার অসভ্য অধিবাসীরাও একটি কন্যাকে জীবন্ত পুঁতিয়া ফেলিয়া ভূ-দেবীকে প্রসন্ন করিত এবং সেই গোরের উপর সমস্ত গ্রামের শস্যবীজ চুপড়িতে করিয়া রাখিয়া যাইত। তাহারা বিশ্বাস করিত, মেয়েটি দেবতা হইয়া ঐ সমস্ত বীজের মধ্যে প্রবেশ করিবে এবং শস্য ভাল হইবে। প্রাচীন মিশরেও "sacrificed red-haired man to satisfy corn-god." সাইবেরিয়াতেও এইরকম বলির প্রথা ছিল। ইহারা কেহ আমেরিকার, কেহ আফ্রিকার, কেহ এশিয়ার, কেহ অস্ট্রেলিয়ার বাসিন্দা। একই রকমের ভূ-দেবী পূজা। ঐক্য দেখিয়া মনে হয়, ইহারা সকলেই এক একবার কানকাটার দেশে আসিয়া শিখিয়া গিয়াছিল। কিন্তু কবে কেমন করিয়া আসিয়াছিল, সে কথা ইতিহাসে লেখে না, অতএব বলিতে পারিলাম না। ঠাকুরমশায় Encyclopaedia Britannica হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, "কানানাইটের দেশে numerous jars with the skeletons of Infants পাওয়া গিয়াছে, we cannot doubt that the sacrificing of children was practised on a large scale among the Cananites." এ ঠিক কথা। কানানাইটরা শিশু বলি দিয়া কটাহের মধ্যে আশেরা দেবীকে নিবেদিত করিত; কিন্তু তিনি কোথায় পাইলেন—খোন্দেরাও শিশু বলি দিয়া ভূ-দেবীকে নিবেদন করিত? তাহারাও শিশু হত্যা করিত সত্য, কিন্তু সে হত্যা দেবতার নৈবেদ্যের জন্য নয়। অনেকটা দারিদ্র্যের ভয়ে, অনেকটা ভূত-প্রেতের দৃষ্টি লাগিয়াছে এই কুসংস্কারে। হত্যা করা মানেই বলি দেওয়া নয়। তবে, কানানাইটদের কটাহের (jars) সঙ্গে এইটুকু মাত্র ঐক্য আছে যে, কন্দকাটারাও বড় বড় জালা জলপূর্ণ করিয়া তাহাতে শিশুটিকে ডুবাইয়া মারিত। কারণ, আর কোনরূপে হত্যা করা তাহারা বিধিসঙ্গত মনে করিত না। কথাটা কোথায়

পড়িয়াছি মনে করিতে পারিতেছি না, কিন্তু কোথায় যেন পড়িয়াছি, কে একজন এক বৃদ্ধ খোন্দকে প্রশ্ন করিয়াছিল, "বাপু, তোমরা এমন যন্ত্রণা দিয়া বধ কর কেন, আর কোন সহজ উপায় অবলম্বন কর না কেন?" সে জবাব দিয়েছিল, "এ-ছাড়া আর কোন উপায়ে মারা ভয়ঙ্কর 'পাপম্'। কটাহের ঐক্য এই যা। সে দশ আনাই হউক আর ষোল আনাই হউক।"

ঋতেন্দ্রবাবু বাইবেলের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, "শিশুঘাতক কানানাইটরা যে সকলকে কিরূপ বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল" ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কলিঙ্গের খোন্দেরা কবে কাহাকে এমন করিয়া বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল, এবং কোন্ দিন কাহার ছেলেমেয়ে চুরি করিয়া আনিয়া দেবতার পূজা দিয়াছিল, তাহা আমার জানা নাই। তাহারা যাহাকে ভূ-দেবীর কাছে বলি দিত তাহাকে 'মিরিয়া' বলিত, এবং এই 'মিরিয়া,' তা সে নর নারী যেই হউক, যৌবনপ্রাপ্ত না হইলে কিছুতেই দেবতাকে উৎসর্গ করা হইত না। তাহারা কানানাইটদের মত ছেলে চুরি করিয়া আনিয়া যে বলি দিত না, তাহার একটা চড় প্রমান এই যে, তাহারা মরণাপন্ন 'মিরিয়ার' কর্ণমূলে এই কথা উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিতে থাকিত, "তোমাকে দাম দিয়া কিনিয়াছি—আমাদের কোন পাপ নাই—কোন পাপ নাই—আমরা নির্দ্দোষ।" কিন্তু, কানানাইটদের সম্বন্ধে এরূপ কিছু আবৃত্তি করিবার নিয়ম ছিল কি? ছিল না। ঋতেন্দ্রবাবু নিজেও প্রবন্ধের এক স্থলে ম্যাকফার্সন সাহেবের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখিয়াছেন, খোন্দেরা আর যাহাই হউক, চোর-ডাকাত ছিল না। তা ছাড়া, কানানাইটদের দেবমন্দিরে শিশুর পঞ্জর দেখিতে পাওয়াটা ঠাকুরমশায়ের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেয় না বরং বিপক্ষে দেয়। তিনি লিখিয়াছেন, কানানাইটদের দেবমন্দিরাদি খনন করিতে করিতে পুরাতত্ত্বানুসন্ধানীরা এমন বৃহদাকার পাত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহার মধ্য হইতে শিশুর সমস্ত পঞ্জর প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এ-সকলই দেবোদ্দেশে শিশু-বলিদানের নিদর্শন বলিয়া পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন।" আমিও করি। কিন্তু, তিনি একটু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইতেন, ইহাদের বলির শিশুগুলি ভূমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধিকল্পে ভূ-দেবীকে উৎসর্গ করা হইলে তাহাদের সমগ্র অস্থিপঞ্জর পাওয়া ত ঢের দূরের কথা, এক টুকরা হাড়ও মিলিত না। কারণ, পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, যাহারাই ভূ-দেবীর প্রীত্যর্থে নরবলী দিয়াছে, তাহারাই মৃতদেহটাকে কোন-না কোন রকমে ভূমির সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছে। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানীর জন্য কটাহে করিয়া তুলিয়া রাখিয়া যায় নাই। উড়িষ্যার কন্দকাটারাও রাখে নাই। তাহারা মৃতদেহটাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া গ্রামের সকলে মিলিয়া ভাগ করিয়া যে যাহার নিজের ক্ষেতে পুঁতিত এমন কি, অবশিষ্ট নাড়িভুঁড়ি হাড়গোড়গুলোকেও ছাড়িত না। দগ্ধ

করিয়া জলে গুলিয়া জমিতে ছিটাইয়া তাহার উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করিয়া তবে শান্ত হইত। এত দূর ত দেবীমাহাত্ম্যে এবং তাঁহার পূজার নৈবেদ্যে কাটিল। ইহাতে ঐক্য অনৈক্য যাহা আছে, তাহা বিচার করিবার ভার পাঠকের উপরে।

ঋতেন্দ্রবাবু এইবার দ্বিতীয় ঐক্যের অবতারণা করিয়াছেন। বলিতেছেন—"যে যেখানে থাকে, তাহার সেই আবাসস্থানের তুল্য প্রিয় আর কি হইতে পারে? তালগাছ কানকাটাদের আবাসবৃক্ষ; এই কারণে তালগাছ ত উহাদের প্রিয় হইবেই। আবার এই তালগাছপ্রিয়তা কানানাইটদের মধ্যেও বড় অল্প লক্ষিত হয় না। কানানাইটরাও বড় তালগাছভক্ত জাতি। তালজাতীয় বৃক্ষ উহাদের এতই প্রিয় যে, কানানাইটদের অন্যতম শাখার নাম ফিনীসিয়। (শব্দের উৎপত্তি তালজাতীয় গাছের নাম হইতে আসিয়াছে। ফিনীসিয় শব্দের উৎপত্তি 'ফাইনিক' শব্দ হইতে, উহার অর্থ 'তালের দেশ'—"phoenike signify the land of palms)"—যদিও 'ফইনস' অর্থাৎ লাল রং (scarlet) হইতেও ফিনীসিয়া হওয়া অসম্ভব নয়। যা হউক, ঋতেন্দ্রবাবুর এ যুক্তিটা ঠিক বোঝা গেল না। কারণ, দেশের তাল গাছটিকে ভালবাসার মধ্যে লওয়াতে আশ্চর্য্য হইবার বিষয় ত কিছুই দেখিতে পাই না। কানকাটাদের দেশে বিস্তর তালগাছ। তাহারা তালের কড়ি-বরগা করে, পাতার ঘর ছায়, চাটাই বুনিয়া শয্যা রচনা করে। বাইবেলের কানানাইটরাও পাম (palm) বড় ভালবাসে। কারণ, 'পাম' তাহাদের দেশের একটি অতি উপকারী বৃক্ষ এবং দেশে আছেও বিস্তর। কিন্তু ইহাতে কি প্রমাণ করে? আমাদের হুগলি জেলায় আমগাছ, তা ফলও ভাল, কাঠও ভাল, আছেও অনেক। আমরা আমগাছ ভালবাসি। বর্দ্ধমান জেলায় কাঁঠালগাছ বিস্তর। তারা ওটা খায়ও বেশী, গাছটাকেও স্নেহ করে—ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? কিন্তু ঋতেন্দ্রবাবু বলিতেছেন, "কারণ কি? উভয়েরই জাতিগত একতা ও উভয়ের এক আদিম বাসভূমিই উহার কারণ।" কিন্তু কেন? দেশের উপকারী গাছকে ভালবাসাই ত সঙ্গত এবং স্বাভাবিক। বরং উনি যদি দেখাইতে পারিতেন, কোন একটা বৃক্ষকে ভালবাসিবার ঠিক হেতু দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, অথচ উভয় জাতিই ভালবাসিয়াছে, তাহা হইলে একটা কথা হইতে পারিত। যেমন, শেওড়া গাছ। যদি দেখান যাইত, ঠাকুরবাড়ির (জগন্নাথ) লোকেও গাছটাকে শ্রদ্ধা করে এবং উড়িষ্যার কানকাটারাও করে, অথচ কেন করে বলা যায় না, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহাদের একজাতীয়তা সন্দেহ হইতে পারিত, কিন্তু এ-স্থলে কৈ, কিছুই ত চোখে ঠেকে না। আরো একটা কথা। কলিঙ্গ দেশের কানকাটার 'পাম' তালগাছ, কিন্তু বাইবেলের কানানাইটদের দেশের 'পাম' খেজুরগাছ। দুটোকেই সাহেবরা 'পাম' বলে, কিন্তু বাস্তবিক তাহারা কি এক? ফলের চেহারাতেও একটু প্রভেদ আছে, ওজনেও একটু কম-বেশী আছে।

তাল ফলটা খেজুর ফলটার চেয়ে একটু বড়। একসঙ্গে রাখিলে মিশিয়া যায় না, তাহা বোধ করি ঋতেন্দ্রবাবুও অস্বীকার করিবেন না। ভোজন করিতেও একরকম মনে হয় না। অতএব গাছ দুটোকে সাহেবরা যা ইচ্ছা বলুক, এক নয়। একটা তাল একটা খেজুর।

ঋতেন্দ্রবাবুর চতুর্থ ঐক্য। বলিতেছেন, "এইবারে পাঠকগণ আর একটি বিষয়ে কলিঙ্গবাসী কানকাটা ও কানানাইটদিগের মধ্যে একতা লক্ষ্য করুন। সেটি উঁহাদের উভয়ের জাতিগত রক্তবর্ণপ্রিয়তা। তাহারা কি পুরুষ, কি রমণী, সকলেই ঘোর লাল রঙের কাপড় পরিতে পারিলে অন্য কাপড় চায় না। বিশেষতঃ গঞ্জাম, বিশাখাপত্তন প্রভৃতি তাল কলিঙ্গ বা কানকাটার দেশের লোকেরা কাপড়ের পাকা লাল বেগুনি রং করিতে সিদ্ধহস্ত। কানকাটারাও ঠিক কলিঙ্গবাসীদের ন্যায় বড় লাল রংয়ের প্রিয়। কানানাইটদের অন্যতম শাখা ফিনীসিয়েরা কাপড়ের ঘোর লাল রং করিবার জন্য এতটা প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল যে, অনেকে অনুমান করেন 'ফইনস' শব্দ হইতে তাহাদের ফিনীসিয়া নামের উৎপত্তি হইয়াছে।" ঘোরতর একতা আছে, তাহা অস্বীকার করিতে পারিলাম না। কিন্তু দুই-একটা নিবেদনও আছে। প্রথম, এই যে, ফিনীসিয়রা যে লাল রঙের কাপড় তৈরী করিত, তাহা ঘরে পুরিয়া রাখিত না, দেশে-বিদেশে বিক্রয় করিত। যাহারা দাম দিয়া কিনিত, তাহারাও লাল রংটাও পছন্দ করিত, এ অনুমান বোধ করি খুব অসঙ্গত নয়। বস্তুতঃ তখনকার লোকেরা লাল রংটার এত অধিক আদর করিত যে, ফিনীসিয়দের ঐশ্বর্য্য মুখ্যতঃ লাল রংয়ের কারবারেই। তাহারা, যে সমস্ত জাতি বলিদান দিয়া ঠাকুর পূজা করিত, ঠাকুরকে রক্ত পান করাইত, তাহারা সকলেই লাল রং ব্যবহার করিতে ভালবাসিত। কেন বাসিত, কেন দেব-দেবীকে লাল রংয়ের কাপড় পরাইত, কেন লাল ফুল, লাল জবা, লাল চন্দন দিয়া সন্তোষ করিতে চাহিত, সে আলোচনা করিতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়। এ প্রবন্ধে তাহার স্থান নাই, আবশ্যকও নাই। শুধু এই স্থুল কথাটা বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে চাই যে, কেবল এই দুটো জাতিই ঘোর লাল রং ভালবাসিত না, সে সময়ে জগতের বার আনা লোকেই ভালবাসিত। তার পরে রং তৈরীর কথা। বিদ্যাটা খুব সম্ভব ফিনীসিয়েরাও কানকাটার কাছে শিখে নাই, কানকাটারাও ফিনীসিয়ের কাছে শিখে নাই। কানকাটারা অর্থাৎ কলিঙ্গবাসী খোন্দেরা, গাছের রস এবং তৃণমূল দিয়া রং তৈরী করিত, কিন্তু ফিনীসিয়েরা মুরে মাছের (Murex-purple shell-fish) মাংস সিদ্ধ করিয়া রং করিত। সুতরাং, বিদ্যাটা একত্র অর্জ্জন করা হইয়া থাকিলে একরকম হওয়াই সম্ভব ছিল। ও-মাছটা কানকাটার দেশের সমুদ্রেও দুষ্প্রাপ্য নয়। আর লাল রং ভালবাসাবাসিটা কি একটা তুলনার বস্তু হইতে পারে? উভয় জাতির চোহারায় সাদৃশ্য ছিল কি না, এ

সব কোন কথাই উঠিল না। কথা উঠিল উভয়েই লাল রং ভালবাসিত। এ-রকম ঐক্য আরো আছে। উভয় জাতিই চোখ বুজিয়া ঘুমাইতে ভালবাসিত, হাতে কিছু না থাকিলে হাত তুলাইয়া চলিতে পছন্দ করিত,—এ-সব ঐক্যের অবতারণাই বা না করিলেন কেন ?

ঠাকুরমশায়ের পঞ্চম ঐক্য—নামে। এটি সবচেয়ে চমৎকার। বলিতেছেন, ' কানানাইট-বংশীয় যে লোকটা ইস্রেলরাজ ডেভিডের শরীররক্ষী ছিল, তাহার নাম ছিল উড়িয়া (Uriah) এবং এই উড়িয়া নামটি কাকতালীয়বৎ হয় নাই। কেন না, কানানাইটেরা যে কলিঙ্গ বা উড্র-দেশীয় লোক, সেকালে সকলেরই জানা ছিল। সেই কারণেই যেমন নেপালী বা ভুটিয়া ভৃত্য থাকিলে তাহার নিজ নামের পরিবর্ত্তে নেপালী বা ভুটিয়া নামেই পরিচিত হয়. এ-ক্ষেত্রেও সেইরূপ হইয়াছে। উড্র হইতে উড়িয়ার উৎপত্তি। ইস্রেলী ভাষায় কি দেশের নামে, কি মনুষ্যের নামে 'ইয়া' অন্ত্য শব্দের প্রচলন বড় অধিক। যথা—জোসিয়া, জেডেকিয়া, হেজেকিয়া, সিরিয়া, ইত্যাদি।" এই কারণেই 'উড্র' শব্দের উপর 'ইয়া' অন্ত শব্দ লাগাইয়া ইস্রেলী ভাষায় উড়িয়া হইয়াছে। আমারও ছেলেবেলায় ডেভিড কপারফিল্ডের উড়িয়া হিপকে উড়ে মনে হইত। ভাবিতাম, লোকটা বিলেত গেল কিরূপে ? এখন দেখিতেছি কিরূপে গিয়াছিল ! আরও ভাবিতেছি, স্কানডেনেভিয়া, বটেভিয়া, সাইবিরিয়া প্রভৃতিও সম্ভবতঃ এমনি করিয়াই হইয়াছে। কারণ, এগুলোও একটা শব্দ কি-না দারুণ সন্দেহ। বরং ইস্রেলী 'ইয়া' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হওয়াই সঙ্গত এবং স্বাভাবিক। অতএব, 'উড়িয়া' যে একটা শব্দ নয়, "উড্র+ইয়া" তাহাও যেমন নিঃসংশয়ে অবধারিত হইল, সেকালে সকলেই যে জানিত কানানাইটরা উড্রদেশীয়, তাহাও তেমনি অবিসংবাদে স্থিরীকৃত হইল। বেশ ! তবে, একটা তুচ্ছ কথা এই যে, ঐ উড়িয়া লোকটা ছাড়া আরও বিস্তর 'উড়িয়া' কানানাইট তথায় ছিল। ইস্রেলদের সঙ্গে অনেক দিন অনেক রকমেই তাহাদের আলাপ। লড়ায়েও বটে, বিয়া-সাদিতেও বটে। আনন্দেও বটে, নিরানন্দেও বটে। বাইবেল গ্রন্থে নাম করা হইয়াছেও অনেকবার, কিন্তু এমনি আশ্চর্য্য যে, তাহাদের কোন স্বদেশীয়কেই আর 'উড়িয়া' বলিয়া আদর করিতে শুনিলাম না। বোধ করি ইস্রেলরাজ ডেভিডের নিষেধ ছিল। বলা যায় না—হইতেও পারে। ষষ্ঠ ঐক্যের অবতারণা করিয়া ঠাকুরমশায় বলিতেছেন, "রাজা ডেভিড যে উড্র-সন্তান কানানাইটকে তাঁহার শরীররক্ষক প্রহরী পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা সম্ভবতঃ তাহাদের জাতিগত গুণ দেখিয়া। বর্ত্তমান কালে সে কানানাইট জাতির অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই একই গোষ্ঠির কন্দকাটা এখনও ভারতের কলিঙ্গ বা উড্রদেশে বিদ্যমান। এই কন্দকাটার শারীরিক সুদৃঢ় গঠন দেখিলেই বুঝা যায়

যে, বাস্তবিক তাহারা শরীররক্ষক-পদে নিযুক্ত হইবার যোগ্য। শুধু ইহাই নহে, রাজপ্রহরীর যে-সকল গুণ থাকা আবশ্যক, সে-সকলও তাহাদের জাতির সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য। কাপ্তেন ম্যাকফার্সন লিখিয়াছেন,—"মিথ্যা কথা, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, গোপনীয় কথার প্রকাশ, এ-সকল কন্দেরা অধর্ম্ম এবং বীরের ন্যায় যুদ্ধে প্রাণত্যাগ ও যুদ্ধে শত্রুনাশ ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য করে।" বেশ কথা। এই জন্য আমিও ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, খোন্দেরা কানানাইটদের মত পরের ছেলে চুরি করিয়া বলি দিত না। কিন্তু খোন্দেরাই কি কানানাইটদের গোষ্ঠী, ফিনীসিয়রা নয়? ঋতেন্দ্রবাবুও ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছেন, এবং আমিও তাহার প্রতিবাদ করি নাই যে, কানানাইটরা ফিনীসিয়দের উপশাখা মাত্র। এবং এইজন্যই তিনি লাল রং-প্রিয়তা, লাল রং তৈরীর ক্ষমতা, তালগাছ বা খেজুর গাছে স্নেহ, 'ফইনস' শব্দ ইত্যাদি প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া ফিনীসিয়দের সহিত অভিন্নতা প্রমাণ করিতে যত্ন করিয়াছেন। বস্তুতঃ ফিনীসিয় ও কানানাইটে প্রভেদ নাই। প্রবন্ধের শেষে তিনি নিজেও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, "ফিনীসিয়রা কানানাইট জাতির অন্যতম শাখা।" কিন্তু এই ফিনীসিয়দের নৈতিক চরিত্রটা কিরূপ? ইস্কুলের ছেলেরাও জানে, ফিনীসিয়রা চুরি-ডাকাতি, বিশ্বাসঘাতকতা, নরহত্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার পাপেই সিদ্ধহস্ত ছিল। বাণিজ্য করিতে বিদেশে গিয়া নিজেদের নৌকা বা জাহাজ কোথাও লুকাইয়া রাখিয়া মাল-মসলা বিদেশী ক্রেতাদের সম্মুখে খুলিয়া ধরিত এবং যখন তাহারা নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে কেনা-বেচায় মগ্ন থাকিত, সুবিধা বুঝিয়া এই ফিনীসিয় ডাকাত বণিক তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া লুটপাট করিয়া লইত এবং যাহাকে পারিত ধরিয়া লইয়া নিজেদের জাহাজে উঠিয়া পাল তুলিয়া দিত। ইহাদিগকেই অন্যত্র দাসরূপে বিক্রয় করিয়া অর্থ অর্জ্জন করিত। বাস্তবিক, এমন অন্যায়, এমন অধর্ম্ম, এমন নিষ্ঠুরতা ছিল না, যাহা এই ফিনীসিয়রা না করিত। দিনে যাহাদের অতিথি হইত, রাত্রে তাহাদের গলাতেই ছুরি দিত। এ-সব ইতিহাসের প্রমাণ করা কথা। অনুমান বা কল্পনা নহে। এমন জাতির জ্ঞাতি হইয়াও উড়িষ্যার কন্দকাটারা এত বড় ধার্ম্মিক হইল কিরূপে? এবং এই ফিনীসিয় শরীররক্ষী উড়িয়াই বা এমন যুধিষ্ঠির হইলেন কি মনে করিয়া? ঋতেন্দ্রবাবু যদি এতটুকু বৈজ্ঞানিক বিচারপদ্ধতি অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন, ফিনীসিয়রা বা কানানাইটরা উড়িষ্যার খোন্দ জাতি হইলে নৈতিক চরিত্রে এমন আকাশ-পাতাল ব্যবধান হইত না। ইহার পরে তিনি রথের প্রসঙ্গ তুলিয়া বলিয়াছেন, "ইস্রেলরাজ [সলোমন] যে-সকল বিষয়ে কলিঙ্গবাসীদের অনুসরণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রথ ও মন্দিরাদি নির্ম্মাণই প্রধান উল্লেখযোগ্য।...কলিঙ্গবাসীরা চিরদিন রথের আড়ম্বরে আকৃষ্ট, রথের ধুমধাম, রথের জাঁকজমক কলিঙ্গের চারিদিকে। সলোমনের এক সহস্র চারি শত রথ নির্ম্মিত

হইয়াছিল।" হয় নাই এ-কথা কেহ বলে না। রাজা সলোমন অনেকগুলি লড়াই করিবার রথ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ঋতেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, কলিঙ্গসন্তানেরা সেগুলি গড়িয়া দিয়াছিল। তাহা হইতে পারে এবং না হইতেও পারে। হইতে পারে এইজন্য যে, ঠাকুরমহাশয়ের নিশ্চিত বিশ্বাস হইয়াছে যে, ফিনীসিয়রা উড়ে-দেশের লোক। উড়ে-দেশে জগন্নাথের রথ আছে, সুতরাং তাহারাই সলোমনের রথ তৈরী করিয়াছিল। আমার বিশ্বাস হয় না এইজন্য যে, একে ত ফিনীসিয়রা উড়ে নয়, তা ছাড়া রথ গড়িবার লোক আরও আছে। সলোমনের সময়ে, অর্থাৎ যীশুখৃষ্টের হাজার বৎসর পূর্ব্বে কলিঙ্গে রথের ধুমধাম কিরূপ ছিল এবং তাহারা কিরূপ রথ তৈরী করিতে পারিত, আমার তাহা জানা নাই। দ্বিতীয় কারণ, রাজা সলোমনের প্রতিবাসী মিশরীয়েরা বহু পূর্ব্ব হইতে সুন্দর মজবুত রথ করিবার জন্য বিখ্যাত ছিল। তাহাদিগের রথাদি কিরূপে তৈরী হইত, তাহা দ্বিবিধ কি ত্রিবিধ, কি কাঠের চাকা তৈরী হইত, সারথিরা কি কি জায়গীর প্রাপ্ত হইত, রথ-চালানো তাহাদিগকে জিমন্যাষ্টিকের মত কিরূপে রীতিমত অভ্যাস করিতে হইত, ইত্যাদি অনেক কথা বাল্যকালে মিশরের ইতিহাসে পড়িয়াছি। তাহা মনে নাই। মনে রাখিবার আবশ্যকও তখন দেখি নাই। কিন্তু এটা মনে আছে যে, প্রাচীন মিশরীয়েরা চমৎকার রথ গড়িতে পারিত। এবং ইহাও মনে হইতেছে, কিছুদিন পূর্ব্বে Struggle of the Nations পুস্তকের দ্বিতীয় কি তৃতীয় অধ্যায়ে দেখিয়াছি, একজন আসীরিয় রাজা ফারাওর (মিশরের রাজা) নিকট পরাজিত হইয়া এই বলিয়া দুঃখ করিয়াছিল, "যদি উহাদের মত লড়াই করিবার রথ থাকিত, তাহা হইলে এ দুর্দ্দশা ঘটিত না।" ফল কথা, তখনকার লোকে রথের উপকারিতা বুঝিত এবং সলোমনের মত বুদ্ধিমান ও ভুবনবিখ্যাত নরপতিও তাহা বুঝিয়াছিলেন এবং সেইজন্যেই অত রথ তৈরী করাইয়াছিলেন। কিন্তু কথা এই, কে গড়িয়াছিল ? উড়িষ্যাবাসীরা কিংবা মিশরবাসীরা ?

বাইবেল গ্রন্থে লেখা আছে, রাজা সলোমন মিশরের রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং মিশরের সহিত আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন "(I Kings 3, 1 and Solomon made affinity with Pharaoh king of Egypt and took Pharoh's daughter &c)" এমন অবস্থায় কেমন করিয়া নিঃসংশয়ে স্থির করা যাইতে পারে, রথগুলি কুটুম্ব এবং প্রতিবাসী মিশরীয়েরা গড়িয়া দেয় নাই, দিয়াছিল কলিঙ্গবাসীর জ্ঞাতি কানানাইটরা। অতঃপর ঋতেন্দ্রবাবু প্রমাণ দিতেছেন, "রাজা সলোমন-প্রতিষ্ঠিত নগরের নাম 'তাড়মর'—এটি সংস্কৃতমূলক কলিঙ্গ নাম। অর্থাৎ 'তাল' বা 'তাড়' একই কথা।" তা হইতে পারে। কেন না, র-ল-ডয়ের জোরে ইতিপূর্ব্বে 'আশেরা' 'তাড়ী' হইয়াছে। এখন 'তাল'কে 'তাড়' করিতে আপত্তি করিলে লোকে আমাকেই নিন্দা করিবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ঐ শব্দটা কি কলিঙ্গ

ছাড়া আর কোন উপায়েই ইংরেজী ভাষায় ঢুকিতে পারে না? তা ছাড়া, 'তাল'টা না হয় 'তাড়' হইল, কিন্তু 'মর'টা কি? যাই হউক, এই 'তাড়মর' সম্বন্ধে আমার কিছুই জানা নাই, সুতরাং এ বিচার ভাষাবিদেরা করিবেন—আমি চুপ করিয়া রহিলাম। কিন্তু, পরিশেষে আমার একটু বক্তব্যও আছে। সেটা এই যে, "কানকাটা বলে, আমি তালগাছে থাকি, যে ছেলেটা কাঁদে তার কাঁধটি ধরে নাচি" ছড়া—কবির গানটির উপর নির্ভর করিয়া ঋতেন্দ্রবাবু টানিয়া-বুনিয়া যে-সব ঐক্য সংগ্রহ করিয়া বাইবেলের কানানাইটকে উড়িষ্যার কানকাটা বানাইয়াছেন, তাহার অনৈক্যও আছে। সেইগুলিকে অস্বীকার করা উচিত হয় নাই। হইতে পারে তাঁহার কথাই ঠিক, আমার ভুল, কিন্তু মিল-অমিল যখন দু-ই আছে, তখন উভয়কেই চোখের সুমুখে রাখিয়াই তাঁহার বৈজ্ঞানিক সত্যে উপনীত হওয়া উচিত ছিল। আমি এতক্ষণ এই কথাটাই বলিবার প্রয়াস পাইয়াছি মাত্র, আর কিছুই নয়। তবে বাংলা ভাষায় আমার কিছুমাত্র দখল নাই, তাই হয়ত কথাগুলাও গুছাইয়া বলিতে পারি নাই এবং ঠাকুরমশায়ের কাছে তেমন শ্রুতিমধুর ও সুখপাঠ্য করিয়াও তুলিতে পারি নাই। তথাপি আশা করিতেছি, এই কিঞ্চিৎকর প্রতিবাদ যদি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ত তিনি নিজগুণে এ-ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া লইয়া পড়িবেন, এবং ভবিষ্যতে আর কখন এমন ত্রুটি না করিতে হয়, সে ব্যবস্থাও দয়া করিয়া করিবেন।

—শ্রীমতি অনিলা দেবী

('যমুনা, আষাঢ়, ১৩২০)

চন্দননগরে আলাপ-সভায়

শরৎবাবু বলিলেন—"আপনাদের এখানে আসার ইচ্ছা আমার বরাবরই ছিল। নানা কাজের ঝঞ্ঝাটে আর শরীর ভাল নয় বলে আসা হয়ে ওঠেনি। বক্তৃতা আমি করতে জানি না। আমি সেবার যখন এখানে আসি, তখন বিশেষ কিছু বক্তৃতা দিইনি। অনেক সভাসমিতিতে যাই, কিন্তু মামুলী ধরণে দু-চারটা কথা বলে যাওয়া—ও আমি পারি না। সেবার কারও সঙ্গে বিশেষ আলাপ পরিচয় হয়নি। তাই আর একদিন এসে আলাপ করার ইচ্ছা ছিল। বলেছিলুম, লিখে কিছু বলে যাব। তাও ঘটে উঠল না।

চারুবাবু আমাকে প্রশ্ন করার ভার আপনাদের উপর দিয়েছেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা—যা এক হয়ে রূপ নিয়েছে আমার লেখার মধ্যে, আমার সাহিত্যে—তাই নিয়ে কিছু বলতে পারি। এ-রকম (আলোচনা-সভা) যদি হয়, আর যাঁরা সাহিত্যিক, সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁদের কৌতূহল আছে, তাঁরা যদি আমায় (কোন লেখাদি সম্বন্ধে ?) কি করে হয়, কেমন করে হয় প্রশ্ন করেন—আমার জ্ঞানগম্য হলে যথাসাধ্য উত্তর দিতে চেষ্টা করব। তবে এমন নয় যে, সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি পারব, কিংবা উত্তর দিতে আমি বাধ্য।

ছেলেবেলায় এখানে একবার আসি। খুব faint মনে আছে—আমার বয়স তখন চার কি পাঁচ। বোড়াই চণ্ডীতলায়—একতলা বাড়ি, কাছে পুকুর—কুণ্ডুমশাইয়ের বাড়ি—এমনি দু-চারটা কথা ছাড়া আর বিশেষ কিছু মনে নেই। ঠাকুর-মা রাগ করে এখানে চলে আসেন। আমিও তাঁর সঙ্গে আসি। সে অনেক দিনের কথা। এখন আমার বয়স ৫৫ বৎসর। About fifty years—প্রায় ৫০ বৎসর আগেকার কথা। এই দিক দিয়ে আপনাদের সঙ্গে আমার একটা আত্মীয়তা থাকার কথা বলা যায়। এখন একেবারে বাইরে গিয়ে পড়েছি। আমার মতামত প্রভৃতি (সম্বন্ধে ?) যদি কিছু জিজ্ঞাসা করেন (ভাল) যদি না হয় আপত্তি নেই—(এতে আর কিছু না হয়) আলাপ পরিচয় হয়। মতিবাবুর কথাও কিছু আজকে শুনতে চাই।"

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তখন অনুরোধ করিলেন—"আপনি আপনার বংশ পরিচয় ও সাহিত্যিক career-এর landmarks-এর কথা কিছু আমাদের বলুন।"

শরৎবাবু বলিলেন,—"বংশ-পরিচয় আপনাকে কিছু দিয়েছি বলে সবাইকেই দেব

না-কি? শুনলে দুঃখ বোধ হবে—বংশের কোনও গৌরবই আমি রাখি না…… যাঁরা আমাদের প্রাচীন ইতিহাস মাটি খুঁড়ে, পাথর খুঁড়ে বার করেছেন আর বলেছেন—এই দেখ আমাদের এই ছিল, ঐ ছিল—আমি তাদের কথায় খুশি হই না। আমার বুক তাতে ফুলে ওঠে না। আমি বলি—আমাদের কিছুই ছিল না। এতে দুঃখ করবার কিছু নেই। নিজের জীবনের পরিচয় দিই না। দু-হাজার বছর আগে আমাদের কি ছিল না-ছিল—তার কথা পাথর মাটি খুঁড়ে আমাদের শুনিয়ে কাজ নেই। আমার কথা পুরান জিনিস নিয়ে গৌরব করে কাজ হবে না। নূতন গড়ে তোল। জাত সম্বন্ধেও তাই, নাই বা থাকল জাত—এমন ছেলে দেখা যায়, যার বংশ-পরিচয় দেবার কিছু নেই—সে নিজের জোরে বড় হয়েছে, successful হয়েছে—আমারও মনের ভাব তাই। আমার একখানা বই বন্ধ হয়ে আছে—"শেষ প্রশ্ন," তাতে এই সম্বন্ধেই আলোচনা করেছি। যা কিছু বর্ত্তমানে চলছে তার অনেক-কিছুর উপর তাতে কটাক্ষ আছে, attack আছে। মতিবাবু হয়ত খুবই রাগ করবেন—তিনি ত রেগেই আছেন—বইখানা এখনও শেষ হয়নি—বোধ হয় দু-চার দিনের মধ্যে লেখা শেষ হবে। শেষ হলে তা পড়লে হয়ত তিনি খুশী হবেন না।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের বংশের একটা খ্যাতি আছে। আমাদের বংশে আটপুরুষ ধরে একজন করে সন্ন্যাসী হয়ে আসছে। আমার মেজ ভাই সন্ন্যাসী। আমার মাতুল-বংশ ধর্ম্মভীরু বংশ। মাতামহ খুব গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। আমিও খুব …এমন কি চার-পাঁচবার সন্ন্যাসী হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি। ভাল-ভাল সন্ন্যাসীরা যা করে থাকেন—অর্থাৎ গঞ্জিকা-সেবনাদি—তা অনেক করেছি। এখন একেবারে উল্টা। এই ধর্ম্ম নিয়ে চলার যে একটা পথ—মতিবাবু যা করেন—তিনি যে line নিয়ে চলেছেন—বোধ হয় এ-সম্বন্ধে কিছু বলা এখানে শোভন হবে না। ওপথ আমার মোটেই নয়।

মতিবাবুর বই আমি খুবই পড়ি—ওঁর যা-কিছু লেখা খুব মন দিয়েই পড়েছি। এই দেশটাকে তিনি আবার পুরাতন ধর্ম্মের উপর দাঁড় করাতে চান—নূতন জাত গড়তে চান, কিন্তু basis হ'ল ধর্ম্ম—ভগবদ্ভক্তি—এই সমস্ত। শাস্ত্রে-টাস্ত্রে অনেক সাধনার কথা আছে,—আমার unfortunately মনটা একেবারে উল্টা দিকে গেছে—সাধনার আর কোন মূল্য খুঁজে পাই না। শাস্ত্র-সাধনা যা ছিল, সবই যদি এত বড় ছিল, আমরা এত ছোট হলুম কেন? নানা লোকে নানা কথা বলবে। চোখের উপর দেখছি সব জাতিই—যাদের আত্মসম্মানবোধ খুব বেশি—তারা স্বাধীন বলে পৃথিবীতে নিজের পরিচয় দিচ্ছে। আমরা এত বড় হয়েও একবার পাঠান, একবার মোঘল, একবার ইংরেজের জুতোর তলায় পিষে মরছি! কেন—তার কোন

জবাব দিতে পারি না। আমরা বলি—আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন খুব বড়—কিন্তু বাহিরের লোক সে-কথা বিশ্বাস করে না। মনে মনে হাসে কি-না—জানি না। এতই যদি বড় ত ছোট হয়ে যাচ্ছি কেন? এই যে দেশটা ত্যাগের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, আমার মনে হয়, ঠিক এরই মধ্যে কোথায় একটা গলদ ঢুকে আছে—সেটা খুঁজেও পাচ্ছি না। ক্রমশঃ (অবনতির স্তরে) নেমেই যাচ্ছি। আমার বইখানা শেষ হয়ে গেলে (দেখবেন) তাতে এই সব মতের আলোচনা করেছি। পাঁচজনকে আহ্বান করে বলছি বলে দিন—এই হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের দুর্দ্দশা কেন হ'ল? এটা কেমন করে সম্ভব হ'ল--কেউ যদি বা'র করতে পারেন—দেশের মহা উপকার হবে! কোন উপায় চোখের উপর দেখতেও পাই না। নিজের শক্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে পারি না, কিছু বিশ্বাস নেই—এটাই যদি বড় জিনিস হয়, কি আশা আছে? আপনারাই বলুন--এর ভিতর কি গলদ আছে? মতিবাবুকেও বলি, এই আলোচনা-সভায় বলুন—কোনখানটায় গলদ আছে---যার জন্য এত বড় শাস্তিভোগ করছি? আমি মনে করেছি—politics-এ আর থাকব না। কোন দিনই বেশি (সম্বন্ধ) ছিল না। আমি এই lineই নেব—ধ্বংস করার কাজ নেব। সমস্ত জিনিস ছোট করে দেখব। খুব বড় ছিলাম অথচ result nil! আমাদের কিছুই ছিল না। তার জন্য দুঃখও নাই। বড় হয়ে ওঠ, যে পথে আর দশ জনে বড় হয়ে উঠেছে। আমাদের সঙ্গে তাদের মেলে না—তারাই বড়—এ কথা বললেই চলবে না—আমরা যা বলি, তা করি না—মিথ্যাবাদী—এটা বড় অসত্য বটে, তবু এটাই একমাত্র কারণ নয়। (এ-সম্বন্ধে) আলোচনা হোক। আমি এ পন্থাই নেব। আমাদের কিছুই ছিল না। ২০০০ বছর আগে কি ছিল, তা নিয়ে গর্ব্ব করব না। যাদের ছিল তাদের সঙ্গে আমাদের কোন যোগ নেই—রক্তেরও যোগ নেই, ধর্ম্মেরও যোগ নেই—শুধু এক দেশে বাস করি, এইমাত্র। তাদের সঙ্গে সম্পর্কের কথা মৌখিক পড়ি, যোগ দেখতে পাই না। কেউ যদি বুঝিয়ে দিতে পারেন—এইটা এই রকমই বটে, তা হলে আলাদা কথা। নহিলে মনে হতে পারে, আমার লেখার ভিতর দিয়ে ক্ষতি হতে পারে। বছর তের-চৌদ্দ আগে অনেকেই মনে করেছিলেন যে, আমি সাহিত্য নষ্ট করে দিলাম। এমন কি, বড় বড় লোকের মনেও ধারণা জন্মেছিল যে, আমি যা লেখা আরম্ভ করেছি, তাতে বুঝি সমস্তই ধ্বংস হয়ে যাবে। এখন সেই মত নাই—এখন অনেকে বলেন—বিশেষ young menরা—"আপনি ভাল পথই নিয়েছেন—আপনার কথা মেনে নেব।" যে জিনিসটা বললুম, জানি হয়ত তার প্রতিবাদ উঠবে। স্পষ্টই বললুম,—রেখে ঢেকে নয়। যদি আপনারা বলেন—এ পথটা ঠিক নয়—কেন যদি দেখিয়ে দিতে পারেন, তা হলে আবার ভেবে দেখব। মতিবাবুকেও এ-কথা বলছি। মোট কথা এই, আমি

সংস্কারের পক্ষপাতী নই। পুরান জিনিসটার পোষাক বদলে নেওয়া আমি চাই না। 'পথের দাবী'তে বুঝিয়েছি—সংস্কার জিনিসটার মানে কি। ওটা ভাল কিছু নয়। যেটা খারাপ জিনিস্ অনেক দিন চ'লে ধড়ধড়ে নড়নড়ে হয়ে পড়েছে—সেটা মেরামত করে আবার দাঁড় করান। যেমন গভর্নমেণ্টের শাসন-সংস্কার—reforms —আর এক দল যারা revolution চাইছে—revolution মানে অন্য কিছু নয়, একটা আমূল পরিবর্ত্তন। আমাদের বৃদ্ধের দল এটা চান না, তাঁরা চান reforms অর্থাৎ মেরামত করা। আমার মনে হয়—মেরামত করে জিনিসটা ভাল হয় না। যা আছে তারই পরমায়ু বাড়িয়ে তোলা হয়। যেটা অচল হয়ে পড়ছে, সেটা negleot-দ্বারা হয়ত আপনি ধ্বংস হয়ে যেত—সেটা শক্ত মজবুত করে আবার খাড়া করা হয়। যেটা খারাপ, তাকে মেরামত করে সংস্কার করে আবার দাঁড় করান উচিত নয়। মতিবাবুও মনে করেছেন—আমাদের ধর্ম্মটাকে সংস্কার করে মেরামত করে সেইটাকেই আবার দাঁড় করাবেন। আমি বলি—মেরামত নয়—ত্রৈটিকেই বাদ দাও। আবার তাকে মেরামত করে খাড়া করবার দরকার কি? ছ-সাত শ' বছরের পুরানো জিনিসটা আবার যদি দাঁড় করাও, আবার সেটা হাজার বছর ধরে চলবে। আচ্ছা মতিবাবুই বলুন—এ-সম্বন্ধে উনি কি মনে করেন।"

মতিবাবু—"শরৎবাবু আমার কাছ থেকে কিছু শুনতে চেয়েছেন।·· তবে ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি যা বললেন সে-সম্বন্ধে দু-একটা কথা আমি না বলে পারি না! ধর্ম্মকে তিনি নাকচ করতে চেয়েছেন। ফরাসী জাতিও ধর্ম্মকে নাকচ করতে চেয়েছিল, তবু তার পরিবর্ত্তে তারা দিয়েছিল সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা—negation-এর পর একটা positive কিছু দেওয়া ত চাই। শরৎবাবু ধর্ম্মকে নাকচ করে তার পরিবর্ত্তে কি দিয়ে যাবেন? এটা জিজ্ঞাসা করার আমার অধিকার আছে। আমি ধর্ম্মকে মেরামত করে, ঝড়তি পড়তি বাদ দিয়ে দাঁড় করাতে চাই না। আমার সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আমি এইটাই বলেছি—ধর্ম্ম আমরা পাইনি। আমাদের দেশ ধর্ম্মকে ঠিক অধিকার করতে পারেনি—ধর্ম্ম অর্থে মোক্ষবাদকেই পুরোভাগে ধরে রেখেছে। ভারতের ৬০ লক্ষ সন্ন্যাসী এই মোক্ষের আকাঙ্ক্ষী হয়ে বনে-জঙ্গলে গিরিকন্দরে বাসা নিয়েছে। এই ৬০ লক্ষ সন্ন্যাসীকে বাদ দিয়েও ভারতের ৩২ কোটী ৪০ লক্ষ (যদি ৩৩ কোটি মোটামুটি অধিবাসীর সংখ্যা ধরা হয়) মানুষ যারা সংসারে বাস করছে, তারাও ধর্ম্মের পরিণাম মোক্ষবাদই জানে। কর্ম্মক্ষয় হলে মানুষের মোক্ষপ্রাপ্ত হবে—এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে আছে। ধর্ম্ম বলতে যদি মোক্ষবাদই একমাত্র বুঝায়, জীবনকে বাদ দিয়েই ধর্ম্ম হয়, তবে ধর্ম্মবস্তু খুব অসার হয়ে যাবে, তাতে সন্দেহ নেই। ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ এ নয়। ধর্ম্ম বলতে realisation, যা fact, যা reality, তারই উপর দাঁড়াতে হবে। ধ্বংসের রুদ্র হয়ে যদি আপনি এসে

থাকেন, আপনি সব ভেঙ্গে যেতে পারেন ; কিন্তু আমার মনে হয়, ধ্বংসের গানের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠার চিন্তাও আপনার মধ্যে রয়েছে। উদীয়মান জাতির পক্ষ থেকে, আপনার কাছ থেকে একটা Positive something চাইছি। আপনি আঘাত দিতে পারেন, কিন্তু আমার বিশ্বাসকে 'না' করতে পারেন না। আপনারও যেমন একটা বিশ্বাস আছে, আপনার 'হাঁ'-কে আমি 'না' করাতে পারব না, তেমনি আমারও একটা বিশ্বাস আছে।

ধর্মকে মেরামত নয়, আমি ধর্মের নূতন রূপ দিতে বলি। ধর্ম মোক্ষবাদ নয়. হিন্দু আজ ধর্ম বলতে (জীবনকে বাদ দিয়ে ?) আত্মপ্রতারণা করছে। এত বড় insincerity হিন্দুর মত আর কোথাও নেই। অক্ষমতা যার মূল ভিত্তি, সে জাতি কখনও প্রতিষ্ঠা পায় না।...আপনার লেখার মধ্যে যে বাস্তবতার পরিচয় পাই —ধ্বংসনীতিরও মধ্য দিয়ে সেই রকম একটা Positive কিছুর সন্ধান আপনাকে দিতে হবে। 'শেষ প্রশ্নে'র পরও আপনাকে লেখনী ধরতে হবে। শেষ আলো আপনাকে দিয়ে যেতেই হবে, বলতে হবে—"ধ্বংসের পর কি দিয়ে গেলেন!"

শরৎবাবু—"মতিবাবুর কথায় আমার কথার ঠিক উত্তর পেলুম না। আমার কথাটা বোধ হয় ধরতে পারছেন না ? আমি এই কথাই বলতে চাই—মেরামত করে কিছু দাঁড় করাচ্ছেন—(এটা ভাল নয় ?)"

মতিবাবু—"বলেছি—ভারতের ধর্ম মোক্ষ নয়। মুক্তির অর্থ—বাসনা ও অহঙ্কার থেকে মুক্তি—জীবন থেকে মুক্তি নয়। মুক্তি—মুচ্ ধাতু থেকে—অহং ও বাসনা গেলে, এই জীবনেই মুক্তির আস্বাদ পাওয়া যেতে পারে, জীবনকে লয় করে নয়। বাসনা-অহঙ্কার-মুক্ত মানুষ Infinite Power-এর সঙ্গে যুক্ত হবে—Bliss and Light-এর reflection জীবনকে অধিকার করবে। মুক্তির আস্বাদ ইহজীবনেই লাভ না করতে পারলে ধর্মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। শ্রদ্ধা-বস্তুর একটা সনাতন রূপ আছে—যে জিনিসটার উপর কোটী কোটী লোকের শ্রদ্ধা আছে, সেটাকে ভাঙবার চেষ্টা না করে, তার যোগ্য ব্যবহার করতে পারলেই আমরা অধিকতর ফল লাভ করব। এ-সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা পরে হবে। এই সভায় অধিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে আপনার মহামূল্য উপদেশ থেকে বঞ্চিত হতে চাই না।"

শরৎবাবু—"মহামূল্য উপদেশ কিছু দিতে পারব না। আমি যেটা করব বলুম—(?)

অহঙ্কার ও বাসনা হতে মুক্তির কথা যা বল্লেন—সেগুলির দরকার। তবে আর আর জাত—যারা (আমাদের মাথায় পা দিয়ে বেড়াচ্ছে (?) তারা সব যেভাবে বড় হয়েছে, সেইভাবে (আমাদের বড় হতে হবে ?)"—

মতিবাবু—"তাঁদেরই মত হতে বলছেন। রোমও একদিন খুব বড় সভ্য জাতি হয়েছিল, কিন্তু তাদের সে সভ্যতার এখন কতটুকু অস্তিত্ব আছে।"

শরৎবাবু—"দেখুন এ-কথায় আমি সান্ত্বনা পাই না। তাদের মত করেও যদি আমরা বড় হতে পারি—(তাতে ক্ষতি কি ?)"

মতিবাবু—"তাতে নিশ্চিহ্ন হবার আশঙ্কা আছে।"

শরৎবাবু—"পৃথিবীর সমস্ত জাতি নিজের পায়ে ভর করে দাঁড়াচ্ছে—বড় হয়ে উঠছে; আমরা পারি না, নিতান্ত নিরুপায়। সেই অবস্থায় আরও ৫০০ বছর পরে কি হবে ভাবতে যাব না। রোমের মত ধ্বংস হয়ে গেলেও (এখন কিভাবে উন্নতি হবে তাই ভাবতে চাই)। আমার বলবার উদ্দেশ্য—আমি বড় চিন্তায় পড়েছি। Politics এ যোগ দিয়েছিলুম। এখন তা থেকে অবসর নিয়েছি। ও হাঙ্গামায় সুবিধা করতে পারিনি। অনেক সময় নষ্ট হ'ল। এতটা সময় নষ্ট না করলেও হ'ত। যা গেছে তা গেছে—খানিকটা অভিজ্ঞতা জমা হয়ে রইল। (এখন থেকে আমি আমার লেখা নিয়েই থাকব ?) আমার কথাটা বোধ হয় আপনারা ঠিক বোঝেননি—"

এই সময় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ গোস্বামী প্রশ্ন তুলিলেন—

গোস্বামী মহাশয়—"আমাদের কিছু যে ছিল না, তার প্রমাণ কি ?"

শরৎবাবু—"প্রমাণ আমাদের অবস্থা।"

গোস্বামী—"কি-রকম প্রমাণ। আচ্ছা ধরুন—আমার বাপ-পিতামহ বড়লোক ছিলেন, খুব ঘটা করে দোল-দুর্গোৎসব করে গেছেন; আমি আজ গরীব হয়েছি বলেই কি বলব, আমার বাপ-পিতামহ দোল-দুর্গোৎসব করে-নি ? সেটা কি সত্য হবে ?"

শরৎবাবু—"আমি তা বলব না। কিন্তু এ-কথা বলব যে, তাঁরা তাঁদের ঐ দোল-দুর্গোৎসবের মধ্য দিয়েই আমাকে এই দুর্দ্দশায় এনে ফেলেছেন।"

চারুবাবু—"দু-ই ঠিক এক কথা নয়···কিছু না থেকে কিছু হওয়ার প্রশ্ন উঠেছে। আপনি এইবার আপনার সাহিত্যিক জীবন সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলুন—কেমন করে আপনার সাহিত্যচর্চ্চার স্পৃহা কিছু নয়, অর্থাৎ অসাহিত্যিক থেকে আপনাকে বিশ্ববিশ্রুত সাহিত্যিক রূপে পরিণত করে তুলল, তার ক্রমবিকাশের কথা বলুন।"

শরৎবাবু—(স-রহস্যে)"ভুল, আমি সাহিত্যিক নই—পেটের দায়ে সাহিত্যিক।"

চারুবাবু—"আপনার এই কথাটা আমরা বিশ্বাস করব না। জানতে চাই, আপনার সাহিত্য-জীবনের সূত্রটা কি করে ক্রমবিকাশের ফলে উচ্চশিখরে এসে দাঁড়িয়েছে।"

শরৎবাবু—"সাহিত্যের গোড়ার কথা হ'ল 'সহিত' থেকে—অর্থাৎ সকলের সহিত সহানুভূতি দরকার। এইটাই মূল কথা।

আমার কি-রকমে কি হ'ল তা জানি না। ছেলেবেলা থেকেই লেখাপড়ার একটা ঝোঁক ছিল। মনের ভিতর থেকে একটা বাসনা হ'ত—যা বাইরে পাঁচ রকম দেখছি শুনছি তার একটি রূপ দেওয়া যায় না? হঠাৎ একদিন লিখতে শুরু করে দিলাম। প্রথমটায় অবশ্য এ'র ও'র চুরি করেই অধিকাংশ লিখতাম। অভিজ্ঞতা না থাকলে ভাল কিছুই লেখা যায় না। অভিজ্ঞতা লাভের জন্য অনেক কিছুই করতে হয়। অতি ভদ্র শ্রান্ত শিষ্ট জীবন হবে, আর সমস্ত অভিজ্ঞতা লাভ হবে—তা হয় না। বলেছি—ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক— আমাকে চার-পাঁচবার সন্ন্যাসী হতে হয়েছিল। ভাল ভাল সন্ন্যাসীরা যা করেন সবই করেছি। গাঁজা মালপো কিছুই বাদ যায় নি।"

[শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্য হইতে একজন টিপ্পনী করিয়া বলিল—'বিদ্যে খুব পেকেই তবে এসেছে—দেখছি!"

শরৎবাবু উপযুক্ত উত্তরই দিলেন—'ওসব বিদ্যে না পাকলে কিছুই হবার জো নেই মশাই।"

তারপর বলিতে লাগিলেন।

"বিশ বছর এটাতে গেল। ঐ সময় খানকতক বই লিখে ফেললুম। 'দেবদাস' প্রভৃতি ঐ আঠার-কুড়ির মধ্যে লেখা। তারপর গান-বাজনা শিখতে লাগলুম। পাঁচ বছর ঐতে গেল। তার পর পেটের দায়ে চলে গেলাম নানা দিকে। প্রচণ্ড অভিজ্ঞতা তাই থেকে। এমন অনেক কিছু করতে হ'ত যাকে ঠিক ভাল বলা যায় না। তবে সুকৃতি ছিল, ওর মধ্যে ডুবে পড়িনি। দেখতে থাকতাম, সমস্ত খুঁটিনাটি খুঁজে বেড়াতাম। অভিজ্ঞতা জমা হ'ত। সমস্ত Islandগুলা (বর্ম্মা, জাভা, বোর্নিয়ো) ঘুরে বেড়াতাম। সেখানকার লোক অধিকাংশ ভাল নয়—smugglers. এই সব অভিজ্ঞতার ফল—'পথের দাবী'। বাড়িতে বসে আর্ম-চেয়ারে বসে সাহিত্য-সৃষ্টি হয় না, অনুকরন করা যেতে পারে। কিন্তু সত্যিকার মানুষ না দেখলে সাহিত্য হয় না। এঁরা করেন কি—বই থেকে একটা 'ক্যারেক্টার' নিয়ে তাকেই একটু অদল-বদল করে আর একটা ক্যারেক্টার সৃষ্টি করেন। মানুষ কি, তা মানুষ না দেখলে বোঝা যায় না। অতি কুৎসিত নোংরামির ভিতরও এত মনুষ্যত্ব দেখছি যা কল্পনা করা যায় না। সে-সব অভিজ্ঞতা আমার মনের ভেতর থাকতে লাগল। আমার memoryটা বড্ড ভাল। ছেলেবেলা থেকে intact আছে, নষ্ট হয়নি। জানবার ইচ্ছা আমার বরাবর আছে। মানুষের ভিতরকার সত্তাটা realise করাই আমার উদ্দেশ্য। যার একটা স্খলন হ'ল, মানুষ তাকে একেবারে বাদ দেবে—এ কেমন কথা?

আমি মানুষের ভেতরটা বরাবর দেখি। এ বললে, সে বললে, পরের মুখে ঝাল খাওয়া, পরের অভিজ্ঞতাকে নিজের করে নেওয়া—এ আমার কোনদিন ছিল না। অতি বড় দুর্ভাগ্যই এ করবে। সত্যিকারের জীবন দেখতে গেলে শুচিবাইগ্রস্থ হলে চলে না। যে অভিজ্ঞতার ফলে গোর্কি, টলষ্টয়, শেক্সপিয়ার পর্য্যন্ত অত শুচিগ্রস্থ হতে পারেননি। তাঁদের ও শুচিবাই ছিল না। Concrete রচনা করতে গেলে কল্পনা চলে না। নিজের অভিজ্ঞতা চাই। পরের লেখা সাহিত্য আমি খুব কম পড়েছি। ও আমার ভাল লাগে না। আমার বাড়িতে যে বই আছে, তার অধিকাংশ সয়েন্সের বই। সেই জন্যই আমার বইয়ে যুক্তির অবতারণা বা synthetic result বেশী। রূপের বর্ণনা, স্বভাবের বর্ণনা বইয়ের মধ্যে নেই। ও আমি দু-এক কথায় সেরে নিই, বেশী নজর দিই না। আসল বস্তু তার সত্তা বা মন যাই বলুন—সেটা মানুষের ভিতরটা। সেইটা উপলব্ধি করবার জন্য চাই প্রচণ্ড অভিজ্ঞতা। আমার অভিজ্ঞতা কি করে সঞ্চয় করেছি তার detailও বলবার প্রয়োজন নেই—সব বলবার মতও নয়। মানুষ (সংস্কারবশতঃ বা দুর্ব্বলতা-হেতু) সে-সব সহ্য করিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের সেই গানটায় (?) যেমন আছে (বিষ যেটা) সেটা শুধু আমারই উপর পড়ল—তা থেকে যা বেড়িয়ে এল, সেটা সকলকে দিয়েছি (আমার সাহিত্যের মধ্য দিয়ে) অনেকে বলে থাকেন এবং rightly বলে থাকেন—'আপনার চরিত্রগুলি পড়লে মনে হয় যেন এরা কল্পনার বস্তু নয়'। আমার চরিত্রগুলির 90% basis সত্য। তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে, সত্যি মাত্রই সাহিত্য নয়। এমন অনেক সত্যি আছে যা সাহিত্যপদবাচ্য হতে পারে না। কিন্তু সত্যের উপর বনেদ না খাড়া করলে চরিত্র জীবন্ত হয় না। বনেদ নিরেট হলে আর ভয় নেই—যাই বললে অস্বাভাবিক, অমনি বদলে ফেলতে হয় না। আমি যে চরিত্র দেখেছি, পারিপার্শ্বিক অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তার যে পরিণতি দেখছি তাই লিখেছি। তাই আমার ভয়ের কারণ নাই। লোকে সেগুলোকে অস্বাভাবিক বললেই আমি মানব না। এই রকম করে আমার সাহিত্য জীবন গড়ে উঠেছে।"

চারুবাবু প্রশ্ন করিলেন—"আপনার যেটা গভীরতর সাহিত্যিক বস্তু, সেটা কেমন করে গড়ে উঠল ? ভাবকে আপনি রূপ দেন কি করে ? বলবার যে ভঙ্গি, যে গড়ন, আগাগোড়া যে রস, যে আকাঙ্খা (?) যে লালিত্য—এ ভাষা কোথায় পেলেন ? আপনার মুখের ভাষার সঙ্গে আপনার বইয়ের ভাষার কোন মিল নেই—না এ 'পথের দাবী'র ভাষা, না অন্য কোন বইয়ের ভাষা।"

শরৎবাবু বলিলেন—"সেটা বলতে পারি না। ভাষাটা আপনি আসে, আমার লেখার ধরণটা সাধারণ থেকে আলাদা। পূর্ব্বেই বলেছি—আমার স্মরণশক্তি খুব তীক্ষ্ণ। আবাল্য যা দেখেছি শুনেছি, সবই যে সব সময়ে মনে থাকে তা নয়, তবে

প্রয়োজন হলে এসে পড়ে। প্রথমে চরিত্রগুলি আমি ঠিক করে নিই—এক, দুই, তিন করে। গল্পের আরম্ভ করা বা চরিত্রগুলিকে ফোটানো আমার পক্ষে অতি সহজ। অনেকে বলে—'আমরা প্লট পাই না বলে লিখি না'। আমি অবাক্ হই, এত বড় প্রকাণ্ড পৃথিবীটা পড়ে রয়েছে, এত বৈচিত্র্য—আর এরা প্লট খুঁজে পায় না! তার কারণ, তারা মানুষটাকে খোঁজে না, গল্প নিয়েই ব্যস্ত থাকে, কিসে লোকের মনোরঞ্জন হয়—আমি সেটা করি না। এই যেমন চারুবাবুকে দেখলুম—তার মন-বস্তুটা নষ্ট করি না, ঘটনাও না। আমার ভাষাটা বোধ হয় সায়েন্সের বই পড়ার দরুন ঐ-রকম হয়ে থাকবে। আমি ভাষা ভাল জানি না—vocabulary খুব কম—(তবু) লোকের ভাল লাগে কেন, জানি না। যা বোঝাতে চাই তা মনে (?) রাখি, তার জন্যে অনেক পরিশ্রম করি। 'সে' ও 'তিনি'—(প্রয়োগ খুব যত্ন করে করতে হয়)। লেখা অনেক ঘষামাজা করতে হয়—স্বতঃ উৎসের মত বেরোয় না। যারা বলে—যা লিখে যাব, তাই ভাল—তারা প্রকাণ্ড ভুল করে। মানুষের বলার মতন লেখাতেও অনেক irrelevant কথা থাকে। সেদিকে নজর রাখতে হয়। আমি যা-তা করে কোন কাজ করি না। সেই জন্য ভূমিকা করে আমার মত বুঝাতে হয় না। আমার কোন বইয়ে ভূমিকা নেই। চার-শো পাতা বই পড়ে যে বুঝলে না, সে চার পাতা ভূমিকা পড়ে বুঝবে? আমি বইয়ের মধ্যেই বোঝবার চেষ্টা করি—কোন কথা দ্ব্যর্থক না হয়, সেদিকে নজর রাখি। আমার সঙ্গে মতের মিল না হতে পারে; কিন্তু কেউ বলতে পারবে না যে, আপনার লেখা বুঝতে পারলাম না।

আর একটা জিনিস বরাবর দেখেছি—সাহিত্যরচনার গোটাকতক নিয়ম-কানুনও আছে। দেখতে হয়, রসবস্তু অশ্লীলতা-পর্য্যায়ে না এসে পড়ে। শ্লীলতা-অশ্লীলতার মধ্যে এমন একটি সূক্ষ্মরেখা আছে, যার এক ইঞ্চি ওদিকে পা পড়লেই সব vulgar—নষ্ট হয়ে যায়। একটু পা টলেছে ত আর রক্ষে নাই। অবশ্য আমি রসিক লোকের কথাই বলছি। vulgar সাহিত্য সর্ব্বদা বর্জ্জনীয়। মনোরঞ্জনের জন্য আমি কখনও মিথ্যে বলব না. এ-জিনিসটা আমি পারতপক্ষে করি না। কঠোর সমালোচনা আমি খুবই পেয়েছি। গলাগালির বন্যা বয়ে গেছে; দেশ বুঝে না, গ্রন্থকার, কবি, চিত্রকর—এঁদের জীবন সাধারণ থেকে ভিন্ন, এখানকার লোকে তা জানে না। জানে না যে, এঁদের স্নেহের প্রশ্রয় দিয়েই বাঁচিয়ে রাখতে হয়। মানুষ চায় এঁদের অভিজ্ঞতা লাভও হোক, আর আমাদের মতন শান্তশিষ্ট ভদ্র জীবন যাপন করুক। তা হয় না। আর ব্যথার বিষয়, আমাদের দেশের সমালোচনার মধ্যে ব্যক্তিগত ইঙ্গিতই থাকে বারো আনা। এ-সব সমালোচনা হয় মনুষ্যটার, বইটার নয়। এই জন্যে অনেকে ভয় পেয়ে যায়। 'বামুনের মেয়ে' বলে আমার একখানা বই আছে। অনেকে হয়ত

পড়েননি। লেখার সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয়; তাঁকে বলি, এই রকম একখানা বই লিখতে ইচ্ছা হয়; এ-সম্বন্ধে আমার অনেক ব্যক্তিগত experience আছে। তিনি বললেন, 'এখন ত আর কৌলিন্য নেই, একজনের ১০০ টা বিয়ে নেই, plot-এর ত ভাবনা নেই—তবে আর এটাকে ঘেঁটে কি হবে? তবে যদি সাহস থাকে লেখো, কিন্তু কিছু মিছে কল্পনা ক'রো না।' পুরানো ছাই ঘাঁটা আমারও উদ্দেশ্য নয়। কৌলিন্য প্রথাটা আমার বড় লেগেছিল। যাঁরা ব্রাহ্মণ বলে নিজেদের ভারি গৌরব বোধ করেন আর ভাবেন—ব্রাহ্মণের রক্ত অবিমিশ্রভাবে বয়ে এসেছে, তাঁদের সেটা মস্ত বড় ভুল ধারণা। ইংরাজীতে যাকে 'blue-blood' বলে, তা আর নেই। কৌলিন্য নিয়ে গোলমাল নিজের চোখে কত দেখেছি। ইতিহাসের কথা নয় নিজে যা দেখেছি তাই লিখেছি। এক-আধটা নয়, অনেক। অমন এক বাড়িতে, নেমন্তন্ন পর্য্যন্ত খেয়ে এসেছি। কৌলিন্য ভাল কি মন্দ—সে বিচার আমার নয়, ও আমি বলিও না। আমি এ-কথা কখনও বলি না যে, বৈদ্যের সঙ্গে কায়েতের বিয়ে দাও। তবে কেউ যদি দেয়, কালচার (শিক্ষাদীক্ষা) মেলে, তা হলে এটা বলি—'তাকে বাধা দিও না'। সে ভাল করলে কি মন্দ করলে সে আমার কথা নয়—অন্ততঃ সে মিথ্যাচারী নয়, এটা ত বলব। সে যেটা ভাল বুঝেছে, করেছে—সামাজিক তর্ক তুলে তাকে বাধা দেওয়া উচিত নয়। অনেকে মুখে বলেন, মেয়ের বিধবা-বিবাহ দাও; কিন্তু যেমনি নিজের মেয়ে বিধবা হ'ল, অমনি বলতে শুরু করেন—দেখুন, ও আমি পারব না; আমার আর পাঁচটা মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ-রকম মিথ্যাচার ভাল বলি না। রবীন্দ্রনাথ—যাঁর মত অত বড় প্রতিভা পৃথিবীতে আর জন্মাবে কি না সন্দেহ— উনিও তাই বললেন—'লেখো, কিন্তু মিথ্যার আশ্রয় নিও না'—কুলিন ব্রাহ্মণ আমি, আমারও লাগবে, ও-রকম করো না। (মিথ্যা করে চরিত্র গড়াও যায় না; যেখানে গড়া হয় সেইটাই মিথ্যা হয়, অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে)। বইখানা বেরুলে উঃ, সে কি আক্রমণ! চারিদিক থেকে বিয়ারিং চিঠি আসতে লাগলো।"

[সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতে, কথা প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছিল]

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র অনুরোধ করিলেন,—'politics সম্বন্ধে আপনার মত কি? বর্ত্তমান political movement সম্বন্ধে কিছু বলুন। এ movement কেমন চলছে বলে আপনার মনে হয়?"

শরৎবাবু "কেন, আপনি চালান-টালান না কি? চলছে বেশ! কিন্তু এ-সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে পারব না।"

[তাঁর লেখার প্রসঙ্গে কি কথায় তিনি বলিলেন]

"লেখার সময় যেন Transported হয়ে যাই। বাড়িতে বলে রেখে দিয়েছি—যখন লিখব, কেউ কিছু জিজ্ঞাসা ক'রো না। করলে যা উত্তর পাবে তা বিশ্বাস ক'রো না।" (সকলের হাস্য)।

"ভাষা আপনি আসে। যার আসে না, তার বড় মুস্কিল। কি করে কথা যোগায়, তা বলাও মুস্কিল।"

[Style-এর কথায়]

"এই গূঢ় (   )—এটাকেই না আপনারা style বলেন? এটা নিজেরই হয়। অনুকরণ করে হয় না।"

[সেই গোস্বামী মহাশয় পূর্ব্বাপর সমস্ত আলোচনা শ্রবণান্তে সহসা আবার কহিলেন]

গোস্বামী—"আপনি মুখে যাই বলুন, আপনার লেখা পড়ে আমার মনে হয়, আপনি সনাতন ধর্ম্মের মর্য্যাদা হানি করতে চাননি। যখন দেখি 'চরিত্রহীন' বইখানার সেই মেয়েটি স্টীমারের উপর একটি বালকের সহিত এক বিছানায় থেকেও নিজের দেহকে নষ্ট হতে দিল না, তখনও কি আমরা বলব—আপনি সনাতন ধর্ম্মটা মানেননি? আপনার অন্তরের অলৌকিক ধর্ম্মবিশ্বাসটাই কি ঐ মেয়েটির চরিত্ররক্ষার কারণ নয়?"

শরৎবাবু উত্তর করিলেন—"আপনি আমার উদ্দেশ্যটা ঠিক ধরতে পারেননি। আপনি যা বলছেন, ওভাবে আমি কিছুই করিনি। মেয়েটি যদি দেহ নষ্টই করত, তাতে আমার কিছু ক্ষতি ছিল না। কিন্তু ঐ চরিত্রটা একেবারে অসত্য হয়ে যেত। অমন লেখাপড়া-জানা সুশিক্ষিত মেয়ে, আর যে বালকের সঙ্গে সে কেবল একটা জিদের বশে পালিয়ে এলো, সে একটা অপোগণ্ড শিশু বললেই হয়, যাকে সে কোন দিক দিয়েই নিজের সমকক্ষ মনে করে না, তাকে দিয়েই যদি সে নিজের দেহটা নষ্ট হতে দিত তা হলে ও চরিত্রটাই মাটি হয়ে যেত।"

অতঃপর শরৎবাবু বলিলেন—"এ আলোচনায় আনন্দ পেলুম। শুধু আমাদের জন্য নয়, এ-রকম আলোচনা-সভার একটি সত্যিকার প্রয়োজনও আছে। দেশটাকে কিভাবে বড় করে তোলা যায়, নানা লোকের নানা মত রয়েছে। মাঝে মাঝে এই রকম পাঠক ও লেখক জড় হয়ে বিভিন্ন চেষ্টায় একটা সামঞ্জস্য করা দরকার। এতে লাভ আছে। আজকাল অনেকেই লিখছে; কিন্তু তাদের অনেককেই ঠিক লেখক বলা চলে না। তাদের লেখায় সংযম দেখা যায় না। যৌন সম্বন্ধ নিয়ে তারা এমন একটা গোলমাল করছে যে, তাদের লেখা সাহিত্যপদবাচ্য কি-না সন্দেহ। এ-সমস্ত লেখার অধিকাংশই বাহির থেকে আমদানি করা। নিজেদের অভিজ্ঞতা নেই—তাই পরের ধার-করা জিনিস চালাতে গিয়ে একটা বিশ্রী কাণ্ড করে

তুলছে। কেহ কিছু বললে তারা জিদের বশে বলে—'খুব করব, লিখব, বলব।' কিন্তু সেটা ঠিক নয়। এ-রকম সভা-সমিতি করে যদি তাদের সঙ্গে আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়, তা হলে তা থেকে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে।"

[শরৎবাবু কথাপ্রসঙ্গে এই কথাটি খুব জোর দিয়াই বলেন]

আমি মানুষকে খুব বড় বলেই মনে করি। তাকে ছোট করে আমি মনে করতে পারি না।*

---

* এই আলাপ-সভার অনুলিখিত বিবরণ ১৩৩৭ সালের কার্তিক সংখ্যা 'প্রবর্তকে' মুদ্রিত হয়। যে-সকল স্থানে অনৈক্য, অস্পষ্টতা বা অসঙ্গতি-দোষ আছে বলিয়া মনে হইয়াছে, সেই সকল স্থলে সংশয়-চিহ্ন দেওয়া আছে।

গ্রন্থ-পরিচয়

বিপ্রদাস

প্রথম প্রকাশ: ১৩৩৬ হইতে ১৩৩৮ সাল পর্যন্ত 'বেণু' পত্রিকায় সর্বপ্রথম 'বিপ্রদাস'-এর দশম পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়। তৎপরে উহা পূর্ণাঙ্গ আকারে প্রকাশিত হয় 'বিচিত্রা'য়। 'বিচিত্রা'য় প্রকাশকালে ১৩৩৯ সালের ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৪০ সালের বৈশাখ—আষাঢ় ও আশ্বিন—ফাল্গুন এবং ১৩৪১ সালের বৈশাখ, শ্রাবণ—ভাদ্র, কার্তিক—মাঘ।

পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ: ১৩৪১ সালের মাঘ মাস (১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫)

রমা (নাটক)

পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ, ১৩৩৫ (৪ঠা আগস্ট, ১৯২৮)। ইহা "পল্লী-সমাজ" উপন্যাসের নাট্যরূপ। ১৩৩৫ সালের ১৯শে শ্রাবণ, শনিবার, আর্ট থিয়েটার কর্তৃক স্টার রঙ্গমঞ্চে সর্বপ্রথম অভিনীত হয়।

রামের সুমতি

প্রথম প্রকাশ: ১৩১৯ সালের ফাল্গুন—চৈত্র সংখ্যা 'যমুনা' পত্রিকায় সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ: 'বিন্দুর ছেলে' ও 'পথ-নির্দেশ' গল্প দুইটির সহিত একত্রে ইহা সর্বপ্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৩২১ সালের শ্রাবণ মাসে (৩রা জুলাই, ১৯২৪)।

আলো ও ছায়া

প্রথম প্রকাশ: ১৩২১ সালের আষাঢ় ও ভাদ্র সংখ্যা 'যমুনা' পত্রিকায় সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ: 'কাশীনাথ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পুস্তকাকারে ইহার প্রথম প্রকাশ হয় ১৩২৪ সালের ভাদ্র মাসে (১লা সেপ্টেম্বর, ১৯১৭)।

মন্দির

প্রথম প্রকাশ: ১৩০৯ সালে 'কুন্তলীন' পুরস্কার-প্রাপ্ত রচনা। রচনাটি তখন সম্পর্কিত মাতুল ৺সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে প্রকাশিত হয়।

পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ: 'কাশীনাথ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পুস্তকাকারে ইহার প্রথম প্রকাশ হয় ১৩২৪ সালের ভাদ্র মাসে (১লা সেপ্টেম্বর, ১৯১৭)।

অপ্রকাশিত রচনাবলী

মুসলিম সাহিত্য-সমাজ: মুসলিম সাহিত্য-সমাজের দশম বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত অভিভাষণ (ঢাকা, ১৫ই শ্রাবণ, ১৩৪৩)। ১৩৪৩ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'বিচিত্রা'য় প্রথম প্রকাশিত। 'শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী'র অন্তর্ভুক্ত হইয়া ইহার প্রথম প্রকাশ হয় শ্রাবণ, ১৩৫৮ সালে।

মুসলমান-সাহিত্য: ঢাকায় 'শান্তি' পত্রিকার পক্ষ হইতে অনুষ্ঠিত সম্মিলনে ১৯৩৬ সালের ৩১শে জুলাই প্রদত্ত বক্তৃতা। ১৩৪৩ সালের ১৯শে ভাদ্র সংখ্যার 'বাতায়ন'-এ প্রকাশিত হয়। 'শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী'র অন্তর্ভুক্ত হইয়া ইহার প্রথম প্রকাশ হয় শ্রাবণ, ১৩৫৮ সালে।

কানকাটা: 'যমুনা' মাসিক পত্রিকার আষাঢ়, ১৩২০ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত। 'শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী'র অন্তর্ভুক্ত হইয়া ইহার প্রথম প্রকাশ হয় শ্রাবণ, ১৩৫৮ সালে। ইহা শ্রীমতী অনিলা দেবী এই ছদ্মনামের রচনা বলিয়া প্রকাশিত হয়।

চন্দননগরে আলাপ-সভায়: এই আলাপ-সভার অনুলিখিত বিবরণ সর্বপ্রথম ১৩৩১ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'প্রবর্ত্তকে' প্রকাশিত হয়। 'শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী'র অন্তর্ভুক্ত হইয়া ইহার প্রথম প্রকাশ হয় শ্রাবণ, ১৩৫৮ সালে।

ষষ্ঠ সম্ভার

সমাপ্ত